মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) : জীবন ও হাদীস চর্চা

MAWLANA ZAKARIA KANDHALOVI (RH.) : LIFE AND STUDY OF HADITH

গবেষক
আবু সায়িম মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং- ০২/২০১৯-২০২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) : জীবন ও হাদীস চর্চা** [MAWLANA ZAKARIA KANDHALOVI (RH.) : LIFE AND STUDY OF HADITH]" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভ (থিসিসটির) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

(আবু সায়িম মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন)
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জনাব আবু সায়িম মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) : জীবন ও হাদীস চর্চা** [**MAWLANA ZAKARIA KANDHALOVI (RH.) : LIFE AND STUDY OF HADITH**]" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচনা হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় ও সীমাহীন জ্ঞানের আধার মহান রাব্বুল 'আলামীনের, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, শান্তির শ্বেত পায়রা, রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ইমামুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সা.) এর উপর।

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপস্থাপিত গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন এর প্রতি; যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংযোজন-বিয়োজন, নানা বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও তিনি আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা ও যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা চিরস্মরণীয়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি। বিশেষ করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ছানাউল্লাহ এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমানসহ সকল শিক্ষক মহোদয়কে। এ ছাড়াও আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম। আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কমচারিবৃন্দের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি তাদের সাফল্যমণ্ডিত কল্যাণকর জীবন কামনা করছি। উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আমার পরিবারবর্গ এবং যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি তাদের লিখকবৃন্দের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আর যারা এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। এছাড়াও যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এ গবেষণা কর্মকে কবুল করে নিন। আমীন।

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন)

বাংলা ভাষায় ‘আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বহুল প্রচলিত ‘আরবি শব্দসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ হয়নি। এছাড়া যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	(উর্ধ্ব কমা) অ	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/ য	ه	ত/হ
د	দ	ع	(উল্টা কমা)	ء	(উর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ/য	غ	গ	ي	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ى	ইয়ে/ য়ে

শব্দসংকেত

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি.পূ.	:	খ্রিস্টপূর্ব
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
তাং	:	তারিখ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
স.	:	সংখ্যা
সং	:	সংস্করণ
সম্পা:	:	সম্পাদনা/সম্পাদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরী সন
বাং.	:	বাংলা সন
রা	:	রাযী আল্লাহু আনহু
র	:	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
সাবরী	:	কবি ইসমা‘ঈল সাবরী
(আ.)		আলাইহিস সালাম
p.	:	Page
Vol.	:	Volume
Pub	:	Publisher
Ed.	:	Edited by
Ibid	:	In the same place

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র/ii

প্রত্যয়নপত্র/iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার/iv

প্রতিবর্ণায়ন/v

শব্দসংকেত/ vi

সূচিপত্র /vii

ভূমিকা/ xi

প্রথম অধ্যায় : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র পরিচিতি ১-৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ : বংশ পরিচয় ০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জন্ম ও ছাত্র জীবন ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষকতা ও বৈবাহিক জীবন ৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হজ্জব্রত পালন ও হিজাযে স্থায়ী বসবাস ৬৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অসুস্থতা, অন্তিম মুহূর্ত ও দাফন ৭৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উত্তরাধিকার ও সন্তান-সন্ততি ৭৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দাওয়াতী জীবন ৯২-১৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় চিন্তাধারায় আপোষহীনতা ৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রমযান বরণের নমুনা ১০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দাওয়াতী কার্যক্রম ও সফর ১০৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অমিয় বাণী ১২০

তৃতীয় অধ্যায় : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষক, খলীফা ও সমকালীন 'আলিমগণ ১৩১-২৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষকবৃন্দ ১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র খলীফা ১৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সমকালীন আলিমগণ ১৯৭

চতুর্থ অধ্যায় : হাদীস চর্চায় মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র অবদান ২৭০-৩১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : শায়খুল হাদীসের রচনাবলী ২৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খুল হাদীসের অবদান ২৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের অনূদিত গ্রন্থাবলী **৩০১**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : *ফাযায়েলে আ'মাল* ও হাদীসের তাহকীক ৩০৬

উপসংহার ৩১৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভারতবর্ষের যে সকল খান্দান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'ইল্‌ম ও ফযল, প্রতিভা ও মনীষার আকররূপে বিরাজমান রয়েছে এ খান্দানটি হলো তাঁর অন্যতম– তাঁদের মূল মাতৃভূমি হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্‌ফরনগর জেলার ঝিনঝানা এলাকায়, পরবর্তীতে তাঁরা উক্ত জেলার কান্ধালা নগরীতে আবাসস্থল গড়ে তোলেন। ভারতবর্ষে এ খান্দানটি সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ খান্দানগুলোর তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ খান্দানটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভার সূতিকাগারের ভূমিকা রেখে আসছে। শুধু প্রজ্ঞা ও মেধা বিকাশে ভূমিকাই রাখেননি; বরং যুগে যুগে এ খান্দানে বহু আলেম, ফাযেল, জ্ঞানী-গুণী ও আল্লাহ্‌র কামিল বান্দাগণের জন্ম হয়েছে। উঁচু প্রতিভা ও অত্যুচ্চ হিম্মতই যাঁদের খান্দানী বৈশিষ্ট্য। এ দুই বৈশিষ্ট্য খান্দানটিকে এতোটাই অভিজাত ও স্বাতন্ত্র দান করেছে যে, সর্বযুগেই সেখানে জ্ঞানী-গুণী সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন জ্ঞানগভীরতা ও ব্যাপক প্রজ্ঞার অধিকারী। প্রত্যেক যুগেই তাঁরা নিজ সন্তানদেরকে প্রচলিত 'ইল্‌ম ও গভীর বুৎপত্তির দিকে পরিচালিত করে আসছেন। তাঁদের সে সতর্ক অভিভাবকত্ব সন্তানদের আল্লাহ্‌প্রদত্ত মেধাকে আরো সুতীক্ষ্ম করে তুলতো। এজন্যই তাঁদের মাঝে উচ্চমানসম্পন্ন ফকীহ ও মুফতী, 'আকলী ও নকলী উভয়বিধ জ্ঞানের সমৃদ্ধ 'আলিম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন কবি ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসকের উদ্ভব হয়েছে।

এ খান্দানের একদিকে হযরত শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) এর ও তাঁর উত্তরসূরিদের শিষ্যত্বের বদৌলতে সুন্নতের পায়রবি, আমল ও আকীদার পরিশুদ্ধি এবং জ্ঞান বিস্তারের প্রবণতা তাঁদের মাঝে সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে তাঁদের মানসিকতা ও অভিরুচিকে আরো উন্নত করে তুলেছে। তাওহীদ ও সুন্নতের অনুগামীতার সাথে সাথে আত্মোৎস্বর্গী মনোভাব এবং জিহাদ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা সংযোজিত হয়েছে।

এ খান্দানে মাওলানা মুযাফ্‌ফর হুসায়ন কান্ধালবী (রহ.) অনন্যসাধারণ তাকওয়া-পহেযগারী, অপূর্ব সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষা পরিবারের পুরুষদের সাথে নারী মহলেও তাক্‌ওয়া, পরহেযগারী, যিক্‌র ও 'ইবাদতের অভিরুচি তৈরি করেছে।

উপরন্ত এ খান্দানের আরেকটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হলো– উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কামালিয়্যাত ও রূহানিয়্যাত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও কামেল পুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ও শিষ্যত্ব বরণে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেননি।

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) ও সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এর পরবর্তী যুগে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) ও শাহ্ 'আবদুর রহীম রায়পুরী (রহ.) সহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন– যারা ছিলেন তৎকালীন সময়ের আত্মশুদ্ধি শাস্ত্রের ইমাম, তাঁদের

সাথে এ পরিবারের ছিলো নিবীড় বন্ধন। আলহামদুলিল্লাহ্– সে ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। এটা তাঁদের জ্ঞানপিপাসা ও হৃদয় মহত্বের পরিচায়ক, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ খান্দানের কবুলিয়াত এবং তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের সীমাহীন কৃপাদৃষ্টির জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে যে, এ খান্দানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই যামানার দাওয়াত ও ইসলাহ তথা ইসলাম প্রচার ও নৈতিকতার প্রসারের সে আযীমুশ শান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যার নযীর আজকের মুসলিমবিশ্বে দুর্লভ। জগদ্বিখ্যাত তাবলীগী দাওয়াত আন্দোলনের উৎস হচ্ছে এ খান্দানটি। এ খান্দানেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর মতো ব্যক্তিত্ব– যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এ যুগে দীনের বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যাঁর খুলুসিয়্যাত, দুর্লভ হিম্মত, উদার দৃষ্টি, কঠোর সাধনা ও ত্যাগের সুদূরপ্রসারী ফল ও বরকতসমূহ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাঁর ইনতিকালের পর এ কার্যক্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব। তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর বোনের ছেলে ও শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর ফুফাতো ভাই এবং তাঁদের উভয়ের সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা ইন'আমুল হাসান (রহ.) এর হাতে এ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। বর্তমানে দিল্লির নেযামুদ্দীনের আমীরের দায়িত্বে আছেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর চতুর্থ বংশধর মাওলানা মুহাম্মাদ সা'দ।

অনুরূপভাবে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর সত্তা পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁদের কামালাতসমূহের জীবন্ত স্মৃতিস্বরূপ এবং তাঁর খান্দানের মনীষীগণের দুর্জয় হিম্মত, মুজাহাদা, বহুমুখী প্রতিভা এবং উন্নত চরিত্রের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মূলতঃ আলোচ্য অভিসন্দর্ভে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র জীবন ও হাদীস চর্চায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হবে। মুসলিম সমাজে জীবন গঠনে তাঁর সময়োপযোগী চিন্তাধারা একজন মুসলমানকে প্রকৃত মুসলিম ও আদর্শ উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে। হাদীস চর্চায় তার নিরন্তর অভিযাত্রা বর্তমান মুসলিম প্রজন্মকে হাদীস বিষয়ে অধিক গবেষণা ও হাদীসের চর্চায় মনোযোগী করে তুলবে।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ) ছিলেন হাদীসের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সিহাহ সিত্তাসহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে তিনি মালেকী মাযহাবের হাদীসের গ্রন্থ *মুওয়াত্তা মালিকের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আওজাযুল মাসালিক* রচনা করে যে, অবদান রেখেছেন এ সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের মুফতী সায়্যিদ উলূভী, যিনি হিজাযসহ সমসাময়িক যুগের গোটা পৃথিবীর 'আলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর 'আলিমরূপে সুপরিচিত ছিলেন– তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) যদি *আওজাযুল*

Dhaka University Institutional Repository

মাসালিকের ভূমিকায় নিজেকে হানাফী বলে পরিচয় না দিতেন, তবে কেউ তাঁকে হানাফী বললে আমি বিশ্বাসই করতাম না; বরং তাঁকে মালেকী মাযহাবের একজন ইমাম বলেই মনে করতাম। এর কারণ হলো– তাঁর রচিত '*আওজাযুল মাসালিকে*' মালেকী মাযহাবের মাস্‌'আলাগুলোকে তিনি যেভাবে সুবিন্যস্ত ও বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিজেদের মালেকী মাযহাবের কিতাবগুলোতে এতো সহজে মাস'আলা বের করা যায় না; বরং অনেক ঘাঁটাঘাটি করে পাওয়া যায়।

আমার এ অভিসন্দর্ভে প্রথম অধ্যায় মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়ে শায়খুল হাদীস সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও দাওয়াতী জীবন-এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষক, খলীফা ও সমকালীন 'আলিমগণ-এর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁর রচনাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকের যে চাহিদা পূরণ করেছে তার আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর *ফাযায়েলে আ'মাল* গ্রন্থটি পৃথিবীর ৫৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে কবুল করুন এবং একে পরকালে মুক্তির উসিলা বানিয়ে দিন।

গ্রন্থপঞ্জী

১) আল-কুরআনুল কারীম

২) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনছারী আল খাজরাজী শামছুদ্দীন কুরতুবী, *আল-জামী লি-আহকামিল কুরআন,* কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিশরিয়্যাহ, ১৯৬৪ ঈ.।

৩) আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর, *তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম,* তাফসীরে ইবনে কাসীর, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ ঈ.।

৪) মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী,* বইরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ ঈ.।

৫) আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত তালাবী, *তাফসীরে কাবীর,* বোস্টনঃ ব্রীল একাডেমিক পাবলির্শাস, ২০০৪ ঈ.।

৬) আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে ওমর, *তাফসীরে খাজেন লি'বাবিত তা'য়িল ফি মা'য়ানিত তানযিল,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.।

৭) আবু হাইয়ান মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে হাইয়ান আল-আন্দালূসী, *আল বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪২০ হি.।

৮) আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে ওমর ইবনে আহমদ আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ আন হাকাইক গ'ওয়ামিদ আত-তানযীল,* বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১৪০৭ হি.।

৯) আবুল কাসেম হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল মা'রুফ আর রাগিব আল ইস্পাহানী, *তাফসীরে রাগিব আল ইস্পাহানী,* কুল্লিয়াতুল আদাবঃ জা'মিয়াতু তনতা, ১৯৯৯ ঈ.।

১০) জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মহল্লী ও জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস সুয়ূতি, *তাফসীরে জালালাইন,* কায়রোঃ দারুল হাদীস, তা.বি.।

১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), *নওয়ীর আল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা.),* দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহঃ লেবানন, তা.বি.।

১২) নিযামুদ্দীন হাছান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুছাইন আন-নিশাপুরী, *গারাইবুল কুরআন ওয়া র-গাইবুল ফুরকান* (তাফসীরে নিশাপুরী), বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি.।

১৩) ইসমাঈল হাক্কী বিন মোস্তফা আল-ইস্তাম্বুলী আল-হানাফী, *রুহুল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.।

১৪) আল্লামা কাযী নাসীরুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল বায়যাবী (র.), *আনওয়ার আত-তানযিল* (তাফসীরে বায়যাবী), বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৬ ঈ.।

১৫) আবু বকর ইবনে আল আরাবী, *আহকাম আল-কুরআন,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ ঈ.।

১৬) আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারী,* (সম্পাদনা পরিষদ কর্তিক সম্পাদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ ঈ.।

১৭) হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), *মা'রিফুল কুরআন,* (অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ ঈ.।

১৮) সাইয়ইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন,* (অনুবাদ- হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমাদ), লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স।

১৯) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *আস সহীহ,* মিশর: দারু-তওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি:।

২০) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ, তা.বি.।

২১) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরি আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম,* বৈরুত: দারু ইহইয়া উত-তুরাসুল আরাবী, তা.বি।

২২) ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.।

২৩) আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল আশআস ইবনে ইসহাক আল-আজদী আস-সিজিস্তানী, *আস সুনান,* বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২৭৫ হি.।

২৪) আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী আল খোরাসানী আন-নাসায়ী, *আস-সুনান,* হালাবঃ মাকতাবাতু মাতবুয়াত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬ ঈ.।

২৫) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল কাযবিনী, *আস সুনান,* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২৬) আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল,* মুয়াছ'ছাছাতুর রিছালাহ: ২০০১ ঈ.।

২৭) মালেক ইবনে আনাছ ইবনে মালেক ইবনে আমের, *মুয়াত্তা ইমাম মালেক,* বৈরুত: দারু ইহ-ইয়া উত-তুরাসুল আরাবী, ১৯৮৫ ঈ.।

২৮) আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম, *কিতাব আল-খারাজ,* আল মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত-তুরাস, তা.বি।

২৯) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'আদ শামছুদ্দীন ইবনে কাইয়েম জাওযী (র),*আহকামু আহলিয-যিম্মাহ,* দাম্মামঃ রমাদিউ লিন-নাশের, ১৯৯৭ ঈ.।

৩০) শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-খতীব আশ শিরবিনী আশ- শাফেয়ী, *মুগনীল মুহতাজ,* স্থা.বি.: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ: ১৯৯৪ ঈ.।

৩১) তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আঃ হালিম ইবনে আঃ ছালাম ইবনে তাইমিয়া (র.), *ফতওয়ায়ে কুবরা,* স্থা.বি., দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ ঈ.।

৩২) আবু মুহাম্মদ মুয়াফফাক আল দ্বীন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ, *আল-মুগনী,* কায়রো: মাকতাবাতুল কাহেরাহ, ১৯৬৮ ঈ.।

৩৩) আবু উবাইদ কাছেম ইবনে ছালাম, *আল আমওয়াল,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি।

৩৪) তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আঃ হালিম ইবনে তাইমিয়া (র.), *মাজমু'উল ফাতওয়া,* মাদীনা মুনাওয়ারাহঃ প্র. বি., ১৯৯৫ ঈ.।

৩৫) মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আঃ আজীজ আবেদীন আদ-দামেশকী আল-হানাফী, *রদ্দুল মুহতার আলা'দ দুর'রিল মুখতার বা হাসিয়াতু ইবনে আবেদীন,* দারুল ফিকরঃ বইরুত, ১৯৯২ ঈ.।

৩৬) মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া*, লাখনো : মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৯৮২ খ্রি.।

৩৭) মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী নদবী, *সীরাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী*, সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে ইয়াহইয়াবী, তা. বি.।

৩৮) মাওলানা মুহাম্মাদ 'আশিক ইলাহী মিরাঠী, *তাযকিরাতুল খালীল*, করাচি : মাকতাবাতুশ শায়খ, তা. বি.।

৩৯) সায়্যিদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইন'আমুল হাসান কান্ধালবী*, সাহারানপুর : মাকতাবায়ে ইয়াদগার, ১৪১৮ হি.।

৪০) মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ 'আলী থানবী, *আরওয়াহে সালাসা*, করাচি : মাকতাবাতু 'উমর ফারূক, ২০০৯ খ্রি.।

৪১) মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*,দিল্লি : ইদারায়ে ইশা'আতে দীনিয়্যাত, তা.বি.।

৪২) মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, ঢাকা : বাড কম্প্রিন্ট, মার্চ, ২০০৯ খ্রি.।

৪৩) মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ 'আলী থানবী, *আরওয়াহে সালাসা*, করাচি : মাকতাবাতু 'উমর ফারূক, ২০০৯ খ্রি.।

৪৪) মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, ঢাকা : আমানিয়াত প্রকাশনী, তা. বি.।

৪৫) ইমামুল মুহাদ্দিস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী আল-মাদানী, *আওজাযুল মাসালিক*, দিমাশ্ক : দারুল কলম, ২০০৩ খ্রি.।

৪৬) ফকীহুল মুহাদ্দিস মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, সংকলন, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী, সংযোজন, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *লামিউদ দারারীর*, মক্কা : আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.।

৪৭) সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসনী, *সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, করাচি : শাহিন ট্রেডিং কোম্পানী, ১৯৭৮ খ্রি.।

৪৮) মাওলানা মুহাম্মদ এহতেশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*।

৪৯) মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলয়াস কান্ধালবী*, বৈরূত : দারু ইব্ন কাসীর, ১৪২৪ হিজরী।

৫০) মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বিশ্ব ইজতিমা*, ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশন, ২০০৯ খ্রি.।

৫১) সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *তাযকিরায়ে মাওলানা মুহাম্মদ হারূন কান্ধালবী*, দিল্লি : মাকতাবায়ে আবুল হাসান 'আলী, ২০০৪ খ্রি.।

৫২) শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেজ মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতী*, মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.।

৫৩) শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল*, দেওবন্দ : ইত্তেহাদ বুক ডিপো, তা.বি.।

৫৪) শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলবী, *আল-ফাযলুল মুবীন ফিল মুসালসালি মিন হাদীসিন নাবিয়্যিল আমীন*, ভারত: দারুল কিতাব, ১৪১৮ হিজরী।

৫৫) শাহ্ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, *বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৮ খ্রি.।

৫৬) শায়খুল হাদীস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান, মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল অনূদিত, *কাশফুল বারী*, ঢাকা: মাদানী কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.।

৫৭) মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, *শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ)-এর পাঁচ কন্যা* (ঢাকা : আকিক পাবলিকেশন্স, ২০১৮ খ্রি.

৫৮) কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আঃ ওয়াহিদ ইবনে হুমাম, *ফতহুল কাদীর,* স্থান.বি.: দারুল ফিকরঃ তা.বি।

৫৯) বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবু বকর (র.), *আল হিদায়া,* (অনু. মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬০) শেখ নিযামুদ্দীন বলখী ও অন্যান্য , *ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াহ,* দারুল ফিকর, ১৩১০ হি.।

৬১) সাইয়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুনান,* বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৭৭ ঈ.।

৬২) আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ আল-কাসানী, *আল বাদাইয়ুস সানা'ই ফী তারতীবি'স সারায়ী,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ ঈ.।

৬৩) আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবের ইবনে দাউদ বালাযূরী, *ফুতুহুল বুলদান,* বৈরুত: দারু মাকতাবাতুল হেলাল, ১৯৮৮ ঈ.।

৬৪) ড. খোন্দকার 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা*, বাংলাদেশ : আস্-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, তা.বি.।

৬৫) মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নাদবী সংকলিত, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক অনূদিত, *মাজালিসে যাকারিয়া*, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০২১ খ্রি.।

৬৬) মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ সারাখসী, *আল মাবসূত,* বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৯৩ ঈ.।

৬৭) জামিল আহমাদ সাকরোদাওয়ী, *আশরাফুল হিদায়া,* করাচি: দারুল ইশায়াত, ২০০৬ ঈ.।

৬৮) মালিক ইবনে আনাছ ইবনে মালিক ইবনে আমের, *আল মুদাওয়ানাহ,* স্থা.বি.: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ ঈ.।

৬৯) আবদুল হালিম কাসেমী, *আহসানুল হিদায়া,* লাহোরঃ মাকতাবা ই রাহমানিয়া, ২০০৪ ঈ.।

৭০) ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াসস সুনান আল-ইসলামিয়াহ – কুয়েত, *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াসস-সুনান আল-ইসলামিয়াহ– কুয়েত, ১৪২৭ হি.।

৭১) নূর মাহাম্মাদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালায়, ২০০৮ খ্রি.

৭২) *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.।

৭৩) *আল-ফুরকান*, রমযানুল মুবারক সংখ্যা, ১৩৯৯ হিজরী, (আগস্ট, সংখ্যা, ১৯৭৯ খ্রি., মুতাবেক), প্রকাশিত, মৌলভী আতীকুর রহমান সম্ভলীর প্রবন্ধ।

৭৪) হিলাল ইবনে মুহসিন আস-সাবেয়ী, *রু'ছুমু দারুল খিলাফাহ,* বৈরুত-লেবাননঃ দারুর রা'ইক আল-আরাবী, তা.বি.।

৭৫) ছালেহ ইবনে হুছাইন আল আ'ইয়াদ, *হুকুকু গাইরিল মুছলিমীন ফী বিলাদিল ইসলামিয়্যাহ,* ওয়াযারাতুশ শু'উন আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আওকফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, মাকতাবাতুল মুলক ফাহাদ: আল ওতানিয়্যাহ, আল-মামলিকাতুল আরাবিয়্যাতুস স'উদিয়্যাহ, ১৪২৮ হি.।

৭৬) ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল আনছারী, *হুকমু বিনাইল কানাইছ ওয়াল মা'আবদ আশ-শিরকিয়্যাহ ফী বিলাদিল মুছলিমীন,* মাকতাবাতুল মুলক ফাহাদঃ আল-ওতানিয়্যাহ, আল-মামলিকাতুল আরাবিয়্যাতুস স'উদিয়্যাহ, ১৪২৬ হি.।

৭৭) ০৪. আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুছা ইবনে আহমাদ ইবনে হুছাইন আল-হানাফী বদরুদ্দীন আইনী, *আল-বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ,* বইরুত-লেবানন: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ ঈ.।

৭৮) মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আরাফাহ আদ-দুসুকী আল - মালিকী, *হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ শরহিল কাবীর,* দারুল ফিকর: স্থান ও তা.বি।

৭৯) আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহিয়া নূরী, *আল-মাজমু শরহিল মাহযাব,* স্থা.বি.,দারুল ফিকর, তা.বি।

৮০) আস সাইয়েদ বিন হামুদাহ, *আন-নাফায়িস ফী আহকামিল কানাইস,* মিশর: দারুত তিলাফিস স'লেহ, ২০১২ ঈ.।

৮১) ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ ঈ.।

৮২) মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী রচিত, *ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রির্সাচ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০০৭ ঈ.।

৮৩) গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকারের ভাষ্য,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ ঈ.।

৮৪) ড. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ ঈ.।

৮৫) অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬ ঈ.।

৮৬) কে. এম. রইছউদ্দিন, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* ঢাকা: খান ব্রার্দাস এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৩ ঈ.।

৮৭) এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস,* ঢাকা: মাওলা ব্রার্দাস, ১৯৯৯ ঈ.।

৮৮) মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, *হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয,* (অনুবাদ- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জহীরুল হক), ঢাকা: এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ২০০১ ঈ.।

৮৯) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী জীবন বিধান*, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রার্দাস, ২০০৪ ঈ.।

৯০) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী জীবন বিধান*, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রার্দাস, ২০০৩ ঈ.।

৯১) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রার্দাস, ২০০৮ ঈ.।

৯২) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *প্রাচ্যের উপহার*, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রার্দাস, ২০০৩ ঈ.।

৯৩) আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান- নিহায়া*, দারুল ফিকর, ১৯৮৬ ঈ.।

৯৪) Syed Amer Ali, *The Spirit of Islam* (reprint), Delhi:Low price publications, 1990.

৯৫) Imāmūddīn, S.M. 1965, *"Some Aspects of Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain (711-1492 A.D)"* N.P: E.J. Brill.

৯৬) Chējnē, Anwār G., 1974. *Mūslīm Spaīn Its histōry and cūlture*, Minneapolis: The University of Minnesota Press.

৯৭) Anver M. Emon, *Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law*, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-966163-3

৯৮) *Gibb, H. A. R. (1970). Mohammedanism: an historical survey. London New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-500245-8.*

৯৯) *Christians and Jews in the Ottoman Empire:The Functioning of a Plural Society*. Contributors: Benjamin Braude - Editor, Bernard Lewis - Editor. Publisher: Homes Meier. Place of publication: New York. Publication year: 1982.

১০০) N Mohammad Sahab (1985), *The doctrine of jihad: An introduction,* Journal of Law and Religion.

১০১) *Klostermaier, Klaus K. (2007). A Survey of Hinduism (3. ed.). Albany, N.Y.: State University of New York Press. ISBN 0- 7914-7082-2.*

১০২) Richards, John F. (1996). *The Mughal Empire*. The New Cambridge History of India. 5 (Reprinted ed.). Cambridge University Press. p. 130. ISBN 9780521566032. Retrieved 28 September 2012.

১০৩) Schimmel, Annemarie (2004). *The empire of the great Mughals*. London: Reaktion Books. p. 54. ISBN 1-86189-185-7.

১০৪) Markovits, Claude, ed. (2004) [First published 1994 as *Histoire de l'Inde Moderne*]. *A History of Modern India, 1480–1950* (2nd ed.). London: Anthem Press. p. 103. ISBN 978-1-84331-004-4.

১০৫) *Muhammad Umar (1 January 1993). Islam in Northern India During the Eighteenth Century.*

১০৬) *Munshiram Manoharlal Publishers. ISBN 978-81-215-0549-9.*

১০৭) John Louis Esposito, *Islam the Straight Path*, Oxford University Press, 1998.

১০৮) Brunschvig, 'Abd, *Encyclopedia of Islam*, Brill, 2nd Edition.

১০৯) Dhattiwala, Raheel and Micheal Briggs. *"The Political Logic of Ethnic Violence: The Anti-Muslim pogrom in Gujarat, 2002."* Politics and Society. 40.4. (2012): 483–516. Web. 10 December 2012.

১১০) "Hindus Under Attack in Bangladesh". *News Bharati. March 3, 2013. Retrieved March 26, 2013.*

১১১) *India: A Laboratory of Inter-Religious Experiment*. Siraj Maqbool Ahmed, 2008, Religion and the Arts,

১১২) *"Religious Pluralism and The Challenges of Inclusivism, Exclusivism and Globalism: An Islamic Perspective"*. In Th. Sumartana et. al. (eds.), *Commitment of Faiths: Identity, Plurality and Gender*. Yogyakarta, Indonesia: Institute of DIAN/Interfidei, 2002.

১১৩) Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. *Lisan Ul-Mizan: Umar bin al-Khattab al-Adiyy.*

১১৪) *Qazi, Moin. Umar Al Farooq: Man and Caliph. Notion Press. ISBN 9789352061716*

১১৫) Sing, Dr. N.K., 1996, *Peace Through Non-violent Action in Islam,* Delhi: Adam Publishers & Distributors.

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বংশ পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	জন্ম ও শিক্ষাজীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	শিক্ষকতা ও বৈবাহিক জীবন
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	হজ্জব্রত পালন ও হিজাযে স্থায়ী বসবাস
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	অসুস্থতা, অন্তিম মুহূর্ত ও দাফন
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	উত্তরাধিকার ও সন্তান-সন্ততি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ পরিচয়

ভারতবর্ষের যেসকল খান্দান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'ইল্ম ও ফযল, প্রতিভা ও মনীষার আকররূপে বিরাজমান রয়েছে এ খান্দানটি হলো তাঁর অন্যতম– তাঁদের মূল মাতৃভূমি হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফরনগর জেলার ঝিনঝানা এলাকায়, পরবর্তীতে তাঁরা উক্ত জেলার কান্ধালা[১] নগরীতে আবাসস্থল গড়ে তোলেন।[২]

ভারতবর্ষে এ খান্দানটি সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ খান্দানগুলোর তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ খান্দানটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভার সূতিকাগারের ভূমিকা রেখে আসছে। শুধু প্রজ্ঞা ও মেধা বিকাশের ভূমিকাই রাখেননি বরং যুগে যুগে এ খান্দানে বহু আলেম, ফাযেল, জ্ঞানী-গুণী ও আল্লাহ্‌র কামিল বান্দাগণের জন্ম হয়েছে। উঁচু প্রতিভা ও অত্যুচ্চ হিম্মতই যাঁদের খান্দানী বৈশিষ্ট্য। এ দুই বৈশিষ্ট্য খান্দানটিকে এতোটাই অভিজাত ও স্বাতন্ত্র দান করেছে যে, সর্বযুগেই সেখানে জ্ঞানী-গুণী সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন জ্ঞানগভীরতা ও ব্যাপক প্রজ্ঞার অধিকারী। প্রত্যেক যুগেই তাঁরা নিজ সন্তানদেরকে প্রচলিত 'ইল্ম ও গভীর বুৎপত্তির দিকে পরিচালিত করে আসছেন। তাঁদের সে সতর্ক অভিভাবকত্ব সন্তানদের আল্লাহ্‌প্রদত্ত মেধাকে আরো সুতীক্ষ্ম করে তুলতো। এজন্যই তাঁদের মাঝে উচ্চমানসম্পন্ন ফকীহ ও মুফতী, 'আকলী ও নকলী উভয়বিধ জ্ঞানের সমৃদ্ধ 'আলিম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন কবি ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসকের উদ্ভব হয়েছে।

এ খান্দানের একদিকে হযরত শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) ও তাঁর উত্তরসূরিদের শিষ্যত্বের বদৌলতে সুন্নতের পায়রবি, আমল ও আকীদার পরিশুদ্ধি এবং জ্ঞান বিস্তারের প্রবণতা তাঁদের মাঝে সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে তাঁদের মানসিকতা ও অভিরুচিকে আরো উন্নত করে তুলেছে। তাওহীদ ও সুন্নতের অনুগামীতার সাথে সাথে আত্মোৎস্বর্গী মনোভাব এবং জিহাদ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা সংযোজিত হয়েছে।[৩]

এ খান্দানে মাওলানা মুযাফ্ফর হুসায়ন কান্ধালবী (রহ.)[৪] অনন্যসাধারণ তাকওয়া-পহেযগারী, অপূর্ব সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষা পরিবারের পুরুষদের সাথে নারী মহলেও তাক্ওয়া, পরহেযগারী, যিক্র ও 'ইবাদতের অভিরুচি তৈরি করেছে।

---

১. কান্ধালায় জনবসতি স্থাপনের উপলক্ষ্য ছিল এ যে, ৭৯৩ হিজরীর ২২শে রজব সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ ইব্ন ফিরূযশাহ্ তুগলক শিকারের উদ্দেশ্যে বর্তমান কান্ধালার নিকট আগমন করলে জুমু'আর দিন এসে যায়। সুলতান তখন কান্ধালায় বসতি স্থাপন ও জামে' মসজিদ নির্মাণের আদেশ জারী করেন। যথা শীগগীর সে আদেশ পালিত হলো। জুমু'আতে স্বয়ং বাদশাহ্ অংশগ্রহণ করলেন সমসাময়িক একজন ফাযিল 'আলিম কাযী শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন মাওলানা কারীম উদ্দীন (যিনি কাযী যিয়াউদ্দীন সুন্নামীর বংশধর ছিলেন)-এর নামে যথেষ্ট জমি প্রদান পূর্বক তাঁকে কাযী, ইমাম, খতীব এবং নিকাহ্ পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাথে সাথে তাঁকে উক্ত কসবার শাসনভারও অর্পণ করেন। তারপর তাঁর বংশধরগণ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। উদ্ধৃত: মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা* (দিল্লি: ইদারায়ে ইশা'আতে দীনিয়্যাত, তা.বি.), পৃ. ১৮

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া* (লাখনোঃ মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ০৯

৩. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, *সীরাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয় কান্ধালবী* (সাহারানপুর: কুতুবখানায়ে ইয়াহইয়াবী, তা. বি.), পৃ. ০৪

৪. তিনি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) এর দাদি (মৌলভী মোহাম্মাদ ইসমা'ঈল এর স্ত্রী বিবি সাফিয়্যা) এর নানা ছিলেন। তিনি ভারত-পাকিস্তানে হাজারো মানুষের কাছে খ্যাত। তিনি মাওলানা মাহমূদ বখ্শ (রহ.) এর পুত্র এবং মুফতী ইলাহী বখ্শ (রহ.) এর ভাতিজা। তিনি মুফতী ইলাহী বখ্শ (রহ.) এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। কিন্তু মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের পর তিনি দিল্লিতে মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক

উপরন্ত এ খান্দানের আরেকটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হলো– উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কামালিয়্যাত ও রূহানিয়্যাত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও কামেল পুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ও শিষ্যত্ব বরণে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেননি।[১]

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) ও সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এর পরবর্তী যুগে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) ও শাহ্ 'আবদুর রহীম রায়পুরী (রহ.)সহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন– যারা ছিলেন তৎকালীন সময়ের আত্মশুদ্ধি শাস্ত্রের ইমাম, তাঁদের সাথে এ পরিবারের ছিলো নিবীড় বন্ধন। আলহামদুলিল্লাহ– সে ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। এটা তাঁদের জ্ঞানপিপাসা ও হৃদয় মহত্ত্বের পরিচায়ক, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২]

এ খান্দানের কবুলিয়াত এবং তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের সীমাহীন কৃপাদৃষ্টির জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে যে, এ খান্দানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ যামানার দাওয়াত ও ইসলাহ তথা ইসলাম প্রচার ও নৈতিকতার প্রসারের সে আযীমুশ শান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যার নযীর আজকের মুসলিমবিশ্বে দূর্লভ। জগদ্বিখ্যাত তাবলীগী দাওয়াত আন্দোলনের উৎস হচ্ছে এ খান্দানটি। এ খান্দানেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর মতো ব্যক্তিত্ব– যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এযুগে দীনের বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যাঁর খুলুসিয়্যাত, দুর্লভ হিম্মত, উদার দৃষ্টি, কঠোর সাধনা ও ত্যাগের সুদূরপ্রসারী ফল ও বরকতসমূহ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাঁর ইনতিকালের পর এ কার্যক্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব।[৩] তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর বোনের ছেলে ও শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর ফুফাতো ভাই এবং তাঁদের উভয়ের সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা ইন'আমুল হাসান (রহ.)[৪] এর হাতে এ দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বর্তমানে দিল্লির নেযামুদ্দীনের আমীরের দায়িত্বে আছেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর চতুর্থ বংশধর মাওলানা মুহাম্মাদ সা'দ।

(রহ.)এর নিকট বাহ্যিক শিক্ষা ও বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক তা'লীম অর্জন করেন। শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক ছিলেন শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (রহ.) এর দৌহিত্র ও সুযোগ্য ছাত্র।

তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়া'কূব মুহাজিরে মাক্কী (রহ.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি দর্স ও তাদরীসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না ; বরং সদাসর্বদা সাধারণভাবে চলাফেরা করেছেন।

মাওলানা মুযাফ্ফর (রহ.) এর বংশানুক্রম এরূপ– মৌলভী মুযাফ্ফর হুসায়ন ইব্ন মৌলভী মাহমূদ বখ্শ ইব্ন মৌলভী হাকীম শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাকীম কুতুবুদ্দীন ইব্ন শায়খ 'আবদুল কাদের ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ শরীফ ইব্ন মৌলভী মুহাম্মাদ আশরাফ ইব্ন জামাল মুহাম্মাদ শাহ্ ইব্ন বাবুন ইব্ন বাহাউদ্দীন ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ ফাযিল ইব্ন শায়খ কুতুব শাহ্। উদ্ধৃত: মাওলানা মুহাম্মাদ 'আশিক ইলাহী মিরাঠী, *তাযকিরাতুল খালীল* (করাচি: মাকতাবাতুশ শায়খ, তা. বি.), পৃ. ৯৭

১. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ২০ মার্চ ১৯১৭ খ্রি. কান্ধালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে হযরতজী বলে সম্বোধন করা হতো। তিনি হলেন তাবলীগ জামাতের দ্বিতীয় আমীর। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি কুর'আন হাফিয হন এবং হাদীসসহ ইসলামী অন্যান্য শাখায় পড়াশোনা করেন। লেখালেখি ছাড়াও তাবলীগে তিনি বেশ সময় ব্যয় করেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হলো– হায়াতুস সাহাবা ও মা'আনিউল আহবার। এছাড়াও তিনি মুন্তাখাব হাদীস গ্রন্থটিরও রচয়িতা। তিনি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ২রা এপ্রিল, ১৯৬৫ খ্রি. লাহোরে ইনতিকাল করেন। উদ্ধৃত: নূর মাহাম্মাদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালায়, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৩

৪. মাওলানা ইন'আমুল হাসান ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রি. কান্ধালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে তাবলীগ জামা'আতের তৃতীয় হযরতজী ডাকা হতো। তাঁর পিতা মাওলানা ইকরামুল হাসান তৎকালীন সময়ে যুগশ্রেষ্ঠ একজন 'আলিম ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল ছিলেন তাঁর নানা এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর দাদা। তিনি তাঁর পিতার কাছে 'ইলমে ওহীর প্রথম সবক গ্রহণ করেন। মক্তবে ভর্তি হয়ে কুর'আন মাজীদ দেখে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর হাফেয মাংতুর কাছে তিনি কুর'আন হিফয সম্পন্ন করেন। মাওলানা হাকিম 'আবদুল হামীদ ব্রেলবীর কাছে উর্দূ ও ফার্সীসহ হস্তাক্ষর সুন্দর করার বিদ্যা অর্জন করেন। অতঃপর নয় কিংবা দশ বছর বয়সে মামা মাওলানা

অনুরূপভাবে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর সত্তা পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁদের কামালাতসমূহের জীবন্ত স্মৃতিস্বরূপ এবং তাঁর খান্দানের মনীষীগণের দুর্জয় হিম্মত, মুজাহাদা, বহুমুখী প্রতিভা এবং উন্নত চরিত্রের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।[১]

যদিও এ খান্দানের নিকট ও অতীস ইতিহাসে অসংখ্য বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, তবে আমি এ খান্দানের অগ্রজ সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করছি। 'হাকীম মুহাম্মাদ আশরাফ সাহেব' থেকে। কারণ, প্রথমত তিনি ছিলেন নিকট অতীতের বুযুর্গ, দ্বিতীয় সুনাম, সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে (পূর্ববর্তী বুযুর্গদের তুলনায়) তিনি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। তৃতীয়ত তাঁর সম্পর্কিত তথ্যগুলোই অপেক্ষাকৃত সমুজ্জ্বল ও অধিক সংরক্ষিত। তাই তাঁর থেকেই শুরু করছি বংশ বৃত্তান্ত।

মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আশরাফ (রহ.)

ইনি ছিলেন মুযাফ্ফরনগর জেলাধীন ঝিনঝানার অধিবাসী সম্রাট শাহ্জাহানের আমলের একজন খ্যাতনামা বুযুর্গ। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে সমকালীন উলামা ও মাশায়েখ একমত ছিলেন। শায়খ কুতুব শাহ্ পর্যন্ত তাঁর উর্ধ্বতন বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ-

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ
ইব্ন শায়খ জামাল মুহাম্মদ শাহ্
ইব্ন শায়খ নূর মুহাম্মদ ওরফে বাবন শাহ্
ইব্ন শায়খ বাহাউদ্দীন শাহ্
ইব্ন মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ
ইব্ন শায়খ মুহাম্মদ ফাযিল
ইব্ন শায়খ কুতুব শাহ্।[২]

ইলিয়াস (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে দিল্লির নিযামুদ্দীনে চলে আসেন এবং মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা এহতেশামুল হাসানের কাছে আরবি ভাষা-সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবদি অধ্যয়ন করার সময়ই শিক্ষক-মুরুব্বি মাওলানা ইলিয়াসের নজর কাড়েন এনামুল। উচ্চশিক্ষা অর্জনের পিপাসা নিয়ে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর পরামর্শে ১৯৩৪ খ্রি. সাহরানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার সুবাদে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ কাশ্মিরি (রহ.)সহ দেশবরেণ্য বিভিন্ন 'আলিমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 'আরবী ব্যকরণ, 'ইলমে ফিকাহ ও দর্শনের ওপর বিশেষ পণ্ডিত্ব ছিলেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালরী'র (রহ.) কাছে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করার মাধমে 'দাওয়ায়ে হাদীস' জামাত সমাপ্ত করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে মাওলানা ইলিয়াসের পরামর্শই ছিল মাওলানা ইন'আমুল হাসানের প্রধান পাথেয়। কেবল দ্বীনি দাওয়াত বা পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিক সাধনার জগতেও মাওলানা ইলিয়াস ছিল তাঁর ওস্তাদ-পীর। ফারেগ হওয়ার পরপরই তাবলিগ জামাতের সাথে সময় ব্যয় করা শুরু করেছিলেন। মাওলানা ইলিয়াসের পরামর্শে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে বা স্থানে জামাত নিয়ে সফর করতেন। নিজামুদ্দিনের কাশিফুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষক থাকাকালীন সময়ও দাওয়াতি আমল থেকে কোনোভাবে দূরে ছিলেন না তিনি। এছাড়া এলাকার সব দাওয়াতী কাজের সঙ্গে ওৎপ্রোতোভাবে জড়িত থাকতেন মাওলানা ইন'আমুল হাসান। ১৯৬৫ খ্রি. বিশ্বতাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবীর (রহ.) ইনতিকালের পর শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) তাঁকে (মাওলানা ইন'আমুল হাসান) বিশ্বতাবলীগ জামাতের আমীর হিসেবে মনোনীত করেন। একজন নওজোয়ান আলিমের কাঁধে এমন বিশাল দায়িত্বভার ন্যস্ত করার ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ কেউ একমত না থাকলেও মাওলানা ইন'আমুল হাসানের দক্ষতা ও খোদাপ্রীতির একনিষ্ঠতায় তাদের জয় করেছিল পরবর্তীতে। মাওলানা ইন'আমুল হাসান তাবলীগ জামাতের এ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আরো অধিক পরিমাণে উৎসর্গী হয়ে উঠেন । দ্বীনের পথের একনিষ্ঠ এ দায়ী জীবনের সিংহভাগ সময় দ্বীনের দাওয়াতী কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দ্বীনের দাওয়াতী আয়োজনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আয়োজন। তিনিও ১৯৯৫ খ্রি. ১০ জুন প্রিয়তম প্রভুর দরবারের ফেরেশেতারা এসে মাহবুরের 'দিদারে' নিয়ে গেলেন এবং স্বহাস্য মনে চলে গেলেন মাওলানা ইন'আমুল হাসান। উদ্ধৃত: সায়্যিদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইন'আমুল হাসান কান্ধালবী* (সাহারানপুর: মাকতাবায়ে ইয়াদগার, ১৪১৮ হি.), খ-১, পৃ. ১৭২

১. মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা* (দিল্লি: ইদারায়ে ইশা'আতে দীনিয়্যাত, তা.বি.), পৃ. ০৮

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-এর স্বহস্তে লিখিত নোট। পারিবারিক বংশপরিক্রমায় শুধু শায়খ কুতুব শাহ্ পর্যন্ত লিখিত আছে। উদ্ধৃত: মাওলানা ইহ্তিশামুল হাসান কান্ধালবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের বংশধরদের মধ্যে প্রত্যেক যুগেই বহুসংখ্যক জ্ঞানীগুণী 'আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ফকীহ-মুফতী, মা'কুলাত ও মান্‌কূলাতের 'আলিম, জবরদস্ত কবি ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের জন্ম নিয়েছেন।[১]

ব্যক্তি জীবনে মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ ছিলেন অত্যুচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গ। লোকমুখে তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাও জানা যায়। এমন অনেক ঘটনা এ বংশেরই বিরল প্রতিভা মুফতী ইলাহী বখ্‌শ (রহ.) তাঁর হস্তলিখিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করেছেন। নমুনা হিসেবে এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরছি। ঘটনাটি তাঁর অমুখাপেক্ষী মানসিকতা ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ চেতনার বৈশিষ্ট্যের স্মারক বহন করছে।

"সম্রাট শাহ্‌জাহান মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের ইত্যকার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সুখ্যাতি শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের জন্য আগ্রহী উঠলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে আনার জন্য কয়েকজন রাজভৃত্য সমেত পালকি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি প্রত্যুসে ফজর নামায পড়ে কোমরে দোপাট্টা বেঁধে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দিল্লির প্রধান তোরণে বাদশাহর পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক অবস্থান করছিল। তারা দূর থেকে মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ-কে দেখতে পেয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে তাঁর পূর্বপরিচিত একজন শাহী আমিরকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করলেন।

বাদশাহ তখন উযীর সা'দুল্লাহ্ খানকে মাওলানা সাহেবের পরীক্ষা নিতে বললেন। বিজ্ঞ উযীর বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফও উযীরকে জ্ঞানপ্রসূত উত্তর দিলেন। উযীর মাওলানা সাহেবের প্রত্যেকটি শাস্ত্রেই অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বাদশাহ্‌র নিকট আরয করলেন, জাহাপনা! আমি মাওলানা সাহেবকে জ্ঞানের অতলান্তিক সমুদ্র পেয়েছি। যার কোনো কুল-কিনারা নেই। তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই।

বাদশাহ শাহজাহান তৎক্ষণাত ঝিনঝানা এলাকার দুই হাজার বিঘা উর্বর জমিন তাঁর নামে বরাদ্দ করে একটি রাজকীয় ফরমান তৈরি করে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি এ ফরমান প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমার রিযিকদাতা আল্লাহ্ কোনো বাদশাহ নয়। অতঃপর তিনি কুর'আন মাজীদের এ আয়াতটি পড়লেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

> "হে মু'মিনগণ! (যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর) তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।"[২]

এবং বললেন, আমি শুধু এ আয়াতের আমল করতে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়েছি। কোনো সম্পত্তি বা জায়েদাদ লাভের খায়েশ আমার অন্তরে নেই। আর না এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে আমি শাহী দরবারে এসেছি। আমি তো শুধু মহান আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করেছি।[৩] পরবর্তীতে বাদশাহ শাহজাহানের সে দুই হাজার বিঘা সম্পত্তির প্রস্তাব মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সাজেদ (রহ.) এর কাছে পেশ করা হলে তিনি তা কবুল করে নেন এবং অদ্যাবধি তাঁর নামেই আছে।[৪]

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের এক পুত্র ছিল। যার নাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফ। তিনিও জ্ঞান-গরিমা ও ধর্মনিষ্ঠায় ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফের

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২. আল-কুর'আন, ০৪: ৫৯

৩. মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হাসান কান্ধালবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৪. প্রাগুক্ত; মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ-এর গবেষণা মতে ঐ রাষ্ট্রীয় ফরমান মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ-এর সন্তানদের নাম ১০৫৬ হিজরী সনে জারি হয়েছিল। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সে ফরমান নবায়ন হয়। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

তিন পুত্র সন্তান ছিল। (১) মাওলানা শায়খ আবুল হাসান (২) মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েয (৩) মাওলানা 'আবদুল কাদের। তাঁদের বংশধরগণের মধ্যে প্রচুর জ্ঞানী-গুণী ও পীর-মাশায়েশ জন্মগ্রহণ করেন।

বিশেষতঃ হাকীম 'আবদুল কাদের (রহ.) এর বংশে মুফতী ইলাহী বখ্শ্ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা মুযাফ্ফর হুসায়ন কান্ধালবী স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন সমকালীন 'আলিম-উলামার মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

আর মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েয (রহ.) ঝিনঝানাতেই বসবাস করতেন। তাঁর বংশধরগণের মধ্যে আছেন, মাওলনাা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল কান্ধালবী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াইয়া কান্ধালবী, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীসহ প্রখ্যাত দা'ঈ মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী ও তাঁর সাহেবযাদা মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী (রহ.) এর মতো জগদ্বিখ্যাত বুযুর্গ ও আহলে ইলমগণ জন্মগ্রহণ করেছেন।[১]

ঝিনঝানা ও কান্ধালায় অবস্থানকারী উভয় শাখা ঊর্ধ্বতন পুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ (রহ.) এর মধ্যে একত্রিত হয়েছে। সেখান থেকে নিচের দিকে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নেমে আসার পরও তা মাঝে-মধ্যে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাহমান হয়েছে। বংশধারার এ ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতা স্পষ্টরূপে অনুধাবনের জন্য এখানে উক্ত শাখার শাজারা বা কুলপঞ্জী পেশ করা হচ্ছে, যা স্বয়ং শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) স্বহস্তে প্রণয়ন করেছেন।[২]

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফ ইব্ন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ[৩] (কুলপঞ্জী-১)

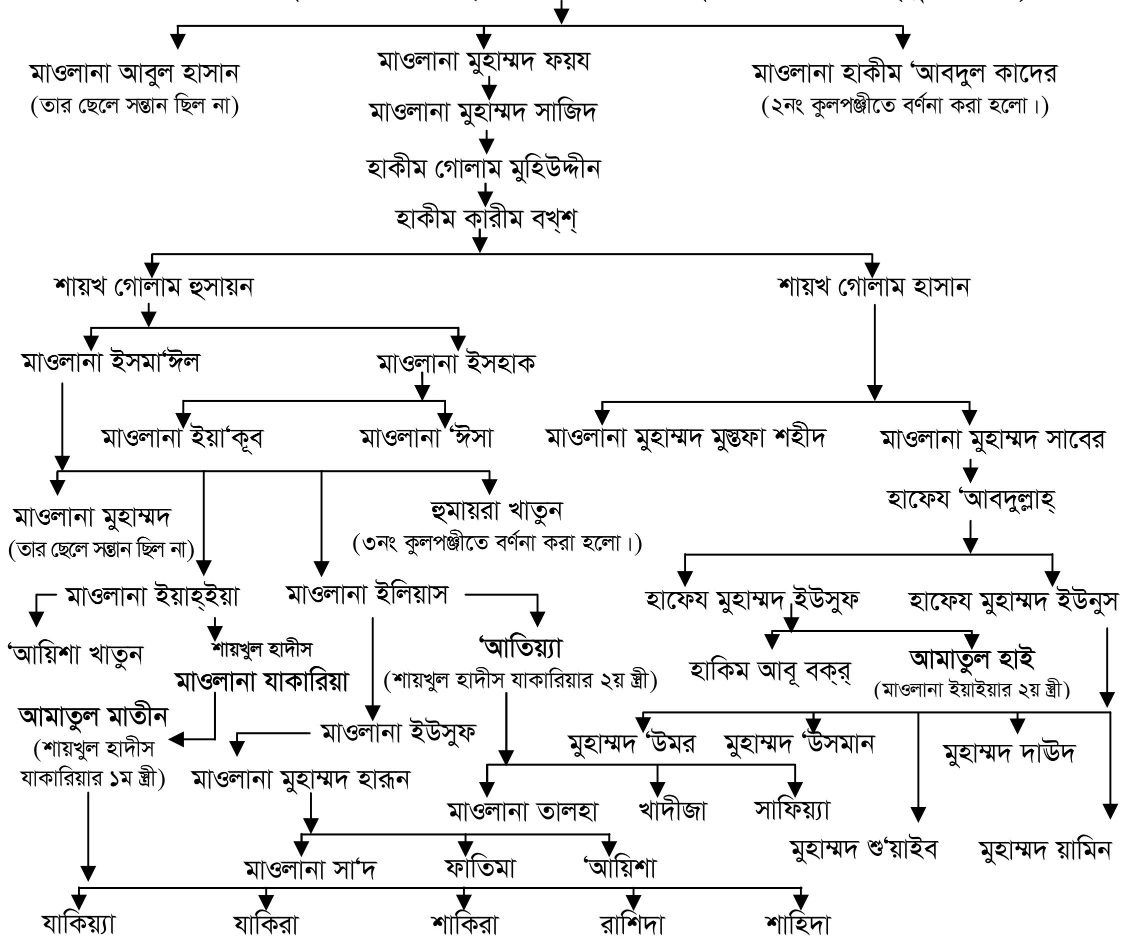

১. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩.মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭ ; মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

মাওলানা হাকীম 'আবদুল কাদের' (কুলপঞ্জী-২)

- মাওলানা হাকীম কুত্‌বুদ্দীন
  - মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ বখ্‌শ (শায়খুল ইসলাম)
    - মাওলানা মুফতী ইলাহী বখ্‌শ্
      - মাওলানা আবুল হাসান
        - মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল হাসান
          - মাওলানা যিয়াউল হাসান
            - মাওলানা শামসুল হাসান (তার ছেলে সন্তান নেই)
            - মাওলানা রউফুল হাসান
              - মাওলানা ইফতিখারুল হাসান
                - মুহাম্মদ আরশাদ
              - মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হক (হালাতে মাশায়েখে কান্ধালার লেখক)
                - মৌলভী ইখতিবাউল হাসান
                - মৌলভী ইহ্‌তিরামুল হাসান
              - মাওলানা ইযহারুল হাসান
              - সালীম কামরুল হাসান
              - মৌলভী নাজমুল হাসান
                - হাকীম 'আইনুল হাসান
                - হাকীম ই'জাযুল হাসান
                  - মুহাম্মদ ওয়াসিম
          - মাও. মুহা. আকবর
            - মৌলভী 'আলাউল হাসান
              - মৌলভী যহীরুল হাসান
                - হাফেয ফরীদুল হাসান
          - মাও. হাকীম মুহা. ইবরাহীম
            - হাকীম রেযাউল হাসান
              - মৌলভী আকরামুল হাসান
                - মাওলানা ইন'আমুল হাসান
                  - মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়রুল হাসান
            - মৌলভী আযীযুর রহমান (তার ছেলে সন্তান নেই)
          - মাও. মুহা. সুলায়মান (তার ছেলে সন্তান নেই)
      - মাওলানা আবুল কাসেম
        - মৌলভী মুহা. ইসহাক
          - মুহাম্মদ আহসান
            - মুহাম্মদ মুহসিন
        - মৌলভী 'আবদুল হক
          - আনসারুল হক
    - মুসাম্মাত বিবি (স্বামী : শায়খ কারীমুদ্দীন থানবী)
    - কামালুদ্দীন
    - মাওলানা মাহমূদ বখ্‌শ্
      - মাও. মুহা. মুযাফ্‌ফর হোসায়ন (তার ছেলে সন্তান ছিল না)
        - বিবি আমাতুর রহমান
          - বিবি সাফিয়্যা (মাওলানা ইসমা'ঈলের ২য় বিবি ও শায়খুল হাদীসের দাদী)
    - মাওলানা ইমামুদ্দীন
      - হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ
        - হাকীম মুহাম্মদ মুশার্‌রাফ (তার ছেলে সন্তান ছিল না)
- মাওলানা হাকীম শরফুদ্দীন

---

১. মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

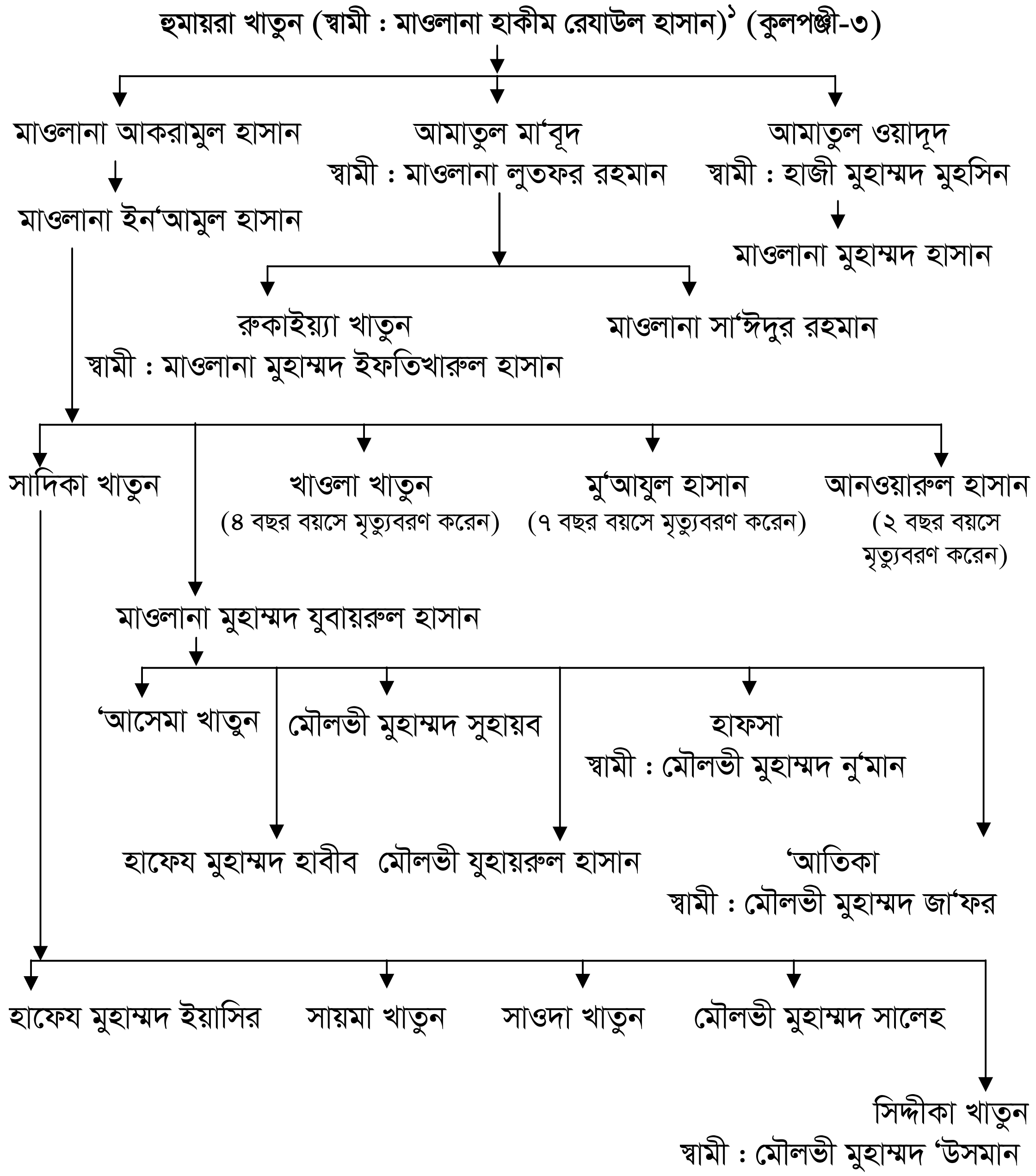

নিম্নে কুলপঞ্জী-১, ২ ও ৩ এর মহান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

মাওলানা মুহাম্মদ সাজিদ

মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ শরীফের অধস্তনদের মাঝে প্রথম কুলপঞ্জটি সূচিত হয়েছে মাওলানা মুহাম্মদ ফয়য থেকে। যাঁর প্রখ্যাত সন্তান ছিলেন, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সাজিদ। তিনি ১১২০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝিনঝানার অত্যন্ত জাঁদরেল 'আলিম, উঁচুদরের গুণী এবং প্রোথিতযশা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। মুফতী ইলাহী বখ্‌শ্ কান্ধালবী তাঁর সূত্রে অনেকগুলো ফাতওয়া নকল করেছেন। বাদশাহ শাহজাহান যে দুই হাজার বিঘা নিষ্কণ্টক জমির ফরমান তাঁর পূর্বপুরুষ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশরাফের নামে জারি করেছিলেন– যা' গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাই পুনর্বার হাকীম মুহাম্মদ সাজিদকে প্রদান করা হয়– যা তিনি গ্রহণও করেন। এভাবে তিনি দীনী কামালাতের

১. সায়্যিদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইন'আমুল হাসান কান্ধালবী* (সাহারানপুর: মাকতাবায়ে ইয়াদগার, ১৪১৮ হি.), খ-১, পৃ. ০৩

সাথে সাথে পার্থিব মর্যাদা ও আভিজাত্যেরও অধিকারী হন। তিনি *'আজায়িবুল গারায়েব'* নামক একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি পদ্য ও গদ্য দু'ধারার লেখাতেই পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর হাকীম গোলাম মুহিউদ্দীন নামক একজন পুত্র সন্তান ছিল। তাঁরও একজন পুত্র সন্তান ছিলেন হাকীম কারীম বখ্‌শ্‌। হাকীম কারীম বখ্‌শের দু'জন পুত্রসন্তান ছিলেন : (১) শায়খ গোলাম হাসান (২) শায়খ গোলাম হুসায়ন।[১]

শায়খ গোলাম হাসান

শায়খ গোলাম হাসান এর বিয়ে হয় হযরত মুফতী ইলাহী বখ্‌শের কন্যার সাথে। তাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যথা–

(১) মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সাবের

(২) মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ মুস্তফা হুসায়ন।

মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সাবের

মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সাবের ছিলেন সূফী প্রকৃতির দরবেশসুলভ চরিত্রের, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এক 'আবিদ বুযুর্গ। তিনি সায়্যিদ আহমাদ শহীদের সাথে জিহাদে শরীক হন এবং যুদ্ধ শেষে ফেরত এসে গোটা জীবন এ কাফেলাকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। তাঁর অন্তরে ছিল জিহাদের জোশ। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। সর্বদাই তাঁর মুকে একটি বাক্য শোনা যেতো– "আছো কেউ আমাকে বন্দুক দেবে? আমি জিহাদে যাবো। হাফেয 'আবদুল্লাহ্‌ নামে তাঁর একটি মাত্র সন্তান ছিল। তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।[২] তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন।

তারা হলেন–

(১) হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফ

(২) হাফেয মুহাম্মদ ইউনুস

এঁদের দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সাধু সজ্জন। *'হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা'*-তে তাঁদের দু'জনের ওপর আলোকপাত এভাবে করেছেন–

"এ দু'জন মনীষা যদিও প্রথম জীবন চাকরির সূত্রে বাইরে কাটিয়েছেন; কিন্তু শেষ জীবনে তাঁরা ছিলেন কান্ধালার ভূষণ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃষ্ট নমুনা। জ্যোতির্ময় চেহারা, ঈমানী কথাবার্তা, ইসলামী আচার-আচরণ ও বেশ-ভূষা, বন্ধুবাৎসল্য, মিশুক স্বভাব, সকলের ব্যথায় ব্যথিত, সকলের মঙ্গলকামী, সকলের প্রতি সহমর্মিতা ছিল তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁরা উভয়েই মুত্তাকী, পরহেযগার ও তাহাজ্জুদগুজার বুযুর্গ ছিলেন।[৩]

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল ও তাঁর পুত্রগণ

গোলাম হুসায়নের ছেলের নাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ঝিনঝানা-তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুর'আন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য ১৮৫৫ হিজরী সনে শায়খ ইলাহী বখ্‌শ্‌-এর কাছে চলে যান। সেখানে তিনি দিল্লির বাহিরে নিযামুদ্দীনের আওলিয়ার

১. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ 'আলী থানবী, *আরওয়াহে সালাসা* (করাচি: মাকতাবাতু 'উমর ফারূক, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৬

কবরের পাশে চৌষট্টি খাম্বা নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাসাদের লোহিত ফটকের একটি ইমারতে বসবাস করতেন।

মাওলানা ইসমা'ঈল ছিলেন তৎকালীন যমানার একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। একবার তিনি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী'র দরবারে তরীকে সুলূক অর্জনের জন্য গেলে, হযরত গাংগুহী বলেন, আপনি সুলূকের লাইনে যা অর্জন করেছেন আমার কাছে আর কি শিখবেন? অর্থৎ এর উদাহরণ হলো– কোনো ব্যক্তি বলল, আমি কুর'আন পড়তে জানি কিন্তু কায়দা বোগদাদী পড়িনি, ওটাও আমি পড়ে ফেলব। মাওলানা ইসমা'ঈল বায়'আত হয়েছিলেন মাওলানা মুযাফ্ফর কান্ধালবীর হাতে। তাঁর থেকে ইজাযত প্রাপ্তও হয়েছিলেন।[২]

মাওলানা মুহাম্মদ

মাওলানা ইসমা'ঈলের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে মৌলভী মুহাম্মাদ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ছিলেন একজন ফেরেশ্তারসদৃশ্য মানুষ। প্রজ্ঞা ও বিনম্রতা, দয়া ও স্নেহ, আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্মুখী মনোভাবের তিনি নিষ্পাপ প্রতিমূর্তি। তিনি দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করতেন। কুর'আন মাজীদের আয়াত وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا-এর নির্মল প্রতিচ্ছবি।[৩] কথা খুবই কম বলতেন। একান্তই আল্লাহ্ নির্ভর, দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপন করতেন। নিযামুদ্দীনের বাংলাওয়ালী মসজিদে শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা ইসমা'ঈল-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এখানে তাঁর পিতা একটি মাদরাসা চালু করেছিলেন। সেখানে প্রাথমিক স্তরের পাঠদান করা হতো।

এ মাদরাসার সিংহভাগ মেওয়াতের শিশুরা লেখাপড়া করত। তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টি নীতির উপর মাদরাসাটি পরিচালিত হতো। তিনি সে মাদরাসায় পাঠদান করতেন। দিল্লি ও মেয়াতের প্রচুর মানুষ তার ভক্ত ছিলেন। ওই দুই জায়গাতেই তিনি বেশি কাজ করেছিলেন।[৪]

যারা তাঁর সংশ্রবে এসেছেন বা তার সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের মাঝেও 'দ্বীনদারিত্ব'-এর গুণ এসে যেতো। বিশেষ করে তাঁর সংশ্রবের প্রভাবে অন্যের কল্যাণকামীতা ও সহমর্মিতা চেতনা সৃষ্টি হতো। এ বিষয়গুলো তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা পরিচিতি এনে দিতো।

যদিও সাংসারিক জীবনে তাঁর কোনো ছেলে সন্তান ছিলো না; কিন্তু একান্তই তাঁর দীক্ষা ও সংশ্রবে এমন কয়েকজন মানুষ গড়ে ওঠেছিলেন, যাঁদেরকে তাঁর সন্তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিশেষত হাজী

---

১. **জন্ম ও বংশ পরিচয়:** নাম রশীদ আহমাদ, পিতার নাম মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ। তিনি পিতা ও মাতা উভয় দিকেই প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ আয়্যূব আনসারী (রাযী আল্লাহু 'আনহু)-এর বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি ৬ জিলকাদ ১২৪৪ হিজরী মুতাবিক ১৮২৬ খ্রি. ভারত বর্ষের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর-এর গাঙ্গুহ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন: মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর পিতার ইনতিকালের পর তাঁর মামা শিক্ষা ও তারবিয়াতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি ফার্সী শিখেছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ গাউছের নিকট। 'আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা নাহু-সরফ, *হেদায়াতুন্নাহু* পর্যন্ত মাওলানা মিয়াজী মুহাম্মদ বখ্শের নিকট পড়েন। অতঃপর ১২৬০ হিজরী সনে তিনি দিল্লির আয়যক কলেজে ভর্তি হয়ে মাওলানা মামলূক আলীর নিকট পড়েন। পাশাপাশি তিনি মাওলানা কাসেম নানুতবীর নিকট *কাফিয়া* পড়েন। এছাড়াও তিনি বেশির ভাগ কিতাব মাওলানা মামলুক আলীর নিকট অর্জন করেন, কিন্তু কিছু কিছু কিতাব মুফতী সদরুদ্দীন-এর নিকট পড়েন। প্রথম অবস্থায় কাযী আহমাদ উদ্দীন পাঞ্জাবী দেহলভীর নিকটও পড়েছেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন 'উলূম ফুনূন বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দের নিকট পড়েন। মৃত্যু: এ ইলমের সাগর ১৩২৩ হিজরী সনে জুমার দিন আযানের পর ৭৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁকে গাঙ্গুহে দাফন করা হয়। উদ্ধৃত: মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন* (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট, মার্চ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৪

২. মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ 'আলী থানবী, *আরওয়াহে সালাসা* (করাচি: মাকতাবাতু 'উমর ফারূক, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৭

৩. অর্থাৎ রহমান-এর বান্দা তাঁরাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। উদ্ধৃত: আল-কুর'আন, ২৫: ৬৩

৪. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইল্‌য়াস আওর উন কী দীনী দাওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

'আবদুর রহমান মেওয়াতী[১] ও মাওলানা 'আবদুস সুবহান[২] ব্যক্তিদ্বয় উল্লেখযোগ্য। কাজে-কর্মে তাঁরা ছিলেন তাঁর সত্যিকার উত্তরসূরি।

মাওলানা মুহাম্মদ কখনো লম্বা বয়ান করতেন না। তবে বসে বসে সংক্ষিপ্তাকারে এমন কিছু কথা বলতেন যে, কথাগুলো শ্রোতার মনের গহীনে আঁচড় কেটে যেতো। অধিকাংশ সময় আখলাক ও দুনিয়াত্যাগ বিষয়ক হাদীস শোনাতেন এবং তার সরল অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিতেন।

মাদরাসায় ২০-২৫ জন ছাত্র আবাসিক থাকতেন। সিরিয়াল অনুযায়ী তারা নিজেরাই রুটি রান্না করতেন; নিজেরাই জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে আনতেন। মাওলানা মুহাম্মদ এতোটাই আত্মবিনাশী শিষ্টাচারী ছিলেন যে, সে কাজগুলোতে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। ছাত্ররা শুধু তাঁর সহযোগী হিসেবে থাকত।

ঝিনঝানা এলাকায় তাঁর বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি ও বাড়ি-ঘর ছিলো; কিন্তু সেগুলো নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিলো না। অন্যরা সেগুলো অধিকৃত করে ব্যবহার করতো। তিনি ঝিনঝানায় এলে কারো কাছে কোনো কিছু দাবি করতেন না। স্বেচ্ছায় কেউ এসে কিছু বাড়িয়ে দিলে তা গ্রহণ করতেন। কান্ধালায় এলে ধনী আত্মীয়-স্বজনদের এড়িয়ে চলতেন। বেশির ভাগ সময় দ্বীনদার গরিবদের সাথে অথবা স্থানীয় বুযুর্গ মোল্লা নিযামুদ্দীন-এর সাথে সময় অতিবাহিত করতেন। সময় পেলে তিনি হযরত গাঙ্গুহী ও তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাজানের মুরিদদের কাছে চলে যেতেন। এভাবে তিনি সবসময় নিজেকে আল্লাহ্ওয়ালাদের সংস্পর্শে রাখতেন। তিনি সবসময় নিজেকে অন্যের উপকারে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করতেন।[৩]

একবার তাঁর চোখের কাছে ফোঁড়া দেখা দিয়েছিলো। সে ফোঁড়াটির সাতটি মাথা ছিল। ডাক্তাররা ক্লোফার্ম গ্রহণ করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি ক্লোফার্ম গ্রহণ করতে তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। এর ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী হতে বাধ্য হন। ডাক্তাররা তখন অবাক হয়ে বলেন, আমরা এমন রোগী আর কখনো দেখিনি।

---

১. হাজী 'আবদুর রহমান আটাওয়ার (মেওয়াত)-এর একটি অমুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবেরই স্বপ্নে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যিয়ারত লাভ করেছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিযামুদ্দীনের মাদরাসায় মাওলানা সাহেবের কাছে কুর'আন মাজীদসহ অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপূরী'র হাতে বায়'আত হন। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ-এর একান্ত সহচর ও প্রধান সহকর্মী ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস-এর সকল দ্বীনি কাজে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পুরনো সহযোগী। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন মেওয়াতের অন্যতম হাকীম ও বুযুর্গ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দ্বীনের অনেক বড় ফিক্র ও দৌলত দান করেছিলেন। বিশেষ করে অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম প্রচার করাটাই ছিলো তাঁর একান্ত অভিরুচি। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষ মেধা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। বহু অমুসলিম তাঁর মাধ্যমে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিলেন। 'সিঙ্গার' এলাকায় তিনি নওমুসলিমদের জন্যে একটি বিশেষ মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদরাসাটিকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। এছাড়াও তিনি মেওয়াত থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি রবী'উস সানী ১৩৬৪ হিজরী সনে মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে পর-পারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। উদ্ধৃত: মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইল্য়াস আওর উন কী দীনী দাওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

২. মাওলানা 'আবদুস্ সুবহান ছিলেন মেওয়াতের শীর্ষস্থানীয় আলেম, মুরুব্বী ও শিক্ষক। মাওলানা মুহাম্মদ সাহেবের একান্ত আস্থাভাজন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি দিল্লির কুরুলবাগ এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে প্রচুর মেওয়াতী তালিবে ইল্ম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে দ্বীনের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগ হয়ে দাওয়াতী কাজে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। যাদেরকে এভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ছিলো। উদ্ধৃত: মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইল্য়াস আওর উন কী দীনী দাওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

তাঁর অধিকাংশ মুহূর্ত অতিবাহিত হতো যিকিরে। সবসময় হাসি-মুখ থাকতেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহী-এর কাছে হাদীস পড়েছিলেন। ইনতিকালের পূর্বের ১৬ বছর তাঁর কোনোদিন তাহাজ্জুদ ছুটেনি। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জামাতের সাথে নামায আদায় করেছেন।

শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দিল্লির কেসাবপূরা নওয়াব 'আলী মসজিদে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই তিনি ২৫ রবিউস্ সানী ১৩৩৬ হিজরী মুতাবিক ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার ঈশার নামাযের পর বিত্রের নামায আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তাঁর জানাযাতেও প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। তাঁর জানাযা নিযামুদ্দীনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে জুমু'আর নামাযের পর তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার পাশে সমাহিত করা হয়। ইনতিকালের সময় তিনি একমাত্র কন্যাকে রেখে যান। যার বিয়ে হয়েছিল ডেপুটি কালেক্টর মৌলভী আলাল হাসান সাহেবের সাথে। আল্লাহ্‌র রহমতের বারিধারায় তাঁর কবরকে সিক্ত করুন। আমীন।[১]

মাওলানা ইসমা'ঈলের দ্বিতীয় বিবাহ

মাওলানা ইসমা'ঈলের প্রথম স্ত্রীর ইনতিকালের পর ১২৮৫ হিজরী সনে তিনি এক আত্মীয়ের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে কান্ধালায় আসেন। কান্ধালায় পূর্ব থেকেই এ খান্দানটির একটি শাখা বসবাস করে আসছিল। সে সময় মাওলানা ইসমা'ঈল কান্ধালার এক মজলিসে হৃদয়গ্রাহী ওয়ায-নসীহত করছিলেন। ঐ সময় মাওলানা মুযাফ্‌ফর হুসায়নের কন্যা আমাতুর রহমান যাকে 'উম্মী জী' বলে ডাকা হতো।[২] তিনি সে ওয়াযের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাওলানা ইসমা'ঈলের ওয়াজে খুবই প্রভাবিত হন। তিনি সকল আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন, আমাদের খান্দান থেকে দিন-দিন ইলম হ্রাস পাচ্ছে। কোনদিন যেন এ খান্দান থেকে ইলম বিদায় নেয়; আমি প্রতি মুহূর্তে এ শঙ্কাই করছি। মাওলানা ইসমা'ঈলকে আমার বেশ দ্বীনদার ও যোগ্য আলেম বলে মনে হচ্ছে। এ কারণে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আমার বড় মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দেবো। যেনো তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বদৌলতে আমাদের এ খান্দানের মাঝে দ্বীনদারিত্ব ও ইল্‌মের বুনিয়াদ মজবুত হয়।

কিন্তু সে সময় মাওলানা ইসমা'ঈলের ভালোই বয়স ছিল। অন্যদিকে কন্যার ছিল একেবারেই কমবয়সী। এজন্য সকলেই ইতস্তত বোধ করছিলেন। উম্মী জী তাদের সকলের মতের বিরুদ্ধে নিজ উদ্যোগে কন্যা সাফিয়্যাকে মাওলানা ইসমা'ঈলের সাথে বিবাহ দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, যিনি এসেছেন অন্যের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে ; আজ তিনি নিজেই নববধূকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। অর্থাৎ মাওলানা ইসমা'ঈল মাওলানা মুযাফ্‌ফর হুসায়নের দৌহিত্রী এবং বিবি আমাতুর রহমানের কন্যা সাফিয়্যা-কে ১৩ রজব ১২৮৫ হিজরী মুতাবিক, ৩০ অক্টোবর, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে দুই পুত্র সন্তান ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যাঁর বিয়ে হয়েছিলো মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ রেযাউল হাসানের সাথে। তাদের সংসার আলোকিত করে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। যথাক্রমে আমাতুল ওয়াদূদ ও আমাতুল মা'বূদ এবং এক ছেলে মাওলানা ইকরামুল হাসান। হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান হলেন, এ মাওলানা ইকরামুল হাসানের প্রথিতযশা সাহেবযাদা।[৩]

সাফিয়্যা[৪]র গর্ভেই শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (র.)-এর পিতা মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ১২৮৮ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার মুহাররম মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর (মুতাবিক ২৩ মার্চ, ১৮৭১

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইল্‌য়াস আওর উন কী দীনী দাওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

২. মাওলানা মুহাম্মাদ 'আশিক ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৩. মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী নদবী, *সীরাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া কান্ধালবী* (সাহারানপুর: কুতুবখানায়ে ইয়াহইয়াবী, তা. বি.), পৃ. ৩৫

৪. তিনি হলেন মাওলানা ইসম'ঈল-এর দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি আমাতুর রহমানের গৃহে ১২৬৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বামীর ঘরে ১৩৩৬ হিজরী সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোদভীতু, মাকবূল বান্দী। সবসময়

যিক্‌র-আযকারে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর প্রাত্যহিক আমলগুলোর কিছুটা নমুনা মাওলানা 'আশিক ইলাহী মিরাঠী *'তাযকিরাতুল খলীল'* গ্রন্থে এভাবে চিত্রিত করেছেন–

- দরূদ শরীফ ৫ হাজার বার।
- ইসমে যাতের (আল্লাহ্) যিক্‌র্ ৫ হাজার বার।
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ১৯০০ বার।
- يَا مُغْنِيْ ১১০০ বার।
- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ১১০০ বার।
- اللهُ الصَّمَدِ ১১০০ বার।
- لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ ১২০০ বার।
- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ২০০ বার।
- حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ৫০০ বার।
- سُبْحَانَ اللهِ ২০০ বার।
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ২০০ বার।
- اللهُ اَكْبَرُ ২০০ বার।
- استغفار ৫০০ বার।
- أُفَوِّضُ اَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ১০০ বার।
- حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ১০০ বার।
- رَبِّ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ১০০ বার।
- رَبِّ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ১০০ বার।
- لَا اِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ১০০ বার।

এছাড়াও তিনি প্রত্যহ এক মান্‌যিল কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। নারীর অসুস্থতা মুক্ত দিনগুলোতে তিনি প্রতি সপ্তাহে কুর'আন মাজীদের এক খতম করতেন। এছাড়াও তিনি রমযান মাসে প্রত্যহ চল্লিশ পাড়া কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি বিয়ের পর স্বামীর সংসারে এসে কুর'আন মাজীদ হিফ্য করেন। তাঁর হাতে ছিল কাজ কিন্তু মুখে চলতো কুর'আন তিলাওয়াত। শায়খুল হাদীস বলেন, আমি এ রমযানে হাকীম মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেবের পীড়াপীড়িতে তাঁর মসজিদে তারাবীর নামায পড়াতাম। আম্মাজান যেদিন ইনতিকাল করবেন, সেদিন ছিল কদরের রাত্র। আমি দ্রুত নামায শেষ করে সাহারানপুরীর পেছনে নফলের নিয়তে নামায পড়তাম। ২৪ রোযার দিবাগত রাতে ২৫ রোযার তারবীতে হাকীম ইসহাক সাহেব বললেন, আজ আধা পারা পড়বে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, জলদি পড়াও। তারাবীহ দ্রুত শেষ করবে। তারাবীহ শেষ করে সাহরানপুরী'র পিছনে নামায পড়ার জন্য ছাত্রাবাস মসজিদে যাবে না ; বরং বাসায় গিয়ে মায়ের খিদমতে মনোনিবেশ করবে। নামায শেষে আমি হাকীম ইসহাক সাহেবের কথা মতো মসজিদে না গিয়ে বাসায় চলে যাই। আমি কল্পনাও করিনি যে, এ মুহূর্তে আম্মাজানের মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হবে। ২৫ রমযানুল মুবারক ১৩৩৫ হিজরী সনে কদরের রাতে আমার স্নেহময়ী মাতা 'আমাতুল হাই (রহ.)' ইহধাম ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান। আমি ছাত্রাবাস মসজিদে উপস্থিত হয়ে হযরত সাহারানপুরীর কাছে বললাম, আম্মাজান ইনতিকাল করেছেন। এ সংবাদ শুনে হযরত নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, ইচ্ছা ছিল, আপনি জানাযার নামায পড়াবেন। কিন্তু আপনি তো ই'তিকাফে। ইসতিনজা তো ই'তিকাফের নিয়ন্ত্রণাধীন। হযরত তারাবীহ নামাযের পর দশ থেকে পনেরো মিনিট খাদেমদের সাথে মতবিনিময় করতেন। এরপর ইসতিনজা শেষ করে অযু করে মসজিদে ফিরে আসতেন। আজকে হযরত আর প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে বের হলেন না। আমি বাসায় গিয়ে মাইয়্যেতের গোসল ও কাফনের দ্রুত ব্যবস্থা করলাম। আম্মাজান সবসময় যে কালো চাদরটি পরিধান করতেন সেটাই খাটিয়ার উপর দিয়ে ঢেকে দিলাম। অতঃপর হযরত ইসতিনজা সেরে ওযূ করে জানাযার নামায পড়িয়ে মসজিদে ফিরে আসলেন। আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে কবরস্তানে চলে গেলাম। আমরা পেশাদার কবর খোদাইকারীদের সরিয়ে দিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা এবং মাদরাসার কয়েকজন ছাত্র মিলে কবর খনন কার্য শেষ করলাম। মাত্র সোয়া ঘণ্টার মধ্যে কাফন-দাফন সম্পন্ন করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার আম্মাজানকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন। উদ্ধৃত: 'আশিক ইলাহী মিরাঠী, *তাযকিরাতুল খলীল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখভিত্তিক নাম بلند اختر (বুলন্দ আখ্তার)”।[১] সাফিয়্যার গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইল্য়াস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ইস্মা'ঈল (র.)-এর কনিষ্ঠ ছেলে।[২]

মাওলানা ইসমা'ঈল ঘরের তরবিয়তের জন্য রাত্রি যাপনে খুব ইহতিমাম করতেন। রাতে ঘরের কেউ কেউ যেন জাগ্রত থাকে। রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত মেঝো ছেলে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া পড়াশুনায় মগ্ন থাকতেন। রাত ১টায় ইয়াহ্ইয়া ঘুমিয়ে পড়তেন। আর মাওলানা ইস্মা'ঈল উঠে পড়তেন। শেষ রাতে বড় ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদকে জাগিয়ে দেওয়া হত। মেওয়াতে মাওলানা ইসমা'ঈলের মাধ্যমে দীনের দা'ওয়াতের সূচনা হয়।

মেওয়াত,[৩] মেউজাতি এবং তাদের ধর্ম ও চরিত্র

---

১. بلند اختر 'বুলন্দ আখ্তার'-এর বর্ণমান অনুযায়ী বের হয় ১২৮৭। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযিযী নদবী, 'আবদুল্লাহ্ আল ফারুক অনূদিত, *মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলভী রহ.* (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ১৪৩৭ হি.) পৃ. ৮৯

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত* (ঢাকা: আমানিয়াত প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ. ৪৪

৩. 'মেওয়াত' হচ্ছে দিল্লির দক্ষিণে প্রাচীনকাল থেকে 'মেউ' জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত যে এলাকা সেটাই মেওয়াত নামে পরিচিত। তখন গোড়গানো (পাঞ্জাব প্রদেশের আনবালা কমিশনারি)-এর বৃটিশ জেলা, ইল্লোর ও ভরতপুরের হিন্দু রাজ্যসমূহ এবং যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার অংশ বিশেষ মেওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অন্যান্য এলাকার মতো মেওয়াতের সীমানা ও আয়তনেও পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন আদী ে মওয়াতের আয়তন বর্তমান মেওয়াত থেকে স্বভাবতঃই কিছুটা ভিন্ন। প্রাচীন মেওয়াত অঞ্চল মোটামুটি ঐ বক্র রেখার ভিতরেই অবস্থিত যা উত্তর (ভরতপুরের) 'ডিগ' থেকে 'রিওয়াড়ি'-এর অক্ষরেখার কিছুটা উপর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পশ্চিমে 'রিওয়াড়ি'-এর নীচে দ্রাঘিমা রেখার ঐ বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত যা ইল্লোর শহরে থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরত্বে পশ্চিমে এবং ইল্লোরের 'বারাচশমা'-এর দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত রেখা অতঃপর বৃত্তাকার হয়ে 'ডিগ' অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে এবং উক্ত রেখার প্রায় দক্ষিণ সীমানা তৈরি করেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে, তারা হিন্দুস্তানের প্রাচীন আর্য সম্প্রদায়ের নয় বরং ভারতের প্রাচীন অনার্য বংশধারার একটি শাখা। এ হিসেবে তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য আর্যবংশীয় রাজপুত্রদের চেয়েও প্রাচীন। ইংরেজ বিবরণ মতে মেওয়াতের খানজাদাগণ মূলত রাজপুত বংশোদ্ভুত। ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে 'মেওয়াতী' বলে এ খানজাদাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আইনে আকবরীর তথ্যানুসারে জানা যায় যে, জাদুরাজপুতরাই মুসলমান হয়ে 'মেওয়াতী' নামে পরিচিত হয়েছে। *তারীখে ফিরোযশাহী*তে মেওয়াতের নাম সর্বপ্রথম শামসুদ্দীন ইলতুমিশের আলোচনায় এসেছে। দিল্লির মুসলিম সালতানাতের গোড়ার দিকে মেওয়াতিরা 'ত্রাস' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন-গভীর বনজংগলের আশ্রয় নিয়ে তারা দিল্লিতে লুটতরাজ শুরু করে দিয়েছিলো। মেওয়াতী-ভীতি তখন এমনই ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, সন্ধ্যার সময় রাজধানীর সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো। কেউ সন্ধ্যার পরে নগরে প্রাচীরের বাইরে যাওয়ার সাহস করতো না। তা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে কোনো না কোনো কৌশলে মেওয়াতীরা শহরে ঢুকে লুটতরাজের সুযোগ খুঁজতো। ফলে শহরবাসীরা ভয়ংকর নিরাপত্তহীনতা বোধ করতো। এদের শায়েস্তা করার জন্য গিয়াসুদ্দীন বলবন এক বড় অভিযান প্রেরণ করেন। তাতে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতি হতাহত হয়। তাছাড়া শহরে আফগান সৈন্যদের চৌকিও স্থাপন করা হয়েছিলো এবং সৈন্যবাহিনীর সহায়তা দিল্লির উপকণ্ঠীয় বন পরিষ্কার করে গোটা এলাকা কৃষিভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল। এর পর থেকে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় মেওয়াতীদের কোনো আলোচনা নেই। শতাব্দী ব্যাপী অজ্ঞাতবাসের পর দেখা গেলো; যুদ্ধবাজ ও দুঃসাহসী মেওয়াতীরা মাঝে মধ্যেই আবার কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তক্ত করা শুরু করে। ফলে সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। ফিরোযশাহের আমলে ইসলাম গ্রহণকারী লক্ষণপাল নামে অপর এক বিখ্যাত খানজাদা গোটা মেওয়াত ও সংলগ্ন অন্যান্য এলাকা নিজের অধিকারে এনেছিলেন। মেও জনগোষ্ঠী কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলো? কোন ঘটনা ও পরিস্থিতি এর পিছনে কাজ করেছে? তদ্রূপ সমগ্র জনগোষ্ঠী একযোগে 'ইসলাম গ্রহণ' করেছিলো, নাকি ধীরগতিতে কয়েক শতকের সময় পরিধিতে তা সম্পন্ন হয়েছিলো? এ সকল প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত কোনো উত্তর খুঁজে বের করা এখন সম্ভব নয়। কেননা, এ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক ইতিহাস, বিশেষতঃ তাদের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস মহাকালের অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে আছে। পরস্পর বিরোধী ও অস্পষ্ট কতিপয় 'লোক-বিবরণ' ছাড়া কোনো ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

মুসলমানদের সুদীর্ঘকালের অব্যাহত অমনোযোগ ও উদাসীনতা এবং মুর্খতা ও ধর্মবিমুখতার কারণে 'মেও' জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অবক্ষয় এতটা নীচে নেমে এসেছিলো যে, জাতীয় ধর্মান্তর ছাড়া আর কোনো স্তর অবশিষ্ট ছিলো না। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের তুলনায় একজন অমুসলিমের অনুভূতি অবশ্যই কম হওয়ার কথা। কিন্তু মেওয়াতী জনগোষ্ঠীর ইসলামহীনতা অমুসলিম ঐতিহাসিকের স্থুল অনুভূতিকেও নাড়া দিয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো থেকে মেওয়াতীদের ধর্মীয় অবক্ষয় ও চারিত্রিক বিপর্যয়ের কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইল্লোর স্টেটের ভূমি প্রশাসন অফিসাররূপে কর্মরত মেজর পি. ডাব্লিউ. পোলিট্টিলেট ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *'ইল্লোর গোজেটিয়ার'*-এ লিখেছেন– "বর্তমানে প্রায় সমগ্র মেওয়াতি জনগোষ্ঠী মুসলমান হলেও তা শুধু নামে মাত্র। হিন্দু জমিদারদের উপাস্য দেবতাই মেওয়াতিদের পূজ্য দেবতা। মুহার্‌রম, ঈদ ও শবে বরাতের চেয়ে হোলি খেলার গুরুত্ব মেওয়াতিদের কাছে কোনো অংশেই কম নয়। জন্মঅষ্টমী, দশহরা, দেওয়ালি ইত্যাদি বেশ কিছু হিন্দুপর্ব মেওয়াতিরাও পালন করে থাকে। বিয়ে-শাদীর 'শুভদিন' নির্ধারণের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হয়। 'রাম' ছাড়া সব হিন্দুনাম তারা গ্রহণ করে। নামের শেষে 'খান' এর মতো ছড়াছড়ি না হলেও শিং-এরও বহুল ব্যবহার দেখা যায়। মেওয়াতিরা হিন্দু শ্রেণিবিশেষের মতো কাজকর্ম বন্ধ রেখে অমাবশ্যা ও কৃষ্ণপক্ষ পালন করে থাকে এবং নতুন কূপ খননের পূর্বে হনুমানের নামে চবুতরা তৈরি করে নেয়। তবে লুটতরাজের প্রয়োজন হলে তখন আর মন্দিরভক্তির পাত্তা থাকে না ; বরং কেউ মন্দিরের পবিত্রতা বোঝাতে গেলে তারা সোজা বলে দেয় তোমরা হলে 'দেও'[১] আর আমরা হলাম 'মেউ'। পৈত্রিক ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে মেওয়াতিরা খুবই অজ্ঞ। দু'একজন কালেমা জানলেও নিয়মিত নামাযীর সংখ্যা একেবারেই নগন্য।[২]

আচারে অভ্যাসে মেওয়াতিরা আধা হিন্দু। তাদের গ্রাম বস্তিগুলোতে মসজিদ খুব কমই দেখা যায়। 'তজারা' তহশিল অঞ্চলে মেওয়াতিদের বায়ান্নটি গ্রামে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি। তাছাড়া প্রতিবেশি হিন্দুদের মতো মেওয়াতিদেরও মন্দির ছাড়া কিছু 'উপসনাক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে 'বলিদান'ও হয়ে থাকে।[৩]

ভারতপুর গেজেটে বলা হয়েছে, মেওয়াতিদের আচারণবিধি হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম আচারণবিধির মিশ্ররূপ। খাতনা, বিয়েশাদী ও দাফন-কাফন সবই ইসলাম সম্মত। সৈয়দ সালার মাস্'ঊদ গাজীর মাযারও যেয়ারত করা হয় এবং মাস'ঊদ গাজীর ঝাণ্ডার নিচে কৃত কসমকে অতিআবশ্য পালনীয় মনে করা হয়। ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে গমন করলেও তারা কখনো হজ্জব্রত পালন করে না। হিন্দুদের আচারপর্বের মধ্যে হোলি ও দেয়ালি উৎসব পালিত হয়। স্বগোত্রে কখনও বিয়েশাদি হয় না। পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়েরা উত্তরাধিকার পায় না। বাচ্চাদের তারা হিন্দু মুসলিম মিশ্রনাম রেখে থাকে। মেওয়াতিরা উত্তেজক ও মাদকদ্রব্য গ্রহণেরও অভ্যাস আছে। এরা খুবই দুর্বল বিশ্বাসী ও কুসংস্কার প্রিয়। কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ গ্রহণের প্রবণতা অত্যধিক। পোশাক পরিচ্ছেদে বেশ হিন্দুঘেষা। এক সময় নবজাতক হত্যার নিষ্ঠুরতাও ছিলো তাদের মাঝে। এখন অবশ্য বিলকুল নেই। এককালে লুণ্ঠন রাহাজানি ছিলো তাদের পেশা। এখন যদিও তাদের চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি হয়েছে। তবু গবাদি পশু হাঁকিয়ে এবং গরু মহিষের রশি খুলে নিয়ে যাওয়ার বেশ দুর্নাম এখনও আছে তাদের।[৪]

---

১. দেব।

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত* (ঢাকা: আমানিয়াত প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ. ৭২

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গোড়গানো' জেলা গেজেটে বলা হয়েছে– সম্প্রতি মেওয়াতে কতিপয় ধর্ম-শিক্ষকের আবির্ভাব হওয়ায় তাদের মাঝে নামায-রোযা শুরু হয়েছে। গ্রামগুলোতে মসজিদও তৈরি হচ্ছে। মেয়েরা হিন্দুদের 'ঘাঘরা' ছেড়ে পায়জামা ধরেছে। এগুলো ধর্মীয় জাগরণের আলামত।[১]

মেওয়াতিদের সরলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, শক্তিমত্তা ও কর্মদক্ষতা, দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা ছিলো এ জাতির বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে তারা নগর সভ্যতার ছায়ায় প্রতিপালিত মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বেশ আলাদা ছিলো। স্বভাবের অতুলনীয় দৃঢ়তা, অনমনীয়তা ও তীব্র স্বজাত্যবোধের ফলেই কার্যতঃ ইসলামহীনতা সত্ত্বেও চরমতম দুর্যোগের সময়ও ধর্মত্যাগের সয়লাব এ অঞ্চলে কখনই আঘাত হানতে পারেনি। পাশ্ববর্তী এলাকাগুলো যেখানে ধর্মত্যাগের ব্যাপক ফিতনায় অকুণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলো সেখানে মেওয়াত ছিলো সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ সুবিস্তীর্ণ এলাকায় ধর্মত্যাদের তেমন কোনো ঘটনাই সংঘটিত হয়নি। বস্তুত মেয়াত ছিলো এক অনাবাদী জমি যেখানে কোনো ফসলের বীজ বপন করা হয়নি। ভ্রান্ত আকীদা ও কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাপ্রসূত রসম রেওয়াজে কিছু আগাছা শুধু কয়েক শতাব্দীর পতিত ভূমিতে গজিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু চৌদ্দশ হিজরীর ভারতবর্ষ বহুক্ষেত্রে মেওয়াতিরা ছিলো 'আরব জাহেলিয়াতের কাছাকাছি নমুনা।[২]

মেওয়াতিদের সাথে সম্পর্কের সূচনা

মেওয়াতের সাথে সম্পর্ক মাওলানা ইসমা'ঈলের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়। এটা ছিল নিছক ঘটনাক্রম বা কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো না ; বরং গায়বী ব্যবস্থা হিসেবেই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলকে আল্লাহ্ তা'আলা মেওয়াত অঞ্চলের প্রবেশ পথে বস্তি নিযামুদ্দীনে এনে বসিয়েছিলেন এবং মাওলানা ইলিয়াসের শুভাগমের পূর্বেই সরলপ্রাণ মেওয়াতিদের অন্তরে এ খান্দানের প্রতি ভক্তি ভালোবাসার বীজ বপন করে দেওয়া হয়েছিলো।

একদিনের ঘটনা। নামাযের সময় হয়ে গেছে। মাওলানা ইসমা'ঈল নামাযী খুঁজতে মসজিদের বাইরে বের হলেন। রাস্তা দিয়ে কিছু মেওয়াতী লোক আসা-যাওয়া করছিলো। তারা তাদের জীবিকার খোঁজে নিয়মিত এ পথ দিয়ে দিল্লি যাতায়াত করতো। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! কোথায় যাচ্ছেন? বললো, মজদুরি করতে যাচ্ছি। মাওলনা ইসমা'ঈল জিজ্ঞেস করলেন, কয় টাকা পারিশ্রমিক পাবে? তারা তাদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক জানালো। তখন মাওলানা বললেন, যদি সে পরিমাণ পারিশ্রমিক এখানেই পেয়ে যাও তবে কি দূরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে? বা এতে কি তোমাদের কোনো আপত্তি আছে? তারা বললো, বাহ্ : রে! এতে আবার আপত্তি কিসের? মেওয়াতীরা এ প্রস্তাব প্রফুল্লচিত্তে লুফে নিলো। তাদের কেউ-ই এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাননি। অতঃপর তিনি তাদেরকে মসজিদে নিয়ে এসে নামায শিক্ষা ও কুর'আন শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। দিনশেষে মাওলানা ইসমা'ঈল তাদের হাতে পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি নিয়মিত চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পর আল্লাহ্র সাথে তাদের মহব্বত হয়। নামাযে খুশূ' খুযূ' চলে আসে। কুর'আন তিলাওয়াতে ভিন্ন রকম স্বাদ উপলব্ধি করতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা নিজে থেকেই পারিশ্রমিক নেওয়া বন্ধা করে দিল। বাংলাওয়ালী মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসার এটাই ছিল বুনিয়াদ। এরা ছিল প্রথম ছাত্র। এরপর থেকে সবসময়ই ১০ থেকে ১২ জন মেওয়াতী ছাত্র মাদরাসায় উপস্থিত থাকতেন। আর তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হতো মাওলানা এলাহী বখ্শ-এর বাসা থেকে।[৩]

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দিল্লির বাহরামের তেহরামী এলাকার খেজুরওয়ালী মসজিদে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই তিনি ৪ শাওয়াল, ১৩১৫ হিজরী (মুতাবেক ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮ খ্রি.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখের বর্ণসঙ্কেত غُفِرَ لَهٗ।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৩. মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

আল্লাহ্ তা'আলা মাওলানা ইসমা'ঈল-কে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছিলেন। দল, মত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিবর্গ এক বাক্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাকওয়া, নিষ্কলুষতা ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মনোভাবের প্রশংসা করতো। তিনি জন্মগতভাবেই 'সন্ধিপছন্দ' লোক ছিলেন। যার কারণে কখনই তার বিরুদ্ধে কাউকে অভিযোগ তুলতে দেখা যায়নি। কারো সাথে না থেকেও তিনি সকলের সাথেই ছিলেন। তাঁর ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও নিঃস্বার্থবাদীতার উৎকৃষ্ট নজীর হলো, যেই দিল্লিতে অসংখ্য দল ও মতের অবস্থান; যাদের একদল অন্যদলের এতোটাই বিদ্বেষী ছিলো যে, কেউ কারো পেছনে নামায পড়তে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু সে দলগুলোর নেতৃবৃন্দ অন্ততঃ এ একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মাওলানা ইসমা'ঈলের প্রতি তাদের কারোর-ই শ্রদ্ধা ও সমীহের কোনো কমতি ছিল না; বরং দল-মত নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন। এ কারণেই তাঁর জানাযায় এতো বিপূল সংখ্যক লোকের উপস্থিতি হয়েছিলো যে, নিকট অতীতে তার কোনো নযীর ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিলো, দিল্লি নগরীর সিংহভাগ মানুষ তেরাহীর সে খেজুরওয়ালী মসজিদে চলে এসেছে।

মাওলানা ইসমা'ঈলের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দিল্লি নিযামুদ্দীনে। এ জনাকীর্ণ জানাযায় সর্বমহলের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা ও আদর্শের 'উলামা-মাশায়েখও যোগদান করেছিলেন। যার কারণে নিযামুদ্দীনে জানাযা হাজির হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল, জানাযার নামাযে ইমামতি কে করবেন? বিষয়টি নিয়ে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কার দানা বেঁধেছিলো। সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াইয়া কান্ধালবী বলেন,

> "আমার বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ খুবই নরম মেজাযের বিনম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যার কারণে আমার আশঙ্কা হলো যে, হতে পারে তিনি কোনো বুযুর্গের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতা দেখিয়ে ফেলবেন এবং তাঁকে নামায পড়নোর অনুরোধ করে ফেলবেন। তখন দেখা যাবে, তার প্রতিপক্ষের লোকেরা তার পেছনে নামায পড়তে অসম্মতি জানিয়ে বসবে। ফলে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য আমি স্বপ্রণোদিত হয়ে জানাযার সামনে অগ্রসর হয়ে বললাম, আমি-ই নামায পড়াবো। সকলেই তখন পূর্ণ প্রশান্তির সাথে আমার পেছনে নামায পড়লেন। যার ফলে সেদিন কোথাও কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি।"[১]

প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে একাধিক জানাযা পড়া হলো। ফলে দাফনকার্য বিলম্বিত হতে থাকে। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত এক কাশ্‌ফ্‌ওয়ালা বুযুর্গ দেখেন যে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল বলছেন, আমাকে দ্রুত বিদায় কর। আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করছি যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণসহ আমার প্রতীক্ষারত আছেন।[২]

অতঃপর বসতী নিযামুদ্দীনের সে বাংলাওয়ালী মসজিদের এক নিভৃত কোণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইনতিকালের স্থান থেকে দাফনের স্থানের দূরত্ব ছিলো প্রায় সাড়ে তিন মাইল। কিন্তু সেদিন এ দীর্ঘ পথের সর্বত্র প্রচণ্ড ভীড় লেগে গিয়েছিলো। যার কারণে বাধ্য হয়ে শবাধারের দু'পাশে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়। যেন একই সময়ে অনেক মানুষ নিজ কাঁধে খাটিয়া বহনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। তারপরও সেখানে এতো প্রচুর পরিমাণ মানুষের ঢল ছিল যে, অনেক চেষ্টা-সাধনার পরও শবাধারে কাঁধ দেওয়ার সুযোগ পাননি। বহু মানুষ বিষণ্ন মনোরথে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে যান।[৩]

---

১. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দ্বীনি দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২. প্রাগুক্ত।

৩. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

শায়খুল হাদীসের পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া হলেন, মাওলানা ইসমা'ঈলের মেঝো ছেলে। তিনি ১লা মুহার্‌রম ১২৮৮ হিজরী, মুতাবিক ২৩ মার্চ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার কান্ধালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

> ولد رحـ في سنة سبع وثمانين بعد ألف ومأتين وأرّخ ولادته باسم "بلند اختر" وكان في الحقيقة كذلك ذا الجد العالي، وسمّي باسم يحيى تفاولا لإحياء العلوم الشرعية الدينية.

> "তিনি ১২৮৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখভিত্তিক নাম হলো 'বুলন্দ আখতার'। আদতেই তিনি তাঁর নামের সার্থক অধিকারী হতে পেরেছেন। জীবনে অত্যচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন। দ্বীনি শরয়ী ইলমের পুনর্জাগরেনের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তাঁর নাম রাখা হয়, ইয়াহইয়া।"[২]

মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার শ্রদ্ধেয় আম্মাজান বলেন, মাতৃদুগ্ধের স্বল্পতার কারণে তার জন্যে দুগ্ধদানকারিণীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছোট্ট ইয়াহ্ইয়ার অনুভূতি শক্তি এতোটাই তীব্র ছিলো যে, তাঁর দুধ মায়ের শরীরের পরিধেয় বস্ত্র থেকে ময়লার গন্ধ পেলে সে কখনই তার থেকে দুগ্ধপান করতো না। দুধ মাতা গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে না আসা পর্যন্ত সে কান্না করতো। দু বছর বয়সে যখন তাঁর দুধ ছাড়ানো হয় ততোক্ষণে তার কুর'আন মাজীদের ত্রিশতম পারার এক চতুর্থাংশ মুখস্থ হয়ে গেছে।[৩]

কুর'আন মাজীদ হিফ্য

স্বভাবজাতভাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রতিভাবান ছিলেন। মাত্র সাতবছর বয়সেই তিনি কুর'আন মাজীদ হিফ্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। হিফ্য শেষে মায়ের নির্দেশ ছিল প্রত্যহ কুর'আন মাজীদ একবার খতম করতে হবে, অন্যথায় খাবার পাবে না। তবে কুর'আন খতমের পর বাকি দিন ছুটি।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি ফজরের নামাযের পর দাদির ঘরের ছাদে উঠে কুর'আন মাজীদ খতম না করে রুটি খেতাম।[৪] কুর'আন মাজীদ খতম শেষে বিশ্রামে না যেয়ে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতাম এবং খুব আগ্রহের সাথে ফারসী পড়তাম। কুর'আন হিফ্যের দিনগুলোতে আমি আব্বাজানের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ফারসির অনেকগুলো কবিতাগ্রন্থ ও গল্পের বই নিজে নিজেই পড়েছিলাম। এতদসত্ত্বেও তার কারণে আমার কুর'আন মাজীদের হিফ্যের উপর বিন্দু পরিমাণ প্রভাব ফেলতে দেইনি।[৫]

হিফ্য শেষে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমাকে আরবী পড়াতে শুরু করেন। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি আমার দ্বীনি প্রতিপালনের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আমরা ইতোপূর্বেই জেনেছি যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁর সমকালের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতার সাথে ওযীফা পাঠ করতেন। তাহাজ্জুদের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতেন। স্বাভাবগতভাবেই

---

১. মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র দিন তারিখের ব্যাপারে কিছু কিছু ঐতিহাসিকগণ একথাও লিখেছেন যে, ঐ দিন চাঁদ দেখার বিষয়টি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিলো। তাই চাঁদ দেখা অপ্রমাণিত ধরে নিলে তাঁর জন্ম তারিখ হয় ৩০ জিলহজ্জ ১২৮৭ হিজরী। আর চাঁদ দেখা প্রমাণিত ধরে নিলে জন্মতারিখ হয় ১লা মুহার্‌রম ১২৮৮ হিজরী সনে। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২. ইমামুল মুহাদ্দিস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী আল-মাদানী, *আওজাযুল মাসালিক* (দিমাশ্ক: দারুল কলম, ২০০৩ খ্রি.), খ-১, পৃ. ৩৫

৩. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৪. সাধারণ নাজে শিক্ষার্থীরা ঘণ্টায় চার পারা তিলাওয়াত করা অস্বাভাবিক নয়। আর একজন হাফেযের পক্ষে ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় পারা তিলাওয়াত করা স্বাভাবিক। সে ভিত্তিতে ছয় ঘণ্টায় এক খতম সম্পন্ন করা মুশকিল নয়।

৫. মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্ধলভী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

তিনি ছিলেন রাতজাগা জিন্দাদিল বুযুর্গ। যার কারণে তিনি শেষ রাতে মাওলানা ইয়াহইয়া ও তাঁর ভাই মাওলানা মুহাম্মদ– দুজনকেই ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিলো, যেন শৈশব থেকেই তারা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মাওলানা মুহাম্মদ তখন ঘুম থেকে উঠে সুদীর্ঘ নফল নামায আদায় করতেন।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া নিজেই বলেন,

> "পিতাজী উযূর দু'আগুলোর প্রতি অনেক ইহ্তিমাম ও পাবন্দি করতেন এবং এরজন্য আমাদের সাথে পীড়াপীড়িও করতেন। আমার 'আরবী উর্দূ ও ফারসীর প্রতি অগাধ নেশা ছিল। তাই আমি উযূতে দু'আ না পড়ে শব্দার্থ জপতে থাকতাম। কখনো কখনো পিতাজী শুনে ফেললে তিরস্কার করে বলতেন, 'খুব তো উযূর দু'আ পড়লে। শরম করে না?"

সাহিত্য সম্পর্কে মাওলানা নিজেই বলেন–

> "আমি 'আরবী সাহিত্যের জন্য শুধু 'মাকামাতে হারীর মাত্র নয়টি মাকামাহ পড়েছি। তা-ও আবার উস্তাদ বাসায় যাওয়ার পথে রাস্তায় হাটতে হাটতে পড়েছি। অধিকাংশ জায়গায় উস্তাদ বলতেন, এ শব্দের অর্থ আমার জানা নেই ; তুমি নিজে দেখে নিয়ো।"[১]

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া জ্ঞানগভীরতার সুখ্যাতি এবং ইলমে ওহীর পাশাপাশি আকলী শাস্ত্রগুলোর গভীর বুৎপত্তির সংবাদ যুবক বয়সেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। তিনি যুবক থাকাবস্থাতেই বড় বড় জ্ঞানী-তাপসীদের কাছ থেকে পণ্ডিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গভীরতাকে সমকালীন বিদগ্ধজন বিস্মিত চোখে স্বীকার করেছেন। এমনকি তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে জ্ঞান-তর্ক করতে পারলে বড়রাও গর্ব করতো।

এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

> **كان رض متوقدا ذكيا طباعا، وكان أبوه معجبا به، ولذا أذن له في التدريس حال تعلمه، وكل مشايخه رض كانوا مفتخرين به، وله في تحصيل العلوم غرائب.**

> "তিনি জন্মগতভাবেই ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী, প্রতিভাবান ও মেধাবী ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা দেখে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান এতোটাই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন। এমনকি তাঁকে নিয়ে তাঁর সমকালীন বুযুর্গরাও গর্ব করতেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।"[২]

মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার হাদীস অধ্যায়ন

বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ শায়খ রশীদ আহমাদ গাংগুহী'র কাছেই হাদীস পড়েছেন। তাই হযরত গাংগুহের প্রতি মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'রও ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আর সিদ্ধান্তও নিয়ে রেখেছেন যে, হাদীস পড়তে হলে হযরত গাঙ্গুহীর কাছেই পড়বো। অন্য কোথাও নয়। এদিকে হযরত গাঙ্গুহী ক্রমাগত শারীরিক অবনতির কারণে, বিশেষত চোখ থেকে অনবরত পানি ঝরার কারণে ১৩০৮ হিজরীর পর থেকে হাদীস পাঠদান স্থগিত করতে বাধ্য হন।

মাওলানা খলীল আহ্মাদ সাহারানপুরী[৩] মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার অধ্যয়ন ও প্রতিভার কথা জানতেন। তাঁর এ প্রতিভা বৃদ্ধির জন্য তিনি হযরত গাঙ্গুহী'র কাছে মাওলানা ইয়াহ্ইয়াকে হাদীস পড়ানোর সুপারিশ

---

১. মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী, *তাযকিরাতুল খলীল*, পৃ. ২০০

২. ইমামুল মুহাদ্দিস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী আল-মাদানী, *আওজাযুল মাসালিক*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৩৬

৩. **নাম ও জন্ম:** তাঁর জন্মের পর প্রথম নাম যহীরুদ্দীন, দ্বিতীয় নাম খলীল আহমাদ। তিনি ১২৬৯ হিজরী সনে সফর মাসে মুতাবিক ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলায় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। **বংশ পরিচয়:** তাঁর পিতা শাহ্ মাজীদ আলী এবং দাদা আহমাদ আলী। তাঁদের বংশলতিকা বিখ্যাত

করেন। মাওলানা সাহারানপুরী বলেন, এ ছেলেটি হলো মাওলানা ইসমা'ঈল কান্ধালবীর ছেলে, তাঁর পরীক্ষা আমি নিয়েছি। এমন শিষ্য কদাচিত চোখে পড়ে না। ছেলেটির যেমন রয়েছে আমল-আখলাক তেমনি রয়েছে হাদীসের প্রতি স্পৃহা। হযরত গাঙ্গুহী এ আবেদন মৌখিকভাবে গ্রহণ করলেন।

সেমতে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া হাদীস অধ্যয়নের জন্য ১৩১১ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাংগুহী'র খিদমতে গমন করেন এবং এ বছরই যিলকদ মাসে *তিরমিযী শরীফ* পড়া শুরু করেন। হযরত গাঙ্গুহীর নানা ব্যস্ততা ও অসুস্থতার দরুণ একঘণ্টার বেশি *তিরমিযী শরীফ* পড়াতে পারতেন না। যার কারণে দাওরা হাদীস শেষ হতে দু'বছর সময় লেগে যায়। প্রায় এক বছর দু'মাস পাঠদান শেষে ১৮ যিলহজ্জ ১৩১২ হিজরী সনে *তিরমিযী শরীফ* শেষ হয়। এর চার দিন পর ২২ যিলহজ্জ ১৩১২ হিজরী সনে রোজ বৃহস্পতিবার *আবূ দাঊদ শরীফের* পাঠদান শুরু হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই হযরত গাঙ্গুহীর চোখের পানি ঝরার রোগটির প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। যার কারণে ছাত্রদের তাগাদার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট কিতাবগুলোর পাঠদান বেশ দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়। ৭ রবি'উল আউয়াল, ১৩১৩ হিজরী সনে রোজ বৃহস্পতিবার *সুনানু আবী দাঊদ* সমাপ্ত হয়। এর দু'দিন পর ৯ই রবি'উল আউয়াল, ১৩১৩ হিজরী সনে রোজ শনিবার *বুখারী শরীফের* দরস প্রদান সূচিত হয়। ১ জুমাদাল ঊলা, ১৩১৩ হিজরী সনে *বুখারী শরীফের* ১ম খণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর ২য় খণ্ডের পাঠদান শুরু হয়। যা ১৭ জুমাদাস সানীতে সমাপ্ত হয়। ততোদিনে চোখের পানি ঝরার রোগটি তীব্র আকার ধারণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অতিদ্রুততার সাথে মাত্র দুমাসে *মুসলিম শরীফ*, *নাসায়ী শরীফ* ও *ইব্ন মাজাহ* শরীফের পাঠদান পূর্ণ করেন। এভাবে ২৩শে শা'বান ১৩১৩ হিজরী সনে দাওরায়ে হাদীস খতম হয়।[১]

এটাই ছিল হযরত গাংগুহী'র হাদীসের শেষ দর্স। আর মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছিলেন তাঁর দরসের রওনক ও প্রধান আকর্ষণ। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া হাদীসের দরসে অনুপস্থিত থাকলে হাদীসের দরস বন্ধ থাকত। হযরত গাংগুহী'র প্রতি মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার এতটাই আস্থা ও ভালোবাসা ছিল যে, তিনি গাংগুহি'র ব্যক্তিগত খাদেম হয়ে যান। মাঝে মাঝে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সামান্য সময়ের জন্য বাহিরে গেলেও হযরত গাংগুহী বে-চায়ন হয়ে বলতেন, "মৌলভী ইয়াহ্ইয়া হচ্ছে অন্ধের যষ্টি।"[২]

সাহাবী আবূ আয়্যূব আনসারীর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মাতা মুবারাকুন নিসা ছিলেন মাওলানা য়া'কূব নানুতবী'র বোন এবং উস্তাযুল আযাতিযা মাওলানা মামলূক 'আলী নানুতবী'র কন্যা। **শিক্ষা:** প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মাওলানা মামলূক 'আলী খানের কাছে বিসমিল্লাহ করেন। অতঃপর উর্দূ ও ফার্সী ভাষার কিতাব নিজ মামা এবং নানার কাছে সমাপ্ত করেন। তিনি 'আরবী শিক্ষা করেন তাঁর আপন চাচা মাওলানা আনসার 'আলী খানের নিকট। অতঃপর পরিবারের মুরব্বিদের পরামর্শে তাঁকে ইংরেজি শেখার জন্য তাঁর চাচাতো ভাই মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি 'আরবী ভাষা ও গ্রামারে দক্ষ হওয়ায় মাত্র ৬ মাসে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করেন। 'আরবী ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকায় তিনি ইংরেজি স্কুল ছেড়ে মামা মাওলানা য়া'কূব নানুতবী'র কাছে চলে আসেন। সেখানে তাঁকে মাওলানা য়া'কূব দারুল 'উলূম দেওবন্দে কাফিয়া জামাতে ভর্তি করে দেন। অবশেষে তিনি মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমে ভর্তি হয়ে হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, উসূলে তাফসীর মাওলানা মাযহার নানূতবী'র কাছে পড়েন। এভাবে তিনি ১২৮৮ হিজরী সনে মাত্র ১৯ বছর বয়সে দরসে নিযামীর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। **কর্মজীবন:** ১৩০৮ হি. সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর ১৩১৪ হিজরী সনে সদরুল মুদার্রিসীনের পদ সুশোভিত করেন। **শাগরেদবৃন্দ:** মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী, মাওলানা আবদুল্লাহ গাঙ্গুহী, মাওলানা ফয়জুল হাসান গাঙ্গুহী, মাওলানা যাফর আহমাদ 'উসমানী, মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমাদ, মাওলানা বদরুল 'আলম মিরাঠী, মাওলানা জামিল আহমাদ থানবী এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী। **ওফাত:** ৭৭ বছর বয়সে ১৫ রবি'উস সানী ১৩৪৬ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকী'তে হযরত 'উসমান-এর পাশে সমাহিত করা হয়। উদ্ধৃত: মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন* (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, মার্চ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৩৬

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতি* (ঢাকা: মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬

২. মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া দরসে হযরত গাংগুহী'র তাকরীর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে গুরুত্বসহকারে শুনতেন এবং দরস শেষে তাকরীরগুলো লিখে ফেলতেন। পরবর্তীতে এ তাকরীরগুলো হাদীসের কিতাবের স্বতন্ত্র হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া হযরত গাংগুহী'র খিদমতে বলতে বলতে বারোটি বছর কাটিয়ে দেন। হযরত গাংগুহী মওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী যেহেতু পূর্বথেকেই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই সম্যক অবগত ছিলেন, তাই তিনি সর্বান্তকরণেই কামনা করতেন যেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরে হাদীসের অধ্যপনার জন্য চলে আসেন। তিনি তাঁকে প্রথমে কিছুদিনের জন্য মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমে আসার আহ্বান জানান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সাময়িকভাবে হাদীসের দরস প্রদান করেন। এভাবে তিন বছর পর খলীল আহ্মাদ সাহারানপুরী তাঁকে স্থায়ীভাবে থাকার তাগাদা দেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ১৩২৮ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে স্থায়ীভাবে মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমে হাদীসের দরস প্রদানের জন্য আগমন করেন। তিনি পূর্ণ পাঁচ বছর ছয় মাস এ মাদরাসায় বিনা-বেতনে ধারাবাহিকভাবে হাদীসের দরস প্রদান করেছেন।[১]

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র আয়ের উৎস ছিল। একটি বাণিজ্যিক লাইব্রেরি। তিনি সেখানে নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন بَكَّاءٌ بِاللَّيْلِ وَبَسَّامٌ بِالنَّهَارِ "দিনে হাস্যেজ্জ্বল আর রাতে মওলায়ে এলাহী'র দরবারে কান্না করতেন।"[২]

মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী বলেন,

> "মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সারা দিন চলতে-ফিরতে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ খতম করে ফেলতেন। তিনি সদাসর্বদা উযূ অবস্থায় কাটাতেন। মসজিদে প্রবেশ করে সোজা মুসল্লায় চলে যেতেন এবং কুর'আন মাজীদ পড়তে শুরু করেন।"[৩]

তিনি আরো বলেন,

> "কুর'আনের মহাব্বত ও হাদীসের দরস-এর পাশাপাশি তিনি খিদমতে খাল্ক ও পরোপকার করতেন। এটাই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ওযীফা। বিধবা, এতীম ও অসহায় ছাত্রদেরকে সদাসর্বদা সহায়তা করতেন। এ কাজগুলো তিনি অত্যন্ত গোপনে করতেন। তিনি কখনো নিজ পরিবারের জন্য পাঁচ রুপির খাদ্যশস্যও একসাথে ক্রয় করেননি। তাঁর ইন্তিকালের সময় ঋণের বোঝা ছিল ৮,০০০ (আট হাজার) রুপি। কিন্তু কেউ জানতেও পারেনি এ রুপিগুলো তিনি কোথায় খরচ করেছেন।"[৪]

মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্ধলভী '*হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*'য় লিখেন–

> "মাওলানা ইয়াহ্ইয়া রমযান মাসে তাঁর মা ও নানীকে কুর'আন মাজীদ শোনানোর জন্য কান্ধালায় চলে আসতেন। তিন দিনে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ শুনিয়ে গাংগুহ ফিরে আসতেন। যে বছর তাঁর মায়ের ইন্তিকাল হয়, সে বছর তিনি একরাতে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ তাঁকে শোনান এবং পরের দিন প্রত্যাগমন করেন।"

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩. মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

হযরত শায়খুল হাদীস বলেন,

هو العلامة الشهير حافظ القرآن والحديث مولانا محمد يحيى بن مولانا محمد اسماعيل بن غلام حسين بن كريم بخش الصديقي نسبا، الحنفي مسلكا، الجشتي النقشبندي القادري ا لشهروردي مشربا، الكاندهلوي وطنا، فإنه رحمه الله كان ذكيا فطنا من يوم ولادته، كان رحمه الله حفظ ربع الجزء الثلاثين من القرآن الكريم عند فطامه، وحفظ القرآن الكريم إذا كان عمره سبع سنين.

"তিনি হলেন বিখ্যাত জ্ঞানতাপস, কুর'আন ও হাদীসের হাফেয মাওলানা ইয়াহ্ইয়া। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল। তাঁর পিতার নাম গোলাম হুসাইন। তাঁর পিতার নাম হাকীম করীম বখশ। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া বংশগতভাবে সিদ্দীকী ছিলেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে চিশ্তিয়া নকশবন্দিয়া কাদেরিয়া সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। জন্মগতভাবে কান্ধালা নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি জন্মগতভাবেই মেধাবী ও প্রতিভাবান ছিলেন। যেসময় তিনি মাতৃদুগ্ধপান ছাড়েন ওই সময়েই তাঁর কুর'আনের পোয়া পারা মুখস্থ। সাত বছর বয়সে গোটা কুর'আন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন।"[১]

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র শিক্ষাদান পদ্ধতি

আমার পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া দরস ও তাদরীসের ক্ষেত্রে ছিল অভিনব পদ্ধতি। তিনি দরসে নেযামীর পাবন্দী না করে প্রত্যেক ছাত্রের মেধা অনুসারে কিতাব নির্বাচন করতেন। ইব্ন মালিকের 'আলফিয়্যা'র সবক প্রতিদিন মুখস্থ শুনতেন। নাহু-ছরফের কায়দা-কানূন পূর্বের মুখে মুখে বুঝিয়ে দিতেন। যা সকলের মুখস্থ হয়ে যেত। রমযান মাসে কোনো ছুটি ছিল না। তবে রমযানের পঠিতব্য কিতাবাদি হত ভিন্ন। 'আরবী সাহিত্যের প্রতি জোর দিতেন খুব বেশি। বিশেষ করে উর্দূ থেকে 'আরবী আর 'আরবী থেকে উর্দূ করার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির খুব বিরোধী ছিলেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল ছাত্ররা পড়বে উস্তাদ সঠিক হলে বলবেন, হুঁ, অন্যথায় উহুঁ বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন খারাপ সম্পর্ক বর্জন। মেধাবী কোনো ছাত্র খারাপ সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত হলে সে নিজের নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলে। আর নির্বোধ ছাত্রের মাঝে বাজে সম্পর্ক না থাকলে সে একদিন না একদিন যোগ্য হয়ে যাবে।

শায়খুল হাদীস বলেন, আমার পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। তিনি মুসাফির হালতে চলতে পছন্দ করতেন। একবার মির্যা এলাহী বখ্শের ছেলে মির্যা সুরাইয়াজাহ দাদাজান ইসমা'ঈলের কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, 'আমি আমার মেয়ে কায়সারজাহাঁ বেগমকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া'র সাথে বিয়ে দিতে চাই।' কিন্তু দাদাজান এ বিষয়টি আব্বাজান ইয়াহ্ইয়াকে বলার সাথে সাথে আব্বাজান বললেন, শাহ্যাদীকে বিয়ে করার পর কখনও চাটাইয়ের উপর ঘুমানোর সুযোগ হবে না।

১. ফকীহুল মুহাদ্দিস মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, সংকলন, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী, সংযোজন, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *লামিউদ দারারী*র (মক্কা: আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যা, ১৯৭৫ খ্রি.), খ-১, পৃ. ১৩

বিবাহ

হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফের প্রথম বিবির গর্ভে তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এঁদের প্রথম দু'জনকে পর পর মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধালবীর সাথে বিয়ে হয়। প্রথম বিবির ঔরসে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিবি আমাতুল হাই-এর ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।[১]

সন্তান-সন্ততি

ইনতিকালের সময় তিনি এক কন্যা সন্তান ও এক পুত্র সন্তান রেখে যান। যথাক্রমে– (১) এক কন্যা সন্তান 'আয়েশা খাতুন; (২) শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালবী।[২]

ইনতিকাল

হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র অসুস্থতা ছিল একদিনেরও কম। ৯ যিলকদ শুক্রবার সকাল থেকে তাঁকে খুবই দুর্বল দেখা যায়। তারপরও তিনি ছাত্রাবাসে জুম'আর নামায অত্যন্ত স্থিরতার সাথে আদায় করেন। নামাযান্তে দুপুরের আহার করে কায়লুল্লাহ্র জন্য শুয়ে পড়েন। বিকাল থেকে পেট খারাপ শুরু হয়। ঈশার পর তা বন্ধ হয়। এরপর শুরু হয় শরীরে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ১০ যিলকদ ১৩৩৪ হিজরী সনে রোজ শনিবার সকাল আটটায় আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতে করতে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।[৩]

দাফনের স্থান নিয়ে মতানৈক্য

হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র ইনতিকালের পর তাঁর ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা দাফনের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করেন। এক পর্যায় বিষয়টি বেশ জটিল আকার ধারণ করে। হাকীম ইসহাক, হাকীম ইয়াকুব ও মাওলানা আলহাজ হাকীম মুহাম্মাদ আইউব-এর ইচ্ছা হলো– তাঁকে তাদের বাগানে সমাহিত করা। কেননা এ পরিবারের সাথে মাওলানার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। অন্যদিকে শাইখ হাবীব আহমাদ সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা হলো– হযরত ইয়াহ্ইয়াকে পুরাতন কবরস্তানে হাজী শাহে দাফন করা। শাইখ আহমাদ বড় বড় লাঠি হাতে সঙ্গী সাথীতের নিয়ে বাড়ির দরজার হাজির। হাজী শাহে মাওলানাকে সমাহিত না করা হলে আজ রক্তারক্তি হয়ে যাবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার হাজী শাহে শুয়ে আছেন। এ সকল দিক বিবেচনা করে হাজী শাহেই দাফন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর। তাঁকে সাহারানপুরের বিখ্যাত হাজীশাহ্ কবরস্তান, যেখানে মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার ও মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমের অন্যান্য বুযুর্গ শুয়ে আছেন, সেখানে সকাল ১০টার মধ্যে মাওলানাকে সমাহিত করা হয়।[৪]

শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস

নাম ও বংশ

ইলিয়াস ইব্ন মাওলানা ইসমাইল ইব্ন গোলাম হুসায়ন ইব্ন হাকীম করীম বখ্শ্ ইব্ন হাকীম গোলাম মুহিউদ্দীন ইব্ন মাওলানা মুহাম্মদ সাজিদ ইব্ন মাওলানা মুহাম্মদ ফয়য ইব্ন হাকীম মুহাম্মদ শরীফ ইব্ন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আশ্রাফ।[৫]

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসনী, *সাওয়ানিহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী* (করাচিঃ শাহিন ট্রেডিং কোম্পানী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৬০; মাওলানা মুহাম্মদ এহতেশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*, ২২৯

২. মাওলানা মুহাম্মদ এহতেশামুল হাসান কান্ধালবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৩. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, *সীরাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয় কান্ধালবী* (সাহারানপুরঃ কুতুবখানায়ে ইয়াহইয়াবী, তা. বি.), পৃ. ২০৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৫. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭ ; মাওলানা ইহ্তিশামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

জন্ম : তিনি ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের মুযাফ্ফর নগর জেলার অন্তর্গত কান্ধালা নামক শহরে ১৩০৩ হিজরী সনে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব

তার শৈবকাল নিজ নানার বাড়ি কান্ধালায় এবং নিজ পিতা হযরত মাওলানা ইসমাইল সাহেব (রহ.) এর সান্নিধ্যে দিল্লির নিজামুদ্দীনে অতিবাহিত করেন। তখন তার পুরো পরিবার কান্ধালায় অবস্থান করছিলো। পরিবারের নারী-পুরুষ সকল সদস্যবৃন্দের মধ্যে ঈর্ষণীয় ধর্মপরায়ণতা ছিল। সদাসর্বদাই তারা অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরে মশগুল থাকতেন। ঘরে স্ত্রীগণ সাধারণভাবে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী নফল নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। রমাযানুল মুবারকে এ ঘরগুলোতে যেনো কুরআন তিলাওয়াতের বাহার লেগে যেতো। প্রতিটি ঘরের কোণ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের মধুগুঞ্জন দীর্ঘ সময় ধরে শোনা যেতো।

এ খান্দানের মহিলাগণের কুরআন বোঝার মতো জ্ঞান ও বোধ ছিল। তাই তারা রস-স্বাদ আস্বাদনপূর্বক কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। কুরআন তরজমা, উর্দূ তাফসীর, *মাযাহিরে হক্ব*, *মাশারিকুল আনওয়ার* ও *হিসনে হাসীন* এ গ্রন্থগুলো ছিল এ পরিবারের মেয়ে মহলের সাধারণ পাঠ্যসূচি। সে সময় ঘরে-বাইরে এমনকি পারিবারিক মজলিসে সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও শাহ্ 'আবদুল আযীয (রহ.)-এর ঘটনাবলী নারী-পুরুষ সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতো। তাঁদেরকে তোতা, ময়না ইত্যাদি কিস্সা বা কাহিনীর পরিবর্তে ঐ সকল বুযুর্গদের ঘটনাবলী শোনাতেন।[১]

প্রাথমিক শিক্ষা

পরিবারের অন্য শিশুদের মতো তাঁরও মকতব থেকে শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শৈশবেই কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। এ পরিবারের হিফযুল কুরআন-এর প্রচলন এতো ব্যাপক ছিল যে, মসজিদের দুই কাতার পর্যন্ত মুয়াজ্জিন ছাড়া কোনো গায়রে হাফেয দাঁড়াতো না।[২]

মুহতারামা নানীর ভবিষ্যৎবাণী

মাওলানা ইলিয়াস-এর নানীজান (উম্মে জী : তিনি হলেন মাওলানা মুযাফ্ফর-এর কন্যা এবং মাওলানা ইসমা'ঈলের শাশুড়ী।) অত্যন্ত উঁচু স্তরের খোদাভীরু নারী ছিলেন। তিনি রাবেয়া বসরী-এর আদর্শ ও গুণে গুণান্বিত পুণ্যবতী এক অনন্য নারী। তাঁর সম্পর্কে মাওলানা ইলিয়াস বলেন,

> "আমি নানীজানের নামাযের দৃষ্টান্ত শুধু হযরত গাঙ্গুহী-এর মধ্যে দেখেছি। সে মহীয়সী নারী নিজ প্রাণপ্রিয় নাতী মাওলানা ইলিয়াস সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে গিয়ে বলেন, আখতার! আমি তোমার কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম-এর সুঘ্রাণ পাচ্ছি।"[৩]

এছাড়াও শৈশব থেকেই মাওলানা ইলিয়াস-এর মধ্যে সাহাবা সুলভ দীনি ব্যাকুলতার একটা ছাপ বিদ্যমান ছিল। যা দেখে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান বলতেন, "মৌলবী ইলিয়াস-কে দেখলে আমার সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়ে যায়।"[৪]

পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিত্বে দ্বীনি জয্বা ও আবেগের যে সুসংগঠিত প্রকাশ ঘটেছিল, তা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। পরিবেশ, শিক্ষা ও আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য তার সে স্বভাবে স্ফুলিঙ্গ এর প্রজ্বলন

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাসীর, ১৪২৪ হিজরী), পৃ. ১২

২. প্রাগুক্ত, মাওলানা ইহ্তিশামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাসীর, ১৪২৪ হিজরী), পৃ. ১৩

ঘটিয়েছিল মাত্র। তাই দেখা যায় শিশু ইলিয়াস এমন কিছু কাজ করতেন, যা সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন হতো। তাঁর সমবয়সী মকতবের সাথী রিয়াজুল ইসলাম কান্ধালভী বলেন, মকতব জীবনে মৌলভী ইলিয়াস একবার লাঠি হাতে বলেন, মিয়াঁ রিয়াজ চলো, বে-নামাযীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি।"[১]

মাওলানা ইলিয়াসের আম্মাজান

মাওলানা ইলিয়াসের আম্মাজান মুহতারামা সাফিয়্যা একজন খুবই উঁচুস্তরের হাফেযা ছিলেন। বিবাহের পর তিনি কুরআন মাজীদ হিফ্য সম্পন্ন করেন।[২]

লেখাপড়ায় গভীর অধ্যবসায়

মাওলানা ইলিয়াস ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় গভীর মনযোগী ছিলেন। প্রতিদিনের পড়া শেষ করে বাকি সময় যিক্‌র ও অন্যান্য অযীফায় কাটিয়ে দিতেন। শেষ রাত্রে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায, যিক্‌র, দু'আ ও রোনাজারিতে নিমগ্ন থাকতেন।

গাঙ্গুহে অবস্থান

মাওলানা ইলিয়াসের মেঝ ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌য়া গাঙ্গুহে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী'র খিদমতে থাকার উদ্দেশ্যে বসবাস শুরু করেছিলেন। আর মাওলানা ইলিয়াস পিতার সান্নিধ্যে দিল্লির নিযামুদ্দীনে ছিলেন। মাঝে মধ্যে কান্ধালায় নানী বাড়িতেও বেড়াতে আসতেন। নিযামুদ্দীনে পিতার স্নেহে ও ইবাদত নিমগ্নতার কারণে তাঁর শিক্ষা সন্তোষজনকভাবে হচ্ছিল না। তাই মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে পিতার নিকট আবেদন করলেন যে, আমি ইলিয়াস-কে আমার সাথে গাঙ্গুহে নিতে চাই। পিতা মাওলানা ইসমা'ঈলও খুশি মনে সম্মতি দিলেন। মাওলানা ইলিয়াস মেঝ ভাই মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া'র সাথে ১৩১৪ হিজরীর শেষে বা ১৩১৫ হিজরীর শুরুতে নিযামুদ্দীন থেকে গাঙ্গুহ্ চলে আসেন এবং এখানেই মেঝ ভাইয়ের কাছে পড়া-লেখা শুরু করেন। তখন গাঙ্গুহ ছিল 'উলামা মাশায়েখের প্রাণকেন্দ্র। ১৩২৬ হিজরী সনে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী'র কাছে হাদীস পড়ার জন্য মাওলানা ইলিয়াস দারুল দেওবন্দে ভর্তি হন। তিনি *বুখারী শরীফ* ও *তিরমিযী শরীফ* শায়খুলহিন্দের কাছে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি আপন ভাই মাওলানা ইয়াহইয়ার খিদমতে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় দফা হাদীসের দাওরা করেন। মাওলানা ইলিয়াসের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তথা কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর (১৩১৫-১৩২৬ হি.) সময় তিনি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর মতো পরশপাথরের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন।[৩]

মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ছিলেন সুযোগ্য উস্তায ও বিচক্ষণ মুরুব্বী। তাই তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, যেন তাঁর প্রতিভাবান ছোট্ট ভাইটি 'উলামা-মাশায়েখের সোহ্‌বতের পূর্ণ ফয়য ও বরকত হাসিল করতে পারে। মাওলানা ইলিয়াস বলেন, যখনই হযরত গাঙ্গুহী'র বিশেষশিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত 'উলামা-বুযুর্গগণ যখন গাঙ্গুহ তাশরীফ আনতেন তখনই বড় ভাই মাওলানা ইয়াহ্‌য়া আমার সবক বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, এখন এঁদের মজলিসে বসে কথা শোনাই তোমার সবক। তুমি তাদের সাহচর্যে থাকবে ও তাদের মূল্যবান কথা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে।[৪]

ইসলাহী সম্পর্ক

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২. পূর্বেই মুহ্‌তারামা সাফিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্‌দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্‌ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাধারণত ছাত্রদের-কে বায়'আত করাতেন না। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস-এর অসাধারণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র অবস্থায়ই তাঁকে বায়'আত করান। মাওলানা ইলিয়াস বলেন, যখন আমি যিকির করতাম তখন হৃদয়ের গভীরে এক ধরণের প্রবল চাপ অনুভব করতাম। বিষয়টি হযরত গাঙ্গুহী-কে জানালে তিনি বিস্ময়াভীভূত হয়ে বলেন যে, মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)ও এমন অভিযোগ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী-এর সমীপে উত্থাপন করেছিলেন। তখন হাজী সাহেব তাকে লক্ষ করে বলেছিলেন "আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দ্বীনের বড় কোনো খিদমত নিবেন।" সুতরাং আশা করি তোমাকে দিয়েও আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বড় কোনো খিদমত নিবেন।[১]

মাওলানা ইলিয়াসের অসুস্থতা ও শিক্ষার বিরতি

মাওলানা শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণ দেহী ছিলেন। অসুস্থতা লেগেই থাকত। গাঙ্গুহ অবস্থানকালে একবার মারাত্মক সাস্থ্যাবনতি ঘটল। কী যে এক মাথা ব্যথা শুরু হলো, মাথা ঝুকানো তো দূরের কথা টেবিলের উপর মাথা রেখে সিজদা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। এ সময় তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী'র সুযোগ্য সন্তান হাকীম মাস'উদ আহমদের কাছে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার ছিল বিশেষ পদ্ধতি, কোনো কোনো রোগীকে তিনি দীর্ঘদিন 'পানিমুক্ত' রাখতেন। এক ফোটা পানিও পান করার অনুমতি ছিল না তখন। বলাবাহুল্য যে, খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হতো এমন অদ্ভুদ 'পানি সংযম' রক্ষা করা। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস তাঁর স্বভাবগত নিয়মনিষ্ঠা ও আনুগত্যপ্রিয়তার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন, তিনি দীর্ঘ সাত বছর 'পানি সংযম' করেছেন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর নামমাত্র পানি পান করতেন।

এ অসুস্থতার কারণে মাওলানা ইলিয়াসের শিক্ষার বিরতি ঘটে। দ্বিতীয়বার পড়ালেখা শুরু হবার কোনো আশাও তিনি দেখছিলেন না। কিন্তু অসমাপ্ত শিক্ষাজীবন নিয়ে তিনি খুবই অস্থির ও পেরেশান ছিলেন। একদিকে ছিল নতুনভাবে শিক্ষাজীবন শুরু করার প্রবল আগ্রহ, অন্যদিকে ছিল শুভানুধ্যায়ীদের পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মুহতারাম মেঝ ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া আমাকে বললেন, আচ্ছা! পড়ালেখা করে শেষ পর্যন্ত করবেটা কি শুনি! আমি বললাম, বেঁচে থেকেই বা করবোটা কি বলুন? এমন মরণপণ মনোভাব দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। আর তিনি পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলেন।[২]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্তের পর ১৩২৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে মাওলানা ইলিয়াস সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ সময় তিনি ঐসকল কিতাব পড়িয়েছেন যা তিনি পূর্বে অধ্যয়ন করেননি। অসুস্থতার দরুন কিছু কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেননি। কিন্তু শিক্ষকতায় এসে অনধিত কিতাবগুলো পূর্ণ দক্ষতার সাথে তিনি পাঠদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক ব্যাপক অধ্যয়নে তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ফিক্‌হশাস্ত্রীয় পাঠ্যপুস্তক *কানযুদ্-দাকায়িক* (كنز الدقائق)-এর সহায়ক হিসেবে তিনি *বাহ্‌রুর রায়িক* (بحر الرائق), *শামী* (شامي) এবং *হিদায়া* (هداية) মতো গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতেন। উসূলে ফিক্‌হ্-এর কিতাব *নূরুল আনওয়ার* (نور الأنوار) পড়ানোর জন্য তিনি *হুসামী* (حسامي) *তাওযীহু তালয়ীহ* (توضيح تلويح) পর্যন্ত মুতালা'আ করতেন।[৩]

আধ্যাত্মিক খেলাফত লাভ

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাত্র বয়সে বায়'আত নিতেন না। শিক্ষা সমাপ্তির পরই বায়'আতের অনুমতি দিতেন। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস-এর অসাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর বায়'আতের দরখাস্ত কবুল করে নেন এবং বায়'আত সম্পন্ন করেন। ১৩৩২ হিজরী সনে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান। মাওলানা ইলিয়াস বলেন, বড় শোক আমার জীবনে দুটি এসেছে– এক হলো পিতার মৃত্যু, দ্বিতীয় হলো শায়খের মৃত্যু। তিনি আরো বলেন, সারা জীবনের কান্না তো সেদিনই করেছি যেদিন আমায় শায়খ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী-এর ইন্তিকালের পর তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান-এর খিদমতে বায়'আতের দরখাস্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁর পরামর্শে মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী-এর সাথে তিনি ইসলাহী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বিশেষ তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন করেন ও খিলাফত লাভ করেন।

এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য বুযুর্গ ও মাশায়েখের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, বিশেষতঃ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর খলীফাগণের সাথে সান্নিধ্যমূলক সম্পর্ক ছিল এবং শাহ 'আবদুর রহীম রায়পূরী, মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবীসহ প্রমূখ বুযুর্গকে তিনি খুব মুহাব্বাত করতেন। তাঁরাও মাওলানা ইলিয়াস-কে নিজ সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। মাওলানা ইলিয়াস বলেন, এ সকল বুযুর্গরা আমার দেহ ও আত্মায় মিশে আছেন।[১]

তৎকালীন সময় আকাবির-মাশায়েখ মহলে মাওলানা ইলিয়াসের বিশেষ কদর ছিলো। কেননা তাঁর তাকওয়া ও ধার্মিকতা ছিলো সর্বজনবিদিত। তাই কখনো কখনো আকাবির-মাশায়িখের উপস্থিতিতে নামাযের ইমামতির জন্য তাঁকেই আগে বাড়িয়ে দেওয়া হতো।

একবার কান্ধালায় শাহ্ 'আবদুর রহীম রায়পুরী, মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী-এর উপস্থিতিতে তাঁকে ইমাম বানানো হলো। কান্ধালবী খান্দাদের বুযুর্গ মাওলানা বদরুল হাসান সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি কৌতুক করে বললেন, এতো বড় বড় বগি আর ইঞ্জিন এমন হালকা! মাশায়েখগণের কোনো একজন বললেন, এ-তো ইঞ্জিনের গতি ও শক্তির উপর নির্ভর করে।[২]

বিবাহ

মাওলনা ইলিয়াস-এর ১৩৩০ হিজরী ৬ই যিলকদ, মুতাবিক ১৮ অক্টোবর, ১৯১২ খ্রি. রোজ শুক্রবার বাদ আসর তাঁর মামা মৌলভী রউফুল হাসান[৩]-এর কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এ মুবারক মজলিসে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, শাহ্ 'আবদুর রহীম রায়পুরী এবং মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী-এর উপস্থিতিতে তাঁর বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ বিবাহ পড়িয়েছেন। এ মুবারক অনুষ্ঠানে মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন। পরবর্তীতে এ নসীহত *ফাওয়ায়িদুস্ সুহবাত* (*فوائد الصحبة*) নামে বারংবার ছাপা হয়।[৪]

প্রথম হজ্জব্রত পালন

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্‌দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩. মাওলানা রউফুল হাসানের আরেক কন্যা আমাতুল মাতীনকে বিবাহ করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী। এ দিকে থেকে মাওলানা ইলিয়াস ও শায়খুল হাদীস ভায়রা-ভাই। অন্যদিকে আমাতুল মাতীনের ইনতিকালের পর শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী চাচা মাওলানা ইলিয়াসের কন্যা 'আতিয়্যা চাচাতো বোনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জামাই শ্বশুরের সম্পর্ক তৈরি হয়।

৪. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্‌দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৩৩৩ হিজরীতে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী ও শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান হজ্জ সফরে যাচ্ছেন শুনে মাওলানা ইলিয়াসও তাঁদের সাথে হজ্জব্রত পালনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এ মহান দুই বুযুর্গের অনুপস্থিতিতে গোটা হিন্দুস্তান আমার কাছে অন্ধকার হয়ে আসছে মনে হলো। এখানে থাকার কথা চিন্তা করাও কষ্টকর মনে হতে লাগল। হজ্জব্রত পালনের জন্য মাওলানা ইলিয়াসের অনুমতির পাশাপাশি অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। তিনি অদ্ভুত এক দ্বিধাদ্বন্দের মাঝে পড়ে গেলেন। তাঁর বোন হুমায়রা খাতুন (মাওলানা আকরামুল হাসানের আম্মা ও মাওলানা ইন'আমুল হাসানের দাদী) তাঁর অস্থিরতা দেখে বললেন, ভাই! আমার অলঙ্কারগুলো নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। এখন ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া'র অনুমতি লাভ। সবশেষে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী-কে সফরের যাবতীয় খরচের অবস্থা জানিয়ে তিনি তিনি চিঠি লিখলেন যে, হজ্জব্রত পালনের জন্য খরচের তিনটি উপায় আমার হাতে আছে। প্রথমতঃ বোনের অলঙ্কার গ্রহণ। দ্বিতীয়ত : ঋণ গ্রহণ। তৃতীয়ত : কয়েকজন আপনজনের অনুদান গ্রহণ। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপরী সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে সফরের অনুমতি দিলেন এবং খরচ সম্পর্কে শেষ প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। এভাবে হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান-এর সহযাত্রী হওয়ার সুযোগ হলো। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী প্রথম জাহাজে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি ১৩৩৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে দ্বিতীয় জাহাজে শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান-এর সহযাত্রীরূপে রওয়ানা হলেন এবং রবিউস-সানীতে ফিরে এসে যথারীতি মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন।[১]

মেঝ ভাই মাওলানা ইয়াহইয়ার ওফাত

১৩৩৪ হিজরী সনে যিলকদ মাসে মেঝ ভাই মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ইনতিকাল করেন। তাঁর বিরোহে মাওলানা ইলিয়াস কঠিন পরীক্ষায় পড়ে গেলেন। কেননা তিনি ছিলেন মাওলানা ইলিয়াসের একদিকে ভাই, অন্যদিকে মুরুব্বী, উস্তায। তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় মাওলানা ইলিয়াস খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন।[২]

বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ-এর ওফাত

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া'র মৃত্যুর দু' বছর পর ১৩৩৬ হিজরীর ২৫শে রবী'উস সানী রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মাওলানা মুহাম্মদ ইনতিকাল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ছিলেন বিনয়, সহনশীলতা, স্নেহ-কোমলতা এবং আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহপ্রেমের মূর্তপ্রতীক। তিনি সদাসর্বদা কর্তব্যসচেতন, দুনিয়াবিমুখ ও তাওয়াক্কুলপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। বস্তি নিযামুদ্দীনের বাংলাওয়ালী মসজিদে পিতা মাওলানা ইসমা'ঈলের স্থলবর্তীরূপে তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখানে পিতার হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার একটি মাদরাসা ছিলো। সাধারণতঃ মেওয়াতী[৩] বাচ্চারাই এখানে পড়ালেখা করতো। মেঝ ভাই মাওলনাা ইয়াহইয়া ও বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তিনি তাঁদের ভক্ত ও অনুরক্তদের অনুরোধে পিতা ও ভাইয়ের শূন্যস্থান পুনঃআবাদ করার মানসে বস্তি নিজামুদ্দীনে অবস্থিত মসজিদ ও মাদরাসার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে আগমনের বিষয়টি মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর অনুমতির উপর ঝুলন্ত রাখলেন। ভক্তরা বললেন, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা নিজেরা স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে তাঁর থেকে অনুমতি আনব। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এভাবে চাপ প্রয়োগ করে অনুমতি হয় না। আমি একা কথা বলবো।

---

১. মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্ধালবী, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা* (দিল্লিঃ ইদারায়ে ইশা'আতে দীনিয়্যাত, তা.বি.), পৃ. ২৩৭-২৩৮

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৩. এ অঞ্চলটি দিল্লির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি ছিল 'মেও' জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। বর্তমানে গোরগাঁও, আলাওয়ার, ভরতপুর ও মথুরার কিছু অংশ নিয়ে মেওয়াত এলাকা বিস্তৃত। উদ্ধৃতঃ মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

বড় ভাই মুহাম্মদ-এর কাফন-দাফন এবং মাদরাসার সাময়িক ব্যবস্থাপনা থেকে অবসর হওয়ামাত্র তিনি সাহারানপুর এসে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীকে সমস্ত অবস্থা অবহিত করলেন। ভক্ত অনুরক্তদের অব্যাহত অনুরোধের ফলে এবং উভয় পুণ্যাত্মা পিতা-পুত্রের পবিত্র হাতে হিদায়াত ও কল্যাণের যে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে তা অব্যাহত রাখার তাগিদে মাওলানা সাহারানপুরী তাঁকে অনুমতি দান করেন। তবে সতর্কতার খাতিরে বললেন, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূম থেকে এক বছরের ছুটি গ্রহণ করা হোক। যদি সেখানে এ বসে এবং স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত হয় তখন স্থায়ী অব্যাহতি গ্রহণ করা যাবে।

মাওলানা ইলিয়াস মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমের মুহতামিম সাহেবের বরাবরে নিয়ম মাফিক যে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

بحضرت مہتمم صاحب

بعد سلام مسنون آنکہ سانحۂ انتقال اخوی جناب مولانا مولوی محمد صاحب کی وجہ سے بندہ کو نظام الدین کے مدرسہ کا انتظام و خبر گیری کے واسطے وہاں کچھ قیام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اکثر اہل شہر و محبان بندہ و خیر خواہان علم متقاضی ہیں کہ بالفعل بندہ وہاں اقامت کرے اور جو منافع و اشاعت علوم حضرت والد صاحبؒ و برادر مرحوم کی سعی اور تعلیم سے ان کوردہ اور گنوار لوگوں میں اور علوم سے نہایت بعید اور ناآشنا لوگوں میں ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی حرص پیدا ہوتی ہی کہ کچھ دنوں وہاں قیام کر کے اس کے اجرا کا بندوبست کر سکوں اور اس دینی حصّہ میں بھی کچھ حصّہ لے لوں، لھذا عارض ہوں کہ ایک سال کے لئے بندہ کی رخصت منظور فرمائی جاوے۔

فقط والسلام، بندہ محمد الیاس امتر عفی عنہ

হযরত মুহতামিম সাহেব,

মাসনূন সালাম বাদ নিবেদন এ যে, ভাই জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ সাহেব-এর ইন্‌তিকালের শোকাবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে মাদরাসা নিযামুদ্দীনের ইন্‌তিজাম ও দেখা-শোনার জন্য কিছুদিন সেখানে আমার থাকার প্রয়োজন। যেহেতু অধিকাংশ শহরবাসী, অধমের মুহিব্বীন ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাগাদা দিচ্ছেন যেন আমি অধম সরাসরি সেখানে অবস্থান করি। তাছাড়া মহান পিতা ও ভ্রাতার শিক্ষা-দীক্ষা ও মেহনত মুজাহাদার বরকতে জ্ঞান ও শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এ মুর্খ গোয়ার মানুষগুলোর মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ইল্‌ম ও তা'লীম প্রচারের যে সুফল অর্জিত হয়েছে তা দেখে নিজের অন্তরেও আকাঙ্ক্ষা জাগছে যে, কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে উক্ত মেহনত পুনরায় চালুর চেষ্টা করি এবং এ মহান দ্বীনী কাজেও কিছু হিস্‌সা লই। তাই অনুগ্রহপূর্বক এক বছর সময়ের জন্য অধমের ছুটি মঞ্জুর করা হোক। ওয়াস্‌সালাম

ইতি

বান্দা মুহাম্মদ ইলিয়াস আখতার[১]

অবশেষে অনুমতি মিললো কিন্তু তিনি মারাত্মক প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে আক্রান্ত হন। দিন দিন প্লুরিসি রোগ বাড়তেই লাগলো। এমনকি শিরা একেবারেই বসে গেলো, হাত-পা শীতল হয়ে আসলো।

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

ফলে সকলেই 'ইন্না লিল্লাহি' পড়া শুরু করে দিলেন। অবশেষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রোগের উপশম হয়ে সুস্থতার লক্ষণ ফুটে উঠলো এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রোগশয্যা ত্যাগ করলেন এবং নতুনভাবে জীবন ফিরে পেলেন।[১]

দিল্লির নিযামুদ্দীনে আগমন

সুস্থ হয়ে তিনি কান্ধালা থেকে নিযামুদ্দীনে চলে এলেন। সে সময় নিযামুদ্দীনে কোনো বস্তি ছিল না। মসজিদের আশ-পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। ছোট একটি পাকা মসজিদ, একটি বাংলাঘর, একটি হুজরা, দরগাহ্র দক্ষিণ দিকে সংশ্লিষ্ট লোকদের বসতি আর অল্প ক'জন মেওয়াতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের গরীব তালিবে ইলম ছিলো। মোটকথা, মাদরাসা, মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট ঘরবাড়ি–তেই ছিলো নিযামুদ্দীনের সমগ্র আবাদী।

স্বাচ্ছন্দ্যে চলার মতো মাদরাসার আয়ের নিয়মিত কোনো সূত্র ছিল না। তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র ভরসা এবং অল্পেতুষ্টি ও পরিচালকের অটুট মনোবলই ছিলো আসল পুঁজি। অশেষ অনটন ও কষ্টসহিষ্ণুতার সাথেই দিনাতিপাত করতে হতো। এমনকি অনাহারেও থাকতে হতো। কিন্তু ছাত্র-উস্তাযের মধ্যে রূহানী তারবিয়ত এমনভাবে হচ্ছিল যে, অনাহারের থেকেও কেউ অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তাও করেনি। কখনো কখনো বন্য ফল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মেটানো হতো। তালিবে ইল্মরা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে রুটি ভেজে চাটনী দিয়ে খেয়ে নিতো। এমন কঠিন পরীক্ষায় মাওলানা ইলিয়াস কখনো বিচলিত হননি। বরং সমাগত সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের কথা ভেবেই তিনি শংকিত হতেন এবং সাথীদের সতর্ক করতেন।

মাদরাসার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও নির্মাণকাজে মাওলানা ইলিয়াসের বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিলো না। মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র হাজী 'আবদুর রহমান[২]-এর প্রচেষ্টায় নিযামুদ্দীনে কয়েকটি হুজরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ উন্নয়ন পছন্দ করেননি। তিনি বলেন, প্রকৃত কাজ হলো শিক্ষা ও তা'লীম। মাদরাসার ইমারত যখন পাকা হলো তা'লীম তখন কাঁচা হলো।

মাওলানা ইলিয়াস অধিকাংশ সময় শায়খ সৈয়দ নূর মুহাম্মদ বাদায়ূনীর মাযারের নিকটে প্রহরে পর প্রহর নির্জনে কাটাতেন। দুপুরের খবার সাধারণতঃ সেখানেই পৌছে দেয়া হতো। রাতের খাবার ঘরে ফিরে খেতেন। সকল নামায জামা'আতের সাথেই পড়তেন। নামাযের জামা'আত করানোর জন্য আমরা সেখানে চলে যেতাম। সবক পড়ার জন্য কখনো ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত হতো। কখনো আবার চক্করওয়ালী মসজিদে এসে পড়িয়ে যেতেন। হাদীসের দরসের পূর্বে তিনি অযু করে দু'রাকাত্ নামায পড়ে নিতেন। তিনি বলতেন, হাদীসের হক তো আরো বেশি। এ হলো নূন্যতম পরিমাণ, যা না করলেই নয়। হাদীস পড়ানোর সময় কারো সাথে কথা বলা কিংবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্‌দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২. শুভস্মরণীয় হাজী 'আবদুর রহমান মেয়াতে এক অমুসলিম বেনিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যিয়ারত লাভ করে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাদরাসা নিযামুদ্দীনেই তিনি মাওলানা মুহাম্মদের কাছে কুর'আন ও দীনী শিক্ষা অর্জন করেন এবং মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী'র হাতে বায়'আত হয়েছেন। মাওলানা মুহাম্মদ-এর সময় সকল দীনী কাজে তিনি প্রবীণতম সাথী ও সহকর্মী ছিলেন। তিনি তাঁকে দীনী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ মনে করতেন। বস্তুতঃ তিনি মেওয়াতের প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দীনের বড় দৌলত দান করেছিলেন। তাঁর ঝোঁক ছিলো অমুসলিমদের মাঝে তাবলীগ করা। এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবযোগ্যতা ছিলো। এক হাজারেরও বেশি মানুষ তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিলো। শিঙগার অঞ্চলে নও-মুসলিমের জন্য একটি মাদরাদা কায়েম করেছিলেন। মেওয়াতের শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজের ইসলাহ ও সংশোধন হলো তাঁর অন্যতম কীর্তি। ৬৪ হিজরী সনে রবি'উস-সানীতে তিনি ইনতিকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি'উন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উঁচু মকাম দান করুন। আমীন। উদ্ধৃতঃ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

দরস ছেড়ে তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার নযির তাঁর এখানে ছিলো না। বিশেষকরে তিনি হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব *মুস্তাদরাকে হাকিম*-এর দরস ফজরের পূর্বেই সম্পন্ন করতেন।[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাওলানা ইসমা'ঈল ও মাওলানা মুহাম্মদ মেওয়াতিদের দীনের দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে এসেছেন। এ দুজন মুসলিম মনীষীদ্বয়ের ইনতিকালের পর মেওয়াতিরা শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। তারা যখন জানতে পারল যে, নিযামুদ্দীনের শূন্য মাসনাদ নতুন করে আলোকিত করেছেন মাওলানা ইসমা'ঈলের পুত্র ও মাওলানা মুহাম্মদের ভাই মাওলানা ইলিয়াস তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী রূপে তাশরীফ এনেছেন তখন তারা পুনরায় নিযামুমদ্দীনে একে একে উপস্থিত হতে থাকে। তারা মাওলানা ইলিয়াসের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বললেন, আপনার খান্দানের প্রতি কৃতার্থ মানুষগুলোকে সুযোগ দিন। যেন তারা আপন বুজুর্গানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে পারি। তারা মাওলানা ইলিয়াসকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে মেওয়াত সফরের অনুরোধ জানাতে লাগলো। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের এলাকায় যেতে পারি এক শর্তে তা হলো– মেওয়াতে তোমরা মক্তব কায়েম করবে। কেননা, এদের মূল চিকিৎসা হলো দীনি তা'লীম তাই তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মেওয়াত অঞ্চল থেকে তাবলীগী দাওয়াতের সূচনা করেন এবং দীন সম্প্রসারণের জন্য মেওয়তে একটি দীনী মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

মাওলানা ইলিয়াস প্রথমে মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলাহ ও সংশোধনের প্রয়াস চলান। তিনি বলেন, যে পর্যায়ের জযবা দ্বারা মক্তব মাদরাসা পরিচালনা করা প্রয়োজন তা এখনো বহুদূরে। নিজেদের মধ্যে ইখলাসিয়্যাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও সমাজ জীবনে ইসলামপ্রীতির কিছুটা উন্নতি লাভ করতে পারলে আল্লাহ্ চাহে তো সামান্য মেহনতেই অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২. মক্তব কায়েম করা মেওয়াতিদের জন্য তখন অসাধ্য কাজ ছিলো, এরচেয়ে কঠিন কোনো শর্ত তারা কল্পনাই করতে পারতো না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো 'রোজগারি' থেকে সরিয়ে বাচ্চাদেরকে পড়ায় এনে বাসানো। তাই শর্ত শোনামাত্র দাওয়াতকারীরা একেবারেই দমে গেলো। তাদের আগ্রহে দারুণ ভাটাও পড়লো এবং চেহারায় পূর্ণ নৈরাশ্য ফুটে উঠলো। ওরাও শর্ত স্বীকার করলো না; মাওলানা ইলিয়াসও তাদের দাওয়াত কবুল করলেন না। দু'তিনবার এমনই হলো। একবার এক বুঝমান মেওয়াতি এ ভেবে মাওলানা শর্ত মেনে নিলেন যে, আগে মাওলানাকে মেওয়াতে নেয়া তো হোক, তারপর দেখা যাবে। মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতে তাশরীফ আনলেন এবং যথারীতি শর্ত পূরণের দাবী জানালেন। তাঁর জোরদার তাগাদা ও পীড়াপীড়ি এবং কিছু লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে একটি মক্তব কায়েম হলো। এভাবে মেওয়াত অঞ্চলে মক্তবের সিলসিলা শুরু হয়ে গেলো। মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতিদেরকে বললেন, তোমরা মক্তবে ছেলে দাও। শিক্ষকদের সম্মানি আমি ব্যবস্থা করবো। প্রধানতঃ কৃষিজীবী মেওয়াতিরা এটা কিছুতেই মানতে রাজি ছিলো না যে, তাদের বাচ্চারা ক্ষেত-খামার ও গুরু-মহিষের যত্ন ছেড়ে কিতাবের যত্নে লেগে যাবে। দ্বীনের খাতিরে সামান্য কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করবে এমন দ্বীনী তলব বা কদর তো তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই খুব হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এবং মনোরঞ্জন ও খোশামোদির মাধ্যমে তাদেরকে মক্তবের ব্যাপারে রাজী করাতে হলো এবং অনেক বলে কয়ে অনুরোধ উপরোধ করে মেওয়াতি বাচ্চাদেরকে পড়ায় বসানো হলো। এ প্রথম সফরে মাওলানা ইলিয়াস মোট দশটি মক্তব কায়েম করলেন। মেওয়াতে দীনীকাজে সর্বপ্রথম তিনি নিজের অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছেন। তারপর অন্যান্যদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। নিযামুদ্দীন ও মেওয়াতের তাবলীগী কাজ এবং মক্তবের দায়িত্ব মাওলানা সৈয়দ রিযা হাসানের উপর এবং দিল্লির তাবলীগী কাজের দায়িত্ব হাফেয মাওলানা মকবুল হাসানের উপর সোপর্দ ছিলো। তাবলীগী কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিলো শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর হাতে। এছাড়াও যাবতীয় বেতনাদি পরিশোধ করা, বিভিন্ন মাহফিলে অংশ নেয়া, নিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরামর্শ সাপেক্ষ বিষয় হাজী রশীদ আহমদের বিবেচনা অনুযায়ী সম্পন্ন হতো। উদ্ধৃতঃ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা'ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

তিনি ১৩৪৪ হিজরীতে দ্বিতীয় হজ্জব্রত পালন করে ফিরে এসে তিনি দাওয়াতের ও গাশ্‌তের[১] কাজ শুরু করেন।[২]

জীবনের শেষ দিকে মাওলানা ইলিয়াস ‘ইলম ও ফিকিরের প্রতি বেশ তাকিদ ও তারগীব দিতে লাগলেন। যারা অশিক্ষিত, তাদের প্রতি বেশি দরদ দেখালেন। যাকাত আদায় করা ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ওপর বিশেষ জোর দিলেন। তার এ মেহনতের ফলে বিশ্বের বহু মানুষ আজ মেওয়াতিদের মতো নিজেদের পরিবর্তন করেছে। এভাবে তিনি বিভিন্ন দেশে ইজতিমা করেন। অবশেষে বিশ্ব ইজতিমা বাংলাদেশে দুই পর্বে পরিচালিত হয়ে আসছে।[৩]

শেষ হজ্জব্রত পালন ও হারামায়নে দাওয়াতের কাজের সূচনা

মাওলানা ইলিয়াসের আজীবন স্বপ্ন ছিলো; ভারতবর্ষে কাজ কিছুটা ভিত্তি ও স্থিতি লাভ করার পর কয়েকজন বিশিষ্ট সাথীসহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনায় গিয়ে তিনি দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। কেননা এ তো মক্কা মদীনারই সওগাত যা গ্রহণ করে সুদূর ভারতের মুসরিম মিল্লাত ধন্য হয়েছেন। সুতরাং হারামায়নের অধিবাসীরা بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا (আমাদের সম্পদ আমাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে) বলে দাওয়াতকে স্বাগত জানাবেন এটাই তো স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এভাবে ‘আরবদের দাওয়াতী জাগরণের মাধ্যমে এ মহান সম্পদ ইসলামী বিশ্বের ঘরে ঘরে বণ্টিত হতে পারে।

৫৬ হিজরীর দিকে তাঁর অন্তরে এ অনুভূতি ও স্পৃহা প্রবল হয়ে দেখা দিলো। তাই জিলকদ মাসের ১৮ তারিখে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মাওলানা ইলিয়াস পানির জাহাজে তাবলীগী বয়ান, আহকামুল হজ্জ বিষয়ক আলোচনা করেন। জিদ্দা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে ‘বাহ্‌রা’ নামক স্থানে যাত্রাবিরতী হলো। তখন স্থানীয় বিশিষ্টদের এক মজলিসে মাওলানা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ সম্পর্কে বয়ান রাখেন এবং শ্রোতামণ্ডলী তাঁকে স্বাগত জানালেন। এভাবে দাওয়াতে তাবলীগের কাজকে অনেকে কঠোর বিরোধিতা করেন আবার অনেকে জোরদার সমর্থন করে বলেন, আমি গায়বী সাহায্যের দৃঢ় আশা রাখি। মাওলানা ইলিয়াসের এখলাসের বদৌলতে আজ দাওয়াতী তাবলীগের মেহনত বিশ্বজুড়ে চলছে।

ইন্তেকাল

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাল কি বৃহস্পতিবার? বলা হলো ‘জ্বি হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, আমার কাপড়-চোপড় দেখে নাও কোনো নাপাকি আছে কি না। নেই শুনে খুশি ও আশ্বস্ত হলেন। খাটিয়া থেকে নেমে অযু করে জামাতের সাথে নামায পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু খাদেমগণ বললেন, আপনি খুবই অসুস্থ। এ অবস্থায় কিভাবে যাবেন? তিনি তাদের কথা শুনলেন না; বরং তিনি মসজিদে ঈশার নামাযের জামাতের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের মধ্যেই ইস্তিঞ্জার হাজত হলো। পরে পাক পবিত্র হয়ে কামরায় ছোট জামাতে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে বললেন, আজ রাতে আমার কাছে এমন লোকদের থাকা উচিত যারা শয়তান ও ফিরেশতাদের আলামতের মাঝে পার্থক্য বুঝে। মাওলানা ইন‘আমুল হাসান-কে জিজ্ঞাসা করলেন, اللهمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ দু‘আটি কি যেন? তিনি পূর্ণ দু‘আ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

اللهمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اوسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ.

---

১. গাশ্‌ত ফারসী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ঘোরাফেরা করা। তাবলীগ জামাতে গাশ্‌ত দ্বারা বোঝানো হয়, জনসাধারনের মাঝে বের হয়ে দ্বীনের প্রধানতম আরকান ও মৌলিকতম বিষয় তথা কালিমা, নামাযের দিকে আহ্বান করা।

২. মাওলানা আবুল হাসান ‘আলী নদবী, *মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কী দীনী দা‘ওয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বিশ্ব ইজতিমা* (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৪৭

"হে আল্লাহ্ ! গুনাহ যত হোক তোমার মাগফিরাত আরো প্রশস্ত আর আমার আমল নয় বরং তোমার রহমতই আমার ভরসা।"[১]

এ দু'আ তাঁর যবানে জারি থাকল। বললেন, আজ এ চায়, আমাকে গোসল করিয়ে নিচে নামিয়ে দাও। দাঁড়িয়ে দুরাকাত নামায পড়ি। তাহলে দেখতে পেতে নামায কি অপরূপ রূপ ধারণ করে। রাত ১২টার দিকে একটা ভয়াভহ ভাব দেখা গেলো। ডাক্তারকে ফোন করা হলো। ডাক্তার এসে ঔষধ খাওয়ালেন। রাতে অনবরত اَللّٰهُ اَكْبَرُ ধ্বনি শ্রুত হলো। শেষ রাতের দিকে মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা ইকরামুল হাসান-কে স্মরণ করলেন। মাওলানা ইউসুফকে বললেন, আয় বেটা ইউসুফ! আমার বুকে আয়! আলিঙ্গন কর। আমি তো চল্‌লাম।

ভোর রাতে আযানের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি'উন। এভাবে শেষ রাতের আধারে নিভে গেলো মিটিমিটি করা শেষ তারাটি। সারা জীবনের সাধনাক্লান্ত মুসাফির যিনি হয়ত কখনো নিশ্চিন্ত ঘুমের স্বাদ পাননি, তিনি আজ আখেরী মানযিলে এসে সুখের আবেশে মিষ্টি ঘুম ঘুমিয়ে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً *فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ *وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার পালন কর্তার নিকট ফিরে যাও। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"[২]

ফজরের নামাযান্তে হাজারো চোখের তপ্ত অশ্রুর মাঝে মাওলানা ইউসুফ-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলো এবং মাওলানা ইলিয়াসের পাগড়ী তাঁর মাথায় বেঁধে দেওয়া হলো।

মাওলানা ইলিয়াসের সন্তান-সন্ততি ও আপনজন

মাওলানা ইলিয়াস ইনতিকালের সময় এক পুত্র সন্তান মাওলানা ইউসুফ ও এক কন্যা সন্তান (শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র দ্বিতীয় স্ত্রী) রেখে যান। খোদ শায়খুল হাদীস ছিলেন মাওলানা ইলিয়াসের আপন ভাতিজা, জামাতা এবং পরমপ্রিয় ও আস্থাভাজন ছাত্র। কবি বলেন,

وما قَلَّ مَن كانَت بَقاياهُ مِثلَنا * شَبابٌ تَسامى لِلعُلى وَكُهولُ

"যার উত্তরাধিকারী তাঁরই মতো উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যুবক কিংবা প্রবীণ, তাঁর মৃত্যু হলেও সে অমর।"[৩]

মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী

জন্ম ও বংশ

তিনি ২৫ জুমাদাল-উলা ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ২০ মার্চ ১৯১৭ খ্রি. রোজ বুধবার ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের মুযাফফর নগর জেলার কান্ধলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্ব তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস, দাদা মাওলানা ইসমাঈল এবং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া-এর চাচাত ভাই।[৪]

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২. আল-কুর'আন, ৮৯: ২৭-৩০

৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আদ্দা'য়িয়াতুল কাবীরাতুশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী* (করাচি: এডুকেশনাল প্রেস, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৬ ; মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত একশ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন* (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২৫

শৈশব ও বাল্যকাল

ছোটকাল থেকেই তিনি একটি দ্বীনি ও ইলমী পরিবেশে লালিত পালিত হন। তাঁর পরিবারের শুধু পুরুষ নয়; বরং মহিলারাও তাকওয়া-পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরিবারের সকলেই ছিলেন হাফেজে কুর'আন।

হিফজুল কুর'আন

মাত্র ১০ বছর বছরেই মাওলানা ইউসুফ পুরো কুর'আন মজীদ মুখস্থ করে ফেলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রতি বিশিষ্ট বুজুর্গদের নেক দৃষ্টি ও স্নেহ মুহাব্বত ছিলো। বিশেষ করে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী তাঁকে নিজ পুত্রের মতো আদর করতেন। তিনিও তাঁকে পিতা বলেই ডাকতেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

হিফজ শেষে তিনি ১১ বছর বয়সে নিজ পিতার কাছে 'আরবী পড়া শুরু করেন। সর্বপ্রথম *মীযান মুনশা'য়িব* পড়েন এবং মাত্র ১৫-২০ দিনেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ব করে ফেলেন। এরপর *সরফেমীর*, *পাঞ্জেগাঞ্জ* অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে পড়েন। এরপর পিতা মাওলানা ইলিয়াস স্বীয় আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে তাকে *নাহবেমীর* পড়ান। এরপর *কাসিদায়ে বুরদা*, *চেহেল হাদীস* ইত্যাদি কিতাব পড়ান। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া-এর নিকট *সুনানে আবূ দাঊদ* পড়েন। মাজাহেরুল উলূম মাদরাসায় মাওলানা 'আব্দুল লতীফ সাহেবের নিকট *সহীহ বুখারী* পড়েন।

তিনি নিজেই বলেন, আমি পয়সা জমা করার জন্য একটি ডিব্বা বানিয়েছিলাম। যা কিছু পয়সা হাতে আসতো তা এ ডিব্বায় রেখে দিতাম। উদ্দেশ্য ছিল এ জমাকৃত অর্থ দিয়ে সীরাতে'র কিতাব ক্রয় করবো। সীরাতের প্রতি এমনই ছিল তাঁর ভালোবাসা।

আতিথেয়তা

দিল্লির নিজামুদ্দীনে সবসময় মেহমান আসতেই থাকতো। মাওলানা ইলিয়াস সর্বদা মেহমানদের সঙ্গেই খানা খেতেন। মাওলানা ইউসুফের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন থেকেই মাওলানা ইলিয়াস স্বীয় পুত্রের হাতে মেহমানদের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি প্রত্যহ বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসতেন এবং সবার খাওয়া শেষ হলে প্লেট-বাসন নিয়ে যেতেন। নিজামুদ্দীনে কাশিফুল উলূম মাদরাসায় ছাত্রদের খাবার রান্না করার নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ধারাবাহিকভাবে সকল ছাত্রই রান্না করত। তিনি নিজেও এ কাজে শরীক হতেন। ছাত্রদের সাথে আটা পিষতেন, মসলা বাটতেন এবং জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন।[১]

বিবাহ

১৩৫৪ হিজরী সনে মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী মাদরাসা মাযাজিরুল 'উলূম-এর বার্ষিকী মাহফিলে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র বড় কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী বিবাহ পড়ান।

প্রথম হজ্জব্রত পালন

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী শৈশব থেকেই হজ্জের তামান্না ছিল। তিনি মাত্র তিন বছর বয়সে খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর বাড়িতে বকরির বাচ্চার সাথে দৌড়াদৌড়ি করতেন। বকরির বাচ্চার উপর উঠে বলতেন, তোর উপর বসেই আমি হজ্জে যাবো। মাওলানা সাহারানপুরী এ শুনে তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, কি বললে তুমি? উত্তরে তিনি বললেন, আমি হজ্জে যাবো। সাহারানপুরী জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে যাবে? উত্তরে তিনি আবার বললেন, এ ছাগলের উপর বসেই যাবো। মাওলানা

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

সাহারানপুরী তাঁর জন্য দু'আ করলেন। ১৩৫৬ হিজরী সনে তিনি পিতা মাওলানা ইলিয়াসের সাথে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হিজাযে গমন করেন।[১]

দ্বিতীয় হজ্জব্রত পালন

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী প্রথম হজ্জের আঠারো বছর পর ১৩৭৪ হিজরী সনে দ্বিতীয় বার হজ্জব্রত পালন করেন। এবার তিনি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান থেকে হাজারো তাবলীগের সাথী নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ইতিমধ্যে হিজাযে তাবলীগের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সফরে তিনি জেদ্দা, মাক্কা মুকাররমা ও মাদীনাতুল মুনাওয়ারাসহ হিজাযের বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী কার্যক্রম প্রচার করেছেন। তিনি মক্কা মুকাররমায় হজ্জের কার্যক্রম শেষ করে ২৩ জিলহজ্জ ১৩৭৪ হিজরী সনে মদীনায় গমন করেন। মদীনাতে তিনি এক চিল্লা (চল্লিশ দিন) অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনা থেকে জেদ্দায় এসে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হন।[২]

শেষ হজ্জব্রত পালন

তিনি ১৩৮৩ হিজরী সনে মুতাবিক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এ হজ্জব্রত পালন করেন। মাওলানা ইউসুফের প্রথম হজ্জব্রত পালনের সময় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা ইলিয়াস ছিলেন। দ্বিতীয় হজ্জব্রত পালনের সময় পিতা শূন্যতা অনুভব করেছেন। এবার হজ্জের সফর সঙ্গী ছিলেন শ্রদ্ধেয় উস্তায মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী। কিন্তু তৃতীয়বার বা শেষ হজ্জব্রত পালনের সময় তাঁদের কেউই জীবিত ছিলেন না। তবে এ সফরে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ছিলেন। সে সাথে মাওলানা ইন'আমুল হাসান কান্ধালবী এবং মাওলানা ইউসুফ-এর ছেলে মাওলানা হারূনও ছিলেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী এবার হজ্জে তাবলীগের দাওয়াতী কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।[৩]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি পাঠদানে মনোনিবেশ করেন। *আবূ দাঊদ শরীফের* দরস দেয়া আরম্ভ করেন এবং বহু বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। পিতা মাওলানা ইলিয়াস তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও তাবলীগের চেয়ে দরস-তাদরীসের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। বিভিন্ন জামাতের সাথে অল্পকিছু সময় দিলেও পিতা যেমনটা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করতেন তিনি তা পূরণ করতে পারেননি। কিন্তু পিতার ইন্তিকালের পর তাবলীগের মুরুব্বীরা তাঁর মাথায় আমীরের পাগড়ী পড়িয়ে দেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাবলীগ ও দাওয়াতের মেহনতের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বলা হয় তিনি দিনে ১৮ ঘণ্টা নিজামুদ্দিনে বয়ান করতেন।

একবার ডাক্তার তাঁকে বললেন, হযরত আপনি আরেকটু কম সময় বয়ান করেন। নইলে আপনার কণ্ঠের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তিনি বললেন, কণ্ঠ ভালো রাখার জন্য যদি আমাকে আল্লাহর কথা বলা থামিয়ে দিতে হয়, তবে সে কণ্ঠ দিয়ে আমি কী করবো? মাওলানা ইলিয়াস-এর সময় তাবলীগের কাজ শুরু হলেও সেটা তখনো বৈশ্বিক রূপ ধারণ করেনি। অল্পকিছু হলেও সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর সময়ে তাবলীগের ও দাওয়াতের মেহনত বিশ্বব্যাপী জোরালোভাবে শুরু হয়। দিনব্যাপী তাবলীগের কাজে এত সময় দেয়ার পরও ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাসনীফাত তথা লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করতেন। তাঁর যে তিনটি রচনা বিশ্বজুড়ে মাকবুল ও সমাদৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

- *আমানিল আহবার*, বিখ্যাত হাদীসের কিতাব *শরহু মা'আনিল আছারের* ভাষ্যগ্রন্থ।
- *হায়াতুস সাহাবা*, সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য।

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৪

- *মুন্তাখাব হাদীস*, তাবলীগ জামাতের ছয় নম্বর সম্পর্কিত নির্বাচিত হাদীসসমূহ, তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

আবুল হাসান 'আলী নদবী বলেন, "তিনি এক বছরের কাজ করেন এক মাসে, এক মাসের কাজ করেন এক সপ্তাহে, আর এক সপ্তাহের কাজ করেন এক দিনে।"[১]

সন্তান-সন্ততি

বিবাহের চার বছর পর ১৩৫৮ হিজরী সনে মাওলানা ইউসুফের ঘর আলোকিত করেন এক পুত্র সন্তান। তাঁর নাম রাখেন হারুন। এ হারুনের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন তাবলীগ জামাতের বর্তমান নিযামুদ্দীনের আমীর মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ।[২]

ওফাত

জীবনের বেশিরভাগ চিল্লা তিনি পাকিস্তানে কাটিয়েছেন। সে পাকিস্তানেই সফরকালীন অবস্থায় ২৯ যিলকদ ১৩৮৪ হিজরী মুতাবিক ০১ এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এ মহামনীষী অল্প বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইনতিকালের পূর্বমুহূর্তে তিনি জোর আওয়াজে পড়লেন, لا اله الا الله الحمد لله الذي انجز وعده لا اله الا الله محمد الرسول الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا شيئ قبله ولا بعده لا شيئ قبله ولا بعده لا شيئ قبله ولا بعده পড়তে পড়তে তিনি তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেলেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। আমিন।[৩]

মাওলানা মুহাম্মদ হারূন

জন্ম

মাওলানা মুহাম্মদ হারূন ১৩৫৮ হিজরী সনে ২৪ রমাযানুল মুবারক মুতাবিক ৮ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ এর ঘর আলোকিত করেন। শৈশব থেকেই তিনি দাদা মাওলানা ইলিয়াস-এর চোখে চোখে থাকতেন।[৪]

মাওলানা ইলিয়াস বলতেন,

> "যে ব্যক্তি তাবলীগের কাজে আমার মাধ্যমে আসতে পারেনি সে আমার ছেলে মাওলানা ইউসুফের মাধ্যমে আসবে। আর যে মাওলানা ইউসুফের মাধ্যমে আসতে পারেনি সে আমার নাতি হারূনের মাধ্যমে আসবে ইনশাআল্লাহ।"[৫]

শৈশব ও কৈশর

মাওলানা হারূন এভাবেই দাদার কোলে তাঁর শৈশব কাটাতে লাগলেন। মাওলানা ইলিয়াসের ইনতিকালের পর তিনি তাঁর পিতা মাওলানা ইউসুফের কাছে নিযামুদ্দীনে কাটাতে লাগলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর পিতা কিভাবে মিম্বরে বসে বয়ান করতেন। এভাবে তাঁর বয়স যখন পাঁচ তখন তিনিও মসজিদের পিছনে গিয়ে সামনে কয়েকটি ইট অথবা তাঁর সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে তিনিও পিতার ন্যায় শাহাদাত আঙ্গুলী নেড়ে-চেড়ে ছোটো আওয়াযে বয়ান করতেন।

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *তাযকিরায়ে মাওলানা মুহাম্মদ হারূন কান্ধালবী* (দিল্লি: মাকতাবায়ে আবুল হাসান 'আলী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

একদিন তাবলীগের এক সাথী মসজিদের পিছনে গিয়ে দেখেন মাওলানা হারূন আলোচনা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি হচ্ছে? এরা কারা? হারূন উত্তরে বলল, এখানে দীনী আলোচনা হচ্ছে, এরা তাবলীগের তাকাযা নিয়ে মক্কার দিকে পায়ে দল রওয়ানা হবে। তিনি বললেন, মক্কায় তো পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। হারূন বললেন, আল্লাহ্ একটা ব্যবস্থা করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্। এভাবেই মাওলানা হারূনের মধ্যে তাকওয়া, পরহেযগারী পয়দা হয় এবং দিল্লির নিযামুদ্দীনে বড় বড় পীর, মাশায়েখের আশা-যাওয়ার মাধ্যমে তাঁর মধ্যে বুযুর্গী দেখা দেয়।

মাওলানা হারূন এভাবেই দিনাতিপাত করছিলেন। তাঁর মা দেখলেন যে, নিযামুদ্দীনে আসা-যাওয়ার ফলে হারূনের লেখা-পড়া কিছুই হচ্ছে না। তাঁর বয়স এখন প্রায় আট বছর। এ বয়সে হিফ্য সম্পন্ন করে ফেলার কথা। কিন্তু এর কিছুই হয়নি। তাই তিনি ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তে হারূনের ব্যাপারে অসিয়্যত করেন–

"হারূনকে আমার পিতা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী[১]-এর কাছে পাঠাতে হবে। কেননা আমি দেখেছি, তিনি ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের মায়ের আদর দিয়ে লালন-পালন করেন। বিশেষত হারূনকে আমার পিতাজী কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান দান করবেন।"[২]

শিক্ষাজীবন

এ অসিয়্যতের পরিপ্রেক্ষিতে হারূনকে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র কাছে প্রেরণ করা হয়। তখনও হারূনের মুসলমানী হয়নি। কিন্তু এতো বয়স হয়েছে এখনো মুসলমানি হয়নি। একথা ভাবা যায় না। শায়খুল হাদীস প্রথমেই তাঁর খতনার ব্যবস্থা করলেন। শায়খুল হাদীস নাতি হারূনের সাথে অনুরূপ আচরণ করতেন যেরূপ তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াহ্য়া তাঁর সাথে করেছেন। এভাবেই মাওলানা হারূনের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি কুর'আন মাজীদ হাজী মুহাম্মদ হানীফ মেওয়াতী'র কাছে পড়েছেন। তিনি হাফেয নূরুদ্দীন মেওয়াতী'র নিকট ১৮ আগস্ট ১৯৫৪ খ্রি. কুর'আন মাজীদ হিফ্য করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা হারূনের 'আরবী, ফার্সী শিক্ষার সূচনা হয়। তিনি মাওলানা মুনিরুদ্দীন মেওয়াতী, মাওলানা সিদ্দীক, মাওলানা য়া'কূব সাহারানপুরী এবং মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ বেলওয়াবীর কাছে মাদরাসা মু'ঈনুল ইসলাম ও বাংলা ওয়ালী মসজিদে কাশিফুল 'উলূম মাদরাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

মাত্র একুশ বছর বয়সে মাওলানা হারূন উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল 'উলূম দেওবন্দে অথবা মাযাহিরুল উলূমে ভর্তি হওয়ার মনোনিবেশ করেন। সে সময় এ প্রতিষ্ঠান দুটিই হাদীস পড়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা দারুল 'উলূম দেওবন্দে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী *বুখারী*র দরস প্রদান করতেন, আর মাযাহিরুল 'উলূমে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী হাদীসের দরস প্রদান করতেন। এছাড়াও মাওলানা হারূনের পিতা মাওলনা ইউসুফ ও দাদা মাওলানা ইলিয়াস মাযাহিরুল 'উলূম থেকেই হাদীসের সনদ অর্জন করেছেন। তিনিও পিতা ও দাদার ন্যায় মাযাহিরুল 'উলূমে ১৩৮১ হিজরী মুতাবিক ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়ে যান। *সহীহ বুখারী*র দরস প্রদান করতেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, জামি' *তিরমিযী*, *শারহু মা'আনিল আসার* এবং *নাসায়ী*'র দরস প্রদান করতেন মাওলানা আমীর আহমাদ। *সহীহ মুসলিমে*র দরস প্রদান করতেন মাওলানা মানযূর আহমাদ খান। *আবূ দাঊদ* পড়াতেন মাওলানা আস'আদুল্লাহ। ১৩৮১ হিজরী সনের শা'বান মাসে তিনি হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করে নিযামুদ্দীনে ফিরে যান।[৩]

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী মাওলানা হারূন-এর নানা ছিলেন।

২. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *তাযকিরায়ে মাওলানা মুহাম্মদ হারূন কান্ধালবী* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

কর্মজীবন

মাওলানা হারূন ১৩৮১ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে নিযামুদ্দীনের কাশিফুল 'উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু পিতা মাওলানা ইউসুফ-এর সাথে তাবলীগী কাজের একজন 'আলিম সহযোগী অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি পিতার এ প্রয়োজন পূরণার্থে তাবলীগের বিভিন্ন সফর এবং বিভিন্ন ইজতিমাতে আসা-যাওয়া শুরু করেন। এভাবে তিনিও তাবলীগের একজন দায়ী' হয়ে গেলেন।

বায়'আত

মাওলানা শাহ্ 'আবদুল কাদির রায়পুরীর নিকট মাওলানা হারূন বায়'আত হন। মাওলানা শাহ্ 'আবদুল কাদিরের সাথে মাওলানা ইলিয়াস ও শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়ার রূহানী সম্পর্ক ছিল। এজন্য মাওলানা হারূন ও মাওলানা তালহা[১] তাঁর সাথে রূহানী সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মাওলানা শাহ্ 'আবদুল কাদির রায়পুরী তাঁদের দুজনের বায়'আত গ্রহণ করে বললেন, তোমরা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া'র নিকট থেকে আত্মশুদ্ধীর সবক গ্রহণ কর। ২৬ রবী'উল আওয়াল ১৩৯২ হিজরী সনে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী মদীনা মুনাওওয়ারাতে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কদম মুবারকের নিকট 'আকদামে 'আলীয়া'য় মাওলানা হারূন কান্ধালবীকে ইজাযত ও খিলাফত প্রদান করেন।[২]

বিবাহ

মাওলানা হারূন, মাওলানা তালহা ও মাওলানা 'আকিল ইব্ন হাকীম-এর বিবাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ পড়ান। মাওলানা হারূন-কে পাঁচ হাজার রূপী দেনমোহরে মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্ধালবীর কন্যার সাথে, মাওলানা তালহা-কে আড়াই হাজার রূপী দেনমোহরে সুফী ইফতিখারুল হাসান কান্ধালবীর কন্যার সাথে এবং মাওলানা 'আকিল-কে মহরে ফাতেমী দেনমোহরে মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবীর কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।[৩]

সন্তান-সন্ততি

মাওলানা হারূনের চার কন্যা সন্তান ও এক পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে দুই কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ইনতিকাল করেন। প্রথম কন্যা সন্তানের নাম ফাতেমা। তিনি ২ রবী'উস সানী, ১৩৮৩ হিজরী মুতাবিক ২৩ আগস্ট ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সন্তানের নাম সা'দ। তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় সন্তান 'আয়িশা। মাওলানা হারূন তাঁকে খুব আদর করতেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন।

মৃত্যু

মাওলানা মুহাম্মদ হারূন ২৯ শা'বান ১৩৯৩ হিজরী সনে ৩৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলায়হি রজি'উন। সে দিন 'আসরের নামাযের পূর্বে মাওলানা হারূনকে গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা তাঁকে গোসল ও কাফনের কাপড় পড়িয়েছেন। তাঁরা হলেন– মাওলানা হাজী হানীফ (মুদাররিস মাদরাসা কাশিফুল 'উলূম); মাওলানা শাব্বীর; মাওলানা দাউদ; কারী রশীদ খুরজুওয়ী; মাওলানা য়া'কূব সাহারানপুরী; মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ খান (মক্কার তাবলীগ জামাতের আমীর ছিলেন। সেদিন তিনি নিযামুদ্দীনে ছিলেন।)। এঁরা ছাড়া আরো কয়েকজন ছিলেন। অতঃপর তাঁকে নিযামুদ্দীনের চৌষট্টি খাম্বার নিকটে জানাযা পড়ানো হয়। জানাযা নামাযের ইমামতি করেন

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকাযারিয়া কান্ধালবীর একমাত্র পুত্র।

২. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *তাযকিরায়ে মাওলানা মুহাম্মদ হারূন কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

মাওলানা ইন'আমুল হাসান। মাগরিবের নামাযের পর তাঁর পিতা মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবীর পাশে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাওস দান করুন। আমীন।[১]

মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ

জন্ম

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী এক আলোচিত নাম মাওলানা সা'দ কান্ধালবী। তিনি ৮ মুহাররম, ১৩৮৫ হিজরী মুতাবিক ০৯ মে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাযে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা সা'দ কান্ধালবী মাওলানা ইলিয়াস-এর বংশধর।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা সা'দ কান্ধালবী দিল্লির নিযামুদ্দিনেই বেড়ে উঠেছেন। তাঁর লেখাপড়াও এখানেই। মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী-এর কাছে তাঁর লেখা-পড়ার হাতেখড়ি হয়। তিনি তাঁকে মসজিদে নববীর রওযাতুম-মিন রিয়াযিল জান্নাতে বসে প্রথম পাঠদান করেন। নিযামুদ্দিন মারকাযে অবস্থিত কাশিফুল উলুম মাদরাসায় ১৯৮৭ খ্রি. লেখাপড়া সম্পন্ন করেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও খিলাফত

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি মাওলানা সা'দ কান্ধালবী আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দুজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে খিলাফত লাভ করেন। তাঁরা হলেন- মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী ও মুফতী ইফতিখারুল হাসান কান্ধালবী। তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে খিলাফত অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি মাওলানা ইন'আমুল হাসান, মাওলানা সায়্যিদ আহমদ খান মাক্কী, মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ বলিয়াবী, হাজী 'আবদুল ওয়াহ্হাব, মুফতী যয়নুল 'আবিদীনসহ প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন।[২]

কর্মজীবন

মাওলানা সা'দ কান্ধালবী পড়ালেখা শেষ করে নিযামুদ্দীনের কাশিফুল উলূমে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি *সুনানু আবী দাঊদ* ও *হিকায়াতুস সাহাবা* পাঠদান করতেন।

বিবাহ

তিনি ১৯৯০ খ্রি. মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমানের কন্যা বারীরাকে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি ৩ ছেলে ও ২ কন্যার পিতা। তাঁর দুই ছেলে নিযামুদ্দীনের কাশিফুল 'উলূম মাদরাসা থেকে তাকমীল সম্পন্ন করে আলিম হন এবং ছোট ছেলে এখনও অধ্যয়নরত।

পারিবারিক সূত্রেই মাওলানা সা'দ কান্ধালবী তাবলিগী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন। তাবলিগের কাজে তার শ্রম ও নিষ্ঠার কারণেই মাওলানা ইনামুল হাসান তাকে ১০ সদস্যের শূরা কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অনেক প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকের উপস্থিতিতে তাকে তিনজন আমিরে ফায়সালের একজন মনোনীত করেন।

তাবলীগ জামাত দু'দলে বিভক্ত

২০১৪ খ্রি. মার্চে মাওলানা জুবাইরুল হাসানের ইনতিকালের পর মাওলানা সা'দ একক আমিরে ফায়সাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।এ সময় তার সাথে আরও কয়েকজনকে ফায়সাল (সিদ্ধান্তদাতা) হিসাবে নিয়োগের দাবি করেন কেউ কেউ। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে তাবলীগ জামাতে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় কয়েকজন সিনিয়র সদস্য (মাওলানা ইব্রাহীম দেওলা, মাওলানা আহমাদ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
২. *দৈনিক যুগান্তর*, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. ইসলামী পাতা।

লাটসহ প্রমুখ) নিযামুদ্দিন মারকায ছেড়ে চলে যান। মাওলানা সা'দ নিযামুদ্দীন থেকেই তার অনুসারীদের তাবলীগী মেহনতের কার্য পরিচালনা করেন। অন্যদিকে মাওলানা ইব্রাহীম দেওলা ও মাওলানা আহমাদ লাটসহ পৃথিবীর 'উলামায়ে কিরামগণ দিল্লির একটি মসজিদ থেকে মাশওয়ারার ভিত্তিতে তাবলীগী কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। বর্তমানে বিশ্ব ইজতিমা'ও বাংলাদেশে দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম পর্বে 'আলমী শূরা তথা 'উলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় পর্ব মাওলানা সা'দ-এর অনুসারীগণ পরিচালনা করে আসছেন।[১]

১. *দৈনিক যুগান্তর*, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. ইসলামী পাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জন্ম, শৈশব ও শিক্ষাজীবন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষাজীবন

ভারতবর্ষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যুগে যুগে অসংখ্য নি'আমত বর্ষণ করেছেন। এ নি'আমত বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সে নি'আমতের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে একটি নি'আমত হলো, যুগে যুগে বাইরে থেকে এমন কিছু পরিবার হিজরত করে এদেশে নিবাস গড়েছেন, যারা এদেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যাঁদের অবদানে এদেশে জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, আত্মশুদ্ধি ও মানবসেবার মতো জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে; যাঁদের কারণে এ ভারতবর্ষের সুনাম-সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সে পরিবারগুলোর তালিকার শীর্ষসারির একটি পরিবারের নাম হলো কান্ধালার শায়খ পরিবার।

এ পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকেই ছিলেন একটি করে সূর্য; যাঁরা তাদের জীবনে এদেশে দীন, ঈমান কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলো ছড়িয়েছেন; দাওয়াত ও সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন। মানবসেবার সে কণ্টকাকীর্ণ পথে তারা যেই চেষ্টা ও সাধনা করেছেন; তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এতোটাই কবুল ও পছন্দ হয়েছে যে, তার দ্বিতীয় কোনো নযির অন্য কোনো পরিবার দেখাতে পারবে না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো– মুফতী এলাহী বখ্শ্ কান্ধালবী, মাওলানা ইসমা'ঈল কান্ধালবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কান্ধালবী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী, মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবী ও অত্র অভিসন্দর্ভের অগ্রনায়ক শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী।

জন্ম

পূর্বেই বলা হয়েছে, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া বিয়ে করেছেন হাফিয ইউসুফ-এর দুই কন্যাকে। প্রথমে জ্যৈষ্ঠ কন্যার সাথে বিবাহ হয়। এ দম্পত্তি যুগলের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জনক হন। কিন্তু এর কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর পরলোক গমনের পরেই মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার শ্বশুর হাফিয ইউসুফ তাঁর দ্বিতীয় কন্যা আমাতুল হাই-এর সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁরই গর্ভে ১৩১৫ হিজরী'র রমযান মাসে ১২ তারিখ দিবাগত রাত ১১টার সময় তারাবীর নামাযের পর কান্ধালা নগরীতে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্মের সুসংবাদ যখন প্রচারিত হলো তখন কান্ধালা শহরের বুযুর্গগণ ও মহল্লাবাসী সবেমাত্র তারাবীর নামায শেষ করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে মুসল্লীগণ দলে দলে মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার ঘরে ছুটে এলেন। তাঁরা নবজাতক শিশুর শুভাগমনের জন্য পিতা-মাতাকে মুবারকবাদ জানিয়ে যার যার ঘরে ফিরলেন।

দাদা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল দিল্লির নিযামুদ্দীনস্থ তাঁর কর্মস্থালে ছিলেন। পৌত্রের জন্ম সংবাদ শুনামাত্র তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো– "আল-হাম্দুলিল্লাহ্, আমার বিকল্প চলে এসেছে।" এ ছিল তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিতবহ। এ বছরই তিনি শাওয়াল মাসে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।[২]

তাহনীক[৩] ও 'আকীকা

শায়খুল হাদীসের পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী (রহ.) অধিকাংশ সময় কুতুবুল আখতার মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর খিদমতে অবস্থান করতেন। শায়খুল হাদীসের জন্মের

১. মাওলানা মুহাম্মদ মাস'ঊদ আযীযী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

২. প্রাগুক্ত।

৩. কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির চাবিয়ে দেয়া খেজুর মুখের লালাসহ নবজাতকের মুখে দেওয়া ও সপ্তম দিনে নবজাতকের মাথা মুণ্ডানো-কে তাহনীক বলে।

সময়ও তিনি শায়খ গাঙ্গুহির খিদমতে ছিলেন। পুত্রের সংবাদ পেয়ে শায়খের অনুমতি নিয়ে 'আকীকার জন্য পুত্র জন্মের সপ্তম দিনে গাংগুহ থেকে কান্ধালা চলে আসেন।[১]

সেসময় পুরাতন খান্দানগুলোতে নিয়ম ছিল মুরব্বীদের সামনে সন্তানকে কোলে নেওয়া এবং শিশুর প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা খুবই সঙ্কোচের একটি বিষয়। এমনকি শিশু সন্তানকে দেখার জন্য ঘরে ডেকে নেওয়ার প্রচলনও ছিল না। কিন্তু 'আকীকার ব্যবস্থা করা ছিল আবশ্যক। পিতার পরিবর্তে দূর সম্পর্কের নানী বিবি মার্‌য়াম শায়খুল হাদীসের 'আকীকার আয়োজন করেন। এতো সব নিয়মনীতি থাকার পরও শায়খুল হাদীসের পিতা মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া বাড়িতে এসে আচানক শিশুকে দেখতে চাইলে অন্দরমহলের সকল নারিগণ বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলাবলি করতে লাগল, হাজার হলেও তো বাপ। আদরের দুলালকে না দেখে কি চুপ করে বসে থাকতে পারে!

মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া সাথে করে নাপিত নিয়ে আসেন। শিশুকে ঘর থেকে বাহিরে নিয়ে আসা মাত্রই মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া নবজাতক শিশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং নাপিতকে ইশারা দিয়ে বলেন, শিশুর মাথা মুণ্ডিয়ে দাও। মাথা মুণ্ডানো শেষ হলে কর্তিত চুলগুলো একত্রিত করে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, আমি চুল মুণ্ডিয়ে দিলাম, তোমরা ছাগল যবাই করে দাও। আর চুলের ওজনে 'রূপা' সদকা করে দাও। অতঃপর মাথায় যাফরানের লাল রং লাগিয়ে[২] নামকরণ করা হয়– মুহাম্মাদ মূসা ও মুহাম্মাদ যাকারিয়া। শেষোক্ত নামেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এ নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

শৈশব

সেসময় মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া স্থায়ীভাবে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর কাছে গাঙ্গুহতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। মাওলানা গাঙ্গুহীর পিতৃসুলভ সম্পর্ক ছিলো মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়ার সাথে। এ কারণে তাঁর সন্তানও মাওলানা গাঙ্গুহীর কাছে স্নেহ-মমতা ও দু'আ লাভের সুযোগ পেয়েছিল। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মধ্যে কান্ধালা ও দিল্লিতে আসা-যাওয়া করতেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী মাত্র আড়াই বছর বয়সে জন্মভূমি ছেড়ে মায়ের সাথে গাংগুহ চলে আসেন।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমি তখন আড়াই বছরের শিশু মাত্র। আমি দেখতে পেলাম, মাওলানা গাংগুহী প্রায়ই শিমূল গাছের নিচে আসন গেঁড়ে বসতেন। আমি তাঁর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম।"[৩]

শায়খুল হাদীস আরো বলেন,

> "যখন আমি একটু বড় হলাম তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাওলানা গাঙ্গুহীর আগমনের অপেক্ষা করতাম, আর তাঁকে দেখামাত্রই উচ্চকণ্ঠে কিরা'আতের মতো করে উচ্চ আওয়াজে বলতাম, আস্‌সালামু 'আলাইকুম। তিনিও একই ভঙ্গিতে আমাকে সালামের উত্তর দিতেন– ওয়া 'আলায়কুমুস্ সালাম।"[৪]

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

২. 'আয়্যামে জাহিলিয়্যাতে মক্কার কাফের মুশরিকরা 'আকীকার প্রাণী যবেহ করে তার মাথার রক্ত নবজাতক শিশুর মাথায় লাগিয়ে দিত। রক্তের পরিবর্তে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাফরানের রং নবজাতকের মাথায় লাগানোর নির্দেশ দেন।

৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী* (লাখনৌ: মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৫০

৪. প্রাগুক্ত।

এছাড়াও আমি হযরত গাংগুহীর কোলে খেলায় মেতে উঠতাম। তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে আমার দুই হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতাম। প্রতি বছর দুই ঈদে হযরতের সাথে পাল্কিতে চড়ে ঈদগাহে আসা-যাওয়া করতাম। এ পালকীর বাহক হতেন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম-'উলামা ও পীর-মাশায়েকগণ। অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে খানা খাওয়া এবং তাঁর খাবার শেষে উচ্ছিষ্টের একমাত্র ভাগিদার আমিই ছিলাম।"[১]

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার আড়াই বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত গাংগুহে অবস্থান করি। এখান থেকে কোথাও যাইনি। আমার বয়স যখন বারো বছর তখন থেকে মায়ের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে সাময়িক সময়ের জন্য কান্ধালাতে আসা-যাওয়া করতাম। কখনও কখনও কান্ধালাতে যাওয়ার পথে আমার পিতা মাওলানা ইয়াহইয়ার বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীসাথীদের বাসায় অবস্থান নিতাম।"[২]

সে সময় গাঙ্গুহ ছিলো 'উলামা-মাশায়েখের তীর্থকেন্দ্রস্বরূপ। মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর বাতিনী প্রশিক্ষণ এবং সুবিখ্যাত দরসে হাদীসের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে 'উলামায়ে কিরাম ও তালিবীনে সাদিকীন তথা সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষিগণ এ অজোপাড়াগাঁয়ে ছুটে আসতেন। সেখানে তখন এমনি এক 'ইলমী ও রূহানী পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো যে, সে যুগে দূরদেশ পর্যন্ত তার জুড়ি পাওয়া বড় দুষ্কর ছিল।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর শৈশব কেটেছে এমনি এক বরকতময় পরিবেশে যে শৈশবকালে পরিবেশের ভালোমন্দের প্রভাব শিশু মনে পড়ে একান্তই তার মনের অজান্তে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গাঙ্গুহ অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় মাওলানা গাঙ্গুহীর নিকটই কাটিয়েছেন। শায়খুল হাদীসের আম্মাজানের সাময়িক সময়ের জন্য কান্ধালাতে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনিও তাঁর সাথে যেতেন। আবার নির্দিষ্ট সময়শেষে গাঙ্গুহেই ফিরে আসতেন। অন্যদিকে শায়খুল হাদীসের পিত্রালয় কান্ধালাও ছিলো একটি ধর্মীয় কেন্দ্র ও জ্ঞানপীঠস্বরূপ। কান্ধালার ঘরে বাইরে ছিলো ইবাদতের পরিবেশ, নফল নামাযাদি ও তিলাওয়াতের উপর গুরুত্বারো করা হতো। আল্লাহ্ ওয়ালাদের সংশ্রব, জ্ঞানচর্চায় মত্ততা ও ব্যস্ততা, আদব-আখলাক, শিষ্টাচারিতা, সদাচার, রিয়াযাত ও সাধনারচর্চা ছিলো ঘরে ঘরে। সচেতন শিশু মনে তার প্রভাব পড়তো অনিবার্যভাবেই। গাঙ্গুহ থেকে কান্ধালার পথে পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন তাঁর খান্দানের কত আত্মীয়স্বজন, মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, সতীর্থসহাধ্যায়ী সমবয়সী। অল্প সময় করে বেড়ানো হতো এক এক বাড়িতে। কখনো বা তাঁরা বড়দুলির পথ ধরে কান্ধালা যেতেন। এ পথেও ছিলো তাঁদের বেশ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমমনা লোক। এ পথে গেলেও অনুরূপ সময় কেটে যেতো। এরা সকলেই ছিলেন জ্ঞানী, গুণী ও শরীফ সজ্জন।[৩]

যে যুগে বুযুর্গগণ শিশুকিশোরদের চরিত্রগঠনে এমন কিছু পন্থা অবলম্বন করতেন যা আজকের মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের কাছে অদ্ভুত লাগবে– যাঁরা শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও তাদের প্রতিটি আবদার পূর্ণ করার পক্ষপাতী। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া এ ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন, আমার তেরো বছর বয়সে একবার আব্বাজান আমাকে কান্ধালা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, এ কথা শুনে আমি এতটাই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছি যে, ঈদের

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *ফাযায়েলে যবানে 'আরবী*, তা.বি., পৃ. ৩৪

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী* (লাখনৌ: মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৫১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

চাঁদের ন্যায় সেদিনের অপেক্ষায় দিন গুণতে শুরু করলাম। তা দেখে আব্বাজান আমার সে সফর মুলতবী করে দিয়ে বলেন, কোনো ব্যাপারে এতো খুশি ও নেশাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।[১]

শায়খুল হাদীসের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন ২৩ জুমাদাল উলা ১৩২৩ হিজরী সনে হযরত গাংগুহী ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সকলের চোখের মনি ও মাথার মুকুট। গাঙ্গুহ ভূমিকে ইল্‌ম ও হিদায়তের যে দিবাকর সুদীর্ঘ কাল আলোকিত করে রেখেছিল এবং দিক-দিগন্ত থেকে অসংখ্য আলোর পিপাসু জ্ঞানন্বেষিকে সে অজোপাড়াগাঁয়ে এনে জড়ো করেছিল, সে হিদায়ত-সূর্যের অস্ত যাওয়ার পর পরই তাঁরা আবার যার যার পথে চলে গেলেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আপন পিতামাতার উপর মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীকে এবং তাঁর মাতৃভূমি কান্ধালার উপর গাঙ্গুহকেই প্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষে সহসা গাঙ্গু ত্যাগ করা সম্ভবপর হলো না। তিনি সেখানেই তাঁর পীর ও উস্তাযের মাটি আঁকড়ে থাকলেন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার চিন্তা করেন।[২]

শিক্ষাজীবন

সেসময় সকলে শিশুদের চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে মক্তবে বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু শায়খুল হাদীসের পিতার বিষয়টি ছিল আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শায়খুল হাদীসের বর্ণনানুযায়ী যখন তাঁর পিতাকে দুধ ছাড়াতে না ছাড়াতেই তিনি পোয়া পারা কুর'আন মুখস্থ করে ফেলেন। আর সাত বছর বয়সে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ হিফ্‌জ সম্পন্ন করেন। কিন্তু শায়খুল হাদীস সাত বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনার বিস্‌মিল্লাহ্‌ও করতে পারেনি। তাঁর শরীরিক গঠন ও প্রবৃদ্ধির মাত্রা ভালই ছিলো। অর্থাৎ গায়ে-গতরে বেশ নাদুস-নুদুস ছিলেন। এ বয়সে এখনো পড়াশুনা শুরু না করায় বংশের মুরব্বিগণ তাজ্জব হয়ে (শায়খুল হাদীসের দাদী) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ! সন্তানসন্ততির মুহাব্বতে অন্ধ হয়ে গেছ। অথচ তুই তো সাত বছর বয়সে হিফ্‌য করেছিলি। যাকারিয়া দেখতে শুনতে তো ভালই বড় হয়েছে। নাতি আমার ষাঁড়ের মতো চরে বেড়াচ্ছে! শুনি তোর ইচ্ছাটা কি? সবশেষে ওকে তুই কি কাজের যোগ্য বানাচ্ছিস ? উত্তরে মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া বললেন, যতদিন খেলতে চায় খেলতে দিন। যেদিন ঢেঁকিতে মাথা সেধাবে সেদিন থেকে নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত পাবে না। সোজা কবরে গিয়েই ফুরসত নেবে।

অক্ষরজ্ঞান

অবশেষে সে শুভমুহূর্ত উপস্থিত হলো। মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর পাঠগ্রহণ শুরু হলো। স্থানটি ছিলো, গাঙ্গুহ। সেসময় মুযাফ্‌ফরনগরের একজন নেক্কার ডাক্তার হযরত গাংগুহের সোহ্‌বতে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আদরের সন্তানকে পড়ার জন্য তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন। তাঁর কাছেই শায়খুল হাদীস কায়েদায়ে বোগদাদী সমাপ্ত করেন। অতঃপর কুর'আন মাজীদ হিফয শুরু করেন। এভাবেই লেখাপড়ার ঘানিতে মাথা দিয়ে দেন।

কুর'আন মাজীদ হিফ্‌য

কুর'আন মাজীদ হিফ্‌য করা ছিল এ খান্দানের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের শিশু সন্তানদের শিক্ষার প্রথম আবশ্যিক স্তর। সে অনুসারে হিফ্‌য শুরু করানো হলো। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া'র শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অভিনব। তিনি প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা সবক দিয়ে বলতেন, এ পৃষ্ঠা একশ' বার পড়ে নাও, বাস, বাকী দিন ছুটি। এভাবে শায়খুল হাদীস হিফ্‌য সম্পন্ন করেন। শিশু যতই মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন হোক না কেন, মানব-প্রকৃতি ও বয়সের চাহিদা থেকে কোনো শিশুই মুক্ত থাকতে পারে না।

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেজ মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতী* (মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.) খ-১, পৃ. ২০

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার ধারণাও ছিলো না যে, একশ' বার এক পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করতে কী পরিমাণ সময় লাগতে পারে। তাড়াতাড়ি করে কিছুক্ষণ পড়েই এসে বলতাম, আব্বাজান! একশ' বার পড়া হয়ে গেছে। আব্বা বলতেন, আচ্ছা! ছুটি। কোনো রকম প্রশ্ন করতেন না। পরেরদিন বলতাম, কাল তো এতটুকু পড়েছিলাম, আজ ঠিক ঠিক-ই একশ' বার পড়েছি। আব্বাজান বলতেন, আজকের সত্য সত্যের তাৎপর্য আগামীতে ঠিকই টের পাবে।"[১]

শায়খুল হাদীস মাত্র ১২/১৩ বছর বয়স পর্যন্ত গাঙ্গুহেই অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ের মধ্যে চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস-এর কাছে উর্দূ পুস্তকাদিসহ *বেহেশতী যেওর* এবং ফারসীর বিভিন্ন কিতাব পড়ে ফেলেন। চাচা মাওলানা মুহাম্মাদ ইল্‌য়াসের দরস দানের পদ্ধতি ছিল, আধুনিক সবকের মধ্যে মারাত্মক ভুল হলে তিনি কিতাব বন্ধ করে দিতেন। আর বলতেন, যাকারিয়া ! তুমি ছয় সপ্তাহ নীরব থাকবে, তা হলে তোমাকে ওলী বানিয়ে দিব। শায়খুল হাদীস বলতেন, ছয় সপ্তাহ তো দূরের কথা ছয় দিনও নীরব থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

'আরবী শিক্ষার সূচনা

১৩২৮ হিজরীতে সাহারানপুর এসে শায়খুল হাদীসের 'আরবী শিক্ষার ধারাবাহিকতা শুরু হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, তার পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য কিতাবসমূহের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌প্রদত্ত মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছিলেন। মাওলানা ইলিয়াসও তা অনুসরণ করতেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি হলো– কোনো কিতাবের সাহায্য ছাড়াই তিনি মুখে মুখে 'আরবী ব্যাকরণের নিয়মাবলী লেখাতেন। তারপর দু'চারটি হরফ বলতেন, (مثال) মিসাল, (اجوف) আজওয়াফ, (ناقص) নাকিস, (مضاعف) মুযা'আফ কায়েদা চতুষ্ঠয় অনুসারে অনেক (صيغة) সিগা বানিয়ে তা শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি তামরীন করাতেন।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমি দশ থেকে বারো দিনেই *সরফে মীর* ও *পাঞ্জেগাঞ্জ* মুখস্থ শুনিয়েছিলাম। অবশ্য *ফুসূলে আকবরী* পড়তে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সে ধারাবাহিকতা অনুসারেই সরফ-নাহুর পাঠ্য কিতাবগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন সহকারে পড়ি। *কাফিয়া*র সাথে *মাজমূ'আয়ে আরবা'ঈন* পড়ানো হয়। কিন্তু *নাফহাতুল ইয়ামানে*র পরিবের্তে পবিত্র কুর'আনের ত্রিশতম পারার তরজমা পড়ানো হয়। *নাফহাতুল ইয়ামান* সম্পর্কে মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া বলতেন, একজন ফাসেদ 'আকিদার লোক জনৈক ইংরেজের ফরমায়েশে এ কিতাবটি প্রণয়ন করা হয়েছে। জানি না, কেনো যে, আমাদের বড়রা এমন একটি বইয়ের এত সমাদর করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, 'আরবী ভাষায় এতে উপাদেয় ও শিক্ষণীয় কিতাবাদি থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আজো এ বইটি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। তবে *নাফহাতুল ইয়ামানে*র তৃতীয় অধ্যায়ের কাসীদা পড়ানো হয়। অতঃপর *কাসীদায়ে বুরদা*, *বানাত সু'আদ*, *কাসীদায়ে হামযাইয়্যা* ও *মাকামাতে হারিরী* ইত্যাদি পড়েছি।"[২]

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
২. প্রাগুক্ত।

অধ্যাপনার জন্য গাংগুহ থেকে সাহারানপুর

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া কান্ধালা থেকে গাংগুহীতে আবাস স্থাপন করেন। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর আহ্বানে প্রতি বছরই হাদীসের কিতাবের দরসদানের জন্য মাওলানা ইয়াহ্ইয়াকে সাহারানপুর যেতে হয়। ১৩২৮ হিজরী সনে মাওলানা সাহারানপুরীর পীড়াপীড়িতে গাংগুহ ছেড়ে সাহারানপুর অবস্থান করেন। এভাবেই শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর সাহারানপুর মাদরাসায় পড়াশুনার ধারাবাহিকতা সূচিত হয়।

শায়খুল হাদীস পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ছাড়াও নাহুর কয়েকটি কিতাব মাওলানা যাফর আহমাদের কাছেও পড়েছেন। তিনি কোন বছর কি কি কিতাব পড়েছেন তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো–

প্রথম বছর : রমযান ১৩২৮ হিজরী থেকে শা'বান ১৩২৯ হিজরী পর্যন্ত

(১) *নাহবেমীর* (পূর্ণ) (২) *শরহে মিয়াতে 'আমেল* (তারকীবসহ পূর্ণ) (৩) *হিদায়াতুন্নাহু* (পূর্ণ) (৪) *কাফিয়া* (পূর্ণ)[১] (৫) *ঈসা গুজী* (পূর্ণ) (৬) *মিরকাত* (পূর্ণ) (৭) *শরহে তাহযীব* (অর্ধেক) (৮) *মুফীদুত তালিবীন* (প্রথম অনুচ্ছেদ) (৯) *নাফহাতুল ইয়ামান* (দুই কাসীদা) (১০) *আলফিয়ায়ে ইব্ন মালিক*[২] (অর্ধেক) (১১) *ফুসূলে আকবরী* (দুই তৃতীয়াংশ) (১২) কুর'আন তরজমা আম্মাপারা (পূর্ণ) ও ২৯ পারা অর্ধেক। (১৩) *মুজমূ'আ চেহেল হাদীস* (পাঁচটি চেহেল হাদীসের কিতাব পূর্ণ)। আব্বাজান *মাজমূ'আ চেহেল হাদীস* অবলম্বন করে আদব পড়াতেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, *মোল্লাজামী* ও কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী-এর *চেহেল হাদীস* পড়াতেন।[৩]

দ্বিতীয় বছর : রমযান ১৩২৯ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩০ হিজরী পর্যন্ত

(১) *আলফিয়ায়ে ইব্ন মালিক* (বাকি অর্ধেক) (২) *শরহে তাহযীব* (অবশিষ্টাংশ) (৩) *কুতবী* (তাসদীকাত ও তাসাব্বুরাতসহ) (৪) *তালখীস* (প্রথম ফন) (৫) *মাকামাতে হারীরী*[৪] (২৩ মাকামাহ) (৬) *হিসাব বিজ্ঞান* (৭) ২৯ পারা কুর'আন তরজমা (অবশিষ্টাংশ) (৮) *নাফহাতুল ইয়ামান* (১ম, ২য় ও ৫ম অনুচ্ছেদ) (৯) *কাসীদা বুরদা* (১০) *বানাত সু'আদ* (১১) *কাসীদা হামযিয়া*।[৫]

তৃতীয় বছর : রমযান ১৩৩০ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩১ হিজরী পর্যন্ত

(১) *মুখতাসারুল মা'আনী* (২) *নূরুল আনওয়ার* (৩) *মুতানাব্বী* (৪) *সাব'আ মু'আল্লাকাত*[৬] (৫) *হুসামী* (৬) *শরহে জামী'* (এক ষষ্ঠমাংশ) (৭) *কানযুদ দাকায়িক* (৮) *আল-মুখতাসারুল কুদূরী*[৭] (৯) *মায়বূযী* (১০) *সুল্লামুল 'উলূম*।[৮]

---

১. *কাফিয়া* ও *হিদায়াতুন্নাহু* পাশাপাশি পড়াতেন। সন্ধ্যায় যতটুকু *কাফিয়া* পড়াতেন, সকাল বেলা ততটুকু *হিদায়াতুন্নাহু* পড়াতেন। উদ্ধৃত: *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৮৩

২. শায়খুল হাদীস বলেন, আব্বাজান আমাকে *আলফিয়া ইব্ন মালিকের* সবক অক্ষরে অক্ষরে আদায় করতেন। আমার স্মরণ আছে, হাতের তালুতে প্রতিটি কবিতার প্রথম শব্দ লিখে রাখতাম। এতে পূর্ণ কবিতা স্মরণ হয়ে যেত। পড়ার সময় এর একটি উর্দূ শরাহও আমি লিখেছিলাম। উদ্ধৃত: *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৮৪

৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতি* (ঢাকা: মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.), খ-১, পৃ. ৮১

৪. মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী টীকাযুক্ত 'আরবী সাহিত্যের কিতাব পড়াতেন না। তিনি টীকা ছাড়া ও ই'রাব মুক্ত কিতাব কলকাতা থেকে ভিপি যোগে আনাতেন। উদ্ধৃত: *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৮৩

৫. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮২

৬. শায়খুল হাদীস বলেন, আব্বাজান আমাকে *মুতানাব্বী* ও *সাব'আ মু'আল্লাকাত* কিতাবদ্বয় টীকামুক্ত ছাপা না পাওয়ায়, তিনি নিজ হাতে লিখে পড়িয়েছেন। উদ্ধৃত: *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৮৩

৭. *কানযুদ দাকায়িক* ও *আল-মুখতাসারুল কুদূরী* পাশাপাশি পড়াতেন। সন্ধ্যায় যে পরিমাণ *কানযুদ দাকায়িক* পড়াতেন সকালে সে পরিমাণ *আল-মুখতাসারুল কুদূরী* পড়াতেন।

৮. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮১

চতুর্থ বছর : রমযান ১৩৩১ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩২ হিজরী পর্যন্ত

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন, আমার খাতায় এ সংক্রান্ত কিছু লেখা নেই। তবে মাদরস্যার বার্ষিক রিপোর্ট বইয়ের ১০১ নং পৃষ্ঠায় এ বছর যে সকল কিতাবের পরীক্ষা হয়েছে এর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে কিতাবগুলো হচ্ছে– (১) *মিশকাতুল মাসাবীহ* (২) *হিদায়া* ১ম ও ২য় খণ্ড (৩) *দেওয়ানে মুতানাব্বী* (৪) *হামাসা* (৫) *শরহু মা'আনিল আসার* (অর্ধেক) (৬) *শরহু নুখবাতিল ফিকার* (৭) *আলফিয়াতুল ইরাকী*। তবে এ শেষোক্ত কিতাবটির পরীক্ষা হয়নি।[১]

পঞ্চম বছর : রমযান ১৩৩২ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন, আমার খাতায় এ সংক্রান্ত কিছু লেখা নেই। তবে মাদরাসার বার্ষিক রিপোর্ট বইয়ের ১০১ নং পৃষ্ঠায় এ বছর যে সকল কিতাবের পরীক্ষা হয়েছে এর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে কিতাবগুলো হচ্ছে– (১) *মুল্লা হাসান* (২) *হামদুললাহ* (৩) *মীর যাহেদ* (৪) *উমূরে আম্মাহ* (৫) *মোল্লা জালাল* (৬) *রেসালায়ে গোলাম ইয়াহ্ইয়া* (৭) *মুয়াত্তা মুহাম্মাদ* (৮) *শরহু মা'আনিল আসার* (অবশিষ্টাংশ) (৯) *উকলিদাস* (১০) *শামসে বাযেগা* (১১) *মুয়াত্তা মালিক*। (শায়খুল হাদীস বলেন, আমি মুয়াত্তা মালিক কিতাবটি না পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেম। পরীক্ষক এটা জানতে পেরে আমাকে ফেল করিয়ে দেন এবং এটাই উচিত ছিল)।[২]

ষষ্ঠ বছর : রমযান ১৩৩৩ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩৪ হিজরী পর্যন্ত

(১) *জামি' তিরমিযী* (২) *বুখারী শরীফ* (৩) *সুনানু আবী দা'ঊদ* (৪) *হিদায়া* (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) (৫) *নাসা'য়ী শরীফ* (পূর্ণ)। শায়খুল হাদীস বলেন, এগুলো আব্বাজানের কাছে পড়েছি।[৩]

সপ্তম বছর : রমযান ১৩৩৪ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩৫ হিজরী পর্যন্ত

(১) *বুখারী শরীফ* (২য় বার) (২) *জামি' তিরমিযী* (২য় বার) এগুলো মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পড়েছেন।[৪]

অষ্টম বছর : রমযান ১৩৩৫ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩৬ হিজরী পর্যন্ত

(১) *সুনানু আবী দা'ঊদ* (২য় বার)। এ কিতাব মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পড়েছেন।[৫]

নবম বছর : রমযান ১৩৩৬ হিজরী থেকে শা'বান ১৩৩৭ হিজরী পর্যন্ত

(১) *মুসলিম শরীফ* (২) *নাসা'য়ী শরীফ*। এগুলো মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পড়েছেন।[৬]

মানতিকের কিতাব অধ্যায়ন

শায়খুল হাদীস মানতিক, ফালসাফা শাস্ত্রের পুস্তকাদি পড়েন মাওলানা 'আবদুল ওয়াহীদ সুম্ভলী[৭] ও মাওলানা আবদুল লতীফের কাছে। এছাড়াও তৎকালে মাজেদ আলী[৮]সহ খায়রাবদীর মতো শিক্ষকের

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. তিনি ছিলেন তৎকালীন সময় মানতিক ও ফালসাফার একজন বড় ইমাম।
৮. মাওলানা মাজেদ 'আলী জৌনপুর জেলার 'মানি কিলাঁ'র অধিবাসী ছিলেন। তিনি মানতিক ও ফালসাফা মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। হাদীস পড়েছেন গাঙ্গুহে। হাদীসের এ দরসেই তিনি মাওলানা

নিকটও তিনি অধ্যয়ন করেন। তবে সিলেবাসভিত্তিক পড়ালেখা শায়খুল হাদীস পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার কাছেই অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার মানতিকের শিক্ষক ছিলেন তিনজন। *কুতবী* (মীর) চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস-এর নিকট পড়েছি। *শরহে ত্বহাবী*সহ মানতিকের অন্যান্য কিতাব মাওলানা 'আবদুল লতীফ-এর নিকট পড়েছি। *সুল্লাম*, *মায়বুযী*, *মীর যাহেদ*, *উমূরে আম্মাহ* মাওলানা 'আবদুল ওয়াহিদ সাম্ভূলী-এর নিকট পড়েছি। এছাড়াও *মোল্লা জালাল* ও *মোল্লা হাসান* তো মাদরাসায় ক্লাসেই পড়েছি।"[১]

হাদীস অধ্যয়ন

১৩৩২ হিজরীর ৭ মুহাররম যোহরের নামাযের পর শায়খুল হাদীসের হাদীস অধ্যয়নের পর্ব শুরু হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া প্রথমে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে *মিশকাত শরীফে*র বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে খুতবা পড়েন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ দু'আ করেন। কিন্তু মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কী কী দু'আ করেছিলেন তা শায়খুল হাদীস জানতে পারিনি। কিন্তু শায়খুল হাদীস দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন তাঁকে দিয়ে আজীবন হাদীসেরই খিদমত করান। তাঁর থেকে যেন হাদীস ছুটে না যায়।

১৩৩৩ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীসের সূচনা হয়। এটি হলো সে বছর যে বছর হযরত সাহারানপুরী দীর্ঘদিন অবস্থানের নিয়তে হিজাযে রওয়ানা হন। শায়খুল হাদীসের খেয়াল ছিলো– চাকুরি বা অন্য কোনো প্রয়োজনের তাড়া নেই। কাজেই এক বছরে দাওরা সম্পন্ন করতে হবে– এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও ছিলো না। এজন্যে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার কাছে *সুনানু আবী দাঊদ* পড়া শুরু করেন। জামি' তিরমিযী'র পাঠগ্রহণ যদিও হযরত সাহারানপুরীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত স্থগিত রেখেছিলেন; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অন্য কিছু কারণে (ইব্‌ন মাজাহ ব্যতীত) অবশিষ্ট্য কুতুবে সিহাহ শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার কাছে অধ্যয়ন করি। সে বছর শায়খুল হাদীস সীমাহীন পরিশ্রম ও সাধনার স্বাক্ষর রাখেন। কারণ তিনি এতোটাই হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন যে, একটি হাদীসও তিনি ওযূ ব্যতিরেকে পড়েননি।[২]

পড়ালেখায় একাগ্রতা

পড়ালেখায় একাগ্রতার জন্য মাদরাসার বাহিরে কোনো কিছুর যেন প্রয়োজন না হয় সেদিকে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া বিশেষ নযরদারী করতেন। শায়খুল হাদীস বলেন, একবার আমার নতুন জুতা কে যেন মাদরাসা থেকে নিয়ে যায়। এরপর ছয় মাস পর্যন্ত আমার জুতা কেনার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, এ সময়ের মধ্যে মাদরাসা থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ আমার হয়নি। আর মাদরাসার মসজিদেই জুমু'আর নামায হতো। তাই জুতার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হাম্মামখানায় যেতে জুতার প্রয়োজন হয়। অনেকেই জুতা পুরানো হয়ে গেলে তা হাম্মামখানায় রেখে আসে, এ চিরাচরিত প্রথা এখনো বিভিন্ন মাদরাসায় দেখা যায়। তাই এখানেও আমার জুতার প্রয়োজন হয়নি।[৩]

ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবীর সহপাঠী ছিলেন। 'মেন্ডোহ গিলাওয়াঠী' ও কলকাতা 'আলীয়ায় তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। বিশেষত তর্কশাস্ত্র ও মানতিকের কিতাবাদি তাঁর যিম্মাতেই থাকতো। ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রি. ঈদুল ফিত্‌রের দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে নিজ মাতৃভূমিতেই সমাহিত করা হয়। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী রচিত, হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮৬

২. মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল* (দেওবন্দ: ইত্তেহাদ বুক ডিপো, তা.বি.), ৩১-৩২।

বিদ্যার্থী হলেন বিদ্যনিষ্ঠ

১০ যিলকদ ১৩৩৪ হিজরী সনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার ইনতিকালে মুহ্যমান যোগ্য সন্তান মাওলানা যাকারিয়া পুনরায় হাদীস পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন করেই আদেশ করলেন, কোনো গড়িমড়ি করা চলবে না, *তিরমিযী* ও *বুখারী* পুনরায় আমার কাছে পড়তে হবে।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার এ একেবারেই সায় দিচ্ছে না। কিন্তু হযরত সাহারানপুরীর নির্দেশ অবজ্ঞা করারও কোনো সুযোগ নেই। সেদিন স্বপ্নে দেখি যে, শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী আমাকে বলছেন, যাকারিয়া ! তুমি আমার কাছে *বুখারী* পড়ো। ঘুম থেকে উঠে ভাবনায় পড়ে গেলাম, শায়খুলহিন্দ তো সুদূর মাল্টায় বন্দীজীবন যাপন করছেন। তাঁর কাছে কীভাবে পড়তে যাবো! মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, তুমি পুনরায় আমার কাছে *বুখারী শরীফ* পড়বে।"[১]

অবশেষে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পুনপাঠ শুরু হলো। এ বছরটি ছিলো সীমাহীন মেহনত ও অধ্যাবসায়ের বছর। শায়খুল হাদীস বলেন, যতদূর আমার মনে পড়ে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ দুই-আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমাতাম না। সারারাত হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাদীসের দরসে বসতাম। এ অক্লান্ত সাধনা, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও সীমাহীন শ্রমদান আমাকে খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নয়নমণি হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এর ফলশ্রুতিতে শায়খুল হাদীস লাভ করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য ও পূর্ণ আস্থা। ফলে শায়খুল হাদীসের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো– যাতে তাঁর পরবর্তী জীবনের সাফল্য, সমসাময়িকদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী এবং ইতিহাসের অমর পাতায় জুড়ে দেয় শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়ার স্বর্ণখোচিত নাম।[২]

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
২. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শিক্ষকতা ও বৈবাহিক জীবন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষকতা ও বৈবাহিক জীবন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-এর কর্মজীবন

সন্তানবৎসল কামালিয়তধন্য পিতার ইনতিকালের মহাবিপদ শায়খুল হাদীস তাঁর বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও ধৈর্যস্থৈর্য ও ঈমানী শক্তির দ্বারা কেবল যে সহ্যই করেছেন এমনটি নয়, বরং শোকাভিভূত খান্দান ও ঘরবাসীদের জন্য সান্ত্বনার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন। মৃত্যুকালে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবীর ঋণের পরিমাণ ছিল আট হাজার টাকা। কেননা, তিনি গোটা জীবন বিনা বেতনে দরস-তাদরীসের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বাহ্যিকভাবে তাঁর আয়ের কোনো উৎস ছিলো না। এ কারণে সংসারের খরচ নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি (কুতুবখানায়ে ইয়াহ্ইয়ায়ী[১]) নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এর মাধ্যমে আকাবিরে দেওবন্দ ও পূর্বসূরিদের কিতাবাদি ছাপাবেন। ক্রেতা যদি নগদ মূল্য দেয় তাহলে যেমন ভালো। বাকিতে কিনে যদি পালিয়েও যায় তাহলেও ভালো। তিনি কোনোদিন কাউকে বকেয়ার জন্যে তাগাদা দেননি। এ কারণেই ইনতিকালের সময় তাঁর ওপর আট হাজার টাকার ঋণ রয়েছে।[২]

পিতার আট হাজার রুপির বিশাল ঋণ

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ইনতিকালের সময় আট হাজার রুপির ঋণ ছিল। তখন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ছিলেন মাত্র উনিশ বছরের তরুণ; কিন্তু প্রতিভাবান এ উত্তরসূরি যথেষ্ট সাহসিকতা ও পৌরুষের সাথে পরিস্থিতি সামলে নেন। এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আব্বাজানের যিম্মায় আট হাজার রুপির ঋণ ছিলো। তখন আমার বয়স ছিলো মাত্র উনিশ বছর। পাওনাদাররা ভেবে ছিলো, তাদের পয়সা বুঝি এবার গচ্চা যাবে। কিছু কিছু ঘনিষ্ঠ লোক তাদের পাওনা পরিশোধের জন্যে এতোটা কঠিনভাবে তাগাদা দিচ্ছিলো যে, তা কোনোদিন কল্পনাতেও আসেনি। ওই বছর আমাকে আর্থিক বিষয়গুলো যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিলো। বিস্ময়ের বিষয় হলো, ওই সময় মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার ওপর এতো অসংখ্য অনণিত রহমত এসেছে যে, বারংবার মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তালার এ বাণী

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া জীবিকা নির্বাহের জন্য মাদরাসা থেকে কোনো বেতন-ভাতা নিতেন না। তিনি কুতুবখানায়ে ইয়াহ্ইয়ায়ী নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। অত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন একজন ম্যানেজারের (মুনশী মুহাম্মদ হুসায়ন ফয়যাবাদী) মাধ্যমে। শায়খুল হাদীস বলেন, মুনশী মুহাম্মদ হুসায়ন ফয়যাবাদী প্রচণ্ড পরিশ্রমী ছিলেন। পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে কাজগুলো সম্পন্ন করতেন। তাঁর একটা অভ্যাস ছিলো আব্বাজান যখন সফরে থাকতেন তখন আব্বাজানের কাছে যেসব চিঠি আসতো তিনি সে চিঠিগুলোর উপর লেখা ঠিকানা কেটে আব্বাজান যেখানে থাকতেন সেখানকার ঠিকানা লিখে দিতেন। সে সাথে তিনি সে চিঠিতে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলোও লিখে দিতেন। আইনমতে যা নিষিদ্ধ। কিন্তু তিনি বিষয়টি জানতেন না। ঘটনাক্রমে একবার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এটি মারাত্মক অপরাধ তখন তিনি আত্মগোপন করে মক্কা মুকাররমায় চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। একবার মুনশী সাহেব শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবীকে কড়া ভাষায় বললেন যে, আপনি তো সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করেন। তা না করে লাইব্রেরির কিছু কাজ তো করে দিতে পারেন। তার এ ধরনের আচরণে আব্বাজান মনোপূত হলেন না। তিনি মুনশীকে বেশ বকা দিয়ে বললেন, মুনশী শোন! আমি তো মনে করি, তার বরকতেই আমার জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

"হযরত মুস'আব ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রাঃ)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা দুর্বল ও অসহায় লোকদের কারণেই রিয্ক ও সহায়তা প্রাপ্ত হচ্ছো।" উদ্ধৃত: *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৩৫৯৪ ও ৩৬৪৯

২. মুহাম্মদ মাসউদ আযিযী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

আমার মনে পড়েছে– وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا "তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নি'আমতগুলো হিসেব করো তো তা গুণে শেষ করতে পারবে না"[১]–এর ওপর শুধু বিশ্বাসই জন্মেনি; বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হয়েছে।"

শায়খুল হাদীস আরো বলেন,

"আমি পূর্ণ সাহসিকতার সাথে এ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। যার ব্যাপারেই জেনেছি, সাথে সাথে তার কাছেই চিঠি লিখেছি। অদ্য হতে আমার আব্বাজান মরহুম মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ঋণের দায়-ভার থেকে মুক্ত। তাঁর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার।"[২]

সম্পদ বণ্টন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

"আমি যেহেতু পরিবারের বড় সন্তান ছিলাম, তাই পিতার ইনতিকালের পর পৈত্রিক সম্পত্তির সুষ্ঠ বণ্টন করার চেষ্টা করেছি। আব্বাজানের ইনতিকালের সময় আমার ছোট বোন নাবালেগা ছিলো। পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে তার অংশ পুরোপুরি হিসাব রাখা মুশকিল ছিলো। এজন্য আমি চাচাজানকে তার উকিল বানিয়ে দিলাম। কান্ধালায় আমাদের যে জায়গা-জমি ছিলো তা আম্মা, দাদি ও ছোট বোনের নামে লিখে দিলাম। আর কুতুবখানা আমার ভাগে নিলাম। যদিও সেসময় এটার মূল্য খুবই কম ছিলো। ঋণের বোঝাও আমার কাঁধে নিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। অধমকে তিনি বাদশাহী জীবন দান করেছেন। তবে প্রথম এক বছর খুব মুজাহাদার সাথে জীবন-যাপন করতে হয়েছে।"[৩]

ঋণ পরিশোধ

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

"পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় আব্বাজানের ঋণের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। আব্বাজানের ইনতিকালের পর বিভিন্ন উপায়ে তাঁর ঋণ পরিশোধের চেষ্টা চালিয়ে যাই। কেননা, তখন আমার কোনো উপার্জন ছিলো না। উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিলো আব্বাজানের রেখে যাওয়া লাইব্রেরিটি। তৎকালীন সময়ে এ লাইব্রেরির মূল্য বাজার দর হিসেবে ঋণের পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি ছিলো। কিন্তু নিলামের দর হিসেবে ঋণের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম ছিলো। আব্বাজানের একান্ত বন্ধু ভাট অঞ্চলের গ্রামপতি জনাব শাহ্ যাহিদ হাসান সাহেব তখন আমাকে পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, আমি যেনো অনতিবিলম্বে লাইব্রেরিটি বিক্রি করে দেই। এরপর যতোটুকু ঋণ বকেয়া থাকবে তা তিনি অনুগ্রহপূর্বক নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন। আর আমি মরহুমের বাড়িতে বা অন্য কোথাও শিশুদেরকে পড়ানোর চাকরি গ্রহণ করি। আমি তার এ প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এতে তিনি বেশ মনোক্ষুণ্ন হয়েছেন।[৪]

আমি প্রতিদিন এক একজন ঋণদাতাকে ওয়াদা দিতাম, আগামীকাল পরিশোধ করবো। পরেরদিন আমি সবক শেষ করে খালপাড় গিয়ে হাকীম খলীল আহমাদ সাহেবের কাছে যেয়ে বলতাম, আজকের সন্ধ্যায় আমাকে এতো টাকা পরিশোধ করতে হবে। তখন তিনি আমাকে

১. আল-কুর'আন, ১৬: ১৮
২. মুহাম্মদ মাসউদ আযিযী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ২০৪
৪. মুহাম্মদ মাসউদ আযিযী নদভী, প্রাগুক্ত।

তাঁর চেম্বারে বসিয়ে বিভিন্ন দোস্ত-আহবাব থেকে দশ রুপি, বিশ রুপি, পঞ্চাশ রুপি করে ঋণ নিতেন এবং একটি কাগজে ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করার তারিখ লিখে আমাকে দিতেন। এভাবে আব্বাজানের অনেক শুভাকাঙ্খী আমাকে সহায়তা করেছেন। এটা ছিলো আমার প্রতিদিনের পেরেশানী।

মরহুম হাবীব আহমদ ছিলেন আব্বাজানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অনেক সম্পদশালী ছিলেন। পরবর্তীতে আমারও তাঁর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়্যত করেছিলেন, যাকারিয়া আমাকে গোসল দিবে এবং জানাযার নামায পড়াবে। আমি প্রায় সময় সবক পড়িয়ে সরাসরি তাঁর কাছে চলে যেতাম। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আজ কত দিতে হবে? আমি বলতাম, পাঁচশ রুপি। এরপর তিনি আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে বলতেন, তুমি রুটি খাও, আমি তোমার জন্য রুপির ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

যদি কোনো দিন আমি বলতাম, আজ পেটে ক্ষুধা নেই। তখন তিনি বলতেন, তাহলে এখান থেকে দূর হও! কোনো পয়সা পাবে না। এজন্য অনেক সময় ক্ষুধা না থাকলেও কিছু না কিছু খেতে হয়েছে। যদি তিনি এসে দেখতেন, আমি কিছুই খাইনি। তখন তিনি বলতেন, যাও আজ পয়সা মিলবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি আমাকে অনেক সহায়তা করেছেন।

আমার আরোও একজন শুভাকাঙ্খী হাফেয যিন্দা হাসান সীমাহীন সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অনেক অনেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। বিশ বছর বয়স থেকে অদ্যাবধি প্রতিদিন আমি আমার দু'আয় তাদের কথা স্মরণ করি। আমার মনে পড়ে না কোনো দিন এমন গেছে, যেদিন তাদের জন্য দু'আ করিনি। প্রতি রমযান মাসে এবং বায়তুল্লায় উপস্থিত হয়েও তাঁদের জন্য বিশেষ দু'আ করেছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে কবুল করুন।"[১]

শিক্ষকতা

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী মাত্র বিশ বছর বয়সে ১লা মুহাররম ১৩৩৫ হিজরী সনে মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় শিক্ষকরূপে নিয়োগ লাভ করেন। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী তাঁর সম্মানী নির্ধারণ করেন ১৫ রুপি। কিন্তু সাহারানপুর মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক মাওলানা শাহ্ 'আব্দুল কাদের রায়পুরী বলেন, তাঁর উপরে অনেক ঋণের বোঝা রয়েছে, বিবাহ শাদীও তো নিকটবর্তী, এজন্য তাঁর সম্মানী ২৫ রুপি হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাওলানা সাহারানপুরী বলেন, এটা মাদরাসার নীতিবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের সিনিয়র শিক্ষকরাও বেতন পাচ্ছে মাত্র ১২ রুপি।[২]

শায়খুল হাদীস বলেন,

"শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হওয়ার পর আমার যিম্মায় দু'টি কিতাবের সবক দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে, *উসূলুশ্ শাশী* যা আমার চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস পড়াতেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, *ইলমুস্ সীগা* যা মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী পড়াতেন। ছাত্রাবস্থায় আমি এ কিতাবের একটিও অধ্যয়ন করিনি। *ইলমুস্ সীগা* নিয়ে বেশি চিন্তা করিনি। তবে *উসূলুশ্ শাশী* কিতাবটি ছিলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

২. মাওলানা মানযূর আহমাদ সাহারানপুরী তাঁর (শায়খুল হাদীসের) পাঁচ বছর পূর্বে মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এ পাঁচ বছরে তাঁর বেতন বাড়তে বাড়তে ১২ রুপি হয়। উদ্ধৃত: শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতি*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ১০৬

মাদরাসার প্রচলিত নিয়মানুসারে বিবেচনা করলে *উসূলুশ্ শাশী* কিতাবটি অধ্যাপনার বয়স তখন আমার হয়নি। কিন্তু নিজের মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমি নিজেকে যোগ্য শিক্ষকরূপেই প্রতিপন্ন হয়েছি। শিক্ষার্থীরা আমার অধ্যাপনায় এতই মুগ্ধ হয় যে, ইতিপূর্বে পড়া সবকগুলোও তারা পুনরায় আমার কাছে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে।

আমি চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সবক কোন জায়গা থেকে শুরু করবো? তিনি বললেন, فصل في الأمر থেকে। আমি তখন এ বিষয়ে *নূরুল আনওয়ার*, *মানার*, *কাশফুল আসরার*, *হুসামী* এবং উসূল সংক্রান্ত আরো অনেক কিতাব মুতালা'আ করলাম। এভাবে *উসূলুশ্ শাশী* কিতাবটি আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় পড়াতে লাগলাম।"[১]

শায়খুল হাদীস ১৩৩৫ হিজরী মুহার্‌রম থেকে ১৩৩৫ শা'বান পর্যন্ত *ইলমুস্ সীগা*, *মিয়াতে আমেল মানযূম*, *শরহু মিয়াতে আমেল*, *খোলাসায়ে নাহবেমীর*, *নাফ্‌হাতুল য়ামান*, *মুনিয়াতুল মুসল্লি*, *উসূলুশ্ শাশী*, *কলা আকূলু*। ১৩৩৬ হিজরী শাওয়াল থেকে ১৩৩৭ হিজরী শা'বান পর্যন্ত *মাকামাতে হারীরী*, *সাব'আ মু'আল্লাকা*, *কুতবী মীর*, *কান্‌য*, *আল-মুখতাসারুল কুদূরী*, *উসূলুশ শাশী* (বাকী অংশ)। ১৩৩৭ হিজরী শাওয়াল থেকে ১৩৩৮ হিজরী শা'বান পর্যন্ত *হিদায়া* (আউয়ালায়ন), *হামাসা* প্রভৃতি। ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ হিজরী সনে *হিদায়া* (আউয়ালায়ন ও আখিরায়ন)সহ *কুতবী মীর*, *কুতুবী তাসদীকাত*, *শরহে তাহযীব*।

- ১৩৪০ হিজরী সনের শাওয়াল থেকে ১৩৪১ রজব পর্যন্ত *বুখারী শরী*ফের তিন পারা পড়ান।
- ১৩৪১ হিজরী সনের শাওয়াল থেকে ১৩৪২ হিজরীর শা'বান পর্যন্ত *মিশকাতুল মাসাবীহে*র ১ম খণ্ড পড়ান।
- ১৩৪২ হিজরী সনের শাওয়াল থেকে ১৩৪৩ হিজরীর শা'বান পর্যন্ত *মিশকাতুল মাসাবীহে*র ২য় খণ্ড পড়ান।
- ১৩৪৩ হিজরী সনের শাওয়াল থেকে ১৩৪৪ হিজরীর শা'বান পর্যন্ত *মিশকাতুল মাসাবীহে*র ৩য় খণ্ড পড়ান।
- ১৩৪৪ হিজরী সনে হিজায সফর করেন এবং ১৩৪৫ হিজরী পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সেসময় তিনি মাদরাসায়ে শরঈয়ায় *আবূ দাঊদে*র দরস প্রদান করেন।
- ১৩৪৬ হিজরী সনে শায়খুল হাদীসের ব্যস্ততা কিছুটা কম থাকায় মাদরাসা মাজাহিরুল 'উলূমের একজন মুদার্‌রিস অসুস্থ হলে তিনি তাদের কিতাবের দরস প্রদান করতেন। অথবা মাদরাসার কোনো আসাতিযায়ে কিরাম লম্বা সফরে গেলেও তিনি তাদের কিতাবের দরস প্রদান করতেন। সেসময় তিনি *তিরমিযী*, *সহীহ মুসলিম*সহ *শামায়েলে তিরমিযী*রও দরস প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ১৩৮৯ হিজরীতে হিজাযে অবস্থান করা শুরু করেন।[২]

হাদীসে মুসাল্‌সালে[৩]র ইজাযত

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ১৩৮৮ হিজরী পর্যন্ত হাদীসের দরস প্রদানের খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ হাদীসের বিভিন্ন খিদমত করেছেন। তৎকালীন সময়ে তিনি হাদীসে মুসালসালাতের ইজাযত প্রদান করতেন।

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ১০৭

২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত *হায়াতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ১০৯

৩. হাদীসে মুসালসাল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন সব হাদীস যা কোনো ধারাবাহিক কর্ম বা গুণ বা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় ধারাবাহিকতা সম্পন্ন হাদীসের বহু প্রকরণ ও ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মুসালসাল হাদীসের গ্রন্থ হলো– রহমত সংক্রান্ত *আল-মুসালসাল বিল আউয়্যালিয়া*, *আল-মুসালসাল বিল মুশাবাকাহ*, *আল-মুসালসাল বিয-যিয়াফাহ*, *মুসালসাল আস-সুবহা*, *মুসালসাল বিল মাহাব্বাহ*, *মুসালসাল বি কিরাআতিস সফ*, *আল-মুসালসাল বি ইয়ওমি আশূরা*, *আল-মুসালসাল বি কাবযিল লিহইয়া*, *আল-মুসালসাল বিল মুহাম্মাদীন*, *আল-মুসালসাল বিল মিসরিয়্যীন*, *আল-মুসালসাল বিল মুসাফাহাহ*। এ বিষয়গুলোর অধিকাংশই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী-এর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। উদ্ধৃত: শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলবী, *আল-ফাযলুল মুবীন ফিল মুসালসালি মিন হাদীসিন নাবিয়্যিল আমীন* (ভারত: দারুল কিতাব, ১৪১৮ হিজরী), পৃ. ৬

'উলূমুল হাদীসের একটি উপশাখার আলোচ্য বিষয় হলো– হাদীসে মুসালসাল সংক্রান্ত আলোচনা। مُسَلْسَلْ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরস্পরাযুক্ত। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি বস্তুগুলোকে একটির সাথে অপরটির সংযুক্ত করেছে বা ক্রমানুসারে শিকলে গেঁথেছে। এরদ্বারা বুঝা যায় যে, একাধিক রাবী হাদীসের সনদ বা মতনে ক্রমান্বয়ে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এটাকে মুসালসাল বলা হয়।[১]

পারিভাষিক অর্থে হাদীসে মুসালসাল হলো– হাদীসের সনদ বা মতন এক স্তরের সকল রাবী অভিন্ন শব্দ বা অভিন্ন অবস্থায় করাকে মুসালসাল বলে।[২]

হাদীসে মুসালসাল প্রথমত দু'প্রকার: (১) রাবীর অবস্থার মুসালসা; (২) রাবীর বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল। বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল কখনো কখনো সনদে আবার কখনো কখনো মতনে হয়ে থাকে।

ইমাম নববী বলেন,

هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى.

> "যে হাদীসের সনদের রাবীগণ কোনো বিশেষণ অথবা রাবীদের বিশেষ অবস্থা কিংবা বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে বজায় রাখেন তাই মুসালসাল।"[৩]

এক কথায় বলতে পারি, হাদীসে মুসালসাল তিন প্রকার–

(১) সনদের মুসালসাল (কখনো হয় সনদে কখনো হয় মতনে)।

(২) রাবীর অবস্থার মুসালসাল,

(৩) মতনের মুসালসাল।

সনদের মুসালসাল

যে হাদীসের সনদ বা মতন এক স্তরের সকল রাবী অভিন্ন শব্দ বা অভিন্ন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন তা-ই মুসালসাল। যেমন: কোনো সনদে এক স্তরের সকল রাবী বললেন, أنبأني فُلانٌ (প্রথম শায়খ), তিনি বললেন, أنبأني فُلانٌ (দ্বিতীয় শায়খ), এভাবে (তৃতীয় শায়খ) বললেন। এখানে সনদটি أنبأني দ্বারা মুসালসাল হয়েছে।[৪]

অবস্থাগত মুসালসাল

কখনো রাবীদের অবস্থা মুসালসাল হয়, যেমন সনদের প্রথম রাবী বললেন, حدثني فلان قائما অমুক শায়খ আমাকে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় রাবী বললেন, حدثني فلان قائما এভাবে তৃতীয়, চতুর্থসহ সবশেষ রাবী বলল, কারণ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ও দাঁড়িয়ে বলেছেন।[৫]

অথবা প্রত্যেক রাবী বললেন, হাদীস বর্ণনা শেষে আমার শায়খ হেসেছেন। হাদীসটি সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু)-থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু

১. শাহ্ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, *বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৪৮১-৪৮২

২. প্রাগুক্ত।

৩. শায়খুল হাদীস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান, মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল অনূদিত, *কাশফুল বারী* (ঢাকা: মাদানী কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রমযানে সহবাসকারী ব্যক্তিকে কাফ্ফারা আদায়ের জন্য সদকা দিলেন। অতঃপর লোকটি বলল,

أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চেয়ে গরীব কাউকে কাফ্ফারা দিবো? আল্লাহ্র কসম! মদীনার দু'প্রান্তের মাঝে আমার চেয়ে গরীব কাউকে দেখছি না। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হেসে দিলেন, এ হাসিতে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার নিয়ে খাও।"[১]

তখন থেকে প্রত্যেক রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা শেষে হাসেন। এটা হলো রাবীর অবস্থাগত মুসালসাল।[২]

মতনের মুসালসাল

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু'আয ইব্ন জাবাল-কে বললেন,

يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"হে মু'আয! আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। অতঃপর তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। অবশ্যই তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দু'আটি পড়বে–

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার (মৌখিক ইবাদত) যিক্র, তোমার কৃতজ্ঞতা (শারীরিক ইবাদত) এবং ইহ্সানের সাথে তোমার (ফরয) ইবাদত আদায় করতে সাহায্য করো।"[৩]

মু'আয ইব্ন যাবাল তাঁর ছাত্র সুনাবিহীকে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় অসিয়্যত করেন, তিনি স্বীয় ছাত্র আবূ আব্দুর রহমানকে মু'আযের ন্যায় অসিয়্যত করেন। এখানে হাদীসের মতনে মুসালসাল হয়েছে। কারণ প্রত্যেক শায়খ তাঁর ছাত্রকে বলেছেন, وأنا أحبك আমিও তোমাকে মুহাব্বত করি।[৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, মুসালসাল প্রথমত দু'প্রকার: প্রথমত রাবীর অবস্থার মুসালসাল এবং দ্বিতীয়ত পদ্ধতির মুসালসাল। বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল কখনো সনদে আবার কখনো মতনে হয়ে থাকে। যা উদাহরণসহ বর্ণনা করা হয়েছে।[৫]

---

১. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১৮০৯

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান, মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল অনূদিত, *কাশফুল বারী* (ঢাকা: মাদানী কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬

৩. *আবূ দাঊদ*, হাদীস নং ১৩০৪; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২১৫৪৬

৪. শাহ্ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, *বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৪৮১-৪৮২; শায়খুল হাদীস সালিমুল্লাহ খান, মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল অনূদিত, *কাশফুল বারী* (ঢাকা: মাদানী কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪

৫. প্রাগুক্ত।

বিবাহ

শায়খুল হাদীসের পিত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী'র ইনতিকালের অব্যবহিত পরে শায়খের আম্মাজান আমাতুল হাই জ্বরাক্রান্ত হন। এ জ্বর টাইফয়েডে রূপান্তরিত হয়। তিনি তাঁর স্বামীর ইনতিকালের পর থেকেই শায়খুল হাদীস যাকারিয়ার বিয়ের জন্য খুব তাগিদ দিতে থাকেন। তিনি বলতেন, "আমি খুব শীগ্‌গির বিদায় হতে যাচ্ছি।" আমার মনটা চায় তোমার ঘরটা যেন তালাবদ্ধ না থাকে। সেসময় মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ছিলেন এ পরিবারের মুরব্বী। তিনি যেনো তাদের পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন। যখন যা করার ইচ্ছা করতেন তাঁর সাথেই পরামর্শ করতেন। শায়খুল হাদীসের মা তাঁর নিকট চিঠি লিখেন, মাওলানা রউফুল হাসানে[১]র কন্যা আমাতুল মাতীনের কথা ব্যক্ত করেন।

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী কনে পক্ষের নিকট শায়খুল হাদীস যাকারিয়ার বিয়ের বিষয়ে চিঠি পাঠান। জবাবে কনে পক্ষ থেকে লেখা হলো, "আমরা প্রস্তুত, আপনার যখন ইচ্ছা আমাদের বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে আসুন।"

মাওলানা সাহারানপুরী আর কালবিলম্ব না করেই বিবাহের দিন ধার্য করেন। অতঃপর কয়েকজন সাথীসহ ২৯ শে সফর ১৩৩৫ হিজরী সনে রোজ সোমবার কনের বাড়িতে হাজির হন। এ বিয়েতে শায়খুল হাদীস, মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা সাহারানপুরী ও তাঁর দু'জন খাদেমসহ মোট পাঁচজন আমরা বরযাত্রী হিসেবে যাই। মাওলানা সাহারানপুরী বিবাহ পড়ান এবং তৎকালীন সময়ে দেড় হাজার রুপী মোহর ধার্য করেন।

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া বললেন, কান্ধালা তো আমার জন্মস্থান। রুখসতী করে কনে উঠিয়ে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি দু'দিন কান্ধালায় অবস্থান করে চলে যাবো। কনে পক্ষ তা প্রত্যাক্ষাণ করেননি; বরং তারা খুশিই হয়েছেন। কিন্তু মাওলানা সাহারানপুরীর কানে এ কথা পৌঁছতেই তিনি বললেন, আমি তো বরের পিতা হয়ে এসেছি। সে নিয়ে যাবার কে? কনেকে আগামীকালই আমার সাথে যেতে হবে। তবে ঘন ঘন আসা-যাওয়া অনেক কষ্ট হবে। দশ পনেরো দিন সেখানে থাকার পর মৌলভী শামসুল হক[২] গিয়ে নিয়ে আসবেন। যেই কথা সে কাজ। পরদিনই সকালে কনের পিতা, চাচা এবং মামারা রুখসতী করে দিলেন। এভাবে বড় চাচা প্রায় দু'তিন বছর আনা-নেওয়া করেছেন।[৩]

এ বছর রমযান মাসে কদরের রাতে তারাবীর নামাযের সময় শায়খুল হাদীসের স্নেহময়ী আম্মাজান ইনতিকাল করেন। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মরহুমের নামাযে জানাযার ইমামতি করেন।[৪]

দ্বিতীয় বিবাহ

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র প্রথমা সহধর্মিণী আমাতুল মাতীন ১৩৫৫ হিজরীর ৫ই যিলহাজ্জ মুতাবিক ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ খ্রি. তারিখে ইনতিকাল করেন। তিনি গর্ভজনিত করণে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালে তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত

---

১. মাওলানা রউফুল হাসানের অপর কন্যাকে শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলানা ইলিয়াস বিবাহ করেছিলেন। এদিক থেকে শায়খুল হাদীস ও মাওলানা ইলিয়াস পরস্পরে একদিকে চাচা-ভাতিজা, অপরদিকে ভায়রাভাই ছিলেন। উদ্ধৃত: আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী (র.), মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত *হায়াতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

২. ইনি আমাতুল মাতীনের বড় চাচা। তিনি ছিলেন এ খান্দানের সবচেয়ে বেশি রাগি মানুষ। উদ্ধৃত: শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ২৫৫

৩. প্রাগুক্ত।

৪. আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী (র.), মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত *হায়াতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

নেন যে, আর বিবাহ-শাদী করবেন না। তাঁর ইনতিকালের খবর শায়খুল হাদীস নিজেই তাঁর শ্বশুড় মাওলানা রউফুল হাসনের নিকট আর্জেন্ট সংবাদ পাঠান। তিনি ফজরের পূর্বেই সাহারানপুর এসে উপস্থিত হন।

তিনি শায়খুল হাদীসকে সীমাহীন মুহাব্বত করতেন। তিনি মেয়ের দাফন শেষ করে কবরস্তান থেকে ফেরার পথে তাঁর বড় জামাতা মাওলানা ইলিয়াসকে বললেন, যাকারিয়া তো এখনো ছোটই রয়ে গেছে। দ্রুত তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করা হোক। আমিও এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবো।

শায়খুল হাদীস বিয়ের কথা মাথা থেকে ঝেরে ফেলে ইলমে দীনের খিদমত ও কিতাবাদি রচনায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু ভাতিজাবৎসল চাচা–যিনি তখন তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন– কোনোমতেই তাঁর একাকী জীবন-যাপন পছন্দ করলেন না। অন্যান্য মুরুব্বীরাও এ ব্যাপারে তাঁর চাচার মতের সমর্থক ছিলেন। শায়খুল হাদীসের ঘর আবাদ হোক, এটাই ছিলো সকলের মনের আকাঙ্ক্ষা।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পঁচিশ-ত্রিশ জায়গা থেকে বিবাহের পয়গাম আসলে লাগলো। বিবাহের জন্য এক প্রকার পীড়াপীড়ি শুরু হলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে আমার মুরব্বী মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী'র নিকট আমার বিয়ের আবেদন করতে লাগলো। একবার মাওলানা রায়পুরী ফজরের সময় সাহারানপুর এসে বললেন, তোমার দ্বিতীয় বিয়ের পয়গাম আসছে। আমি তাদের বারংবার ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তারা নাছোড় বান্দার ন্যায় আমার পায়ে পড়ে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। এবার আমি আর পারছি না অপরাগ হয়ে পড়েছি। তুমি দ্রুত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাও।[১]

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "ইতোমধ্যে আমার চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার দাদা (মাওলানা ইসমা'ঈল)-এর বংশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করার ইচ্ছা করেন। এ ব্যাপারে চাচাজান হাফেয মুহাম্মদ হুসায়নের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বললেন, আপনার কন্যা 'আতিয়্যার জন্য অন্য কোথাও স্বামী খোঁজাখুজি না করে যাকারিয়ার দিকে খেয়াল করুন।
>
> আমার মনে হচ্ছে আপনার কন্যার জন্য যাকারিয়াই সঠিক পাত্র। এরপর চাচাজান সাহারানপুরে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং অধমের নিকট তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি আরয করলাম, চাচাজান আপনি তো জানেন, আমার বিবাহের বিলকুল ইচ্ছা নেই। কিন্তু আপনার নির্দেশকে আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। আপনি বিবাহের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।"[২]

প্রথম স্ত্রীর ইনতিকালের চার মাস অতিবাহিত হতে না হতেই শায়খুল হাদীসের দ্বিতীয় বিবাহ তাঁর চাচা মাওলানা ইলিয়াসের কন্যা 'আতিয়্যা'র সাথে ঠিক হয়। এ বিবাহ ৮ই রবী'উস সানী ১৩৫৬ হিজরী মুতাবিক ১৮ই জুন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার জুমু'আর নামাযান্তে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী বিয়ের সংবাদ পেয়ে বলেন, এ বিয়ে আমি পড়াবো। তিনি যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে মহরে ফাতেমী ধার্য করে বিবাহ পড়ান এবং তিনি মহরে ফাতেমী স্পষ্ট করে দেন। অর্থাৎ মহরে ফাতেমী হলো ৫০০ দেরহাম এবং প্রচলিত মুদ্রায় ১৩৩ রুপি ধার্য করে দিলেন। এ বিয়েতে মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী নিজের পক্ষ থেকে ওলীমার ঘোষণা দেন।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত।
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ২১৯
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৬৬

বায়'আত[১]

১৩৩৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী দীর্ঘ প্রবাস জীবন হিজাযে কাটানোর উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর কাছে বায়'আতের ধুম পড়ে যায়। শায়খুল হাদীস বলেন, "বায়'আতের হিড়িক পড়ে যাওয়ায় আমার মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আমি মাওলানা সাহারানপুরীকে আমার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করলে আমাকে বললেন, মাগরিবের নামাযান্তে নফল থেকে ফারেগ হওয়ার পর চলে এসো। আমি মাওলানা সাহারানপুরীর কামরায় প্রবেশ করতেই দেখি মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ গাঙ্গুহী বসে আছেন। ইতিপূর্বেই তিনি তাঁর খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এবার বায়'আত নবায়নের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। মাওলানা সাহারানপুরী যথাসময়ে আমাদের দু'জনকে কাছে ডেকে তাঁর পবিত্র দু'খানা হাত আমাদের দু'জনের হাত দ্বারা ধরিয়ে বায়'আতের কথাগুলো বলতে শুরু করলেন। এ সময় মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নার আওয়াজে আমিও স্থির থাকতে পারলাম না। আমরা দু'জনই কাঁদতে লাগলাম। আমাদের কান্নার আওয়াজ শুনে আমার পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া এবং মাওলানা 'আবদুর রহীম ছাদের উপরে এক কোণা থেকে মাওলানা সাহারানপুরীর কামরার দিকে উঁকি মেরে দেখলেন। মাওলানা সাহারানপুরী আমাদের দু'জনকে বায়'আত করাচ্ছেন। মাওলানা 'আবদুর রহীম আব্বাজানকে বললেন, যাকারিয়ার এ সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমার জন্য দু'আও করলেন।[২]

---

১. বায়'আত-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শপথ। শপথ এটি বাংলা শব্দ, যার অর্থ চুক্তি, অঙ্গীকার, সংকল্প, ক্রয়-বিক্রয় করা, আদান-প্রদান, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ঐকান্তিক সাধনা। এগুলোকে আরবীতে (بَيْعَةٌ) বায়'আত বলা হয়। ইংরেজিতে– To Sell, To make a contract, To offer for sell etc. Agreement, Arrangement, Business, Deal, Contact, Commercial Transaction, Bargain, Sale, Purchase. ect বলা হয়। বায়'আত হলো ইসলামী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, من خرج من الطاعة، وفارض الجماعة فمَاتَ مَاتَ ميتةً جاهليةً "যে ব্যক্তি বায়'আত ব্যতীত এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করলো। উদ্ধৃত: *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৮৪৮। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। (১) বায়'আতে রিযওয়ান (২) আকাবার শপথ (৩) হুদায়রিয়ার শপথ (৪) মক্কা বিজয়। উদ্ধৃত: ড. খোন্দকার 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী আকিদা* (বাংলাদেশ: আস্-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, তা.বি.), পৃ. ৫৭৬

২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী'র বায়'আতের শাজারা

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী বায়'আত হয়ে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন
মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী অতঃপর সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী
তাঁরা উভয়ে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী থেকে
তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী থেকে
তিনি শায়েখ নূর মুহাম্মদ ঝানঝানুভী থেকে
তিনি শায়খ 'আবদুর রহীম থেকে
তিনি শায়েখ আবদে বারী আমরুহী থেকে
তিনি শায়েখ আবদে হাদী থেকে
তিনি শায়খ ইয্যুদ্ দীন আমরুহী থেকে
তিনি শায়খ মুহাম্মদ মাক্কী থেকে
তিনি শায়খ মুহাম্মদ থেকে
তিনি শায়খ মুহিব্বুল্লাহ্ এলাহাবাদী থেকে
তিনি শায়খ আবূ সাঈদ গাঙ্গুহী থেকে
তিনি শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী থেকে
তিনি শায়খ জালালুদ্দিন থানেশ্বরী থেকে
তিনি শায়খ 'আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী থেকে
তিনি শায়খ আহমাদ 'আরিফ রদওলবী থেকে
তিনি শায়খ 'আবদুল হক রদওলবী থেকে
তিনি শায়খ জালালুদ্দিন পানিপথী থেকে
তিনি শায়খ শামসুদ্দিন পানিপথী থেকে
তিনি শায়খ 'আলাউদ্দিন 'আলী আহমাদ সাব্বির থেকে
তিনি শায়খ ফরীদুদ্দিন শকরগঞ্জ অযোধ্যাবী থেকে
তিনি শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী থেকে
তিনি শায়খ মুঈনুদ্দীন চিশতী থেকে
তিনি শায়খওসমান হরুনী থেকে
তিনি শায়খ শরীফ জেন্দানী থেকে
তিনি শায়খ কুতুবুদ্দিন মওদুদ চিশতী জেন্দানী থেকে
তিনি শায়খ নাসীরুদ্দিন আবূ ইউসুফ চিশতী থেকে
তিনি শায়খ আবূ মোহাম্মদ চিশতী জেন্দানী থেকে
তিনি শায়খ আবূ আহমাদ আবদাল চিশতী থেকে
তিনি শায়খ আবূ ইসহাক শামী থেকে
তিনি শায়খ মমশাদ আলভী দিনুরী থেকে
তিনি শায়খ হাজী হুবায়রা বসরী থেকে
তিনি শায়খ হুযায়ফা মারআশী থেকে
তিনি শায়খ সুলতান ইবরাহীম বিন আদহাম থেকে
তিনি শায়খ খাজা ফুযায়েল বিল ইয়ায থেকে
তিনি শায়খ 'আবদুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ থেকে
তিনি শায়খ খাজা হাসান বসরী থেকে
তিনি হযরত 'আলী (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে
তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন আহমাদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে।[১]

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল* (ভারত: ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ২৫৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ্জব্রত পালন ও হিজাযে স্থায়ী বসবাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ্জব্রত পালন ও হিজাযে স্থায়ী বসবাস

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। *সহীহুল বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমে* আছে–

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন, হানযালা ইব্ন আবী সুফ্য়ান থেকে, তিনি ইকরামা ইব্ন খালিদ থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রাযী 'আল্লাহু 'আনহুমা) থেকে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জব্রত পালন করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"[১]

প্রকৃতপক্ষে হজ্জ হলো দুটি দৃশ্যের নমুনাস্বরূপ। এর প্রতিটি ব্যাপারেই দু'টি হাকীকত নিহিত রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মৃত্যু ও মরণোত্তর অবস্থার দৃশ্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রেম ও তার অপূর্ব অভিব্যক্তি ও আত্মার সত্যিকারের প্রেমে মাতোয়ারা হওয়ার দৃশ্য।

প্রথমটি হচ্ছে মৃত্যু ও মরণোত্তর দৃশ্য অর্থাৎ মানুষ যখন তার বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন প্রিয়দেরকে পিছনে ফেলে বাড়ি থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়, তখন সে যেন অপর কোনো দেশ বা জগতের পানে বেরিয়ে পড়ে। যেমনটি মানুষ তার মৃত্যুর সময়টিতে করে থাকে। সবকিছুকে বিদায় দিয়ে একাকী ছুটতে হয় কবরের পানে। হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় এ একটি কথা ভাববার মতো যে, আজ যেভাবে সবকিছুর মায়া কাটিয়ে সাময়িকভাবে চলে যেতে হচ্ছে, তেমনি শীগগিরই একদিন চিরতরে সবকিছুর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য হচ্ছে প্রেমের অভিব্যক্তির। হাজীর অবস্থার মধ্যে তা এতটাই সুস্পষ্ট যে, এজন্য কোনো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক দু'প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে তাঁর দাসত্ব ও তাঁর প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই মালিক। এ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নামাযের মধ্যে যা আগাগোড়া একান্তই বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও দাসত্বের অভিব্যক্তি।

দ্বিতীয় সম্পর্ক হচ্ছে 'ইশ্ক ও মহব্বত-ভালোবাসা এবং অনুরাগের। কেননা, তিনি হচ্ছেন প্রতিপালক, নিয়মতদাতা, পরম উপকারী, দয়ালু, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার যত গুণ সব গুণেরই তিনি আধার। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে সহজাত প্রেমপ্রীতি। হজ্জে সে প্রেমপ্রীতির সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। সফরের শুরুতেই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, সকল প্রিয়জন ও ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় বন্ধুর গলির দিকে, মরু-বিয়াবানে, অলিতে-গলিতে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করতে হয়।

কেনো এ মুক্তির বন্ধন? কিসের ঐ দুর্বার আকর্ষণ? কেনো এ মাতোয়ারা, কিসের ঐ অস্থিরতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য? এসব শুধু এজন্যে যে, প্রেমাষ্পদের দরজায় প্রেমিকের ভিড় জমানোর নির্দিষ্ট সময়টা আসন্ন। প্রেমের জন্যই যখন এ মুবারক সফর, তখন পথের সকল সঙ্কট প্রেমে মাতোয়ারা এ নিয়ে হাসি মুখেই বরণ করে নিতে হবে। তারপর ইহরামেও সে প্রেমে মাতোয়ারা মনের অভিব্যক্তি। না মাথায় টুপি, না

১. *সহীহুল বুখারী*, খ-১, পৃ. ২

গয়ে জামা; ফকীরসুলভ বেশভূষা! না আছে তাতে সুগন্ধি, না পরিপাট্য। এক পাগলসুলভ বেশভূষা, যা প্রেমিক চিত্তের ব্যাকুলতা বিহ্বলতাকেই প্রকাশ করছে।[১]

উচিত ছিলো তো ঘর থেকে বের হতেই যেনো এ অবস্থা শুরু হয়ে যায়। এজন্য কোনো কোনো 'আলেমের মতে, ঘর থেকেই ইহ্রাম বেঁধে যাওয়া উত্তম, কিন্তু ইহ্রামের পর অনেক জিনিসই বর্জন করে চলতে হয় তাই কোনো কোনো সুখি মানুষের জন্যে এ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ কষ্টকর। কিন্তু বন্ধুর নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথেই প্রেমের আদব মানতেই হবে এবং আলু থালু কেশে সত্যিকারের প্রেমিকের বেশেই তাকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

হাদীসের পরিভাষায় হজ্জ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

> عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنِ الْحَاجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الشَّعِثُ التَّفِلُ" فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَىُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ " الْعَجُّ وَالثَّجُّ".
>
> "ইব্ন উমর (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাজী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আলু-থালু কেশে মহান আল্লাহ্ দরবারে হাজির। অন্য একজন বলল, কোন্ হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন, যার জামা-কাপড় ধুলি ধুসরিত হয়ে আছে। অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, উত্তম হাজ্জ কি? উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা।"[২]

"স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গর্বভরে তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন,

انْظُرُوا إِلَى زُوَّارِ بَيْتِي فَقَدَ جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا

> "দেখ দেখ, আমার ঘরের প্রেমিক যিয়ারতকারীদের প্রতি দেখ! তারা আমার কাছে এসেছে আলুথালু কেশে ধুলি ধুসরিত হয়ে।"

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"আর তারা দূর দূরান্তর পথ অতিক্রম করে আসবে।"[৩]

সেই প্রেমের মতোয়ারা মুখে লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লা শারীকা লাকা লাব্বায়ক, ধ্বনি তুলে চিৎকার করতে করতে ফরিয়াদ জানাতে জানাতে গিয়ে হাযির হয় মক্কা মুয়ায্যমায়। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এদিকেই ইঙ্গিত করে উপরিউক্ত হাদীসে বলেন,

اَلْحَجُّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ

হজ্জ হচ্ছে চিৎকার ধ্বনি ও কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার নাম। বলাবাহুল্য, মিনতি ও ফরিয়াদের সুরে চিৎকার করাটা হচ্ছে প্রেমের প্রাণ স্বরূপ। দহিত প্রাণের কোনো লোক– যার অন্তরে প্রকৃতই প্রেমের যখন রয়েছে যখম প্রেমাস্পদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়, তখন তার মনমগজের অবস্থা কী দাঁড়ায় আর সে কী ভাবনা চিন্তা করে তা' ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই।

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
২. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ২৯৯৮
৩.আল-কুর'আন, ২২: ২৭

তারপর কার্যকলাপ, অঙ্গভঙ্গি, হাবভাব আর কোনো বাধাধরা নিয়মের ছক মেনে চলে না। কখনো বা সে প্রেমাস্পদের ঘর প্রদক্ষিণ করে, কখনো বা সে ঘরের দরজা চৌকাঠ প্রাচিরে চুমু খায়, চোখ মলে, কপাল ঠুকে, মাথা আছড়ায়। কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে ধরে কান্নাকাটি করাও সে প্রেমিকসুলভ মাতোয়ারা মনেরই অভিব্যক্তি। কেননা, প্রিয়ার বা প্রেমাস্পদের আঁচল ধরাও প্রেমেরই এক বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোও সে প্রেমে মতোয়ারা প্রেমিকের অস্থিরতারই এক অনন্য দৃশ্য! না আছে মাথায় টুপি, না আছে গায়ে জামা, পরণে পাজামা! পাগলের মতো কখনো এদিকে আবার কখনো ওদিকে ছুটে যাচ্ছে। তারপর মিনায় গিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ সে উন্মাদমনের উন্মাদনার শেষ অঙ্ক। এ প্রেমিকদের সকলেরই এ পালাটি আসে। প্রেমিকের উতলা এ যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে, তখন যে-ই তার পথে বাধার সৃষ্টি করে, অন্তরায় হয়, তাকেই সে পাথর ছুঁড়ে মারে। সর্বশেষ আসে কুরবানীর পালা। আসলে এটা ছিলো জানেরই কুরবানী। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু তাঁর অপার দয়ায় একেই মালের কুরবানীতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ও প্রেমিকের সর্বশেষ পরিণতি। এভাবেই আমরা হজ্জ আদায় করে থাকি।[১]

শায়খুল হাদীস পাঁচবার হজ্জব্রত পালন করেন

প্রথম হজ্জব্রত পালন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

> "১৩৩৮ হিজরীর ২রা শা'বানের কথা। সেসময় আমি সাহারানপুর ছিলাম। এটা ছিল আমার প্রথম হজ্জ। আমার পীর ও মুরশিদ মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী পূর্বে কয়েকবার হজ্জ করেছেন। এবারও তিনি হজ্জ করার মনস্থ করলেন। এ সময় আমার মাঝে দুটি জিনিস কাজ করছিল। একটি হলো বায়তুল্লায় উপস্থিতির প্রবল আগ্রহ আর দ্বিতীয়টি হলো আমার পীর ও মুরশিদ সাহারানপুরীর সফরসঙ্গী হওয়া। আমরা সাহারানপুর থেকে রওয়ানা হয়ে বোম্বে পৌঁছে জানতে পারি যে, জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার জন্য একটি জাহাজ তৈরি আছে। কিন্তু তাকে মাত্র ২০/২৫টি সিট খালি আছে। এ জাহাজের সফর ছিল খুবই আরামদায়ক। কেননা জাহাজটি ছিল বেশ বড়। পরের জাহাজটি ছিল ছোট। মাওলানা সাহারানপুরী সে জাহাজের ৩০০ টিকিট কিনলেন। পরের জাহাজটি তৈরি হয়ে আসতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগলো।
>
> এ সময় আমার বোম্বে অবস্থান করতে হলো। সেসময় বোম্বেতে দেওবন্দীরা প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারতো না। সেখানে বিদ'আতীদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তারা দেওবন্দীদের যেখানে পেতো সেখানেই অপদস্থ করতো। ইতিপূর্বে মাওলানা আশ্রাফ 'আলী থানবী'র উপর এখানে হামলা হয়েছিল। হামলার আশঙ্কায় বোম্বায়ের মেজবানরা শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কবরস্তানে তাবু টানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলেন। জাহাজের অপেক্ষায় সেখানে ২০দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাহারানপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত আমাদের খানা-পিনা, মিষ্টি-মিঠাই, ফল-ফলাদীর ছড়াছড়ি ছিল। যে যতো পেরেছে খেয়েছে। কোনো ধরা-বাধা ছিল না।
>
> বোম্বে পৌঁছেই মাওলানা সাহারানপুরী আমাদের বিশেষ কয়েকজনকে ডেকে বললেন, এখান থেকে আমাদের সফর শুরু হচ্ছে। দুই চারজন করে নিজেদের একটি গ্রুপ তৈরি করে ফেলো। আমি সাহারানপুরীর সাথে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে ছাড়া কারো সাথে গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও। আমি হাজী মকবুল সাহেবের কাছে আমার ৬০০ রুপি দিয়ে একত্রিত হয়ে গেলাম। সেসময় ৬০০ রুপিতে ভালোভাবে হজ্জ হয়ে যেত। হাজী

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

মকবুল সাহেব মাওলানা সাহারানপুরীর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে আমি মাওলানা সাহারানপুরীর দস্তরখানে শরীক হয়ে গেলাম, যা সফরের শেষ পর্যন্ত ছিল।[১]

শা'বানের ২৭ কিংবা ২৮ তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ল। ১২ দিন পরে ১০ই রমাযানুল মুবারকে জাহাজ জেদ্দা বন্দরে গিয়ে পৌঁছলো। জাহাজ ছাড়ার ২দিন পরই জাহাজে রমাযান শুরু হয়ে যায়। জাহাজ ছোট হওয়ায় সমুদ্রে খুব বেশি দুলতে থাকে। যার ফলে সকলেরই বমি বমি ভাব আর মাথা ব্যাথা হতে লাগলো। আমার প্রচুর পরিমাণে বমি আর মাথা ব্যথা হলো। মাওলানা সাহারানপুরী বললেন, তারাবী পড়তে হবে। আমি বললাম, মাথা ব্যাথার সাথে তো পারা যায় কিন্তু তারাবীহের মধ্যে বমি হলে কী করবো? তিনি বললেন, বমি হলে বমি করবে, সাথে সাথে আবার অযু করে নিবে।[২]

প্রথম আট রাকা'আতে মাওলানা সাহারানপুরী আধা পারা পড়তেন। পরের বারো রাকা'আতে আমি পৌনে এক পারা পড়তাম। জেদ্দা পৌঁছে মাল-সামানা নামাতে এবং কাস্টমস এর চেকিং থেকে বের হতে হতে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হাজী মকবুল সাহেব আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, ভক্তির কারণে বড় মিয়াকে নিয়ে আবার তারাবীতে দাঁড়িয়ে যেও না। তাঁর দুর্বলতার দিকে একটু খেয়াল রেখো। একটু পরেই মাওলানা সাহারানপুরী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই যাকারিয়া! কী অবস্থা? তখন আমি হাজী সাহেবের কথামতো বললাম, শরীরে অনেক ক্লান্তি। কিন্তু মাওলানা সাহারানপুরী অত্যন্ত এতমিনানের সাথে একাই ২০ রাকা'আত তারাবী পড়ালেন। বার বার তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজের উপর আফসোস হতে থাকলো। নামাযের মধ্যে আমি কয়েকবার মাওলানা সাহারানপুরীর কাছাকাছি গেলাম এবং বলতে চাইলাম যে, আপনার দুর্বলতার জন্যই ওজর করেছিলাম। কিন্তু তা আর বলা হলো না। সে আফ্সোস এখনও আমাকে পীড়া দেয়।[৩]

জেদ্দায় একদিন অবস্থান করে পরের দিন মক্কা শরীফ পৌঁছে গেলাম। মাওলানা সাহারানপুরী মক্কায় পৌঁছে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী-এর অন্যতম খলীফা মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন-এর সাথে দেখা করে মু'আনাকা করেন। এভাবে আমরা মক্কায় রমাযানুল মুবারক অতিবাহিত করলাম। এ বছর থেকে রমযানের রাত্রিতে আর ঘুমাইনি। ফজরের পর থেকে যোহর পর্যন্ত ঘুমাতাম। যোহরের পর থেকে তাওয়াফ, সাঈ সম্পন্ন করতাম।[৪]

এবার মদীনায় যাওয়ার পালা। যেতে বারো দিন, আসতে বারো দিন এবং মদীনায় তিনদিন অবস্থান করা এ মোট সাতাশ দিন। কিন্তু আমরা মদীনায় প্রায় এক মাস অবস্থান করলাম। অতঃপর জিলকদের শেষ ভাগে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে বারো দিন সফরে ৪ই জিলহজ্জ মক্কা শরীফে হাজির হলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ও বিদায় হজ্জের সময় এ তারিখেই মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ করেছিলেন। মক্কায় তখন অরাজকতা চলছিল, তাসত্ত্বেও মক্কায় এক মাস অবস্থান করেছি। এরপর মুহার্‌রম মাসে ১৩৩৯ হিজরী সনে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে ৮ই সফর সাহারানপুর পৌঁছলাম। এভাবে আমার প্রথম হজ্জ সম্পন্ন হয়।"[৫]

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৩৯৭
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

দ্বিতীয় ও তৃতীয় হজ্জব্রত[১] পালন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

"মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী হলেন আমার মুরব্বী। তিনি ১৩৪৪ হিজায সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন। সেসময় তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে থাকার মনোনিবেশ করেন। তাঁর মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল মদীনার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। সে উদ্দেশ্যেই তিনি ১৩৩৮ হিজরী সনে মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে মাওলানা মুহিব্বুদ্দীনের অনুরোধে ফিরে আসেন।[২]

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ১৩৪৪ হিজরী সনে মাদরাসা থেকে দীর্ঘ দেড় বছরের ছুটি নিয়ে পুনরায় হিজায সফরের মনোনিবেশ করেন। এ সফরে আমার যাওয়ার কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিলো না। কেননা, মাদরাসার কাজে এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে খুবই অসুবিধার মধ্যে ছিলাম। তাই মাওলানা সাহারানপুরীর সাথে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে মাদরাসা কীভাবে চলবে, কারা কি দায়িত্ব পালন করবে তা সবকিছু ঠিক ঠাক করে দেন। আমি কোনোভাবে বিষয়টি জানতে পারি যে, এ প্রস্তাবনায় আমি অধমকে মাদরাসার সদরুল মুদাররিসীন তথা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব এড়ানোর জন্য একটা বাহানা বের করে মাওলানা সাহারানপুরীর নিকট আরয করলাম, আপনি চলে গেলে *বাযলুল মাজহূদ* রচনার কী হবে? এ কথা শুনে মাওলানা সাহারানপুরী চিন্তিত হয়ে বললেন, কী হবে তাতো আমারও বুঝে আসছে না। আবার তোমাকে ছাড়া লেখাও সম্ভব না। তখন আমি বললাম, তাহলে এ সফরে আমিও আপনার সঙ্গী হবো। এভাবেই আমার যাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

আমরা ১৩৪৪ হিজরী সনের ১৬ই শাওয়াল মাসে সাহারানপুর থেকে বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। যেহেতু এ সফরটি ছিলো মাওলানা সাহারানপুরীর বিদায়ী সফর। অর্থাৎ তিনি আর হিন্দুস্তানে ফিরে আসবেন না। তাই দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভক্ত মুরিদান সাহারানপুর এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। মাদরাসা থেকে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা ছিলো লোকে-লোকারণ্য। অনেকে আবার দিল্লি পর্যন্তও সফরসঙ্গি ছিলেন। আমরা ১৭ শাওয়াল দিল্লি থেকে হায়দারাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করে বোম্বাই পৌঁছি। বোম্বাই থেকে ৭ই জিলকদ জাহাজে জেদ্দার উদ্দেশ্যে আরোহণ করি। ২ জিলকদ এ জাহাজটি নিরাপদে জেদ্দায় পৌঁছে। দু' রাত জেদ্দায় অবস্থান করার পর আমরা উটে চড়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সে সময় মক্কা-মদীনাতে এতো জৌলুস ছিলো না। নবী যুগের চিহ্ন কিছুটা হলেও অবশিষ্ট ছিলো। তৎকালীনসময় সেখানে ঘর-বাড়ির অবস্থা ছিলো অতিসাধারণ। বাবে ইবরাহীমের কাছে একটি দোতলা ঘর ভাড়া নিয়ে মাওলানা সাহারানপুরীকে দোতলায় আর আমি এবং অন্যান্য খাদেমগণ নিচতলায় অবস্থান করলাম। এ সফরে মাওলানা সাহারানপুরী খানায়ে কা'বার ভেতরে প্রবেশ করার এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩]

হজ্জের কাজ খুবই আসানীর সাথে সম্পন্ন হয়। ২৬শে জিলহজ্জ 'আসরের নামাযের পর মাওলানা সাহারানপুরীর সাথে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ১২ দিন সফর শেষে

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ১৩৪৪ হিজরী সনে দ্বিতীয় হজ্জ তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে এবং ১৩৪৫ হিজরী সনে তৃতীয় হজ্জ তাঁর পিতার পক্ষ থেকে আদায় করেন। উদ্ধৃত: শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৪০৯

২. প্রাগুক্ত।

৩. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া* (লাখনো: মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭৬

৮ই মুহার্‌রম ১৩৪৫ হিজরী সনে আমরা মদীনাতুল মুনাওওয়ারায় প্রবেশ করি। সেসময় মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী'র বড় ভাই মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ পূর্বেই একটি তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন। *বাযলুল মাজহূদ* রচনার সুবিধার্থে মাওলানা সাহারানপুরী দ্বিতীয় তলা খালি করে সেখানে অবস্থান করেন।

এ সফরে আমার চাচাজান মাওলানা ইলিয়াসও সফর সঙ্গি ছিলেন। চাচাজানও মদীনায় দীর্ঘদিন অবস্থানের এরাদায় গমন করেছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রওযা মুবারক থেকে ভারতে ফিরে যাওয়ার ইশারা পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৩৪৬ হিজরী সনে মুহার্‌রম মাসে এ দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসি। আমি ফিরে আসার মাত্র তিন মাসের মাথায় মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মহান আল্লাহ্ ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। যার সাথে ঘরে বাইরে সবসময় ছায়ার মতো ছিলাম আজ তাঁর জানাযায় আমি শরীক হতে পারিনি।"[১]

চতুর্থ হজ্জব্রত পালন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

"১৩৪৪ হিজরীর পর থেকে ১৩৮৪ হিজরী পর্যন্ত আর হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হিজাযে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে দুইবার হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। বিভিন্ন কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তন্মধ্যে একবার হলো ১৩৬৯ হিজরী সনে। অনুরূপভাবে ১৩৭৪ হিজরী সনেও হজ্জের পূর্ণ এরাদা থাকা সত্ত্বেও হজ্জে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাওলানা ইউসুফ[২]-এর বরকতে ১৩৮৬ হিজরী সনে চতুর্থবার হজ্জব্রত পালন করা সম্ভব হয়। তিনি রজব মাস থেকে আমাকে হিজায সফরের প্রস্তুতির জন্য অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুবিধা এবং কিতাবপত্র রচনার কাজে সীমাহীন ব্যস্ততার দরুন আমি অস্বীকার করছিলাম। শাওয়াল মাসে আমার এক ঘনিষ্ঠ শাগরেদ আলহাজ্জ আবুল হাসান সিদ্দিকী বললেন, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী এবার হজ্জব্রত পালনে হিজায গমন করছেন। যদি আপনি তাঁর সাথী হতে চান তবে আমি আপনার ভাড়ার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু আমি তাতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম।

কয়েকদিন পর মাওলানা ইউসুফ আমাকে বললেন, ভাইজান! আমার প্রথম হজ্জ আব্বাজানের সাথে হয়েছে, দ্বিতীয় হজ্জ মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানীর সাথে হয়েছে। এবার তৃতীয় হজ্জে আমার একজন মুরুব্বি প্রয়োজন। আমি বললাম, তুমি তো এখন মাশা'আল্লাহ্ নিজেই মুরুব্বী। তিনি আমাকে বললেন, আমার দিল চাচ্ছে আপনি এবার আমার সাথে চলেন এবং এখনই এরাদা করেন। এ কথার জবাবে আমি তাকে কিছুই বলিনি।

এদিকে আলহাজ্জ আবুল হাসান সিদ্দিকী আমার নিকট এসে ভাড়ার টাকা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে আমি তা নিতে অস্বীকার করি। তা সত্ত্বেও তিনি 'ঈশার নামাযের সময় আমার অজান্তে বিছানার নিচে পাঁচ হাজার রুপি রেখে চলে যায়। অবশেষে ৬ই জিলকদ মোতাবেক ২১ মার্চ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সকাল বেলা হাজী আজীমুল্লাহ নাসীরুদ্দীনের গাড়িতে করে থানাভবন, ঝানঝানা হয়ে মাগরিবের সময় নিযামুদ্দীনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ১০

---

১. প্রাগুক্ত।

২. জন্ম: রোজ বুধবার, ২৫ জুমাদাল উলা, ১৩৩৫ হিজরী, মুতাবেক ২০ মার্চ, ১৯১৭ খ্রি.। মৃত্যু: ২৯ যিলক্বদ, ১৩৮৪ হিজরী, মুতাবেক ২ এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রি. ইনতিকাল করেন। তিনি তাবলীগ জামা'আতের একজন মুরব্বী ছিলেন। উদ্ধৃত: সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

জিলকদ ফ্রন্টিয়ার মেইলে বোম্বে রওয়ানা হলাম। সেখানে এক দুই দিন অবস্থান করে ১২ জিলকদ রবিবার সকাল ৮টায় বোম্বে জাহাজ রওয়ানা হয় এবং ২৪ জিলকদ জেদ্দায় পৌঁছি। সেখান থেকে জনাব আরশাদ আমাদেরকে তার গাড়িতে করে সোজা তার বাসায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে 'আসরের পর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের সময় আমরা মক্কায় পৌঁছলাম।[১]

আমি ও মাওলানা ইউসুফ উভয়েই হারাম শরীফে ফজরের সালাত আদায় করার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে গাড়িতে চড়ে হারাম শরীফে ফজরের সালাত আদায় করতে যেতাম। গাড়ির ব্যবস্থা না হলে মাদরাসা সাউলতিয়ার মসজিদে সালাত আদায় করে হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হতাম। কেননা সেখানে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ হারামে তিন ঘণ্টা বয়ান করতেন। আমিও মনোযোগ দিয়ে তাঁর বয়ান শুনতাম। বয়ান শেষে বাসায় চায়ের প্রশস্ত দস্তরখানের ব্যবস্থা করা হতো। হজ্জ সম্পন্ন করে ২৭ জিলহজ্জ আমরা মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মিনায় যোহরের সালাত আদায় করি। 'আসরের পর বদর যুদ্ধের শাহাদাত বরণবরণকারী সাহাবীগণের মাযার যিয়ারত করলাম।[২]

২৮ জিলহজ্জ সকাল বেলা আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। সেখানে আমরা বিশ দিন অবস্থান করার পর ১লা সফর রওয়ানা হয়ে জেদ্দায় যোহরের সালাত আদায় করি। সেখান থেকে 'আসরের পর রওয়ানা হয়ে হুদায়বিয়া মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করি। ঈশার সময় মক্কায় পৌঁছলাম এবং রাতেই ওমরা থেকে ফারেগ হয়ে গেলাম। ৮ই সফর জেদ্দা থেকে বিমান যোগে করাচি পৌঁছলাম। সেখান থেকে ২৪ সফর করাচি থেকে লাইলপুর পৌঁছলাম। এভাবে বিভিন্ন এলাকাতে অবস্থান করে ইজতিমার ব্যবস্থা করি। অবশেষে রবী'উল আওয়াল মাসে আমি সাহারানপুর আসলাম আর মাওলানা ইউসুফ নিযামুদ্দীন চলে যান। আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাওলানা ইউসুফের সাথে বিদায়ী মু'আনাকা করি তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি হেঁচকি মেরে কান্না করছিলেন। তিনি বললেন, চার মাস এক সাথে থাকার পর আজ পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।"[৩]

পঞ্চম হজ্জব্রত পালন

শায়খুল হাদীস চতুর্থ হজ্জ করেছেন ১৩৮৬ হিজরী সনে। দীর্ঘ দু'বছর পর ১৩৮৯ হিজরী সনে (১৯৬৯ খ্রি. মুতাবেক) হিজায সফরের নিয়ত করেন। এ সফরে পে-কার্ড ওয়াচ কোম্পানীর হাজী মুহাম্মাদ শফী সাহেব সঙ্গী হবেন। কিন্তু তার একটি মুকাদ্দমার তারিখ থাকার দরুণ তিনি যেতে পারেননি। হাজী মুহাম্মদ শফী বলেন, আমি শায়খুল হাদীসের সাথে কথা বলে লাখনৌ এসে জানতে পারলাম যে, সৌদি 'আরবের ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ভাইস চ্যান্সেলর চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটি আকস্মিক সভা আহ্বান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (আমীর ফাহাদ)-এর পক্ষ থেকে এ দা'ওয়াত করা হয়েছে। আমি শায়খুল হাদীসকে এ গায়বী ব্যবস্থাপনার খবর দিলে তিনি যার পর নাই আনন্দিত হলেন। অতঃপর হিজায সফরের জন্য আমরা ১০ই জিলকদ শনিবার রাতে দিল্লি থেকে বিমান যোগে বোম্বে যাত্রা করি। শায়খুল হাদীসের সফর সঙ্গী ছিলেন আলহাজ আবুল হাসান। পথিমধ্যে মুসাফিরদের মিষ্টান্ন দ্বারা মেহমানদারী করা হয়। সেখান থেকে কিছু মিষ্টান্ন শায়খুল হাদীসের সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন, মৌলভী সাহেব ! আমি রোযা। শায়খুল হাদীস এ সফর রোযা ও ওযুর হালতে সম্পন্ন করার সংকল্পন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা শায়খুল হাদীসের এ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।[৪]

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৪. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৪১৫

শায়খুল হাদীস (রহ.) বোম্বে থেকে করাচির বিমানবন্দর পৌঁছে দেখেন, সেখানে অনেক বড় মাজমা' হচ্ছে। এ মাজমায় মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' দেওবন্দীও আগমন করেন। সেখান থেকে যোহরের সালাত শেষে দু'আ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর জিদ্দাভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। শায়খুল হাদীস صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ "তওবার উদ্দেশ্যে লাগাতার দুই মাসের রোযার নিয়ত করেন।"[১]

এ সফরে শায়খুল হাদীসের নিয়ম ছিল, মাগরিবের পূর্বেই তিনি বাবে জিব্রীল দিয়ে প্রবেশ করে রওযায়ে আত্হারের সম্মুখ দিয়ে যেতে ডান দিকে যে লম্বা দেওয়াল আছে, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কদম মুবারকের দিকে মুখোমুখি হয়ে দেওয়াল ঘেঁসে বসে পড়তেন এবং সালাতের পরে মুরাকাবার হালতে বসতেন। ইফতারের সময় হলে এক গ্লাস যমযম পান করতেন। অতঃপর 'ঈশা পর্যন্ত মুরাকাবার হালতে থাকতেন। 'ইশার সালাতের পর বের হয়ে মোটর বাইক যোগে বাসস্থানে এসে পানি বা শরবত পান করতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, সেসময় শায়খুল হাদীসের বহুমুত্র রোগ ছিল। এ অবস্থায় তিনি কীভাবে ঘণ্টার ঘণ্টা আদবের সাথে মুরাকাবায় কাটাতেন। শায়খুল হাদীস মদীনায় উৎপন্ন তরিতরকারী দিয়েই সাহরী করতেন। হজ্জ শেষে ২১ জিলহজ মদীনা শরীফ গমন করেন এবং মদীনা থেকে ১১ই মুহার্‌রম মক্কায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে জেদ্দা, জেদ্দা থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে ফিরে আসেন।[২]

মদীনায় স্থায়ী বসবাস

পরবর্তী বছর তথা ১৫ যিলকদ, ১৩৯০ হিজরী সনে (১৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ খ্রি. মুতাবেক) তারিখে হিজাযে ষষ্ঠ সফরের ইচ্ছা করেন। শায়খুল হাদীসের জীবনের ইচ্ছা ছিল মদীনা তইয়্যেবায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। হযরত শায়খুল হাদীসের শায়খ ও মুরশিদ মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীরও এ একই প্রত্যাশা ছিল। আল্লাহ্ তাঁকে এ প্রত্যাশা কবুল করেছেন। এ সফরেই শায়খুল হাদীস মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার মনস্থ করেন এবং হিজরতের নিয়ত করেন। অবশেষে ১৮ রবীউল আউয়াল, ১৩৯৩ হিজরী (২৩ এপ্রিল, ১৯৭৩ খ্রি. মুতাবেক) সনে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ২৬ রবীউল আউয়াল, ১৩৯৩ হিজরী (১ মে, ১৯৭৩ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ মঙ্গলবার বোম্বে থেকে হিজাযের উদ্দেশে যাত্রা সূচিত হয়। বিদায় সম্বর্ধনার জন্য মাজমা' হয়েছিল লোকে লোকারণ্য। দুবাই বিমানবন্দর থেকে তাবলীগ জামাতের লোকজন তাঁকে নামিয়ে নেন। এরমধ্যে অনেকে বায়'আত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩]

২৭ রবীউল আউয়াল, ১৩৯৩ হিজরী সনে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন এবং 'উমরা আদায় করেন। এ সফরে শায়খুল হাদীস মাদরাসা সাউলতিয়া'র অফিসে এবং মক্কায় ভাই সা'ঈদ রহমাতুল্লাহ্'র বাসায় অবস্থান করেন। মক্কায় হযরতের শরীর খুব একটা ভালো ছিল না। তিনি মদীনায় যেতে চাইলে খাদেম ও ভক্তবৃন্দগণ তাঁকে নিষেধ করেন। তিনি তাদের এ নিষেধ উপেক্ষা করে পরের দিন সকালে মদীনা মুনাওওয়ারার দিকে গাড়িযোগে রওয়ানা হন। সকালে সাড়ে বারোটায় মদীনায় মাদরাসা শারইয়্যায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি মসজিদে নববী'র 'বাবুন নিসা' তোরণ থেকে একটু সামনে বেড়ে রওযায়ে আতহারের পূর্ব দিকে 'আকদামে আলীয়া'য় অবস্থান করতেন।

১. প্রাগুক্ত।

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৪১৯

৩.প্রাগুক্ত।

৪. ডাক নাম সা'দী, তিনি হলেন, মাদরাসা সউলাতিয়ার প্রথম নাযেম মাওলানা সাঈদের পৌত্র হাকীম না'ঈম কীরানভী মাক্কী'র ছেলে এবং একই মাদরাসার দ্বিতীয় নাযেম মাওলানা মুহাম্মাদ সলীমের ভাতিজা। তিনি সৌদী সরকারের অধীনে মক্কা মুআয্‌যমায় রেজিস্টার (কাতিবুল আদ্‌ল) পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়খুল হাদীস ওফাতের আগ পর্যন্ত মক্কাতে তাঁর এ বিলাসবহুল বাসাতেই অবস্থান করেন। উদ্ধৃত: মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

শায়খুল হাদীসের আইনগত কফীল হওয়া, টিকিট ইত্যাদি এসব কিছুরই দায়িত্ব ছিল ভাই মুহাম্মাদ সা'দীর। এবার শায়েখের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা চালান। আর রাবেতা 'আলমে ইসলামীর প্রধান শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-কায্যায-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং মক্কার প্রসিদ্ধ 'আলিম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আলূভীও তাদের সাথে একত্রে প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

১৩৯৩ হি. জুমাদাল উলা'র ১৬ (১৭ জুন, ১৯৭৩ খ্রি. মুতাবেক) তারিখে হঠাৎ খবর পাওয়া যায় যে, শায়খুল হাদীসের একামা হয়ে গেছে। সকলেই হতবাক, এ কী করে সম্ভব! দশ-পনেরো বছর যাবত অনেকেই এখানে পড়ে আছেন এবং বড় বড় লোক দিয়ে সুপারিশ করেও কোনো লাভ হয়নি। অথচ হযরত শায়খুল হাদীসের একামা হয়ে গেছে, তা কী করে সম্ভব!

শায়খ সালেহ কায্যায এবং শায়খ মুহাম্মাদ আলূভী'র আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাদশাহ ফয়সাল রাজ দরবারের কারো সাথে পরামর্শ না করেই নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ একামা শায়খুল হাদীসের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ একামা হাতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এরই মধ্যে রমযান শুরু হয়ে যায়। পনেরো রমযান পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। পনেরো রমযানের তারাবীহ আদায় শেষে শায়খুল হাদীস মাদীনা তাইয়্যেবার দিকে রওয়ানা হন। এ রমযানের প্রথম অর্ধেক মক্কায় 'উমরার জন্য থেকে যান আর দ্বিতীয় অর্ধেক মদীনার মসজিদে নববীতে ই'তিকাফ করেন। এবারের ই'তিকাফ ছিল মসজিদে নববীর 'বাবে স'উদে'র একটু সামনে। এভাবেই তিনি মদীনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১]

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, খ-১, পৃ. ৪২৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অসুস্থতা, অন্তিম মুহূর্ত ও দাফন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অসুস্থতা, অন্তিম মুহূর্ত ও দাফন

অসুস্থতা

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। অনেক সময় ঘনিষ্ঠ ভক্তজন ও ডাক্তাররাও তাঁর জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে যেতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, মাশায়েখ ও মুরব্বীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণাবলীর প্রচার, তাঁদের রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রসার, তাবলীগী জামাআতের দেখাশোনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত মুরীদানকে 'কামেল' পর্যায়ে উন্নীতকরণের যে বিপুল খিদমত তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তা' সম্পন্ন করার জন্যে বারবার আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে এবং ভক্তজনরা আবার আশ্বস্ত হয়েছেন।

শায়খুল হাদীসের একান্ত ডাক্তার হিসেবে ডাক্তার ইসমাঈল সদাসর্বদা তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনি কখনই পৃথক হননি। তাই অন্তিম সময়ের মুহূর্তগুলো ডাক্তার ইসমাঈল-এর বর্ণনানুযায়ী একটি পত্র থেকে তুলে ধরা হলো–

শায়খুল হাদীসের রোগব্যাধি তো কয়েক বছর যাবৎ লেগেই ছিল। পূর্বের চেয়ে অনেকটা ভালোই মনে হচ্ছিল। খাবার-দাবার, কথাবার্তা সবকিছুই ঠিকমত চলছিল। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে সুস্থ মানুষের মতোই পরামর্শ দিচ্ছিলেন। মাওলানা আকিল *মুসলিম শরীফে*র ব্যাখ্যার কাজ করছিলেন, তিনি প্রতিদিনের কাজগুলো 'ইশার সালাতের পর শায়খুল হাদীসকে শোনাতেন। হযরত মাওলানা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং জরুরি পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। হযরত দুর্বলতা অনুভব করলেও কেমন যেন সুস্থ ছিলেন। এক ওয়াক্ত সালাত হারামে গিয়েই পড়তেন। প্রথম দিকে যোহরের সালাতে যেতেন। পরবর্তীতে রোদের তীব্রতার কারণে 'ইশার সালাত হারামে গিয়েই পড়তেন।[১] এ ব্যাধি ও দুর্বলতা নিয়েই তিনি ১৫ই মুহাররম ১৪০২ হিজরী সনে মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে হিন্দুস্তানে আগমন করেন।

দীর্ঘ দুই মাস হিন্দুস্তানে অবস্থান করে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয়। এতে তেমন একটা লাভ হয়নি; বরং তিনি দিন দিন আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অবশেষে মহান আল্লাহ্ শায়খুল হাদীসের শেষ আকাঙ্ক্ষা এবং ভক্ত অনুরক্তদের দু'আ কবুল করলেন। তিনি এবং তাঁর সাথিসঙ্গীসহ ১৮ রবী'উল আওয়াল, ১৪০২ হিজরী সনে মুতাবিক ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে করাচির পথে জিদ্দা রওয়ানা হয়ে মদীনা মুনাওওয়ারায় পৌঁছে গেলেন। চিকিৎসা অব্যাহত ছিলো। হিন্দুস্তানের ভক্তগণ কখনো তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির সংবাদে উদ্বেগাকূল আবার কখনো বা একটু উন্নতির সংবাদে আশ্বস্ত হচ্ছিলেন।[২]

অন্তিম মুহূর্ত

শায়খুল হাদীসের মৃত্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর একান্ত ভক্ত অনুরক্ত খাদেম ও তাঁর সার্বক্ষণিক চিকিৎসক বন্ধুবর ডাক্তার ইসমাঈল-এর পত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। যা তিনি ঘনিষ্ঠজনদেরকে লিখিত পত্রে জানিয়েছিলেন।[৩]

হঠাৎ করে ১২ মে, ১৯৮২ খ্রি., রোজ বুধবার হযরত শায়খুল হাদীসের ১০২ ডিগ্রি জ্বর হয়। চিকিৎসার ফলে জ্বর নেমে যায়; কিন্তু দুর্বলতা অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং হারামে গিয়ে সালাত আদায় বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তন্দ্রায়তা শুরু হয়।

১৪ মে, ১৯৮২ খ্রি. জুমার সালাত হারামের জামাতের সাথে মাদরাসা উলূমে শরইয়্যার সদর দরজায় অবস্থান করে আদায় করেন। হারামের জামাত এ পর্যন্ত এসে সংযুক্ত হত। জ্বর নেমে যাওয়ার পর

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে পানীয় গ্রহণ করেন। ১৪ মে, থেকে ইনতিকালের আগ পর্যন্ত হযরত শায়খুল হাদীসের শিরায় গ্লুকোজ প্রবেশ করানো হয়। আর অন্যান্য চিকিৎসাও ইনজেকশনের মাধ্যমে চলতে থাকে।[১]

১৫ মে, শনিবার চোখে ও পেশাবে পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। রক্ত পরীক্ষা করে যকৃত ও মূত্রাশয়ের রোগ নির্ণীত হয় এবং উভয় অঙ্গ ঠিকমত কাজ না-করার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। ১৬ মে, রাতে অনেক সংজ্ঞাহীনতা থাকে। পরের দিন ফজরের পর থেকে একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। রবিবার পুরো দিনই সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। এমন কি যেই কাতে শোয়ানো হত সে কাতেই থাকতেন। নড়তে চড়তে পারতেন না। এক কথায় আওয়াজ, নড়াচড়া, কাশি- কোনোকিছুই ছিল না। নাড়ি ও রক্তচাপ দেখে স্বস্তি পাওয়া যেত যে, শীগ্গীরই কোনো সঙ্কটের আশঙ্কা নেই। চিকিৎসাসহ বিবিধ তদবীর চলতে থাকে। রবিবার বিকালে বুখারী শরীফের খতম শুরু করা হয়। আর বুখারী খতম শেষ হয় সোমবার। খতমের পর শায়খুল হাদীসের ছেলে মাওলানা তালহা সাহেব বিনয়-কাতর হয়ে দু'আ করেন। মক্কা মুকাররমায় শাইখ মুহাম্মাদ আলূভী মালিকীর ওখানেও সূরা ইয়াসীনের খতম করা হয়।

১৭ মে, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার সংজ্ঞাহীনতা ছিল; তবে আগের দিনের মত নয়; বরং কিছুটা অস্থিরতা ছিল। শায়খুল হাদীস সকালে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতে থাকেন। যোহরের পর থেকে 'ইয়া কারীম ইয়া কারীম' অথবা 'ও কারীম কারীম' বলতে থাকেন। কখনও কখনও 'ইয়া কারীম ও ইয়া হালীম'ও বলতে থাকেন। 'ইয়া কারীম' ধ্বনি শেষ মুহূর্তেও উচ্চরণ করতে থাকেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ অকর্মণ্য (ডাক্তার ইসমাঈল) অন্যান্যা ডাক্তারদের সাথে বরাবর পরামর্শ করতে থাকে। বিশেষত ডাক্তার আশ্রাফ, ডাক্তার আইয়ুব, ডাক্তার সুলতান, ডাক্তার মানসূর, ডাক্তার আবদুলসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রক্ত পরীক্ষার বিষয়ে ডাক্তার ইনসেরাম যথেষ্ট সহায়তা করে যাচ্ছিলেন। তবে যকৃত ও মূত্রাশয়ের দুর্বলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। রক্ত ও পেশাব পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য বিভিন্ন তদবীর চলতে থাকে। খাবার-দাবার প্রায় বন্ধ ছিল। শিরায় বোতলের মাধ্যমে খাবার, পানি ও গ্লুকোজু ইত্যাদি প্রবেশ করানো হত।[২]

২১ মে, জুমার সালাত হারাম শরীফের জামাতের সাথে মাদরাসা শরইয়্যার সদর দরজায় আদায় করেন। ২৩ মে, রবিবার সকাল পর্যন্ত শারীরিক অবস্থা বেশ ঠিক থাকে। যোহরের পর থেকে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু হয়। মাগরিবের আধা ঘণ্টা পর যখন আমি ফার্মেসীতে ছিলাম। তখন হযরতের খাদেম নজীবুল্লাহ্ টেলিফোনে জানান যে, হযরতের তবিয়ত খারাপ। আমি কালবিলম্ব না করে উপস্থিত হই। গিয়ে দেখি শ্বাসকষ্টের মাত্রা অত্যন্ত প্রবল, যার কারণে শায়খুল হাদীস অস্বস্তি বোধ করছেন। শ্বাস নিতে অনেক সময় ধরে নিতে দেখা যায়। আমি পরীক্ষা করে জরুরি ইনজেকশন দিই। ইনজেকশন দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। 'ইশার পর আমার ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত তবিয়ত অনেকটা স্বাভাবিক ছিল।

২৪ মে, রোজ সোমবার ফজরের সময়ও অবস্থা তুলনামূলক স্বাভাবিক থাকে এবং হযরত একটু একটু করে কথাও বলতে থাকেন। তবে আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এজন্য যে, গতকাল থেকে একেবারের প্রস্রাব হয়নি। সকাল আটটার দিকে আবার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। এরজন্য এবং প্রস্রাবের জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। ফলে আসরের সময় পেশাব হয়। শ্বাসকষ্টের জন্য ইনজেকশন ও অক্সিজেন লাগানো হয়। দুপুর বারোটার সময় অস্বস্তি পরিলক্ষিত হয়। কখনও বলতেন, বসাও। কখনও বলতেন শোয়াও। কখনও বলতেন, ঔষধ দাও। এ ছাড়া সময়ে সময়ে 'ইয়া কারীম ও কারীম' বুলন্দ আওয়াজে বলতে থাকেন। আমি (ডাক্তার ইসমাঈল) সবসময় হযরতের পাশেই বসে থাকতাম। হযরত কখনো কখনো আমার হাত ধরে জোরে চাপ দিতেন। প্রায় বেলা এগারোটার সময় আলহাজ্ব আবুল হাসান বালিশ উঁচু

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

করে দেন, তখন শায়খুল হাদীস আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাক্তার সাহেব আছেন? আলহাজ্ব আবুল হাসান জওয়াব দেন যে, হাঁ, ইনিই ডাক্তার ইসমাঈল। একথা শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এটাই ছিল হযরত শায়খুল হাদীসের মুখের শেষ কথা। এরপর থেকে 'ইয়া কারীম, ও কারীম' বলতে থাকেন। যোহর পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। যোহরের পর থেকে একদম নীরব হয়ে যান এবং শেষ সময় পর্যন্ত নীরবই থাকেন। আমি অধম (ডাক্তার ইসমাঈল) বার বার হযরতের নাড়ি ও রক্তচাপ পরীক্ষা করতে থাকি। রূহ বের হওয়ার একটু আগে হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা তালহা জিজ্ঞেস করেন, এ কি শেষ সময় ? আমি মাথা নেড়ে বললাম, মনে হচ্ছে। তখন মাওলানা তালহা জোর আওয়াজে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে শুরু করেন। বিকাল পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট। হঠাৎ শায়খুল হাদীস জোরে জোরে দুইবার শ্বাস নিলেন। তারপর চোখগুলো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হতে থাকে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন।[১]

এতদিনে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন শায়খুল হাদীসের মনের তামান্না পূরণ করেন। তাঁর শায়খ হযরত সাহারানপুরীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। জীবদ্দশায় অনেক ঝড়ঝাপটা ও চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু কোনোদিন হযরত সাহারানপুরী থেকে পৃথক থাকবেন এ চিন্তাও করেননি। হযরত সাহারানপুরীর আশা ছিল, মৃত্যুর পর মদীনাতে থেকে যাওয়া, তাঁর মনের আশাও ছিল মদীনাতে থেকে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শায়খ ও শাগরেদ্ উভয়ের মনের আশা পূরণ করেন।

অন্তিম মুহূর্তে শায়খুল হাদীসের কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ

শায়খুল হাদীসের অন্তীমকালে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– (১) হযরত শায়খুল হাদীসের সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা (২) হযরত মাওলানা আকিল (৩) জা'ফর ইব্ন আকিল (৪) আলহাজ্ব আবুল হাসান (৫) মৌলভী নজীবুল্লাহ (৬) সুফী ইকবাল (৭) মৌলভী ইউসুফ মাতালা (৮) হাকীম আবদুল কুদ্দুস (৯) মৌলভী ইসমাঈল (১০) মৌলভী নযীর (১১) ডাক্তার আইয়ুব (১২) হাজী দিলদার আসআদ (১৩) আবদুল কাদীর (১৪) ডাক্তার ইসমাঈল।[২]

কাফন-দাফন

হযরত শায়খুল হাদীসের ইনতিকালের পরপরই কালবিলম্ব না করে দাফন-কাফনের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। তখনই ডাক্তার আইয়ুবকে হাসপাতালের ছাড়পত্র আনার জন্য পাঠানো হয়। দাফন ইশার পর হবে, না কি ফজরের পরে– এ নিয়ে সাহেবযাদা মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা, মাওলানা আকিল ও অন্যান্য খাদেমগণ পরামর্শ করেন। কিছু আত্মীয়-স্বজন মক্কা থেকে আসার কথা ছিল। এজন্য সিদ্ধান্ত হয় যে, ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, ইশার পরই জানাযা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষণা দেওয়া হয়। অতীব দুঃখের বিষয় মক্কা থেকে তারা আসার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তারা সময়মত পৌঁছতে পারেনি। সবজায়গা ঘোষণা হয়ে যায় যে, ইশার পর জানাযা হবে। তাই জানাযার সময় পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।[৩]

মাগিরবের পর গোসলের ব্যবস্থা করা হয়। খাদেম ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এ মুবারক কাজে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা করে। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ কাজের আঞ্জাম দেন। তাঁরা হলেন– (১) মাওলানা ইউসুফ মাতালা (২) আলহাজ্ব আবুল হাসান (৩) মৌলভী নজীবুল্লাহ্ (৪) হাকীম আবদুল কুদ্দুস (৫) জাফর (৬) শাহ্ আতাউল মুহাইমিন ইব্ন শাহ্ আতাউল্লাহ বুখারী (৭) সুফী আসলাম (৮) মৌলভী ইহসান (৯) কাযী আবরার (১০) আবদুল মাজীদসহ আরো কয়েকজন।

অন্যদিকে ডাক্তার আইয়ুবকে ছাড়পত্র আনতে পাঠানো হয়। দুই ঘণ্টা হয়ে যায় তিনি এখনো এসে পৌঁছাননি। কিছুক্ষণ পরেই তিনি এসে বলেন। ছাড়পত্র সংগ্রহে কিছু আইনী জটিলতা রয়েছে। হযরত

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৩. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

শায়খুল হাদীসের সাহেবযাদা মাওলানা তালহা ছাড়া অন্য কারো হাতে ছাড়পত্র দিবেন না। মাওলানা তালহাকে তাঁর সাথে পাঠানো হয়। কবরস্থানে কবর খননের কথা বললে, হাসপাতালের ছাড়পত্র ছাড়া আমরা কবর খনন করতে পারব না।[১]

এসময় ইশার সালাতের বাকি ছিল মাত্র ৪৫ মিনিট। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ পুনরায় পরামর্শ করতে বসেন। কেননা, ইশার আগে কবর প্রস্তুত হওয়া মনে হচ্ছে মুশকিল। এজন্য ফজরের পরেই সালাতে জানাযার ব্যবস্থা করতে হবে। এরইমধ্যে সাইয়্যেদ হাবীব এসে বলেন, আমি কবরের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে এসেছি এবং কবর খনন কাজ শুরু হয়েছে। বিশ মিনিট পর হাসপাতালের ছাড়পত্রও চলে আসে। অন্যদিকে কবর প্রস্তুত হওয়ার খবরও এসে পড়ে। এমনকি কবরস্থানের লোকজন নির্দিষ্ট খাটিয়াও নিয়ে আসে। আনুমানিক ইশার আযানের পনেরো মিনিট পূর্বেই জানাযা একেবারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

এজন্য প্রথম পরামর্শ মুতাবেক জানাযা বাবুস সালাম গেট দিয়ে হারাম শরীফে নেওয়া হয়। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী ইশার ফরয সালাতের পর সাথে সাথে হারাম শরীফের ইমাম আবদুল্লাহ্ যাহিম জানাযার সালাতের ইমামতি করেন। অতঃপর বাবে জিবরীল গেট দিয়ে বের হয়ে বাকী' কবরাস্থানের দিকে জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়। ভিড় ছিল বেসামাল। হয়তো এমন ভিড় আর কোনো জানাযায় দেখা যায়নি। কবর হযরতের ইচ্ছানুসারে আহলে বায়তের সীমানার ভিতর এবং হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর কবরের পাশেই খনন করা হয়। কবরে যাঁরা নামেন– (১) হযরত শায়খুল হাদীসের সাহেবযাদা মাওলানা তালহা (২) আলহাজ আবুল হাসান।[২]

---

১. প্রাগুক্ত।
২. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
উত্তরাধিকার ও সন্তান-সন্ততি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকার ও সন্তান-সন্ততি

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র পিতার ইনতিকালের সময় তাঁর একজন সহোদরা বোন ছিলো। হযরত শায়খুল হাদীসের সহোদরা বোন একজনই ছিলেন। তাঁর নাম হলো– 'আয়িশা খাতুন। জনাব মামুন শু'আইবের সাথে ৯ সফর, ১৩৩৭ হিজরী (১৪ নভেম্বর, ১৯১৪ খ্রি.) সনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রায় ২৪ বছরের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করে আজ ১৬ যিলহজ, ১৩৬১ হিজরী (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ খ্রি.) সনে কান্ধালায় ৪০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি একটি মেয়ে সন্তান রেখে যান। তাঁর সাথে মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়ার বিবাহ হয়। তাদের ঘরেই মৌলভী মুহাম্মাদ সালমান ও মৌলভী মুহাম্মাদ খালেদের জন্ম হয়।[১]

মৃত্যুকালে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র এক পুত্র তাল্‌হা এবং পাঁচ কন্যা রেখে যান। এক নজরে শায়খুল হাদীসের পরিবারবর্গ।[২]

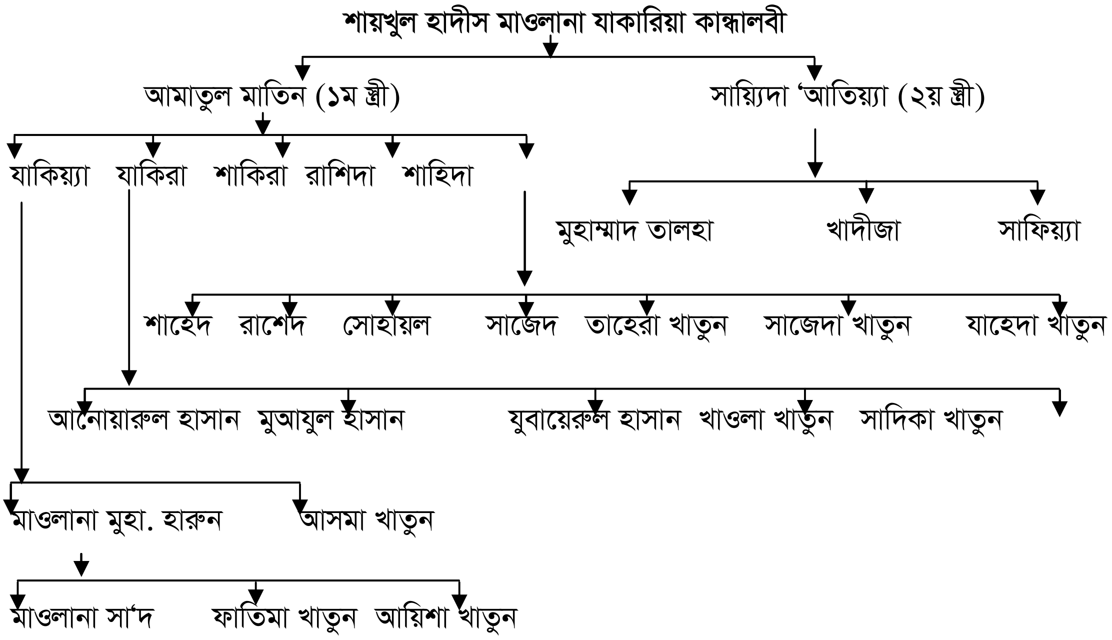

নিম্নে তাদের বর্ণনা তুলে ধরা হলো–

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী প্রথম স্ত্রী'র ইনতিকালের পরে পরিবারের মুরব্বীদের পীড়াপিড়ীতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করেন আমাতুল মাতিনকে। তাঁর জীবনী সম্পর্কে কোথাও কোনো আলোচনা পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ছিলেন শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলাানা ইলিয়াসের শালিকা। সে হিসেবে চাচা-ভাতিজা ছিলেন ভায়রা-ভাই।

অন্যদিকে শায়খুল হাদীসের দ্বিতীয় স্ত্রী সায়্যিদা 'আতিয়্যা সম্পর্কেও অনুরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ছিলেন শায়খুল হাদীসের চাচাতো বোন। অর্থাৎ মাওলানা ইলিয়াসের মেয়ে। সে হিসেবে এখানে চাচা-ভাতিজা হয়ে গেলেন জামাই-শশুর।

---

১. মুহাম্মদ মাসউদ আযিযী নদবী, আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদীত, *মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলভী রহ. জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৫-৩১৭

২. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, *শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর পাঁচ কন্যা* (ঢাকা: আকিক পাবলিকেশন্স, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১০৮

শায়খুল হাদীসের প্রথম স্ত্রী আমাতুল মাতিনের গর্ভে পাঁচ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যারা হলেন–

১) যাকিয়্যা

২) যাকিরা

৩) শাকিরা

৪) রাশিদা

৫) শাহিদা

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র বড় কন্যা হলেন– যাকিয়্যা

শায়খুল হাদীসের প্রথম সহধর্মিণীর প্রথম সন্তান যাকিয়্যা। তিনি ১৩৩৭ হিজরী সনে ৪ শা'বান (৫ মে, ১৯১৯ খ্রি. মুতাবেক), রোজ মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানার খান্দানের পুরাতন নিয়ম হলো, কোনো মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই নিকট আত্মীয় গায়রে মাহরামের সাথে তার বিবাহ ঠিক হয়ে যেত। সে হিসেবে আমার বড় মেয়ে অর্থাৎ হারুনের আম্মার বিবাহ হয় মাওলানা ইউসুফের সাথে। যখন সে জন্ম নিলো, তখন ধাত্রী আমার চাচীকে বললো, আপা! আপনাকে মুবারকবাদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ইউসুফের জন্য বউ দান করেছেন।[১]

সায়্যিদা যাকিয়্যা মা-বাবার আদর-স্নেহ, সুন্দর দীনি পরিবেশ ও সর্বোত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হন। ঘরে বসেই তিনি মা-বাবার কাছে কুর'আন তরজমা, তাফসীর, হাদীস, মাসআলা-মাসায়েল ও ইসলামী ইতিহাসসহ বিভিন্ন লেখাপড়া করেন। তিনি ঘরের কাজের পাশাপাশি দিনে চার থেকে পাঁচ পারা কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। তবে রমযানে এরচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করতেন। এ বিষয়ে শায়খুল হাদীস *ফাযায়েলে রমযান*-এ লিখেছেন–

> "নিজের অযোগ্যতার কারণে নিজে কিছু করতে না পারলেও ঘরে আমার মেয়েদের পরস্পরের মাঝে কুর'আন তিলাওতের প্রতিযোগিতা দেখে খুব আনন্দ হয়। তারা সকল ঘরোয়া কাজের পাশাপাশি দৈনিক ১৫/২০ পারা কুর'আন তিলাওয়াত করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ মেহেরবানিতে তাদের এ আমলকে কবুল করে নিন এবং আরো বেশি বেশি কুর'আন তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন।"[২]

সায়্যিদা যাকিয়্যা'র বিয়ে সম্পর্কে শায়খুল হাদীস *আপবীতী*তে বলেন,

> "চাচাজান ইলিয়াস (রহ.) প্রতি বছরই সাহারানপুরের বার্ষিক মাহফিলে আসতেন। এ বারও তিনি মাহফিলের একদিন পূর্বে ২ মুহাররম, ১৩৫৪ হিজরী'তে মাদরাসা চলে আসেন। সেদিন মাগরিবের নামাযের পর চাচাজান আমাকে বললেন, যাকারিয়া! আগামীকাল হযরত মাদানী'কে দিয়ে যাকিয়্যা ও যাকিরার বিয়ে পড়িয়ে দিতে চাই।' আমি বললাম, চাচাজান ! এ তো খুশির কথা। আমাকে জিজ্ঞেস করার আবার কি আছে? ইশার নামাযের পর বাড়িতে গিয়ে বড় দুই মেয়েকে বললাম, চাচাজানের ইচ্ছায় আগামীকাল তোমাদের বিয়ে। মাদরাসার মাহফিলে হযরত মাদানী এ বিয়ে পড়াবেন। যাকিয়্যার আম্মা বলল, দু-এক দিন আগে বললে তো এক জোড়া কাপড় বানাতে পারতাম। তখন আমি বললাম, আচ্ছা ! আমার তো জানা ছিল না যে, ওরা 'নাঙ্গা' ঘুরছে। আমি তো জানতাম তাদের গায়ে কাপড় আছে। এ কথা শুনে আমার স্ত্রী একেবারে চুপ হয়ে গেলেন।"[৩]

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতি* (ঢাকা: মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.), খ-১, পৃ. ২৫৭

২. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী বিয়ে পড়ানোর কথা শুনে বললেন, মহর কত? চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস বললেন, মহরে মিছিল[১]। আর আমাদের পরিবারে মহরে মিছিল হলো আড়াই হাজার রুপি। এ কথা শুনে হযরত মাদানী বললেন, আমি মহরে ফাতেমী ছাড়া বিয়ে পড়াবো না। মাওলানা ইলিয়াস বললেন, ফুকাহায়ে কিরামের মতে মহরে মিছিলের কমে বিয়ে পড়ানোর জন্য মেয়ের স্পষ্ট অনুমতি লাগে, শুধু 'সুকূত' মৌনতা যথেষ্ট নয়। মাওলানা ইলিয়াস বললেন, মেয়েরা অমত করবে বলে আমার মনে হয় না। বিয়ে পড়ানো হয়ে যাক, তবে ওদের অনুমতির উপর বিয়ে স্থগিত থাকবে। মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী বলেন, তুমি ঘরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে নিলেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর মহরে ফাতেমীতেই ১৩৫৪ হিজরী সনে ৩ মুহাররম (৭ এপ্রিল, ১৯৩৫ খ্রি. মুতাবেক) তারিখে মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী সাদাসিধা আড়ম্বরহীন বিয়ের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কিছু কথা বললেন এবং মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা এনামুল হাসানকে একসাথে দাঁড় করিয়ে খুতবা প্রদান করেন। এভাবে খুতবা শেষে সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী মাদরাসা মাযাহিরুল উলূমের বার্ষিক মাহফিলে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ[২]-এর সাথে যাকিয়্যার এবং মাওলানা এনামুল হাসানের সাথে যাকেরা'র বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৩]

বিয়ের পর দীর্ঘ এগারো বছর নিযামুদ্দীনের অন্দর মহলেই তিনি অতিবাহিত করেছেন। নিযামুদ্দীনে আগত জামা'আতের মেহমানদারী রান্না-বান্নার কাজ তাকে সামাল দিতে হতো। তিনি এ কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। তারপরও তিনি সারাদিনে তিন থেকে চার পারা কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন।

মাওলানা ইলিয়াসের ইনতিকালের পর সায়্যেদা যাকিয়্যা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আস্তে আস্তে অসুস্থতা চূড়ান্তরূপ ধারণ করে। এদিকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব তাবলীগের কাজে নিজেকে এতোটাই নিয়োজিত রেখেছিলেন যে, তিনি ঘরের খবর নেওয়ার সুযোগ পাননি। যার ফলে মুহতারামার চিকিৎসার দায়িত্ব ছিলো হাফেয ফখরুদ্দীন দেহলবীর উপর। তিনি প্রায় দিল্লি থেকে নিযামুদ্দীনে এসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন।[৪]

একবার মাওলানা মানযূর নু'মানী-এর স্ত্রী তাকে মাওলানা ইউসুফের ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, "তিনি সবসময়ই দীনের চিন্তা ও মেহনতে ব্যস্ত থাকেন, নিজেরই কোনো খবর রাখতে পারেন না। তাই আমিই তাকে বলেছি যে, আপনি আমার বিষয়ে পেরেশানি হবেন না। চিকিৎসা তো চলছেই। আল্লাহ্ তা'আলা যদি জান্নাতে একত্রিত করে দেন তাহলে সেখানে নিশ্চিন্তে একসাথে থাকার সুযোগ হবে ইনশাআল্লাহ্।

দীর্ঘ এক যুগ সংসারের মধ্যেই তিনি অনেক দিন রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন। মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। বিভিন্ন চিকিৎসা করেও ফল না হওয়ায় দিন দিন তিনি আরো অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে ২৯ শাউয়াল, ১৩৬৬ হিজরী (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রি. মুতাবেক) সনে সোমবার সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে সিজদায়াবনত অবস্থায় মহান

---

১. মহরে মিসিল হলো, আপন বোন, ফুপি ইত্যাদি রক্ত সম্পর্কিয়দের বিয়েতে মহরের যে পরিমাণটি থাকে।

২. মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী (আরবী: مولانا محمد يوسف كاندهلوي) (হযরতজি বলেও পরিচিত) (জন্ম: ১৯১৭- মৃত্যু: ১৯৬৫) ছিলেন ভারতের একজন মুসলিম পণ্ডিত। পরবর্তীতে তিনি তাবলিগ জামাতের দ্বিতীয় আমির হন। দশ বছর বয়সে তিনি কুর'আন হাফিয হন এবং হাদীস ও ইসলামীসহ অন্যান্য শাখায় পড়াশোনা চালিয়ে যান। লেখালেখি ছাড়াও তাবলিগে তিনি বেশ সময় ব্যয় করেন। তার দুইটি বিখ্যাত বই হলো *হায়াতুস সাহাবা* ও চার খণ্ডের *মাআনিউল আহবার ফি শারহ*। তিনি *মুন্তাখাবে হাদীস* বইয়েরও রচয়িতা। মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভি ৪৮ বছর বয়সে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। উদ্ধৃত: সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩.শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ২৫৮

৪. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

রব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। মাওলানা মুহাম্মাদ হারূন তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। আরেক সন্তান মুহাম্মাদ মূসা। তিনি সাত-আট মাস জীবিত থাকার পর ৯ রবী'উস সানী ১৩৪৪ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। সায়্যিদা যাকিয়্যাকে কবরাস্তানে মাওলানা ইউসুফের কামরার পশ্চিম দিকে মঙ্গলবার সকাল নয়টায় তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

সায়্যিদা যাকিয়্যা'র সন্তান-সন্ততি

সায়্যিদা যাকিয়্যার এক ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন।

(১) মাওলানা হারূন

(২) আসমা খাতুন।

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হারূন

২৪ রমযান ১৩৫৮ হিজরী (মুতাবেক ৭ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রি.) সনে রোজ মঙ্গলবার সাহারানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা মাওলানা ইলিয়াস জন্মের এক সপ্তাহ পর ১ শাওয়াল মুতাবেক ১৩ নভেম্বর নাতি হারূনকে দেখতে আসেন। তিনি ১৮ যিলহজ, ১৩৭৩ হিজরী (১৮ আগস্ট, ১৯৫৪ খ্রি.) সনে তাবলীগের মারকায নিযামুদ্দীনে হযরত সুলতান মেওয়াতী ও হাফেয নুরুদ্দীন সাহেবের কাছে হিফয সম্পন্ন করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে হযরত হারূন রমযানের তারাবীতে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ শোনান এবং সবকয়টি রোযা রাখেন। ১৩৭৫ হিজরী, মুতাবেক ১৯৫৫ খ্রি. রোজ বুধবার, শায়খুল হাদীস কান্ধালায় তাঁদের পারিবারিক মসজিদে ফজরের নামাযের পর ফারসী '*আমদ নামা*' ও অন্যান্য কিতাবের সবক চালু করেন। অবশেষে তিনি ১৩৮১ হিজরী সনে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর থেকে দাওরায়ে হাদীসে শরীক হন।

রবি'উল আউওয়াল মাসের ৮ তারিখে, ১৩৮১ হিজরী (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬১ খ্রি. মুতাবেক) সনে হযরত 'আবদুল কাদের রায়পুরীর খানকায় তাঁর উপস্থিতিতে হযরত মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্ধালবী'র কন্যাকে মহরে ফাতেমীতে বিয়ে করেন। তিনি তিন সন্তানের জনক। (১) মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ[২], (২) ফাতিমা খাতুন[৩], (৩) আয়েশা খাতুন[৪]।

মাওলানা মুহাম্মদ হারূনের বায়'আত ও তারবিয়াতী সম্পর্ক ছিলো শাহ্ 'আবদুল কাদির রায়পুরী'র সাথে। রায়পুরীর ইনতিকালের পর তিনি নানাজান শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর তরবিয়তে ছিলেন এবং ২৬ রবী'উল আওয়াল ১৩৯১ হিজরী সনে শায়খুল হাদীসের পক্ষ থেকে তাঁকে এজাযত ও খিলাফত প্রদান করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ হারূন ৩০ শা'বান ১৩৯৩ হিজরী (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ খ্রি.) সনে রোজ শুক্রবার জুম'আর নামাযের পূর্বে বেলা এগারোটার দিকে ইনতিকাল করেন। তাঁকে নিযামুদ্দীন মারকাযের কবরস্তানেই দাফন করা হয়।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২. মাওলানা মুহাম্মাদ সা'দ ৮ মুহাররম ১৩৮৫ হিজরী (১০ মে, ১৯৬৫ খ্রি. মুতাবেক) সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিযামুদ্দীন মাদরাসা কাশিফুল উলূম থেকে ফারেগ হন। এখানেই তিনি ইলমী ও দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহারানপুরীর বড় মেয়ে বারিরাহ খাতুনকে বিয়ে করেন। উদ্ধৃত: মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩. ফাতিমা খাতুন ২ রবিউছ ছানী, ১৩৮৩ হিজরী (২৩ আগস্ট, ১৯৬৩ খ্রি. মুতাবেক) জন্মগ্রহণ করেন। দারুল উলূম সালতিয়া, মক্কা মুকাররমা-এর মুহতামিম মুহাম্মাদ শামীম সাহেবের পুত্র হালীম সাহেবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি মক্কাতেই অবস্থান করেন। উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৪. আয়েশা খাতুন ৬ যিলহজ্জ ১৩৮৭ হিজরী (৬ মার্চ, ১৯৬৮ খ্রি. মুতাবেক) সনে জন্মগ্রহণ করেন। হাজী ইফতিখার হাসান কান্ধলভীর পুত্র যিয়াউদ্দীন সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

কন্যা আসমা খাতুন

তিনি ১৪ শাওয়াল ১৩৬১ হিজরী (২৫ অক্টোবর, ১৩৪২ খ্রি. মুতাবেক) সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের তিন বছর পর ২৬ শাওয়াল, ১৩৬৪ হিজরী (১৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রি. মুতাবেক) সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সাহারানপুরে মাওলানা হাকীম সায়্যেদ মুহাম্মাদ আইউব সাহেবের পিতা হাকীম মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের ওয়াক্‌ফ্‌কৃত কবরাস্তানে দাফন করা হয়।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র দ্বিতীয় কন্যা হলেন– যাকিরা

শায়খুল হাদীসের প্রথম সহধর্মিণীর দ্বিতীয় সন্তান যাকিরা। তিনি ১৩৩৮ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (সেপ্টেম্বর মাসে ১৯২০ খ্রি. মুতাবেক) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ বা সন সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে কোনোকিছু জানা যায়নি। এ সময় হযরত শায়খুল হাদীস প্রথম হিজায সফরে হযরত সাহারানপুরীর সাথে গিয়েছিলেন। তখন সৌদিতে শরীফ হুসায়নের রাজত্ব চলছিল। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান-কে গ্রেফতার করে 'মালটা'র কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তাঁর সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে মাওলানা সাহারানপুরীসহ আরো যারা ছিলেন তাদের সকলকেই নজরবন্দি রাখা হয়েছিলো। ১০ সফর ১৩৩৯ হিজরী সনে মুতাবেক ২২ অক্টোবর, ১৯২০ খ্রি. হারাময়ন থেকে শায়খুল হাদীস সাহারানপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এর প্রায় তিন মাস পূর্বে সায়্যিদা যাকেরা জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বড় বোন সায়্যিদা যাকিয়্যা'র মতো তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষা শায়খুল হাদীসের হাতেই হয়েছে। বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘরেই মা-বাবার কাছে কুর'আন শিক্ষাসহ কুর'আন তরজমা ও তফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করেন।[৩]

এ বংশের মহিলারা মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী, মাওলানা শাহ্ 'আবদুল কাদের রায়পুরী ও মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইলিয়াস দেহলবী এ তিনজন মুরুব্বীর সাথে পত্রমাধ্যমে আত্মসংশোধনের সম্পর্ক রাখত।

আত্মসংশোধনের জন্য তাদের প্রতি মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইলিয়াস দেহলবী'র তিনটি চিঠি–

(১) এনামুল হাসানের স্ত্রী ২০ রমযান দু'আর জন্য চিঠি লিখেছে। আমি তার জন্য ও আমার সকল কলিজার টুকরার জন্য দু'আ করছি এবং আশা করি তারাও যেনো আমাকে তাদের দু'আয় শামিল রাখে। তাবলীগের 'ছয় সিফাতে'র প্রতি সকলেই খুব গুরুত্ব দেবে। যারা জানে না তাদের সাথে আলোচনা করবে এবং এসব বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করবে।[৪]

(২) যাকিয়্যা, যাকিরা ও 'আতিয়্যা! সকলেই নিজেদের কুর'আন তিলাওয়াত সহীহ করার চেষ্টা করবে এবং ছোটদের পেছনেও মেহনত করবে। সবসময় তাবলিগী উসূলের উপর অটল থাকবে এবং অন্যদের সাথেও বেশি বেশি আলোচনা করবে।[৫]

(৩) যাকিয়্যা ও যাকেরা দুজনেরই দুটি চিঠি পেয়েছি। আমার মেয়েরা! তোমাদের জন্য সবসময় দু'আ করি। তবে লিখলে আরো বেশি মনে পড়ে, বেশি দু'আ আসে। মেয়েরা! দুনিয়ার চাকচিক্ক, ধনদৌলত ও নাম-শুহরত কোনো কিছুই কাজে আসবে না। কাজে আসবে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তার উপর (অথ্যাৎ কুর'আনের তিলাওয়াত ও তার উপর আমল, খুশু'-খুযূ'র সাথে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ, বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে)

---

১. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৫. প্রাগুক্ত।

> অটল থাকবে। এটাই সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাদেরকে এ সম্পদ দান করুন। আর বেশি কী লিখব? বেঁচে থাকো। খুশি থাকো। বিভিন্ন অযীফা পড়ে আমাদের জন্য এবং সকলের জন্য দু'আ অব্যহত রেখো।[১]

এমনিভাবে হযরত রায়পুরীও পরিবারের একজন সদস্যের মতো ছিলেন। প্রায় সব মেয়ের বিয়েতেই তিনি নতুন দামি লেপ হাদিয়া দিয়েছেন। কারো অসুস্থতার সংবাদ পেলে নিজে দেখতে চলে আসতেন। অথবা কখনো পত্র লিখে খোঁজখবর নিতেন।

মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী'র সম্পর্কও এরচেয়ে ব্যতিক্রম ছিলো না। সকলের বিয়ে তিনি নিজে পড়িয়েছেন।[২]

বিবাহ

ষোলো বছর বয়সে মাওলানা ইকরামুল হাসান সাহেবের পুত্র মাওলানা এনামুল হাসানের সাথে ৩ মুহার্‌রম ১৩৫৪ হিজরী (৭ এপ্রিল, ১৯৩৫ খ্রি. মুতাবেক) সনে সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী তাঁর বিবাহ পড়ান। বিয়ের প্রায় এক বছর পর ১২ রবী'উল আউয়াল, ১৩৫৫ হিজরী মুতাবেক ৩ জুন ১৯৩৬ খ্রি. তার রুখসতী হয়। রুখসতীর সময় মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা 'আশিক এলাহী মীরাঠীও উপস্থিত ছিলেন। রুখসতী'র পর ২০ রবি'উল আউয়াল ১৩৫৫ হিজরী সনে তিনি মাওলানা এনামুল হাসানের সাথে কান্ধালায় যান। তাঁর বিবাহ এবং যাকিয়্যার বিবাহ একই সময় একই মজলিসে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে যাকিয়্যার আলোচনায় গত হয়েছে।[৩]

হজ্জব্রত পালন

যাকিরা জীবনে একবার হজ্জব্রত পালন করেছেন। এ কাফেলায় পরিবারের অনেক মহিলা সদস্য ছিলেন। এমনকি সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী-এর পরিবার এবং মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা এনামুল হাসানও ছিলেন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী তাঁর ডায়রিতে এবং *তারীখুল কাবীর* গ্রন্থে এ সফর সম্পর্কে লিখেছেন–

> "আজ ১০ শাওয়াল ১৩৭৪ হিজরী মুতাবেক ২ জুন ১৯৫৫ খ্রি. সকাল সাতটায় আমি, ভাই একরাম, যুবায়ের তার মা খালাসহ এবং হাকীম ইলিয়াস তার স্ত্রী-পুত্রসহ সকলে দিল্লির পথে রওয়ানা হলাম। সেখান থেকে যোগ হলো, তালহা, তালহার মা ও বোনেরা, হারুন ও তার দাদি, মাওলানা এফতেখার, তার মা ও বোন, ওয়াসিম ও তার মা, হাকীম আইনুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা এনাম, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ ও আরো অনেকেই। সেখান থেকে ১৪ শাওয়াল সোমবার সন্ধ্যায় কাফেলা দেহরা এক্সপ্রেসে বোম্বায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। আর আমি দিল্লিতেই থেকে গেলাম।
>
> ওরা বোম্বাই পৌঁছে বুধবার সকাল সাড়ে ছয়টায়। সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী নিজের পরিবারসহ এ দেহরা এক্সপ্রেসেই মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটায় বোম্বায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আর আমি ১৭ শাওয়াল ভোর ছয়টার গাড়িতে সাহারানপুর ফিরে আসি। ২১ শাওয়াল সোমবার ভোর থেকেই মালপত্র জাহাজে উঠানো শুরু হয় এবং দশটার দিকে যাত্রীরাও উঠতে থাকে। বিকেল পাঁচটায় মোহাম্মদী জাহাজ সবাইকে নিয়ে হেজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ২৯ শাওয়াল মুতাবেক ২১ জুন এগারোটার বোম্বাইয়ে কারী মুঈদ টেলিগ্রাফ পান যে,

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২. প্রাগুক্ত।

৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ২৫৮

মুহাম্মাদী জাহাজ জেদ্দায় পৌঁছে গেছে। বুধবার বিকেল পাঁচটায় আমি ভাই আকরামের দেওয়া সকাল নয়টার একটি টেলিগ্রাফ পাই যে, আমরা সহিসালামতে জেদ্দাতে পৌঁছে গেছি। ২১ জুন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটায় তারা জেদ্দায় পৌঁছে। সেদিনই 'ঈশার পর কিছু পরিচিতজন একটি গাড়িতে করে সকলকে মক্কায় নিয়ে যায়।

হজ্জশেষে মাওলানা ইউসুফ সবাইকে নিয়ে ৪ সফর ১৩৭৫ হিজরী মুতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সকালে জেদ্দা থেকে রওয়ানা হয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ খ্রি. জুমার দিন সকালে বোম্বাই পৌঁছেন।"[১]

ইহধাম ত্যাগ

সায়্যিদা যাকিরা ইনতিকালের পূর্বে কয়েক বছর যাবত শ্বাসকষ্ট ও ডায়েবেটিক রোগে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েন। দিন দিন অসুস্থতা বাড়তে থাকে। এর উপর আবার উভয় চোখে অপারেশন হয়। এছাড়াও হাঁটু ব্যথা ছিল। চলাফেরায় বেশ অসুবিধা হতো। এক সময় একেবারেই বিছানাতে পড়ে গেলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যা-ও একটু উঠতেন তা-ও শুধু পাশেই রাখা নামাযের চকি পর্যন্ত। একসময় সেটুকু শক্তিও যখন আর অবশিষ্ট ছিলো না তখন চকির পরিবর্তে যেখানে শুতেন সেখানেই একটু আলাদা জায়গা করে দেওয়া হলো। সেখানেই নামায ও ওযায়েফ আদায় করতেন। তিনি সবসময় ফজরের নামাযের পর কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন এবং যোহরের পর *'হিসনেহাসীন'* পড়তেন। তাহাজ্জুদের পাবন্দি করতেন। ইনতিকালের নয়-দশ মাস পূর্বে অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয়ে যায়। সারা দিনই অচেতন ও নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতেন। এ অবস্থাতেই ৫ শা'বান ১৪০৮ হিজরী (২৩ মার্চ, ১৯৮৮ খ্রি. মুতাবেক) দিল্লির নিযামুদ্দীনে ইন্তিকাল করেন।[২]

সন্তান-সন্ততি

যাকিরা পাঁচ সন্তানের জননী ছিলেন।

(১) মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হাসান

(২) মুহাম্মাদ মুআযুল হাসান

(৩) খাওলা খাতুন

(৪) মাওলানা মুহাম্মাদ যোবায়েরুল হাসান

(৫) সাদেকা খাতুন

প্রথম সন্তান : মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হাসান

মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হাসান ২২ জুমাদল উলা, ১৩৫৮ হিজরী মুতাবেক ১১ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমের সাবেক নাযেম মাওলানা 'আবদুল লতিফ তাকে তাহনীক[৩] করান। জন্মের ২২ দিন পর ১৪ জুমাদাল উখরা ১৩৫৮ হিজরী মুতাবেক ১ আগস্ট ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলবার তার আকীকা হয়।

মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হাসান হায়াত পেয়েছিল মাত্র এক বছরের মতো। সে ইনতিকাল করেন ১৯ জুমাদাল উখরা ১৩৫৯ হিজরী মুতাবেক ২৬ জুলাই, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার রাতে। সে রাতেই নিযামুদ্দীনের কবরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।[৪]

---

১. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩. কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির চিবানো খাদ্য নবজাতকের মুখে দেওয়া।
৪. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

দ্বিতীয় সন্তান : মুহাম্মাদ মুআয়ুল হাসান

মুহাম্মাদ মুআয়ুল হাসান ৭ জুমাদাল উখরা ১৩৬২ হিজরী, মুতাবেক ১১ জুন, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ জুমাদাল উখরা মুতাবেক ১৭ জুন, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার তার 'আকীকা হয়। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী, মাওলানা একরামুল হাসান, মাওলানা ইউসুফ ও তার আম্মাসহ মাওলানা এনামুল হাসানও 'আকীকায় শরীক ছিলেন।

মুহাম্মাদ মুআয়ুল হাসানও ৭ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি ২৭ রজব, ১৩৬৯ হিজরী, মুতাবেক ১৬ মে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রোজ মঙ্গলবার রাতে কান্ধালায় ইনতিকাল করেন। তাকে হাজী শাহ্ কবরাস্তানে দাফন করা হয়।[১]

তৃতীয় সন্তান : খাওলা খাতুন

খাওলান খাতুন ২৮ রবী'উস সানী ১৩৬৭ হিজরী মুতাবেক ১০ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রোজ শনিবার কান্ধালায় হামীদ মনযিলে জন্মগ্রহণ করেন। খাওলা খাতুনও মাত্র চার বছর বয়সে ২১ রজব ১৩৭১ হিজরী সনে মুতাবেক ১৮ এপ্রিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। তাকে নিযামুদ্দীন কবরাস্তানে সমাহিত করা হয়।[২]

চতুর্থ সন্তান : মাওলানা মুহাম্মাদ যোবায়েরুল হাসান

মাওলানা মুহাম্মাদ যোবায়েরুল হাসান ১০ জুমাদাল উখরা, ১৩৬৯ হিজরী মুতাবেক ৩০ মার্চ, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৭৪ হিজরী সনে কুর'আন মাজীদ হিফয শুরু করেন। হিফ্য শেষে তিনি *কাফিয়া* পর্যন্ত বাড়িতেই বিভিন্ন উস্তাদের কাছে পড়েন। অতঃপর ১৩৮৫ হিজরী সনে *শরহেজামী'* জামাতে মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরে ভর্তি হয়ে ১৩৯০ হিজরী সনে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন।

দীর্ঘ আট বছর তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী'র সান্নিধ্যে থাকেন। ১৩৯৮ হিজরী সনে শায়খুল হাদীস তাকে খিলাফাত ও এজাযত প্রদান করেন। অতঃপর তিনি নিযামুদ্দীনে দাওয়াতে তাবলীগ ও ইলমী খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এখানে তিনি *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফে*র দরস প্রদান করতেন। তিনি পিতা এনামুল হাসান-এর ইনতিকালের পর থেকে তাবলীগের হাল ধরেন। বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতিমা'য় তিনি আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেছেন।

বিবাহ

২৫ শাওয়াল ১৩৮৮ হিজরী মুতাবেক ১৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রোজ বুধবার সাহারানপুরের মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ ইলিয়াসের কন্যা তাহেরা খাতুনকে বিবাহ করেন। তিনি তিন পুত্র সন্তান ও তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

তিন পুত্র সন্তান

(১) হাফেয মুহাম্মদ হাবীব

(২) মৌলভী মুহাম্মদ সুহায়ব

(৩) মৌলভী যুহায়রুল হাসান

তিন কন্যা সন্তান

(১) 'আসমা খাতুন

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

(২) হাফসা

(৩) 'আতিকা

ইনতিকাল

তিনি ১৮ মার্চ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন।

পঞ্চম সন্তান : সাদেকা খাতুন

সাদেকা খাতুন ১ রবীউস সানী ১৩৭২ হিজরী মুতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুর'আন মাজীদ ও অন্যান্য বিষয়ে ঘরেই তা'লীম গ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। তিনি দুই পুত্র সন্তান ও তিন কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন।

পুত্র সন্তান

(১) হাফেয মুহাম্মদ সালেহ

(২) মুহাম্মাদ ইয়াসীর

কন্যা সন্তান

(১) সিদ্দীকা খাতুন

(২) সাওদাহ

(৩) সায়মা খাতুন

সাদেকা খাতুনের ইনতিকাল সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র তৃতীয় কন্যা হলেন– শাকিরা

শায়খুল হাদীসের প্রথম সহধর্মিণীর তৃতীয় সন্তান শাকেরা। তিনি ১৩৪৫ হিজরীর সফর মাসে (আগস্ট মাসে ১৯২৬ খ্রি. মুতাবেক) জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মতো তিনিও পিতা-মাতার কাছে ঘরেই শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেন। তৎকালীন সময় ঘরের মেয়েদের শিক্ষাদনের যেসকল পদ্ধতি গ্রহণ করতেন তার মধ্যে একটি হলো চিঠিপত্র। মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাওলানা ইলিয়াস-এর একটি চিঠির নমুনা।

> "প্রিয় যাকিয়্যা, যাকিরা, শাকিরা, রাশিদা ও শাহিদা সকলকে দু'আ। আমি যে বিষয়টি সবসময়ই তাগিদ দিয়ে আসছি, অর্থাৎ "প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করা, নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামায পড়ে নেওয়ার একটি পরিবেশ ঘরে তৈরি করা। এছাড়াও কান্ধালায়, মুযাফ্‌ফর নগরে ও সাহারানপুরে তোমার সাথী-সঙ্গীরা ও পরিবারের সবাই কতটুকু 'আমল করছে তা আমাকে লিখে জানাবে।
>
> আমার এ চায় যে, আমি অধম নিজের দুর্বলতার কারণে নফসের নোংরামী থেকে বেঁচে থাকতে না পারলেও, অন্তত আমার পরিবার ও পরিচিতজনেরা যেন বেঁচে থাকতে পারে। সেজন্য সবাইকে তিনটি মূলকথা বলে রাখি–
>
> ১) ইবাদতের মধ্যে খুশুখুযূ ও একাগ্রতা তৈরি করা।
> ২) সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত নির্ধারিত দু'আ ও 'আমলসমূহ আদায় করা।
> ৩) আল্লাহ্‌র সামনে সত্যিকারার্থে একজন অভাবী ও নগন্য বান্দার মতো বিনয় ও আশা নিয়ে হাযির হওয়া এবং যে-দুনিয়া বাস্তবিকই ধ্বংসশীল ও মূল্যহীন তা থেকে মনকে সরিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকা।"

-বান্দা মুহাম্মাদ ইলিয়াস

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

বিবাহ

শাকিরা'র বিবাহ হয় বিশ বছর বয়সে। এ বংশেরই ছেলে মাওলানা আহমাদ হাসান-এর সাথে ১৯ জুমাদাল উলা ১৩৬৫ হিজরী (২২ এপ্রিল, ১৯৪৬ খ্রি. মুতাবেক) সনে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত মাদানী (রহ.) মহরে ফাতেমী নির্ধারণ করে তাদের বিবাহ পড়ান। এ বিয়েতে হযরত 'আবদুল কাদের রায়পুরী, হাফেয ফখরুদ্দীন দেহলভী, হাফেয মাকবুল দেহলভী, কারী সাইয়্যেদ রেযা হাসান, কারী দাউদ, মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা এনাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "শাকিরার স্বামী মাওলানা হাসান তখন দেওবন্দ মাদরাসায় পড়তো। আমি তার হাত মারফতই সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী'র খিদমতে একটি চিরকুট লিখলাম যে, "দুই মেয়ের বিয়ের চিন্তা করছি। আর আপনার যখন সাহারানপুর আসা হবে তখন পত্রবাহককেও সাথে নিয়ে আসবেন। সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী উত্তরে বললেন, আগামী পরশু লাখনৌ যাচ্ছি। সেখান থেকে চারটার গাড়িতে আসবো এবং 'আসরের পর বিয়ে পড়াবো।"

১৯ রবী'উল আওয়াল ১৩৬৫ হিজরী সনে মুতাবিক ২২ এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার মাওলানা হাসানকে নিয়ে মাওলানা মাদানী সাহারানপুর চলে আসেন এবং যথা সময়ে মাদরাসার পুরাতন মসজিদে বিয়ে পরানো হলো। মাগরিবের পর মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হলো। তেমন কাউকে দাওয়াত দিতে পারিনি। তবে সায়্যিদ মাদানী'র উসিলায় কিছু মেহমান এসেই পড়েন।

মহরে ফাতেমীর উপর বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরদিনই শাকিরা তার শ্বশুড়ালয়ে (কান্ধালায়) চলে যান। তাদের সাথে মাওলানা একরামুল হাসান ও মাওলানা এনামুল হাসান-কে বর-কনের সাথে প্রেরণ করেন।

শাকিরা'র বিয়ের আড়াই বছর পর ১২ জুমাদাল উখরা, ১৩৬৭ হিজরী, (২২ এপ্রিল ১৯৪৮ খ্রি. মুতাবেক) একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তিনি তালাকপ্রাপ্তা হন। এ বিষয়ে জামি'আ মাযাহিরে উলূমের মুফতিয়ানে কিরামের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তারা সবকিছু বিবেচনা করে এ তালাককে অনুমোদন দেন। তাদের দেওয়া এ ফতোয়া '*ফতোয়ায়ে মাহমূদীয়া*'য় ছাপা হয়। এ বিয়েতে তাদের কোনো সন্তান হয়নি।[১]

এ ঘটনার পর থেকে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে সবসময় জ্বর থাকত। তিনি সবসময় শয্যাশায়ী হয়ে থাকতেন। ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হয়। মাদানী (রহ.) তাবিয ও কিছু আমলও দেন। ১০ রজব, তাঁর ঔষধ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ পানিও তাঁর গলা দিয়ে নামছিল না। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১২ রজব, ১৩৬৯ হিজরী (১ মে, ১৯৫০ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ সোমবার, সকাল সাড়ে সাতটায় ইনতিকাল করেন।

হযরত শায়খুল হাদীস বলেন, হঠাৎ একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আমার কাছে সাহারানপুর এসেছিলেন। আমিও তাঁর সাথে বাড়ি চলে যাই। তখন শাকেরা ছিল মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বাড়ি এসেই মাওলানা ইউসুফ তাঁর সামনে যেতেই সূরা ইয়াসীন পড়াতে বলল। মাওলানা ইউসুফ সূরা ইয়াসীন পড়তে শুরু করেন। তিনি যখন سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ আয়াতে পৌঁছেন, তখন মাওলানা ইউসুফ তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন দেখতে পান। তিনি আয়াতটি পর পর তিনবার তিলাওয়াত করেন। তৃতীয় বার পড়ার মাঝামাঝিতে বললেন, "আমার মরহূমা মেয়ে শাকিরা রব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করে।" হযরত শায়খুল হাদীসের জিবদ্দশাতেই শাকিরা ছাড়া কন্যাগণ সকলেই

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.), হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, *আপবীতি* (ঢাকা: মাকতাবাতুত তুল্লাব, ২০১৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪

হজ্জ পালন করেন। হযরত শায়খুল হাদীস ১৩৬৯ হিজরী সনে শাকিরার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ আদায় করেন।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র চতুর্থ কন্যা হলেন– রাশিদা

শায়খুল হাদীসের প্রথম সহধর্মিণীর চতুর্থ সন্তান রাশিদা। তিনি ১৩৪৭ হিজরী (১৯২৮ খ্রি. মুতাবেক) সাহারানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে মাওলানা সাঈদুর রহমানের সাথে ১৯ রবিউছ্ ছানী, ১৩৬৫ হিজরী (২২ এপ্রিল, ১৯৪৬ খ্রি. মোতাবেক) সনে রোজ সোমবার সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী বিয়ে পড়ান।

শায়খুল হাদীস '*আপবীবী*'তে লিখেন, "মরহূম সাঈদুর রহমান মাযাহিরে উলূমে লেখাপড়া করত। বড়ই নেককার মানুষ ছিল। বলা যায় নামের বরকত পেয়েছিল। তার গুণাবলি লিখতে গেলে অনেক পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। ছোট বেলাই তার পিতার ইনতিকাল হয়ে যায়। পিতার ইনতিকালের পর একরকম আমি তাকে লাল-পালন করি। ছোট বেলা থেকেই সে ছিল অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির। আমি কখনই তাকে দুষ্টুমী করতে দেখিনি। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতের উচ্চস্থান দান করুন। আমীন।"

রাশিদা বিয়েতে ১২০ জন মেহমানকে আপ্যায়ন করেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিয়ের আঠারো মাস পর মাওলানা সাঈদুর রহমান ১৯ শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরী (১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন।[২]

দ্বিতীয় বিয়ে

শায়খুল হাদীসের বড় মেয়ে যাকিয়্যা'র ইনতিকালের প্রায় তিন বছর পর মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এ বিয়ে হযরত শায়খুল হাদীসের ইচ্ছায় হযরতের চতুর্থ মেয়ে রাশিদা'র সাথে ১৯ রবিউছ্ ছানী, ১৩৬৯ হিজরী (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ খ্রি. মুতাবেক) রোজ বুধবার মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফের সাথে বিবাহ দেন। এ বিয়েতে হযরত শাহ্ 'আবদুল কাদের রায়পুরী, হাফেয ফখরুদ্দীন, হাফেয মাকবুল হাসান দেহলভী ও মাওলানা এনামুল হাসানসহ কান্ধালার অনেক আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজন উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পর তাঁরা দিল্লির নিযামুদ্দীনে চলে যান। সেখানে তাঁরা দীনী দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন। রাশিদা মহিলাদের দু'আ, নামায, কুর'আন ইত্যাদি সবকিছুই শিক্ষা দিতেন। যোহরের নামাযের পর '*ফাযায়েলে আ'মাল*' ও *খাসায়েলে নববী*'র তা'লীম করতেন।

বিয়ের কয়েক বছর পর বিভিন্ন অসুস্থতায় কেটেছে। চোখে সানী রোগ হওয়ার কারণে কিতাব দেখে পড়তে পারতেন না। দীর্ঘদিন তা'লীম বন্ধ ছিল। ১৪ জুমাদাল উলা ১৩৭৫ হিজরী (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ খ্রি.) সনে রোজ শুক্রবার চোখের সানীর অপারেশন করা হয়। চোখ ভালো হলে পুনরায় মহিলাদের তা'লীম চালু হয়।

এর কিছুদিন পর রাশিদা'র উপর যাদুর প্রভাব দেখা দেয়। সাহারানপুরের কাযী জা'ফর আহমাদ তাঁর চিকিৎসা করেন এবং আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। যাদুর প্রভাব থেকে উঠতে না উঠতেই কলেরায় আক্রান্ত হন। দেখতে দেখতে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গলা দিয়ে রক্ত আসা শুরু হয়। হযরত ইউসুফ তখন সাহারানপুর ছিলেন, রাশিদা'র অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি দিল্লি চলে আসেন। চিকিৎসা করার পর তিনি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন।

অবশেষে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ-এর ইনতিকালের ৩২ বছর পর ১৩ মুহাররম ১৪১৭ হিজরী, (১ জুন, ১৯৯২ খ্রি. মুতাবেক) সনে ইনতিকাল করেন। মাওলানা যুবায়ের কান্ধলভী সেদিন মাগরিবের পর

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।

জানাযা নামাযের ইমামতি করেন এবং তাঁকে মারকাযের কবরস্তানে যেখানে পরিবারের অনেকেই শায়িত তাদের পাশেই দাফন করা হয়।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র চতুর্থ কন্যা হলেন–শাহিদা

শায়খুল হাদীসের প্রথম সহধর্মিণীর পঞ্চম সন্তান রাশিদা। তিনি ৯ যিলকদ ১৩৫২ হিজরী (১৯ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রি. মুতাবেক) সনে সাহারানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে ২০ রবিউছ ছানী ১৩৬৯ হিজরী (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ সোমবার হাকীম মুহাম্মাদ আইয়ূবের ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহারানপুরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী সেদিন খুবই জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। তারপরও তিনি মহরে ফাতেমীর উপর এ বিয়ে পড়ান। বিয়েতে মাওলানা 'আবদুল কাদের রায়পুরীও উপস্থিত ছিলেন।

সন্তান-সন্ততি

তিনি চার ছেলে তিনি কন্য সন্তানের জননী ছিলেন।

(১) মাওলানা মুহাম্মাদ শাহেদ

(২) মাওলানা হাফেয রাশেদ

(৩) মাওলানা মুহাম্মাদ সুহায়ল

(৪) মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ সাজিদ

এবং কন্যাগণ

(৫) তাহেরা খাতুন

(৬) সাজেদা খাতুন

(৭) যাহেদা খাতুন

তাহেরা খাতুনের বিয়ে হয় মাওলানা যুবায়ের হাসান কান্ধলভী'র সাথে। সাজেদার বিয়ে হয় মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ খালিদ সাহারানপুরী'র সাথে। যাহেদার বিয়ে হয় মাওলানা কারী মুহাম্মাদ আম্মার সাহারানপুরীর সাথে।[২]

রবিউল আওয়াল মাসে ১৩৫৮ হিজরীতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ তাঁকে দিল্লির প্রসিদ্ধ 'রাম মনোহর লোহিয়া' হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিন দিন ইমারজেন্সী বিভাগে রাখার পর আই.সি.ইউ-তে নেওয়া হয়। হাসপাতালে তাঁকে দেখার জন্য মাওলানা সায়্যিদ রাশেদ মাদানী, মাওলানা সায়্যিদ মাহমূদ মাদানী দেওবন্দ থেকে চলে আসেন।

অবশেষে ৬ জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী (২ মে, ২০০৯ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ শনিবার বিকেল চারটায় স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হন। সেদিন ইশার নামাযের পর দিল্লির মারকায নিযামুদ্দীনে মাওলানা ইফতেখারুল হাসানের নির্দেশে মাওলানা যুবায়ের হাসান জানাযার নামায পড়েন। মারকাযের কবরাস্তানে মাওলানা মুহাম্মাদ 'উমর পালনপুরী ও মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ বালয়াবীর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[৩]

১. মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহারানপুরী (মূল), মাওলানা মাসরূর বিন মানযূর অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র এক পুত্রসন্তান

মৌলভী মুহাম্মাদ তালহা

শায়খুল হাদীসের দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষের একমাত্র পুত্র সন্তান হলেন মৌলভী মুহাম্মাদ তালহা। তিনি ২ জুমাদাল উলা ১৩৬০ হিজরী (২৮ মে, ১৯৪১ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাইখের জীবদ্দশাতেই ১৬ রজব, ১৩৭৫ হিজরীতে মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের রায়পুরীর মাজলিসে হিফ্য শেষ করেন।

তিনি ২ জুমাদাল উলা, ১৩৭৬ হিজরী (৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রি. মুতাবেক) সনে সাহারানপুরে ফারসি শিক্ষার সূচনা হয়। ১ শা'বান, ১৩৭৬ হিজরীতে আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য দিল্লির নিযামুদ্দীনে গমন করেন। সেখানে আসাতিযায়ে কিরামগণের কাছে প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করে ১৩৮১ হিজরী সনে সাহারানপুর ফিরে আসেন এবং মাযাহিরুল উলূমে ভর্তি হয়ে *শরহে জামী*, *হিদায়া আউয়ালাইন*, *মাকামাতে হারীরি* ইত্যাদি কিতাব পড়েন। ১৩৮৩ হিজরী সনে কাশিফুল উলূম মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন। *বুখারী শরীফ* পড়েন মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেবের কাছে। *তহাভী শরীফ* পড়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের কাছে। *তিরমিযী* ও *মুসলিম শরীফ* পড়েছেন মাওলানা 'উবাইদুল্লাহ সাহেবের কাছে। *আবূ দাঊদ* পড়েন মাওলানা ইযহারুল হাসান সাহেবের কাছে।[১]

ইলমে দীন শিক্ষা অর্জন করে হযরত রায়পুরীর কাছে বায়'আত হন। অতঃপর ১৩৯৩ হিজরীর রবি'উল আউয়াল মাসে শায়খুল হাদীস তাঁকে খিলাফত দান করেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী'র ইনতিকালের পর তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি তাঁকে ১৪০২ হিজরী সনে শাওয়াল মাসে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শায়খুল হাদীস যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি পিতার খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।[২]

মাওলানা তালহা একবার শৈশবে তার সমবয়সীদের সাথে খেলা করছিলেন। তিনি খেলাচ্ছলে শিশুদের বায়'আত করাচ্ছিলেন। ঠিক এ মুহূর্তে হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) রিক্সা থেকে নেমে দেখেন মাওলানা তালহা শিশুদের বায়'আত করাচ্ছেন।

তখন হযরত মাদানী বলেন : আমাকেও বাই'আত করে নাও।

মাওলানা তালহা বলেন : জী, আসুন।

এভাবে তিনি মাদানী (রহ.)-কে বায়'আত করেন। তখন থেকেই সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী (রহ.) তাঁকে 'পীর সাহেব' নামে ডাকতেন।

ইনতিকাল : তিনি ১২ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার যোহরের পর ভারতের মিরাঠ আনন্দ হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি'উন।[৩]

---

১. মুহাম্মদ মাসউদ আযিযী নদবী, 'আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদীত, *মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলভী রহ. জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দাওয়াতী জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ধর্মীয় চিন্তাধারায় আপোষহীনতা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	রামাদান বরণের নমুনা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	দাওয়াতী কার্যক্রম ও সফর
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	অমিয় বাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় চিন্তাধারায় আপোষহীনতা

প্রথম পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় চিন্তাধারায় আপোষহীনতা

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর চরিত্রে ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তা এবং আপন পূর্বসূরি ও 'উলামায়ে হকের মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার গুণ দান করেছিলেন। এর কিছুটা ছিল তাঁর সহজাত এবং কিছুটা তাঁর বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এর ব্যতিক্রম বা অন্যথা তিনি কোনোক্রমেই বরদাশ্ত করতে পারতেন না। যখনই ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্ব ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র বা সংকট তিনি আঁচ করেছেন, তখনই তিনি অধীর ও ব্যথাতুর হয়েছেন। নিজে সে ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সে ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইংরেজ আমলে যখন প্রথমবার বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন প্রণীত হলো, তখন শায়খ সে সংকট আঁচ করতে পেরে "কুর'আন মাজীদ ও জাবরিয়া তা'লীম" তথা কুর'আন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ আইন প্রথমে দিল্লিতে কার্যকরী করা হয়। পুস্তিকাটি ১৩ই মুহার্‌রম ১৩৫০ হিজরীতে রচনা করা হয়। তাতে গ্রন্থকারের নামের পূর্বে 'মর্মাহত' শব্দটি লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন– যাতে তাঁর মর্মবেদনার কথাটি ব্যক্ত হয়েছিলো।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে (১৯৪৮-৪৯ খ্রি.) যখন পুনরায় সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হচ্ছিলো, তখন শায়খুল হাদীস পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি এ আইনের অন্তর্নিহিত সুদূরপ্রসারী বিষয়ের কথা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এ দীন লেখকের না'তে ৩রা জামাদিউস সানী, মুতাবেক ৬ই এপ্রিল, ১৯৪৯ খ্রি. তারিখে লিখিত চিঠিতে তিনি জানান–

روزافزوں احوال سے یہ فکر سوار رہتا ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان رہنا بھی چاہے گا، تو شاید رہ سکے، اوراس کا کوئی حل نہیں ملتا، آج کل مجھ پر جو چیز زیادہ مسلط ہے، وہ مکاتب کا مسئلہ ہے، ہر جگہ سے جبریہ تعلیم کے سلسلہ میں مکاتب کے بچوں پر لوگوں کا زور ہے، اوراس سلسلہ میں اگر کسی سے کچھ کہا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے کہا جائے؟ اور کیا کہا جائے؟ جن سے امیدیں وابستہ ہو سکتی تھیں، ان سے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بہترین لچھے دار، اور زوردار تقریر سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ مکاتب کا یہ سلسلہ محض اضاعت اوقات ہے، بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، قومی تعلیم بالخصوص ہندی پڑھنے کی دینی ضرورت اس درجہ بتائی جاتی ہے، تس درجہ کی سر سید کے خیال میں انگریزی کی بھی نہیں آئی ہوگی۔ واللہ المستعان

"পরিস্থিতির ক্রমাবনতির দরুন সব সময়ই চিন্তা হয়, কেউ মুসলমান থাকতে চাইলেও বুঝি থাকতে পারবে না। এর কোনো সমাধানও খুঁজে পাচ্ছি না। আজকাল আমার সবচাইতে দুর্ভাবনার কারণ হচ্ছে আমাদের মক্তবগুলো। সর্বত্রই বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য লোকে জোর দিচ্ছে মক্তবের শিশুদের উপর। এ ব্যাপারে যদি কিছু আলাপ করতে চাইও তবে কার সাথে আলাপ করবো, কী আলাপ করবো, কিছুরই কুলকিনারা করে উঠতে পারছি না। যাদের উপর এ ব্যাপারে আশা করা যেতে পারতো, তাদের সাথে যখন এ ব্যাপারে কথা বলি তখন তাঁরা বেশ জাঁকালো বক্তৃতা করে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, মক্তবের এ পদ্ধতিটা নিছক সময়ের অপচয়। শিশুদের মূল্যবান সময়ের এভাবে অপচয় করার কোনো মানেই হয় না। জাতীয় শিক্ষা বিশেষতঃ হিন্দী শিক্ষা ধর্মীয় প্রয়োজনেও এতটা জরুরি বলে তাঁরা বুঝাতে

> চেষ্টা করেন, স্যার সৈয়দ ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় এতটুকু কোনোদিন চিন্তা করেননি। আল্লাহ্ই সহায়।"[১]

অনুরূপভাবে তিনি তাওহীদ, ইত্তিবায়ে সুন্নত ও রদ্দে বিদ'আতের যে শিক্ষা ও উত্তরাধিকার তাঁর পূর্বসূরি পিতৃপুরুষ এবং উস্তাদ ও শায়খদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন, তার সমর্থন ও সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকতেন। দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক 'আলিম মুসলমানদের একত্রে সমাবেশ ও এদেশে বেঁচে থাকার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তাই তাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া উরুসের ও পুনর্জীবন দানকেও সমর্থন জানাতে থাকেন– যাতে করে মুসলমানরা পরস্পরে সাক্ষাৎ ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পান। এ সংবাদ পেয়ে শায়খুল হাদীস অত্যান্ত মর্মাহত হন। এক চিঠিতে তিনি লিখেন–

> الله کی شان، انقلابات زمانہ، اور اپنے اعمال بد کے ثمرات، دیوبندي جماعت تو عرس کے بند کرنے کی ہمیشہ ساعی رہی، اب وہ عرسوں کو فروغ دینے والے بن گئے، جس شخص کے بڑے نظام الدین کے عرس کے زمانہ میں بستی چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کا ناخلف یہ سوچتا ہے کہ اس موقعہ پر جایا جائے، تاکہ پاکستان سے آنے والے احباب سے جن کو عرس کے عنوان سے اجازت مل جاتی ہے، ملاقات ہوتائے۔

> "আল্লাহ্র শান, যুগের পরিবর্তন ও নিজেদের দুষ্কর্মের ফলই বলতে হবে যে, যে–দেওবন্দী জামা'আত সর্বদা উরুস বন্ধের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ তাঁরাই উরুসের উন্নতি বিধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁদের বাপ-দাদারা নিযামুদ্দীনের উরুসের সময় বস্তি ছেড়ে কায়েকদিনের জন্য বাইরে চলে যেতেন, তাঁরাই আজ মনে করেন উরুসের ওসিলায় পাকিস্তান থেকে আসার সুযোগ পাওয়া বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য উরুসই হচ্ছে একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ।"[২]

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে একবার শায়খুল হাদীসের নজরে পড়লো '*আল-জমিয়ত*' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনের উপর। তাতে শায়খুল হিন্দ পঞ্জিকার' ঘোষণা ছিলো। পত্রিকার একটি সংখ্যায় উক্ত পঞ্চিকার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখলেন: "পঞ্জিকার গুরুত্ব বর্ধিত করেছে সায়্যিদ মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী'র ছবি। গোটা পঞ্জিকার মূল্য ঐ এক ছবিতেই উঠে যায়।" তিনি এ ছবিটি দেখে একটি বারের জন্যও ভাবলেন না যে, *আল-জমিয়ত* পত্রিকাটি হচ্ছে 'উলামায়ে দেওবন্দের মুখপত্র এবং জমিয়তে 'উলামার নেতৃত্ব তাঁরই প্রিয় ও সম্মানিত বুযুর্গদের হাতে। তিনি এ বিষয়টি চিন্তা না করে সায়্যিদ মাদানীকে লিখিত একটি চিঠি পাঠান। তাতে লিখা ছিলো–

> ایک ضروري امر کی آپ کی اور مولانا منظور صاحب کی توجہ مبذول کرتا ہوں، شیخ الہند جنتري کے نام سے کوئی جنتري طبع ہوئی ہے، جس کو میں نے شب تک دیکھا نہیں، لیکن اس کا اشتہار جمعیت کے پرچوں میں، اور جمعیت نمبر میں طبع ہوا ہے، اگر اب تک نہ دیکھی ہو تو جمعیت نمبر میں اس کا

---

১. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, *শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া* (লাখনো: মাকতাবায়ে ইসলাম, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২০৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

اشتہار ملاحظہ فرماویں، اس کے متعلق اخبار الجمعیۃ ۱۹ اپریل ۳ صفحہ پر تبصرہ شائع ہوا ہے، اس میں حضرت مدنی زاد مجدہم کی تصویر کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا، کہ جنتري کی پوري قیمت صرف اس ایک تصویر سے وصول ہو جاتی ہے، یہ مشائخ وعلماء کے آرگن کے لئے نہایت نامناسب ہے، یہ حضرات تصویر کشی کی تقبیح نہ کریں تو کم از کم مدح سرائی تو نہ کریں، اس کے متعلق اگر آپ حضرات کے نزدیک نامناسب نہ ہو تو الفرقان اور تعمیر دونوں میں تنقید ضروري ہے۔

"একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আপনার ও মাওলানা মনযূর নু'মানী'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি। শায়খুল হিন্দ জন্তরী নামে একটি পঞ্জিকা বের হয়েছে– যা এখনো আমি দেখিনি। কিন্তু তার বিজ্ঞাপন জমিয়তের কাগজপত্রে বিশেষতঃ জমিয়ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। যদি এখনো না দেখে থাকেন, তবে জমিয়ত সংখ্যায় অবশ্যই তা' দেখে নেবেন। এ সম্পর্কে আল-জমিয়ত পত্রিকার ১৯শে এপ্রিল সংখ্যার আলোচনা করতে গিয়ে সায়্যিদ মাদানীর ছবির প্রশংসায় লিখিত হয়েছে– "এ কথা বললে এতটুকু আতিশয্য হবে না যে, উক্ত পঞ্জিকার মূল্য ঐ এক ছবিতেই উঠে যায়।" 'আলিম সমাজের মুখপত্রের জন্য এটা অত্যন্ত অশোভনীয়। এঁরা যদি ছবি অংকনকে নিন্দা করতে একান্তই অপারগ হন, তবে কমপক্ষে তার প্রশংসাকীর্তন থেকে বিরত থাকা উচিত। অসঙ্গত বিবেচনা না করলে আল-ফুরকান ও তা'মীর পত্রিকায় এর সমালোচনা হওয়া উচিত।" (২৭ জমাদিউস সানী, ৬৮হিজরী/১৯৪৯ খ্রি.)[১]

অনরূপভাবে শায়খুল হাদীস একবার শুনতে পেলেন যে, একজন শ্রদ্ধেয় দেওবন্দী 'আলিম ১২ই রবী'উল আউয়ালের এক মীরাদুন্নবী জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে শায়খুল হাদীস এক চিঠি লিখলেন–

ابھی چند روز ہوئے اخبار میں ۱۲ ربیع الاول میلادي جلسہ... کی شرکت کا وعدہ پڑھا، جب سے سوچ میں ہوں کہ جس چیز پر اکابر نے ایسے ایسے نم ٹھونکے وہ ایسی بن گئی کہ اخبار جمعیت تو گویا اس کے پروپیگنڈہ کے لئے وقف ہو گیا۔

"মাত্র কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে রবী'উল আওয়ালের মীলাদী জলসায়... অংশ গ্রহণের ওয়াদার খবরটি পড়লাম। সেই অবধি ভাবছি, যে ব্যাপারে আমাদের গুরুজনগণ এতই নাক সিটকালেন, আর আজ '*আল-জমিয়ত*" পত্রিকা স্বয়ং তারই প্রচারণার জন্য যেন ওয়াক্ফ্ হয়েই রয়েছে।"[২] (১১ই রবী'উল আউয়াল, ৭৪ হিজরী তারিখের চিঠি)

এ চেতনার ফলশ্রুতিতেই শায়খুল হাদীস আবুল হাসান 'আলী নদবীকে অত্যন্ত তাগিদের সাথে মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদের '*তাকভিয়াতুল ঈমান*'[৩] গ্রন্থের 'আরবী অনুবাদ করার আদেশ করেন। ১৩৯৩ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে আমি গ্রন্থটি 'আরবী করার ওয়াদা করি। কিন্তু তিনি তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না; বরং সে সময় আমার সফর সঙ্গী ছিলেন প্রিয়বর সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াযেহ নদবী।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৩. এ গ্রন্থটি উক্ত জামা'আতের দৃষ্টিভঙ্গির মুখপত্র স্বরূপ। নির্ভেজাল তাওহীদের এমন বলিষ্ঠ দাওয়াতের দৃষ্টান্ত বিরল।

শায়খুল হাদীস তাকেও বললেন যে, মদীনা থেকে ফেরার পূর্বেই যেনো গ্রন্থটির 'আরবী অনুবাদের কাজ শুরু করেই যাই। সে হিসেবে আমি ঠিক বিদায়ের দিন ২৯ অথবা ৩০শে জিলহজ্জ পূর্বাহ্নে হাজীদের পূর্ণ ভিড় ও যিকির, তাসবীহ ও দুরূদের শোরগোলের মধ্যে বাবে জিবরীল ও বাবে রহমতের মধ্যখানে বসে গ্রন্থটির ভূমিকার প্রথমাংশ লিখি এবং তৎক্ষণাৎই ওয়াযেহ নদবী বাবে 'উমরে উপবিষ্ট শায়খুল হাদীসকে গিয়ে তা শুনিয়ে দেন। শায়খুল হাদীস তাতে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অনেক্ষণ দু'আ করেন এবং এ কাজের অগ্রগতি দেখে মুবারকবাদ জানান। ১৩৯৪ হিজরীর শেষদিকে গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় পাদটীকাও সংযোজন করা হয়েছে। একটি দীর্ঘ ভূমিকা এবং লেখক-পরিচিতিও আমি তাতে সংযোজিত করি। গ্রন্থটি কলেবরে ৩৫৯ পৃষ্ঠা হয় এবং সাহারানপুরের কুতুবখানা ইশা'আতুল 'উলূম ১৩৯৪ হিজরীতে প্রকাশ করেন। মুদ্রিত হওয়ার পর শায়খুল হাদীস প্রচুর সংখ্যায় তা ক্রয় করে বন্ধুবান্ধব ও ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করেন।

ধর্মীয় মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রাখার এ প্রেরণাই তাঁকে মদীনা তায়্যিবার এমন একটি ব্যাপারে কলম ধারণে উদ্দীপ্ত করে–যা' একটা ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাধিটি হচ্ছে শ্মশ্রুমুণ্ডন। তিনি দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি 'আরবীতেও অনূদিত হয়ে 'আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। 'আরব-সমাজে এ গাফলতিটি ব্যাপকভাবেই শুরু হয়েছিলো।[১]

ধর্মীয় কাজে উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খুল হাদীসকে মহান হৃদয় ও দ্বীনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের মতো উদারতা দান করেছিলেন যে, দ্বীনের জন্য উপাদেয় যে কোনো কাজে তিনি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করতেন। তাবলীগী জামা'আত, কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী মাদরাসা (মাযাহিরুল 'উলূম, দারুল 'উলূম দেওবন্দ, নদওয়াতুল 'উলামা) সমূহের কথা ছাড়াও কোথাও কোনো দ্বীনী বা সংস্কারমূলক তৎপরতার কথা জানতে পারলে তিনি প্রাণ খুলে তার প্রশংসা করতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন।

১. সায়্যিদ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে মাহাত্ম্য দান ও মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন করেন, এমন কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য; বরং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, রূহানী কামালাত ও বাতেনী হালতসমূহ এবং আব্দ ও মা'বূদ তথা বান্দা ও আল্লাহ্র মুয়ামেলাতের খবর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না।

کراماکاتبین راہم خبر نیست

"কিরামান কাতিবীনও জানে না সে গোপন খবর।"[১]

তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও দূরদর্শিতা

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খুল হাদীসকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন তাঁর উচ্চতর ধী-শক্তি ও অনন্যসাধারণ মেধার কারণে। বড় বড় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁর সে উচ্চতর ধী-শক্তির প্রশংসা করতেন। কখনো কখনো মাওলানা 'আবদুল কাদির রায়পুরী বলতেন, আমাদের যেখানে শেষ সেখানে এই চাচা-ভাতিজার (মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা যাকারিয়া) যাত্রা শুরু হয়।

শায়খুল হাদীসের বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির একটি উদাহরণ হলো– তাবলীগ জামা'আতের আমীর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের ইনতিকালের পর একটি মহলের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কলিজার টুকরা দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মদ হারূনকে তাঁর দাদা ও আব্বার স্থলাবর্তী হিসেবে আমীর পদে মনোনীত করেননি; বরং মাওলানা ইনামুল হাসানকে আমীর হিসেবে মনোনয়ন করেছেন।

জ্ঞানবুদ্ধি, বয়স ও অভিজ্ঞতায় কেবল তিনিই পারতেন জামাআত ও তার কার্যধারার সঠিক পথনির্দেশ দিতে। শায়খুল হাদীসের এ মনোনয়নের বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছেন এবং দিল্লির কিছু উচ্চপদস্থ লোক শায়খের এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করারও চেষ্টা করেন, কিন্তু শায়খ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। পরবর্তীতে অভিজ্ঞতা এবং তাবলীগের বর্তমান বিশ্বজনীন প্রসার ও উন্নতি তাঁর সে মনোনয়নের নির্ভুলতাই প্রমাণ করে। এছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রেই শায়খুল হাদীসের নির্ভুল পথনির্দেশ, তীক্ষ্ণদর্শিতা ও দূরদর্শিতা তাবলীগ জামা'আতকে অনেক সঙ্কটজনক মুহূর্তে বিভিন্ন ফিতনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেছে।[২]

অতিথি পরায়ণতা

অতিথিপরায়ণতা যদিও সকল বুযুর্গান ও মাশায়েখেরই প্রতীকধর্মী গুণ এবং তাঁদের দস্তরখানসমূহের বিস্তৃতির কথা নিজ নিজ যুগে প্রবাদ বাক্যের মতোই প্রসিদ্ধ ছিল এবং স্বয়ং শায়খুল হাদীসের যুগেই বিভিন্ন খানকাহ ও ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহে সর্বদাই মেহমানের ভিড় লেগেই থাকতো, এতদসত্ত্বেও শায়খুল হাদীস বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"যে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত মেহমানের সম্মান এবং সমাদর করা।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৩. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৭৫, ৬১৩৫; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৫।

শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকূব মুজাদ্দেদী ভূপালী বলেন,

> "দুটি কাজ হলো বড় ইবাদত, একটি হলো বিবাহ, অন্যটি হলো মেহমানদারী। এদুটি বিষয়ে রূহ আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আহারের মাহাত্ম্য এবং তার ইবাদত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া এখনো ধরে রেখেছেন। একদিন দুপুরের ভোজনে আমি তাঁর মাজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সিলসিলা ও মাশায়েখের আত্মীয়তাবন্ধনের এক আত্মীয় আগন্তুক আহারের সময় কোনো একটি মামলা বা আদালতের রায়ের প্রসঙ্গ তুলতেই শায়খুল হাদীস বলেন, এখন খান তো, পরে ওসব শুনা যাবে খান।"[১]

শায়খুল হাদীসের দরবারে মেহমানের সংখ্যাধিক্য ও রকমারি খাবারই কেবল থাকতো না; বরং তিনি অতিথিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাঁদের প্রিয় খাবার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করাকেও জরুরি মনে করতেন। একবার এক মেহমান নাসিকারোগের জন্য গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি তিনি জানতে পেরে নিযামুদ্দীনের হোটেল মালিক বাবু আয়াযকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা শাক-শবজি দিয়ে কয় প্রকার রান্না করতে পারেন? তিনি জবাব দিলেন, দুই থেকে চার প্রকার রান্না করা যেতে পারে। তিনি ঘরে এসে তাঁর মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা শাক-শবজি দিয়ে কয় প্রকার রান্না করতে পারো? তারা বলল, আমরা আট থেকে প্রায় দশ প্রকার তরকারি রান্না করতে পারবো ইন্শাআল্লাহ্।

শায়খুল হাদীস মেহমানদের সাথে প্রত্যেককে পূর্ণ সময় সাহচর্য দিতেন এবং বাহ্যতঃ মনে হতো, সকলের সাথেই বুঝি তিনি খাচ্ছেন, কিন্তু একটু গভীরভাবে যারা শায়খুল হাদীসের দিকে খেয়াল করতেন, তারা বুঝতে পারতেন শায়খুল হাদীস আসলে খুব অল্পই আহার করতেন। দস্তরখানের একটি আদব ছিলো যে, যার সামনে যে আহার্য বা চায়ের পেয়ালা রাখা হতো তার জন্য তা অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেয়া চলতো না। কেননা, তাতে পরিবেশকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকতো। তারা ভাবতেন একজন বুঝি খেয়ে সেরেছেন, অথচ আসলে হয়তো তিনি তা অন্যজনকে দিয়েছেন, অথচ খাদেমরা তা হয়তঃ টেরও পাননি। এরূপ ক্ষেত্রে শায়খুল হাদীস বলতেন, এখানকার ব্যবস্থাপনা এখানকার লোকদের হাতে, আপনারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে চাইলে নিজ ঘরে গিয়ে তা করবেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শায়খুল হাদীসের এ কড়াকড়িই ছিলো যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় তাঁর এ কড়াকড়ি অনেক সময় আমিরানা মেজাজের লোকদের মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ হয়ে যেতো। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে শায়খুল হাদীস তাঁদের এ অসন্তুষ্টির পরোয়া করতেন না।[২]

গুরুজনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা

শায়খুল হাদীসের একটি অন্যতম গুণ ছিলো আপন সিল্সিলার মাশায়েখ ও মুরব্বীদের পূর্ণ আনুগত্য, তাঁদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসার এবং তাঁদের ইলমী ও দীনী ফয়েযসমূহকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার সযত্ন প্রচেষ্টা। এ যুগে এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তাঁর এ প্রেরণাই তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী *বুখারী শরীফের* যে তাকরীরগুলো তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁর সাথে একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা ও পাদটীকা জুড়ে দিয়ে *'লামিউদ্ দুরারী'* *لامع الدراري* নামে অত্যন্ত শানশাওকতের সাথে প্রকাশ করেন। আরব দেশসমূহে কিবাতটিকে পরিচিতি করার মানসে তিনি তাঁর শাগরেদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবীকে দিয়ে একটি পরিচিতি ও ভূমিকা লেখান।[৩]

অনুরূপভাবে মাওলানা গাঙ্গুহীর তিরমিযী শরীফের যে তাকরীরগুলো মাওলানা ইয়াহ্ইয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেগুলিকেও শায়খুল হাদীস *'আলকাওকাবুদ দুররী আলা-জামি'ইত্ তিরমিযী'* *الكوكب*

১. সায়্যিদ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

الدرري على جامع الترمذي নামে প্রকাশ করেন এবং এ কিতাবের ভূমিকাও মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবীকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *বাযলুল মাজহূদ* (*بذل المجهود*) ছাপার জন্য শায়খুল হাদীস এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিলো এ গ্রন্থটি না ছাপা পর্যন্ত তিনি কোনো মতেই স্বস্থি পাবেন না। যাঁরা এ কাজে শায়খুল হাদীসকে সহযোগিতা করতেন, তিনিও তাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হাতে দু'আ করতেন। এটা মুরব্বীদের প্রতি তাঁর প্রাণের টানেরই পরিচায়ক এবং শায়খুল হাদীসের উন্নতি ও মাকবুলিয়তেরও যে এটা একটা অন্যতম হেতু ছিলো, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুরুব্বীগণের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসার ছাড়াও তিনি তাঁদের জীবনী প্রণয়ন ও প্রচারেও পূর্ণ সচেষ্ট থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রিয়বর মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবীকে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর একটি জীবনী আধুনিক আঙ্গিকে রচনার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ তাওফীক দানও করেন তিনি *হায়াতে খলীল* নামক গ্রন্থটি ১৩৯৬ হিজরী ১৯৭৬ খ্রি. লিখে শেষ করেন। লেখক তা কিছু কিছু লিখে শায়খুল হাদীসের খেদমতে পাঠিয়ে দিতেন। শায়খুল হাদীস তাঁকে লিখেন–

> "বাদ সালাম মাসনূন। তোমার সংকলিত *হায়াতে খলীল*-এর পাণ্ডুলিপি মদীনা শরীফে পৌঁছে আনন্দ দান করে। আমি তা পড়িয়ে শুনে শুনে সেখান থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ শ্রমকে কবুল করে উভয় জাহানে তোমাকে তরক্কী দান করুন। মাশাআল্লাহ্! তুমি বেশ পরিশ্রম করে অনেক গবেষণা করে জীবন-বৃত্তান্ত সংকলিত করেছো।"[১]

শায়খুল হাদীস কেবল গুরুজনদের বেলায়ই নয়, যে কেউ তাঁকে কোনো কাজে একটু সাহায্য সহযোগিতা করতেন, বা তাঁর কোনো উপকারে আসতেন, তার প্রতিই তিনি এমনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করতেন যে, সে ব্যক্তি রীতিমত সঙ্কোচবোধ করতো। শায়খুল হাদীসের ৮৯ হিজরীর হিজায সফরের সময় তাঁর খাদেমদের ভিসা লাভের ব্যাপারে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী বলেন, অফিসারদের সাথে আমার পূর্বপরিচিতির সুবাদে আমি যৎসামান্য উপকার করার সৌভাগ্য অর্জন করি। উক্ত খাদেমদের সাহচর্য শায়খুল হাদীসের জন্য বেশ সহায়ক ও আরামদায়ক হয়। এজন্য তিনি হিজায থেকে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবীকে পত্র প্রেরণ করেন, মাওলানা আবুল হাসান আলী বলেন, পত্রটি পাঠ করলে এখনো লজ্জায় মাথা নত হতে হয়। তিনি তাতে লিখেন,

> اس میں نہ ذرا مبالغہ ہے، اور نہ ذرا تصنّع کہ اس مرتبہ حاضري کے بعد سے کثرت سے صلوۃ وسلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رفع مراتب ودرجات عالیہ کے لئے بہت ہی اہتمام سے اور بہت ہی کثرت سے دعائیں کرتا رہا، لکھتے ہوئے تو شرم آتی ہے لیکن اس مرتبہ کی حاضري کا سہرا صرف جناب کے سر ہے، اس لئے اگر اس حاضري میں اعمال حسنہ ہو گئی ہو تو انشاء اللہ اس کے ثواب میں آپ کی شرکت بغیر کہے ہے، احسان کے بدلہ میں دعائیں ہی کر سکتا تھا اور مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ الله. کی بناء پر آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیا

"মোটেও একটু বাড়িয়ে বা বানিয়ে লিখছি না যে, এবার মদীনায় হাজিরীর পর সালাত ও সালাম পেশ করার পর আপনার দর্জা বুলন্দ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর দু'আ করেছি। লিখতে তো সংকোচ বোধ করি, এবার কেবল আপনার জন্যেই হাজির হতে পেরেছি। তাই যদি তাতে কোনো নেকী হয়ে থাকে,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

তবে না বললেও তাতে আপনার একটা অংশ আছে। আপনার উপকারের প্রতিদানে আমি দু'আ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতাম? আর. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ "যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।" এ পবিত্র বাণী অনুসারে আপনার খেদমতেও তা আরজ করে দিলাম।"[১]

সকলের সাথে শায়খুল হাদীসের আচরণ এরূপই ছিলো। একবার তিনি বলেন, এবার হিজায গিয়ে হেরেম শরীফে বাল্যকালের পুরনো পুরনো লোকদের কথা স্মরণ করে দু'আ করবো ইনশাআল্লাহ্। কান্ধালায় থাকাবস্থায় তাঁর কাছে এক ভিক্ষুক আসতো। তিনি তার জন্যও দু'আ করেছেন। শায়খুল হাদীসের এই প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রীতিবাৎসাল্য দেখে সেই পুরনো বাক্যটিই মনে পড়ে গেল:

اولئك قوم لا يشقى بهم جليسهم

"এঁরা হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি, যাঁদের পার্শ্বে বসা লোকও কোনোদিন বঞ্চিত হয় না।"

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামাদান বরণের নমুনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামাদান বরণের নমুনা

রামাদানুল মুবারক হলো রহমত, বরকত ও তাজাল্লীর মাস, ইবাদত বন্দেগীর বসন্তকাল এবং আধ্যাত্মিকতার অভিষেক অনুষ্ঠান স্বরূপ। ইব্ন 'আব্বাস (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রামাদানুল মুবারকে পুণ্য কার্যাদিতে ঝঞ্জা বায়ুকেও ছাড়িয়ে যেতেন। আম্মাজান আয়শা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহা) বলেন, রামাদানের শেষ দশক উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণরাত জেগে কাটাতেন এবং ইবাদত-বন্দেগী নফল নামাযাদির জন্য কোমর কষে বাঁধতেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রেমিক ওলী-আল্লাহ্গণ এবং আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাগণের জন্যও এ মাসটি হচ্ছে মনের আশা পূরণের প্রিয়তম মাস। তাই এ মাসটির আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁরা সারা বছর ধরেই দিন গুণতে থাকেন। প্রাথমিক যুগের ওলীআল্লাহ্গণের কথা নয়, নিকট অতীতের কোনো কোনো বুযুর্গ সম্পর্কেও শুনা যায় যে, ঈদের চাঁদ দেখার পর থেকেই তাঁরা পরবর্তী রামাদানের অপেক্ষা শুরু করে দিতেন। রামাদানুল মুবারক আসতেই তাঁদের অন্তরে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হতো। তাদের হাবভাবে যে কথাটি ফুটে উঠতো–

هذا الذي كانت الايام تنتظر

فليوف لله اقوام بما نذروا

"এই সই শুভক্ষণ যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা ছিলো কো যাহার,

আল্লাহ্র নামে মানত যাদের সুবর্ণ সুযোগ তার করে নিক বিহিত তাহার।"[১]

আবার কখনো বা উতলা মনে গজলের কলি ভাজেন–

پلا ساقیا وہ مئے دل فروز

کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

"মন মাতানো শরাব আজি পিলও আমায় বন্ধু সাকী!

এমন ফুলের বসন্তকাল নিত্য কভু আসে নাকি?"

রামাদানুল মুবারক আসতেই দীনী ও রূহানী তথা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ ও খানকাসমূহের পরিবেশের পরিবর্তন সূচিত হতো। স্থায়ীভাবে এসব কেন্দ্রে বসবাসকারিগণ ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দগণ ঠিক তেমনি ছুটে আসতেন যেমন ছুটে আসে লোহা চুম্বকের টানে অথবা পতঙ্গ প্রদীপের পানে। এসব আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তিলাওয়াত ও নফল ইবাদত প্রভৃতি দ্বারা এমনিভাবে মুখর থাকতো যেন দিবারাত্রির মাঝে এছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আর এ রামাদানের পর আর কোনো রামাদান আসবে না। প্রত্যেকে অন্যদের উপর বাজীমাত করতে চাইতে এবং রামাদানের প্রতিটি দিনকে রামাদানেরই কেবল নয়, নিজের জীবনের অন্তিম দিন বলে মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাই কিছুক্ষণের জন্য এ পরিবেশে এসে পড়তো সে-ই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর কথা বে-মালুম হয়ে যেতো। মৃত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হতো, সাহসহারাগণ বুকে সাহস ফিরে পেতো, বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রাণে প্রাণে তরঙ্গায়িত হতো। আধ্যাত্মিকতার এ মহড়া স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য যাদেরই হতো, তাদের মন সাক্ষী দিতো যে, আল্লাহ্ প্রেমিকদের এ আধ্যাত্মিক সাধনা, আল্লাহ্কে পাওয়ার এ আকুতি, এ কর্মকোলাহল, দীন ও রূহগানিয়াতের পতঙ্গদের এহেন ভীড়, পার্থিব স্বার্থ ও ভোগ-বিলাস ভুলে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য এতো লোক যতদিন এভাবে সমবেত হতে থাকবে, ততদিন আর যাই হোক, পৃথিবী ধ্বংসের আর

১. সায়্যিদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

এর অধিবাসীদের জীবনের পাঠ চুকাবার ফায়সালা হতে পারে না। নিম্নে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়ার রামাদানের বসন্তকাল কিভাবে কাটাতেন তারই একটি নমুনা চিত্র তুলে ধরলাম।

শায়খুল হাদীসের রামাদানের 'আমল

রামাদান এলেই শায়খুল হাদীসের দৈনন্দিনের কর্মসূচি পালটে যেত। তিনি রামাদানের 'আমলকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। রামাদান আসার ছয় মাস পূর্ব থেকেই তিনি রামাদানের জন্য প্রতীক্ষা করতেন আর বলতেন, রামাদানের আর কত দিন বাকি আছে? আবার রামাদান চলে গেলেও তিনি অনুরূপ ব্যথিত হতেন।

রামাদান মাসে কুর'আন তিলাওয়াতের মা'মূল

শায়খুল হাদীস রামাদান মাসে প্রত্যহ এক খতম কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। ১৩৮০ হিজরী সন পর্যন্ত তাঁর এ 'আমল বহাল থাকে ; বরং তার পরেও কিছুদিন চালু ছিল। রামাদান মাসে শায়খুল হাদীস কারো সাথে মুলাকাত বা দেখা-শোনা একেবারেই কম করতেন। তিনি পূর্ণ রামাদানে পবিত্র কুর'আন ত্রিশ খতম করেন। কখনো যদি ২৯ রোযা হয়ে যায় এ চিন্তা করে তিনি প্রত্যহ একটু বেশিই তিলাওয়াত করে রাখতেন। পূর্ণ রামাদানই তিনি মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। শায়খুল হাদীসের সাথে অনেক ভক্তবৃন্দও পূর্ণ রামাদান মাস ই'তিকাফে বসতেন। অনেক সময় ডাকে চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হলে কাওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হত। তাই তিন-চার জন খাদেমকে ই'তিকাফের বাহিরে রাখতেন।

শায়খুল হাদীস রামাদান মাসে তিন জনের থেকে কুর'আন তিলাওয়াত শুনতেন। প্রথম দশকে মুফতী ইয়াহইয়া শোনাতেন। তারপরের দশকে হাফেয ফুরকান এরপর পরের দশকে মুফতী ইয়াহইয়া ছেলে মিয়াঁ সালমান।[১]

রামাদানের সময়সূচি

শায়খুল হাদীসের রামাদান বরণের নমুনা সম্পর্কে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী বলেন,

> "১৩৮৫ হিজরী (১৯৬৫-৬৬ খ্রি.) সনের রামাদান পালনের বিস্তারিত নির্ঘণ্ট একজন অষ্টপ্রহরের সাথী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আমি ছিলাম। মধ্য শা'বান থেকে ২৮ রামাদান পর্যন্ত যেসকল মেহমান বাইরে থেকে আসতেন এবং পূর্ণ রামাদান অথবা রামাদানের কিছু অংশ শায়খুল হাদীসের সাথে কাটিয়ে চলে যান জনৈক খাদেম তাঁদের একটি তালিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি করেছিলেন। তাতে ৩১৩ জন মেহমানের নাম আছে।
>
> শায়খুল হাদীসের রামাদানের সময়সূচি ছিলো এরূপ: লোকজন যখন সাহ্‌রী খাওয়ার জন্য উঠতো, শায়খুল হাদীস তখন নফল নামাযে মশগুল থাকতেন। একেবারে সাহ্‌রীর শেষ ওয়াক্তে দু'একটা ডিম খেতেন এবং এক কাপ চা পান করতেন। তারপর ফজরের জামা'আত পর্যন্ত বালিশে হেলান দিয়ে লোকজনের দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। মেহমানগণ তাঁর দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। ফজরের পর আরাম করতেন প্রায় নয়টা পর্যন্ত। তারপর প্রাত্যহিক কর্ম সেরে নফল নামাযে দুপুর পর্যন্ত মশগুল থাকতেন। তারপর ডাকে আসা চিঠিপত্র দেখতেন এবং কিছু জরুরি পত্রাদি লেখতেন যোহর পর্যন্ত। তারপর নামায পড়তেন। যুহরের নামায পড়েই আবার কুর'আন তিলাওয়াত শুরু করতেন তা আসর পর্যন্ত চলতো। মেহমানদের প্রতি কায়মনোবাক্যে যিকিরে মশগুল থাকার নির্দেশ ছিলো। আসরের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই চলতো। যাকেরীনগণ যিকিরে এবং অন্যান্যরা এভাবে কুর'আন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। আসরের নামাযের পর শায়খুল হাদীস নিজে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করে শুনাতেন। অধিকাংশ মেহমান হয় কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত শুনতেন নতুবা নিজেরাও তিলাওয়ত করতেন ইফতার পর্যন্ত। ইফতারের কয়েক মিনিট পূর্বেই

---

১. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী, হাফেয মাওলানা মুফতী শফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৭৭

তিলাওয়াত বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য মুরাকাবায় ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। মেহমানদের প্রতি তখন মসজিদের আঙিনায় ইফতারীর দস্তরখানে চলে যাওয়ার নির্দেশ থাকতো আর শায়খুল হাদীস পর্দার অন্তরালে একান্তই নিভৃতে থাকতেন। আযানের সাথে সাথে মদীনার খেজুর ও এক পিয়ালা যমযমের পানি দিয়ে ইফতার করতেন। তারপর ধ্যানমগ্ন হতেন বা ঠেস লাগিয়ে বসতেন। মাগরিবের নামাযের পর মেহমানদেরকে আহার করানো হতো আর আযানের আধঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নফল নামাযে লিপ্ত থাকতেন। এ সময় দু একটি ডিম খেতেন। তারপর এক পেয়ালা চা।

ইশার আযাপনের আধঘণ্টা পূর্বে পর্দা তুলে দেওয়া হতো। শায়খুল হাদীস ঠেস দিয়ে মেহমানদের দিকে মুখ করে বসতেন। সে এক অপূর্ভ দৃশ্য। এ সম য় নতুন আগন্তুকগণ দেখা করতেন। তারপর আযান হতেই যার যার প্রাকৃতিক কর্মাদি সেরে প্রথমে নফল তারপর ইশার ও তারাবীহ্র নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। এবার রামাদানে তিনভাগে কুরআন শুনেন। প্রথমে শুনান মুফতী ইয়াহ্ইয়া, তারপর হাফেয ফুরকান তারপর মুফতী ইয়াহ্ইয়ার পুত্র সালমান। তাঁরাও শায়খুল হাদীসের সাথে ই'তিকাফ করতেন।

রামাদানের শেষ দশক বা তারও কিছু পূর্বে কোনো কোনো ভক্তগণ বার বার মিষ্টি বা কাবা আনার দরুন তারাবীর পর এক দু'লোকমা শামী কাবাব বা মিষ্টান্ন খেতেন। কিন্তু অধিকাংশই মেহমানদের বিলিয়ে দিতেন। রামাদানের শুরুর দিকে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, তারাবীর পরে কিতাব পাঠ করা হবে। শায়খুল হাদীস নিজেই তা বলে দিয়েছিলেন। তাই তারাবীর পর কিতাব পড়া হতো। আর এসম চানা বা ফুলকি প্রবৃত্তি পরিবেশনের যে প্রথা পূর্ব থেকে চলে আসছিল, সময়ের অপচয় রোধের জন্য এবার তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিতাব পাঠ শেষে শায়খুল হাদীস বলতেন, মেহমানগণ! এবার যান, মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন! অধিকাংশ মেহমানই তখন কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত ও নফল নামায প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হতেন। শায়খুল হাদীস নিজেও আপন সাধনায় লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিছুক্ষণ পর পর অল্প সময়ের জন্য আরামও করতেন। কিন্তু তাও হাদীসে বর্ণিত–

تَنَامُ عَيْنِيْ وَلَا تَنَامُ قَلْبِيْ

"আমার চোখই কেবল ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না।"

কোনো কোনো সময় পাশেই অবস্থানরত আমাকে (সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী) উপরিউক্ত হাদীস বলতেন। তিনি এও বলতেন, তোমাদের কুর'আন তিলাওয়াত ও যিকিরের দ্বারা আমার আরামে কোনো বিঘ্ন হয় না।"[১]

পরবর্তী রামাদান (১৩৮৬ হিজরী) মাসের নির্ঘণ্ট অনেকটা অনুরূপই ছিলো। কোনো কোনো ব্যাপারে একটু পরিবর্তনও ছিলো বটে। মাওলানা মুনাওয়ার হুসায়ন বিহারী[২] তাঁর পত্রের বরাতে যে অবস্থার কথা বর্ণনা ছিলো তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাগুলো তুলে ধরলাম–

"২৯ শে শা'বান ফজরের নামাযের পূর্বেই মেহমানগণও ই'তিকাফকারীগণ বিছানা বিছিয়ে নিজ নিজ আসন দখল করতে শুরু করেন। ফজরের পর যারা গিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই তৃতীয় কাতারে জায়গা পেয়েছিলেন। শায়খুল হাদীস পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ২৯শে শা'বান আসরের পরেই ই'তিকাফ নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরিত হবে। তিনি তাই করলেন। সাথে সাথে নব্বই জনের অধিক এবং একশত থেকে তিনি অথবা চার জন মেহমানও নতুন ছাত্রাবাসের মসজিদে অবস্থান ও ই'তিকাফের নিয়তে পৌঁছে গেছেন।

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
২. তিনি ছিলেন শায়খুল হাদীসের খলীফাগণের অন্যতম একজন খলীফা।

মসজিদটি ছিলো বেশ প্রশস্ত। ভিতরেই ছিলো ছয়টি কাতার। কিন্তু মেহমানগণ ও তাঁদের সামানাপত্রে মসজিদটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো। যেসকল মেহমান রাতের বেলা অথবা পরের দিন সকালে বা তারপরে এসেছিলেন, তাঁদের সকলকেই মসজিদের বারান্দায় ই'তিকাফ করতে হয়েছিলো। এভাবে বারান্দায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো। এভাবে মসজিদের বারান্দা পূর্ণ হয়ে গেলে মসজিদের ভিতরে চাপাচাপি করে আরো কিছু মেহমানের জায়গা করে দেওয়া হলো। রামাদানের প্রথম দশক যেতে না যেতেই প্রত্যেক মেহমান মাত্র দেড় ফুট করে জায়গা পেলো। রামাদানের দ্বিতীয় দশকে মেহমানদের সংখ্যাধিক্যের জন্য মসজিদের খোলা আঙিনায় বিশাল প্যান্ডেল টানানো হলো। শেষ দশকে তাও লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। পূর্বেই মাদরাসার ছাত্রবাসের ছয়টি কামরা খালি করা হয়েছিলো। প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে এ কামরাগুলোতে গণ্যমান্য মেহমানগণকে চৌকির ব্যবস্থা করে তাঁদের রাখা হয়েছিলো। কিন্তু শেষ দশকে কেবল দু'টি কামরায় গণ্যমান্য মেহমানদেরকে রেখে বাকি চার কামরায় ঢালাও বিছানা করে সাধারণ মেহমানদের জায়গা করে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সকল কামরাতেই ঢালাও বিছানা করে দিতে হয়। ২৩ থেকে ২৮ রামাদান পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশ' মেহমান দস্তরখানে হাযির হয়েছেন।

এ বছর তাবলীগী জামাআতের উলামা-মাশায়েখ, মুদাররিসীন ও আহলে 'ইলমগণ প্রচুর সংখ্যায় এসেছেন। বিশেষ করে গুজরাট, বোম্বাই ও পালনপুরের মেহমানদের সংখ্যা ছিলো চোখে পড়ার মতো। এমনিতে সাধারণভাবে ইউপির মেহমানদের সংখ্যা ছিলো বেশি। আফ্রিকা, আন্দামান, মহীশূর, মাদ্রাজ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামেরও অনেক মেহমান ছিলেন। এ বছর শায়খুল হাদীস অনেককে খেলাফত প্রদান করেন।

যোহর থেকে আসর পর্যন্ত শায়খুল হাদীস কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। মেহমানগণ তখন যিকিরে মশগুল থাকতেন। আসর পর্যন্ত অধিকাংশ মেহমান সশব্দ যিকিরে এবং কেউ কেউ নিঃশব্দে যিকিরে বা মুরাকাবা এবং কিছু সংখ্যক কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। কথাবার্তা বলা ছিলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আমভাবে এ মর্মে হিদায়েত দেওয়া ছিলো যে, আমার এখানে যদি আস, তবে গল্পগুজবে লিপ্ত হওয়া যাবে না। শুয়ে থাকো অথবা চুপ থাকো তাতে কোনো আপত্তি নেই। আসরের পর কিতাবাদি পড়ে শুনানো হতো। *ইমদাদুস সুলূক*, আল্লামা সুয়ূতীর একখানা রিসালা, অপর একখানা রিসালা, তারপর *ইতমামুন নি'আম* তরজমা *তাবভীবুল হিকাম*, তারপর *ইকমালুশ শিয়াম শরহে ইতমামুন নি'আম* প্রভৃতি সুলূক বা আধ্যাত্মিক পাঠ্য কিতাবাদি পূর্ণ রামাদান মাস পড়ে শুনানো হয়। ইফতারের পনেরো মিনিট পূর্বে কিতাব শুনানো বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং শায়খ পর্দার অন্তরালে মুরাকাবায় নিমগ্ন হতেন। মাদীনার খেজুর ও যমযম দিয়ে ইফতার করতেন। কিছু খাওয়ার অভ্যাস ছিলো না। তারপর আবার ধ্যানমগ্ন হতেন। মাগরিবের নামাযের পর প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নফল নামাযে মগ্ন থাকতেন। এরপর দু'টি ডিমের কুসুম খেয়ে এক পেয়ালা চা পান করতেন।

তারপর পর্দা তুলে দেওয়া হতো। সোয়া সাতটার দিকে আম মজলিস শুরু হয়ে যেতো। নবাগতদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং কতদিন পর্যন্ত মেহমান থাকবেন, তা জিজ্ঞাসা করতেন। কোথায় মেহমান অবস্থান করবেন তা বলে দিতেন। তারপর আটটা পর্যন্ত বুযুর্গানের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। এ সময় বায়আতও করতেন। আযান হওয়ার সাথে সাথে ইশার নামাযের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো। তিনি নিজেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সেরে নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন।

তারাবীর নামাযের পর সূরা ইয়াসীনের খতম হতো এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আয় রত থাকতেন। তাবলীগী জামাআতের বিশিষ্ট 'আলিমদের কেউ থাকলে তাঁকেই মুনাজাত পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিতেন। এভাবে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কিতাব পড়ে শুনানোর

সিলসিলা চালু থাকতো। তাবলীগী কারগুজারী (কাজের রিপোর্ট)ও এ সময় শুনানো হতো। এ কিতাবী মজলিস শেষে রাত বারোটার দিকে পর্দা ফেলে দেওয়া হতো।

একেবারে কিছু না খেয়ে থাকলে পিপাসা বেশি হতো, আবার পানি বেশি পান করলে পেটে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রামাদানের পরেও বেশি কিছুদিন পর্যন্ত কিছু খেতে পারতেন না। এজন্য বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্টজনের অনুরোধে ইফতারীর সিলসিলা শুরু করা হয়। শায়খুল হাদীস কিছু ফলমূল খেয়ে নিতেন। পৌনে একটা পর্যন্ত বিশেষ মজলিস চলতো। মুরাকাবার মতো বসে থাকতেন। একটার পর শুয়ে যেতেন। চারটার সময় ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি সেরে নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। সুবহে সাদিকের আধঘণ্টা পূর্বে দুধ ও এক পেয়ালা চা পান করতেন। তারপর নফল নামাযে লিপ্ত হতেন এবং আযান পর্যন্ত এভাবেই নামাযের মধ্যে কাটতো।"[১]

১৩৯৫ হিজরীর রামাদানের সময়সূচি শায়খুল হাদীসের স্বহস্তে লিখিত, *আপবীতী* থেকে উদ্ধৃত করছি। শায়খুল হাদীস বলেন–

"মাগরিবের পর আওয়াবীন নামাযে দুই পারা কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করা। তারপর চা পান করা। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা। সাড়ে আটটা'র মধ্যে মাজলিস শুরু এ মাজলিসে বাই'আত ও নসীহত করতেন। 'ইশার নামায নয়টা থেকে সাড়ে দশটা। তারপর খতমে ইয়াসীন ও দু'আ। রাত এগারোটা পর্যন্ত ফাযায়েলে রামাদান তা'লীম হয়। বারোটার মধ্যে বিদায়ী মুসাফা শেষ করে দরজা বন্ধ করে দিতেন। আবার রাত তিনটার সময় দরজা খুলে দিতেন এবং সাহরীর ইনতেযাম করতেন। অতঃপর তাহাজ্জুদ নামাযে দুই পারা কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। ফজরের নামাযের পর বিশ্রাম নিতেন নয়টা পর্যন্ত। তারপর দেখে দেখে দুই পারা কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। বেলা এগারোটার পর বিবিধ 'আমল। যোহর নামাযের পরে খতমে খাজেগান ও যিক্‌র এবং দুই পারা কুর'আন মাজীদ শোনানো হত। বাদ 'আসর ইরশাদ ও ইকমাল।"[২]

১৩৮৫ হিজরী থেকে শায়খুল হাদীস নতুন ছাত্রবাসের মসজিদে রামাদান পালন শুরু করেন। প্রতি বছরই সমাবেশ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৩৮৫ হিজরীতে চল্লিশ জন ই'তিকাফকারী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা দু'শোতে উন্নীত হয়। ১৩৮৬ হিজরী সনে ই'তিকাফকারীর সংখ্যা দু'শো থেকে শুরু হয়। ১৩৮৭ হিজরীতে তাঁবু টানানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়াও ছাত্র খালি কক্ষগুলোতে মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ১৩৯৪ হিজরীর রামাদান কাটে সাহারানপুরে। নতুন ছাত্রবাসের মসজিদ তখন দোতলা হয়ে গেছে। রামাদানের শুরুতে ৮/৯ শ' জনের মতো মেহমান ছিলেন। রামাদানের শেষ তারিখে মাওলানা নাসিরুদ্দীন বলেন, আজ মেহমানের সংখ্য প্রায় ১৮শ'। প্রথম দশকের শেষদিকেই মেহমানের সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়িয়েছিলো। ২৭/২৮ রামাদান পর্যন্ত মেহমানের সংখ্যা দুই হজারে উঠেছিলো।[৩]

সাহারানপুরে রামাদান অতিবাহিত করার সময় শায়খুল হাদীসের সাথে অবস্থানকারিগণ যদিও পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াত, নফল ইবাদত ও রামাদানের বিশেষ আমলসমূহে নিবিষ্ট থাকতেন (খুব কমই তার ব্যতিক্রম হতো) তবুও শায়খুল হাদীস বারংবার বলতেন, সাথীদের যার যত ইচ্ছা খেয়ে শুইতে পারেন। কিন্তু কেউ গল্পগুজবে মত্ত থাকতে পারবেন না। কেননা, এর চাইতে বেশি ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। এত কড়া নির্দেশ থাকা সত্বেও শায়খুল হাদীস রামাদানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে বলে নিশ্চিত হতে পারছেন না।[৪]

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৪. প্রাগুক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাওয়াতী কার্যক্রম ও সফর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাওয়াতী কার্যক্রম ও সফর

ইংল্যান্ডের সফর

শায়খুল হাদীস দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ডে দুই বার সফর করেছেন। প্রথম বার ১৩৯৯ হিজরী (১৯৭৯ খ্রি. মুতাবেক)। দ্বিতীয় সফর ১৪০২ হিজরী (১৯৮১ খ্রি. মুতাবেক)-তে সফর করেন।

১৩৯৯ হিজরীতে শায়খুল হাদীসের ইজাযতপ্রাপ্ত খলীফা মৌলভী ইউসুফ মাতালা'র আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে প্রথম সফর করেন। মৌলভী ইউসুফ ও তাঁর ভাই মৌলভী আবদুর রহীম মাতালা[১] কয়েক বছর আগে লন্ডনের লংকাশায়েরস্থ হলকম্ববারী-তে 'দারুল উলূম হলকম্ববারী' নামে একটি দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি গোটা বৃটেনে সবচেয়ে বড় আরবী মাদরাসা এবং তারবিয়াতী ও দাওয়াতী মারকাযে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বোল্টনের শহুরে জনপদ থেকে প্রায় আট থেকে দশ মাইল দূরে হলকম্ব হিল নামক পাহাড়ে অবস্থিত। আসলে এটা ছিল একটি সিনোটোরিয়াম, কোনো কারণে তা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। একে ১৯৭৩ খ্রি. এক লাখ পনেরো হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে দারুল উলূমের জন্য ক্রয় করা হয়।

শায়খুল হাদীস ২৪ জুন ১৯৭৯ খ্রি. বেলা সাড়ে দশটায় ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে দূরদূরান্ত থেকে শত শত লোক তাঁকে এক নজর দেখার জন্য এসে জমা হয়। বিমানবন্দরে আগত সকলেই দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শায়খুল হাদীসকে অভ্যর্থনা জানান এবং কামরায় পৌঁছে 'ইশার নামাযের পর থেকে এক ঘণ্টা সকলের সাথে মুসাফাহা করেন। রাত একটা ত্রিশ মিনিটে তিনি বিশ্রামের জন্য বিছানায় চলে যান এবং ভোর চারটায় উঠে ফজরের নামায আদায় করেন। ইংল্যান্ড সফরের সময়সূচি–

ফজরের নামাযের পর যিক্র ও অযীফা, সকাল সাড়ে আটটায় নাশ্‌তা, সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত শায়খুল হাদীসের রচিত তাসাওউফ ও তাযকিয়া সম্পর্কিত কোনো কিতাব থেকে তা'লীম। সাড়ে তিনটায় যোহরের নামায। নামাযের পর খতমে খাজেগান ও সম্মিলিত দু'আ। তারপর যাকিরীনের সশব্দ যিকির এবং অন্যদের কাজ দরূদ, ইসতিগ্‌ফার ও তাসবীর-তাহলীলে মগ্ন থাকা। সন্ধ্যা ছয়টায় চা পর্ব। সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা এক ঘণ্টা মাওলানা মুফতী মাহ্‌মূদ হাসান গাংগুহীর বয়ান। আটটার সময় আসরের নামায। নামাযের পর বিকালের আহার। পৌনে দশটায় মাগরিবের নামায এবং নামাযের স্ব স্ব স্থানে বসেই এক ঘণ্টা শায়খুল হাদীসের আম মাজলিস। অতঃপর সাড়ে এগারোটায় 'ইশার নামায।

বিকাল ছয়টা থেকে আশপাশের লোকজন তাদের দোকানপাট, অফিস ও কারখানা ইত্যাদি কর্মব্যস্ততা থেকে ফারেগ হয়ে অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছাসের সাথে মাদরাসায় পৌঁছে যেত। তখনও মাদরাসায় কয়েক হাজার লোকের সমাগম। শায়খুল হাদীস সকলকে একই নসীহত করতেন যে, আমাকে দেখার জন্য এসে কোনো লাভ নেই। বরং 'আমল করলে তোমাদের ফায়দা হবে। তোমরা কমপক্ষে প্রত্যেকে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং সকলেই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করে দিল ও যবানকে বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশ্‌গুল রাখ।

যারা শায়খুল হাদীসের হাতে হাত রেখে বাই'আতের জন্য এসেছে তাদেরকে এক হাজারবার দরূদ পূর্ণ হওয়ার পরই বাই'আত গ্রহণ করতেন। এ বাই'আতে 'ইমান নবায়ন, গুনাহখাতা থেকে তওবা, ভবিষ্যতের আনুগত্য ও সত্যবাদিতার ওয়াদা-অঙ্গীকার (ইত্যাদি) সম্বলিত বাক্যমালা নিজের যবানে বলতেন এবং মালিক 'আবদুল হাফীয মাইকে তা পুনরাবৃত্তি করে শুনিয়ে দিতেন।

শায়খুল হাদীস ইংল্যন্ডে প্রায় বারো দিন ছিলেন। বারো দিনের মধ্যে এগারো দিনই মাদরাসায় অবস্থান করেছেন। মাত্র একদিন বৃটেনের তাবলীগের মারকায ডিউজবারীতে যান। মারকাযে যাওয়ার পথে কায়েক মাইল পূর্বে বাটলী ১ জুলাই ১৯৭৯ খ্রি. রবিবার বারোটায় পৌঁছেন সেখানে হযরতের নামেই 'যাকারিয়া মসজিদে' অবস্থান করেন। যোহরের পূর্বে মুফতী মাহ্‌মূদ হাসান বয়ান করেন পরে শায়খুল হাদীসের কাছে মহিলারা বাই'আত গ্রহণ করেন। দুপুরের আহারও এখানে সম্পন্ন করেন।

---

১. তাঁদের দুই ভাইয়ের প্রতি শায়খুল হাদীসের বিশেষ সুদৃষ্টি ছিল। তাঁরা দু'জনই হযরতের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান খাদিম ছিলেন।

অতঃপর ৫ জুলাই ১৯৭৯ খ্রি. সকাল নয়টায় ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে সকাল দশটায় লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এখান থেকে ইয়ার ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দিল্লি পৌঁছেন।[১]

রামাদান মাসে সাউথ আফ্রিকায়

শায়খুল হাদীস ৮৬ বছর বয়সে সাউথ আফ্রিকায় সফর করেন। সেসময় রোগে-শোকে, দুর্বলতায় জরাজীর্ণ। নড়াচড়া তো দূরের কথা, নিজে নিজে পার্শ্ব পরিবর্তন করাও অসম্ভব ছিল। এ অবস্থায় শায়খুল হাদীসের দক্ষিণ আফ্রিকায় সফর করা আল্লাহ্ তা'আলার কারিশমা ও হযরতের কারামত ছাড়া আর কিছুই না। দক্ষিণ আফ্রিকা হলো ইসলামী ও পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরোধী একটি দেশ। সেখানে হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত লক্ষ লক্ষ তাওহীদী সন্তান বসবাস করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শায়খুল হাদীসের সফর আর তৃষ্ণার্তদের কাছে কুয়া পাঠানো একই কথা।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) তাঁর এক খাদেমের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন।

> "অনেক সুসংবাদ ও সুস্বপ্নের ভিত্তিতে এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় রামাদান কাটানোর জন্য দোস্ত-আহবাবের পক্ষ থেকে জোরালো আবেদন করা হয়। ওজর, দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও রোগব্যাধির কারণে ওয়াদা করার সাহস হচ্ছে না; কিন্তু সুসংবাদ ও সুস্বপ্নের আধিক্যের কারণে সাহস করে ফেলেছি।"

সাউথ আফ্রিকার সফরের আহ্বায়ক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন মৌলভী ইউসুফ তাতলা'। শায়খুল হাদীস তাকে কিছু শর্ত-শরায়েত আরোপ করেন। তন্মধ্যে–

(ক) আমার ও আমার সাথী-সঙ্গীদের ভাড়ার দায়িত্ব আমার যিম্মায় থাকবে।

(খ) যারা নিয়মিত হাদিয়া-তোহফা পাঠিয়ে থাকেন, তারা ব্যতীত অন্যদের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) খাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা কৃত্রিমতা করা যাবে না। খুব সাদাসিধা এক দুই প্রকারের খাবারেই যথেষ্ঠ থাকতে হবে।

(ঘ) কেউ যেন এক বা দুই দিনের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার কল্পনাও না করে।

কেননা আসা-যাওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে ; আল্লাহ্‌র রহমত ও মদদে আমি সাউথ আফ্রিকা সফরের ইচ্ছা করেছি। সকল যাকিরীনদের একত্রিত করবে, যারা গুরুত্বের সাথে যিক্‌র করে। সফর চলাকালীন সময় অনেকেই সফরের ভাড়া ও অন্যান্য খরচে অংশগ্রহণ করতে চায়। কিন্তু শায়খুল হাদীস তা না-মঞ্জুর করেন। হযরতের যেই কথা সেই কাজ। তিনি নিজের পকেট থেকে নিজের ও খাদেমদের ভাড়া বহন করেন। পাকিস্তানী মুদ্রায় এ খরচের পরিমাণ হলো– দুই লাখ রুপি।

ইসলামিক সেন্টার রি-ইউনিয়নের ডিরেক্টর মাওলানা সাঈদ আঙ্গারের প্রস্তাবে স্টেংগার যাওয়ার পথে রি-ইউনিয়নের সফর মঞ্জুর করেন।

শায়খুল হাদীস মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৪ শা'বান, ১৪০১ হিজরী, (৬ জুন, ১৯৮১ খ্রি.) রোজ শনিবার রওয়ানা হন। মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে উমরা সম্পন্ন করেন। সেখানে প্রায় দশ দিন অবস্থান করে ১৪ শা'বান, ১৪০১ হিজরী (১৬ জুন, ১৯৮১ খ্রি. মুতাবেক) জিদ্দা থেকে রি-ইউনিয়ন পৌঁছেই রামাদানের আমল চালু করে দেন। সেখানে চার দিন অবস্থান করে ২০ জুন, ১৯৮১ খ্রি. রোজ শনিবার সকালে সেন্ট ডেনিস থেকে সেন্টপিয়ার গমন করেন। পরের দিন ২১ জুন, ডারবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানের লোকজন পূর্বেই নিজেদের দাড়ি রাখা আরম্ভ করেন। ২৯ শা'বান ১৪০১ হিজরী সনে সমস্ত মেহমানদের সাথে নিয়ে স্টেংগার জামে মসজিদে চলে যান এবং এখানেই পূর্ণ রামাদান ই'তিকাফ করেন।

সেসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচণ্ড শীত ছিল। স্টেংগার জামে মসজিদটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। উপর তলায় প্রায় বারোশ লোক এবং নিচ তলায় প্রায় এক হাজার লোকের সমাগম হয়। সেখানে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট পরিমাণ। চারদিকে গাড়ি রাখার প্রশস্ত জায়গা আছে। গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থাও আছে। এ কারণেই এ মসজিদকে নির্বাচন করা হয়।

---

১. *আল-ফুরকান*, রামাদানুল মুবারক সংখ্যা, ১৩৯৯ হিজরী, (আগস্ট, সংখ্যা, ১৯৭৯ খ্রি., মুতাবেক), প্রকাশিত, মৌলভী আতীকুর রহমান সম্ভলীর প্রবন্ধ।

এক বর্ণনানুসারে শনি ও রবিবার দিন সেখানে ছয় থেকে সাত হাজার লোকের সমাগম হয়। জায়গার সংকুলান না হওয়ায় তিনদিকে চারটি তাঁবু খাটানো হয়। এ মাজমা' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়ারলেস সেট করতে হয়। মসজিদের পাশে একটি অস্থায়ী ইনফরমেশন সেন্টার (তথ্যকেন্দ্র) স্থাপন করা হয়। মেহমানদের খেদমতের জন্য একশ' সদস্যবিশিষ্ট একটি জামাত নির্দিষ্ট করা হয়- পঞ্চাশ জন সাহরীর জন্য আর বাকী পঞ্চাশ জন ইফ্তারের জন্য।

রামাদানের শুরুর দিকে ই'তিকাফকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় হাজারের মতো। শেষের দিকে হাজার ছাড়িয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন বেশিরভাগ মসজিদের নিচ তলায় ই'তিকাফ করতেন এবং বহিরাগতরা ই'তিকাফ করতেন উপরতলায়। শায়খুল হাদীসের যিয়ারতের জন্য আগত ব্যক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এমন কি তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পরিণত হয়। বিশেষত শনি ও রবিবারের কথা তো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রামাদানের কর্মসূচি–

ফজর নামাযের পরে অনেকেই আবার ইশরাকের পরে শুয়ে পড়তেন। কিছু কিছু লোক কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। বাদ যোহর খতমে খাজেগাঁ। তারপর যিক্‌রের মাজলিস। আসরের পর ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত কিতাবী তা'লীম। তারপর ইফতার। মাগরিবের পর নফল। তারপর খাবারের সময় দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বাই'আতের মাজলিস। তারপর তারাবীর প্রস্তুতি। তারাবীর পর খতমে ইয়াসীন ও দু'আ। আর ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পাঠ।

অতঃপর শায়খুল হাদীস আগন্তুকদের সাথে সালাম মুসাফাসা করতেন। এতে প্রায় এক ঘণ্টার উপরে সময় লেগে যেত। অনেকেই রাতে নফল ইবাদত ও তিলাওয়াতের মধ্যেই জাগ্রত থাকতেন। এরই মধ্যে সাহরীর সময় হয়ে যেত। সাহরী খেয়ে তাসবীহ ও যিক্‌রে মশগুল হতেন। প্রত্যহ নিয়মিত ওয়াজ ও নসীহত করা হত। একদিন মাওলানা মুফতী মাহ্‌মূদ সাহেব গাংগুহী ওয়াজ করতেন ; আরেকদিন মাওলানা আবদুল হালীম জৌনপুরী। কিতাবী তা'লীম করতেন মাওলানা মুঈনুদ্দীন ও মাওলানা শাহেদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। তারাবীর নামায পড়াতেন মাওলানা সালমান। আর মাওলানা আবদুল হাফীয মাক্কী দু'আ পরিচালনা করতেন। দু'আ ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ। গোটা দুনিয়ার হিদায়াত এবং দীন-ইসলামের বিজয় ও উন্নতির জন্য দু'আ করতেন।

রামাদান মাসে শায়খুল হাদীস এ এলাকাতে অবস্থানের ফলে গোটা এলাকায় দীনের নতুন এক উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায়। অনেক জায়গায় যিক্‌রের মাজলিস চালু হয়। নতুন নতুন মসজিদের বুনিয়াদ শুরু হয়। দীনী মাদরাসা ও কুর'আনী শিক্ষার মক্তব সূচিত হয়। ধনাঢ্য পরিবারগুলোতে ইসলামের আলো বিকশিত হয়। তাদের সন্তান-সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়।

অপরদিকে তাবলীগী মেহনতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল, একশ' দুইশ' মাইল দূর থেকেও শায়খুল হাদীসের যিয়ারত লাভের জন্য আসতে থাকে।

৩ শাউয়াল, ১৪০১ হিজরী (৪ আগস্ট, ১৯৮১ খ্রি. মুতাবেক) সনে রোজ মঙ্গলবার যোহরের নামায আদায় করে খতমে খাজেগাঁ শেষে মাওলানা আবদুল হাফীয মাক্কী বিদায়ী দু'আ পরিচালনা করেন। মাজমায় কান্নার রোল পরে যায়। সকলেই ডুকরে ডুকরে কাঁদতেথাকে। শায়খুল হাদীস প্রয়োজনাদি সেরে দুইটার সময় গাড়িতে চড়ে বসে এবং স্টেংগারের মসজিদে রওয়ানা হন। অনেক জায়গায় থেমে থেমে দু'আ করতে থাকেন। তারপর সিলভারগ্লেন থেকে রিচমন্ড, সেখান থেকে মারিচবুর্গ (এখানে প্রায় তিন হাজার লোক মুসাফাহা করেন।), সেখান থেকে ইস্পিংগো বিচ। এখানে ছিল প্রায় হাজার লোকের মাজমা। এখানেই জুম'আর নামায আদায় করে ডারবান চলে যান। সেখান থেকে হোয়াইট রিভার বেসরকারী বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মৌলভী মুহাম্মাদ গার্ডী দু'টি বিমান চার্টার করে রেখেছিলেন। এখানে হোয়াইট রিভারের মাজমাও ছিল অনেক বড়। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল। আশপাশ থেকে প্রায় আটশ' কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান কুর'আন মাজীদের সবক নেন।

এখান থেকে উড়োজাহাজযোগে রওয়ানা হয়ে জোহান্সবার্গ পৌঁছেন। এখানেও একই রকম আমল জারি থাকে। জোহানস্‌বার্গ থেকে কেপ-টাউন গমন করেন। এখানে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যলয় ও সৌদী 'আরবের শিক্ষাপ্রাপ্ত জাভাদেশীয় উলামায়ে কিরামগণ (যাঁরা এখানের বাসিন্দা ছিলেন।) অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। শায়খুল হাদীস প্রথমে কবরস্তানে গিয়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন।

জাভীয়া বংশোদ্ভূত একজন 'আলিম নাযীম মুহাম্মাদ। তিনি মক্কায় লেখাপড়া করেন। তিনি কেপ-টাউন 'উলামা সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। শায়খুল হাদীসের আগমনে তিনি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অল্প সময়ের মধ্যেই

এখানকার লোকেরা সকলেই শায়খুল হাদীসকে খুবই আপন করে নেন। অতঃপর কেপ-টাউন থেকে জোহানস্‌বার্গ যান। জোহানস্‌বার্গ থেকে লিনসিয়া চলে আসেন। এখানে প্রায় তিন হাজার লোকের মাজমা' হয়। মুসাফা করতে করতে অনেক সময় চলে যায়। শায়খুল হাদীস শিশুদের বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করান। এরমধ্যে একজন ইংরেজও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৪ ও ১৫ শাউয়াল, ১৪০১ হিজরী সনে লেন্‌সিয়া অবস্থান করেন। এখানে আরো কয়েক জন লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৭ শাওয়াল ১৪০১ হিজরী সনে জাম্বিয়াওয়ালারা হিন্দুস্তানী এক লাখ পঁচিশ হাজার রুপি খরচ করে একটি ফৌজি উড়োজাহাজ চার্টার করে জোহানস্‌বার্গ পাঠিয়ে দেন। উড়োজাহাজটি ছিল এগারো সিটের। বিদায়লগ্নে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। গাড়ি ছিল প্রায় শ'য়ের উপরে। যেহেতু এটা ছিল বিদায়ী মুহূর্ত, তাই দক্ষিণ আফ্রিকার সকল ভক্তবৃন্দরা শায়খুল হাদীসকে এক পলক দেখার জন্য ছুটে আসে। পুরো মাজমা' চিৎকার করে কান্না করছিল। পথিমধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ছোট একটি বসতি চিপাটা-তে উড়োজাহাজ অবতরণ করে। সেখানে ভক্তদের সংখ্যাও ছিল হাজারের মতো। চিপাটায় উড়োজাহাজকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে হেফাযত করেন। এখানে শায়খুল হাদীস জুম'আর নামায আদায় করেন এবং একটি দীনী মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপন করেন।

২১ শাউয়াল, ১৪০১ হিজরী সনে চিপাটা থেকে লুসাকা গমন করেন। লুসাকার বিমানবন্দরে শায়খুল হাদীসের আগমনের কথা শুনে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে পুরো বিমানবন্দর কেঁপে ওঠে। এখানের মেযবানরা অসাধারণ মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। এখানে ইবরাহীম হোসাইন লম্বাতওয়ালা পুরো লুসাকা শহরের সকল মুসলমানদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। এখানে এমন শামিয়ানা পাতা হয় যার নিচে কয়েক হাজার লোকের সঙ্কুলান হয়। প্রায় আড়াই হাজার লোক আহার করেন। ২৪ আগস্ট শায়খুল হাদীস দারুল উলূম পরিদর্শন করেন এবং সেখানারকার লোকজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাদরাসার নাম রহমানিয়া রাখা হয়।

লুসাকা বিমানবন্দর যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি ছাড়াই একশ' পঞ্চাশটি গাড়ি ছিল। উড়োজাহাজ লুসাকা বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে তিউনিসের বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তিউনিসিয়ার বিমানবন্দরে যামাতের সাথে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিউনিসের বিমানবন্দর থেকে লন্ডন বিমানবন্দরে গিয়ে পৌছেন।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সফর

২৪ শাউয়াল, ১৪০২ হিজরী (২৫ আগস্ট, ১৯৮১ খ্রি. মুতাবেক) সনে শায়খুল হাদীস জাম্বীয়ার রাজধানী লুসাকা থেকে ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লুসাকা থেকে উড়োজাহাজযোগে ম্যানচেস্টার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখানকার ভক্তবৃন্দরা আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে পঞ্চাশ সিটের একটি উড়োজাহাজ চার্টার করে রেখেছিলেন। এ উড়োজাহাজে করে শায়খুল হাদীস তাঁর খাদেমসহ ম্যানচেস্টার পৌছেন। দুপুর দুইটা পঁচিশ মিনিটে দারুল উলূম বোল্টান পৌছেন। শায়খুল হাদীস সেখানেই পৌছেই কুর'আন মাজীদ খতম, বাই'আত, ইজতিমা ইত্যাদি সকল ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। ২৮ শাউয়াল (২৯ আগস্ট মুতাবেক) রোজ শনিবার ছুটির দিন থাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষের সমাগম ঘটে।

২৯ শাউয়াল (৩০ আগস্ট, মুতাবেক) রোজ রবিবার ডিউজবারী তাবলীগী মারকাযে যাওয়ার পথে বাটলী নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এখানে মসজিদে মহিলাদের সমাগম ছিল অনেক বেশি। মহিলারা জমায়েত হয়েছিলেন শায়খুল হাদীসের কাছে বাই'আতের জন্য। অতঃপর সেখান থেকে এগারোটা চল্লিশে ডিউজবারী পৌছেন। এ মারকায থেকে ৩৫টি জামা'আত বিদেশের জন্য বের হয় এবং তাদের মুসাফা অনুষ্ঠিত হয়। মাজমা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় পাঁচ হাজার লোকের। দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দরা দলে দলে ছুটে আসছিলেন। ডিউজবারী মারকায থেকে ব্লাকবার্ন মাদরাসার তিন শহীদের কবরে সূরা ফাতিহা পাঠের জন্য গমন করেন। এ তিনজন গত বছর একটি দুর্ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন।

৫ যিলকদ দারুল উলূম জমিয়তে উলামায়ে বারতানিয়া'র সমাবেশে শায়খুল হাদীস অসুস্থতার জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরের দিন ৬ যিলকদ রবিবার ৫২ জন ছাত্রের দস্তরবন্দী, খতমে বুখারী ও মিশকাতের সবক উদ্বোধন হয়। এ দিন স্টেজে গমন করেন। চারপাশে ছাত্ররা তেপায়ার উপর হাদীসের কিতাব রেখে বসে যায়। প্রথমে 'হাদীসে মুসালসাল বিল আওয়ালিয়া' পড়া হয়। অতঃপর শায়খুল হাদীস মাওলানা ইসলামুল হক বুখারীর শেষ হাদীস পড়েন। এরমধ্যে নতুন বছরে *সহীহুল বুখারী*র সবকের উদ্বোধনও হয়ে যায়। এরপর

মিশকাত জামাতের পালা। তিনজন উস্তাদকে শায়েখের পক্ষ থেকে টুপি ও পাগড়ি প্রদান করা হয়। বৃটেনে এই প্রথম বারের মতো মুসলমানরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। ৫২ জন 'আলিম, কারী ও হাফেজ তৈরি হয়। এরপর আযান ও নামাযের জামাত শুরু হয়। এ দিন প্রায় সাত হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

অসুখের তীব্রতার কারণে ডাক্তারের পরামর্শে শায়খুল হাদীস কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন। অতঃপর ১৬ ডিসেম্বর, সৌদি গমন করেন। বিদায়লগ্নে মাদরাসা ও আশপাশের সড়কগুলো মানুষজন দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখানে প্রায় সাত হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। সকাল দশটা পঁচিশ মিনিটে ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর পৌঁছেন। বারোটার সময় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর অবতরণ করেন। সেখান থেকে দুপুর দুইটা পঁচিশ মিনিটে উড়োজাহাজ ছাড়েন। সাথীসঙ্গীরা উড়োজাহাজের ভিতরেই ইহরাম বাঁধেন। অসুস্থতার কারণে শায়েখ আগে থেকেই জিদ্দার নিয়ত করেছিলেন। আটটা আঠারো মিনিটে নিরাপদে জিদ্দায় অবতরণ করেন।[১]

হিন্দুস্তান সফর

সাউথ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড সফরের পর মাদীনা মুনাওওয়ারা এসে শায়খুল হাদীসের শরীরের অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়ে যায়। দুর্বলতার কারণে নড়াচরা করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় ১৫ মুহার্‌রম ১৪০২ হিজরী (১২ নভেম্বর, ১৯৮১ খ্রি. মুতাবেক) সনে হিন্দুস্তান আগমন করেন এবং সেখানে ২০ দিন অবস্থান করেন। হিন্দুস্তানে শায়খুল হাদীসের স্বাস্থ্যের এতটাই অবনতি ঘটে যে, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি দিল্লিতে হলি ফ্যামেলি হাসপাতালে ভর্তি হন। ভর্তি করার সাথে সাথেই সেখানে এক্সেরেসহ সবধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকরা ক্যান্সারের সন্দেহ করেছিলেন। দুর্বলতার কারণে কয়েক বার রক্ত দিতে হয়।. শায়খুল হাদীসের দেখা-শোনার জন্য সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ মাঞ্জুর, মুহাম্মাদ সানী, মৌলভী মুঈনুল্লাহ, মৌলভী তাহেরসহ আরো অনেকেই দিল্লি গিয়ে উপস্থিত হন।

শায়খুল হাদীসের এ অবস্থা দেখে জমিয়তে 'উলামায়ে হিন্দ-এর প্রধান মাওলানা সাইয়্যেদ আস'আদ মাদানী, সময়ে-অসময়ে উপস্থিত হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আর হযরতের অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি কে সাহারাপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এ কথা শুনে শায়খুল হাদীসের খাদেমগণ সকলেই একমত পোষণ করেন।

হাসপাতাল থেকে শায়েখ হাফেয কারামাতুল্লাহ্‌র কাছে গমন করেন। এখানে শায়খুল হাদীসের চিকিৎসাসহ সবকিছুরই বন্দোবস্ত ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শায়খুল হাদীস সুস্থ হতে থাকেন। অবশেষে হযরতের দিলের তামান্না ছিল মদীনা মুনাওওয়ারায় চলে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ তামান্না পূরণ করেন। তিনি কারামাতুল্লাহ্‌র ঘর থেকে ১৮ রবীউল আউয়াল, ১৪০২ হিজরী (১৬ জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রি. মুতাবেক) সনে করাচি হয়ে জিদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং জিদ্দা থেকে মদীনায় পৌঁছে যান। সেখানেও চিকিৎসা চলতে থাকেন।

হিজায থেকে পাকিস্তান

১৩৮৩ হিজরীতে শায়খুল হাদীস তৃতীয় বার হজ্জ সফরে যান। ফেরার পথে তিনি পাকিস্তানের করাচি, লাহোর, সারগোধা ও ঢাডিয়ায় হয়ে নিজ ভূমি হিন্দুস্তানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের যিয়ারতবঞ্চিত ভক্তরা হৃদয়ের আকুতি নিয়ে শায়খুল হাদীসের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। আজ সেই প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হলো। মাওলানা ইউছুফ ও শায়খুল হাদীস-এর মত বুযুর্গদ্বয়ের যিয়ারত ও অপ্রত্যাশিত নেয়ামত অর্জনের জন্য স্টেশনগুলোতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম। তাঁরা রাতে ঘুমাতে পারেননি, তাছাড়া সেসময় পাকিস্তানে গরম ও লু-হাওয়া চলছিল। ভক্তদের উপচেপড়া ভীর ও আগ্রহ দেখে তাঁরা এয়ারকান্ডিশন গাড়ির গ্লাস খুলে দিয়ে ভক্তবৃন্দের সাথে হাতে হাত মিলাচ্ছেন আর তাদের মৃনের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন।

আমরা তিনদিন করাচি থাকার পর সোমবার লয়েলপুরের উদ্যেশ্যে রেলযোগে রওয়ানা হই এবং সেখানে সকাল নয়টায় পৌঁছি। ভক্তবৃন্দরা আমাদের আরামআয়েশের জন্য ফার্স্ট ক্লাস এসি রিজার্ভ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছোটবড় প্রত্যেক স্টেশনে চার থেকে পাঁচ'শ লোকের সমাগম ঘটে। তারা আমাদেরকে এক নযর দেখার জন্য অপলোক নেত্রে রেলগাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। যেহেতু বগিটি এসি ছিল তাই জানালা খোলা যাচ্ছিল না।

১. মাওলানা আবদুল আলীম অনূদীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৭২

আমরা প্রত্যেক স্টেশনেই দরজা খুলে তাদের সাথে হাত নেড়ে অভিভাদন জানিয়েছি। যাদের সাথে হাত মেলানো সম্ভব হয়েছে মিলিয়েছি। এসকল কারণে রাতে ঘুমানোরও সুযোগ হয়নি। মঙ্গলবার লায়েলপুর পৌঁছি সেখানেও ভক্তবৃন্দের এতটাই ভিড় ছিল যে, বেশিরভাগ সময় দরজা-জানালা বন্ধ করেই ভিতরে বন্দী থাকতে হয়। লায়েলপুর থেকে বুধবার আসরের পর সারগোধায় দিকে রওয়ানা হই। সারগোধায় যখন পৌঁছি তখন সেখানে তীব্র গরম ছিল। লায়েলপুরের তাপমাত্রা ছিল ১১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সারগোধায় ছিল ১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দু'দিকে বরফের বড় বড় খণ্ড রেখে বৈদ্যুতিক পাখা দিয়ে হাওয়া দিত। রায়পুরী'র মাকবারা ছিল ঢাড়িয়াতে। শায়খুল হাদীস ঢাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। খাদেমগণ ঢাড়িয়া সফর মুলতবী করতে চান। কিন্তু এ সফর কিছুতেই তিনি মুলতবী করতে দেননি। কেননা সেখানে শুয়ে আছেন প্রাণপ্রিয় রায়পুরী। তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি সারগোধা থেকে বৃহস্পতিবার আসরের পর ঢাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হই। ঢাড়িয়া পৌঁছেই রায়পুরী'র কবরের সামনে ফাতেহা পাঠ করি এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ঢাড়িয়াতে রহমত বর্ষণ হতে থাকে। কে জানে? এ সময় হঠাৎ করে লু-হাওয়ার পরিবর্তে ঠাণ্ডা বাতাস চলে আসবে। এমনকি রাতে গায়ে চাদর দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। আমরা ঢাড়িয়াতে যে কয়দিন অবস্থান করেছি সে কয়দিনই আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন ছিল।

শায়খুল হাদীস বলেন, রায়পুরী'র দিলের তামান্না ছিল তিনি আমার কাছে কুর'আন তিলাওয়াত শুনবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। এখন রায়পুরী'র কবরের সামনে কুর'আন মাজীদ খতম করার প্রতি মনোযোগ দেন। ঢাড়িয়াতে তিনদিন অবস্থান করি। এখানেও নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ভিড় জমিয়েছে। দরজার সামনে ভাই ইসমাঈল লায়েলপুরী পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু দরজা খুললেই আবার পূর্বের ন্যায় ভিড়। মাওলানা ফযল আহমাদ কয়েক দিন পূর্বেই ঢাড়িয়া পৌঁছেন। হাফেয আবদুল আযীয গমথলভী জুমার দিন সকালে ঢাড়িয়া গিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। তারপর আবার রবিবার সকালে গিয়ে সোমবার আমাদের সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা আবদুল আযীয রায়পুরগুজরাঁ, তাঁর ভাই মুফতী আবদুল্লাহ্‌, মাস্টার মঞ্জুর, মৌলভী সাঈদ ডোঙ্গাবোঙ্গা তো খবর শুনেই করাচি এসেছিলেন। সারগোধা থেকে আযাদ সাহেবও আমাদের সাথে গিয়েছিলেন এবং আমাদের সাথেই প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বোপরি ঢাড়িয়া থেকে লাহোর এবং রায়বিন্ডে এক রাত অবস্থান করে ১৫ জুলাই উড়োজাহাজযোগে দিল্লিতে চলে আসি।

হিন্দুস্তানে শায়খুল হাদীসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সফর

শায়খুল হাদীস বিভিন্ন সময় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছেন। তিনি মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, মাওলানা হোছাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা 'আবদুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহারানপুরী, মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠীর মত বড় বড় বুযুর্গগণ মুযাফ্‌ফরনগর, মুরাদাবাদ, বেরেলী ও মেওয়াতে ছোট ছোট সফর হয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রথম সফর

শায়খুল হাদীস ১৩৬২ হিজরী সনে রজব মাসে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াসের ইশারায় লখনৌর তাবলীগী জামাত ও তাবলীগী যিম্মাদারের অনুরোধে এই সফর মঞ্জুর করেন। ১৮ জুলাই মাওলানা ইল্‌য়াস লাখনৌ গমন করেন। পরের দিন ১৯ জুলাই শায়খুল হাদীস সাহারানপুর থেকে সোজা লাখনৌ চলে যান। লাখনৌ ইজমিতায় মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী, মাওলানা আবদুল হক মাদানী, মাওলানা এহতেশামুল হাসান, হাফেয ফখরুদ্দীন (খলীফা, সাহারানপুরী) এবং তাবলীগ জামাতের কিছু নির্ভরযোগ্য মুরব্বী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই লখনৌতে দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা'র মেহমানখানায় কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন মজলিসে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সফর

১৩৬৫ হিজরী সনের ৩,৪ ও ৫ জুমাদাস সানি মাসে আলহাজ্ব শাইখ আইয়ায আলী'র দাওয়াত ও ব্যবস্থাপনায় বাকীনগর মহল্লায় গমণ করেন। এ ইজতিমায় মাদানী ছাড়া (তখন মাদানী নৈনিতাল জেলে ইংরেজদের হাতে বন্দী ছিলেন।) দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা 'আবদুশ্‌ শাকুর ফারুকী লখনৌভী, মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়িব (মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ), মাওলানা যফর আহমাদ থানভী, মাওলানা 'আবদুল হক মাদানী, মাওলানা

'আবদুল হালীম সিদ্দীকী, মাওলানা হাকীম ডাক্তার সাইয়েদ 'আবদুল 'আলী (নাযেম, নাদওয়াতুল উলামা), মাওলানা শাহ্ হালীম আতা (শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ইজতিমার বৈশিষ্ট ছিল যে, আম-জনতা, 'উলামা-মাশায়িখ, বিশেষে-নির্বিশেষে সকলের জন্য বাসস্থান ও খাবার-দাবারের দস্তরখান ছিল এক ও অভিন্ন। শায়খুল হাদীস রোজনামচা লিখতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন–

> "এই ইজতিমার একটি বৈশিষ্ট্য হলো– আঞ্চলিক কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে খাবার-দাবারে কোনো তারতম্য করা হয়নি। পুরো মাজমা'কে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্যই একই রুটি ও ডাল, কখনও রুটি ও শোরবা দিয়েও মেহমানদারী করা হয়েছে।"[১]

তৃতীয় সফর

১৩৬৬ হিজরী সনে (১৯৪৭ খ্রি. মুতাবেক) শায়খুল হাদীস লাখনৌ ও রায়বেরেলীতে সফরের ইচ্ছা করেন। এ সফরে শায়খুল হাদীসের সাথে মাওলানা 'আবদুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ, পীর হাশেমজান (সিন্ধুর প্রখ্যাত বুযুর্গ এবং মুজাদ্দেদিয়া তরীকার শায়েখ), আলহাজ সাইয়েদ মুহাম্মাদ খলীল নাহটুরী ও মৌলভী যহীরুল হাসান কান্ধালভী প্রমুখ বুযুর্গগণ ছিলেন।

দু'দিন লাখনৌ থাকার পর শায়খুল হাদীস ও মাওলানা 'আবদুল কাদের রায়পুরী বিশাল জামাতসহ স্বতন্ত্র লরীযোগে রায়বেরেলীতে উপস্থিত হন। শাহ্ আলমুল্লাহ্ (সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদের পিতামহ)-এর মসজিদের সামনে নদীর ওপারে এই মুবারক কাফেরা অবতরণ করে এবং কিশতীর সাহায্যে নদী পার হয়ে শাহ্ আলমুল্লাহ্র খানকায় প্রবেশ করেন। তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য গণ্যমান্য লোকজনের পাশাপাশি এলাকাবাসীও উপস্থিত ছিলেন। এখানে কাফেলা একদিন একরাত্র অবস্থান করেন। দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দঘন। সেদিন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী শায়খুল হাদীসকে উযূ করাচ্ছিলেন, এমন সময় শায়খুল হাদীস বললেন, মৌলভী সাহেব ! এখানকার পরিবেশের জন্য জায়গাটি আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এখানে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না। মন খুবই খারাপ লাগছে।

হিজায থেকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সফর

১৩৯৩ হিজরীর রামাদানের পর শায়খুল হাদীস প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। এ কারণেই তিনি এ বছর হজ্জে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। একামা পাওয়ার পর হিজাযে ছয় মাস অবস্থান না করলে একামা বাতিল হয়ে যায়। মৌলভী মুহাম্মাদ হারূনের ইনতিকালসহ আরো কিছু জরুরতের জন্য ভক্তবৃন্দরা শায়খুল হাদীসকে মদীনা থেকে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসার চিন্তা করেন। হযরতের পাকিস্তানী দোস্ত-আহবাবের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের ভিসা পাওয়া যায়। এজন্য তিনি ১৩৯৪ হিজরীর ৩ জুমাদাল উলা (২৪ মে, ১৯৭৪ খ্রি. মুতাবেক) তারিখে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে মাগরিবের নামাযের পর যাত্রা করেন। রাতে ডাক্তার মুহাম্মাদ ইসমা'ঈলে'র[২] অনুরোধে বিশ ঘণ্টা বদর প্রান্তরে অবস্থান করেন। রাত্রি যাপন করেন মসজিদে আরীশের আঙিনায়। আসরের পর বদর থেকে রওয়ানা হয়ে রাতে মাদরাসা সাউলাতিয়া'য় অবস্থান করেন।

অতঃপর ২২ জুন, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শায়খুল হাদীস জিদ্দা থেকে করাচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা তিনটা পঁচিশ মিনিটে করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ওখানকার সমাবেশ ছিল অনেক বড়। এ সমাবেশে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার লোকের সমাগম ঘটে। পাকিস্তানের মাক্কী মসজিদে যোহরের নামায আদায় করে, মাওলানা মুফতী শফী সাহেবের মাদরাসা এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী'র মাদরাসায়ও তাশরীফ রাখেন। এরই মধ্যে মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী থানভীর সাথেও দেখা হয়ে যায়। সেখান থেকে রায়অন্ডের উদ্দেশ্যে শুক্রবার যাত্রা শুরু করেন। রায়অন্ডেও মানুষের ভিড় ছিল

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে মাওলানা ইউসুফ কান্ধালভী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-২৬২
২. তিনি তখন বদরের সরকারী চিকিৎসক ছিলেন।

প্রচণ্ড। রায়অন্ড থেকে যাওয়া হয় ঢাড়িয়ায়। সেখানেও ছিল প্রচুর লোকের সমাবেশ। দিল্লি যাওয়ার জন্য টিকিট কাটা হয় করাচি থেকে, এজন্য আবার করাচি যেতে হয়। করাচি থেকে দিল্লি পৌঁছে সেখানে একদিন অবস্থান করে সরাসরি সাহারানপুরে চলে আসেন। উদগ্রীব ভক্তবৃন্দ সকলেই আস্তে আস্তে সাহারানপুরে ভিড় জমাতে থাকেন।

এবার হিন্দুস্তানে থাকাবস্থায় মেওয়াতেও একটি সফর করেন এবং আগস্টে সাহারানপুরের তাবলীগী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন।

১৩৯৪ হিজরী সনে রামাদান অতিবাহিত করেন সাহারানপুর। এ বছর মাদরাসার ছাত্রাবাসের মসজিদ ছিল দ্বিতল। তারপরও ই'তিকাফকারীদের জায়গা না হওয়ায় ছাত্রদের বিভিন্ন কামরা খালি করার প্রয়োজন হয়। রামাদানের শুরুতে মেহমানের সংখ্যা ছিল প্রায় আট-নয়শ'। রামাদানের শেষ দশকে মেহমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারোশ'-এর কোঠায়। মৌলভী নাসীরুদ্দীন জানান, ২৭ রোযায় মেহমানের সংখা দাঁড়ায় প্রায় দুই হাজার।[১] তারাবীহতে প্রতিদিন তিন পারা তিলাওয়াত করা হয়। যাতে রামাদানের প্রথম দশকেই এক খতম হয়ে যায়। এ বছর মৌলভী খালেদ (মৌলভী সালমানের সহোদর ভাই) কুর'আন মাজীদ শোনান।

রামাদান মাসে শায়খুল হাদীসের স্বাস্থ্য আরো নাজুক হতে থাকে। ১৩৯৪ হিজরীর ১৫ যিলকদ (৩০ নভেম্বর, ১৯৭৪ ইং) তারিখে সাহারানপুর থেকে হিজাযের দিকে যাত্রা সূচিত হয়। সাহারানপুর থেকে দিল্লি আবার দিল্লি থেকে বোম্বে। সাহারানপুরে এতো লোকের সমাগম হয় যে, কাঁচাঘর থেকে ছাত্রাবাস পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ।

১৮ যিলকদ, ১৩৯৪ হিজরী সনে দিল্লি থেকে উড়োজাহাজযোগে বোম্বে এবং ২১ যিলকদ বোম্বে থেকে করাচি যাত্রা করেন। পরের দিন করাচি থেকে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে যান। হজ্জের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় শায়খুল হাদীস মক্কায় থেকে হজ্জ সমাপনের চিন্তা করেন। হজ্জ সম্পন্ন করে ১৫ যিলহজ্জ রাতে বদরে অবস্থান করেন। পরেরদিন মদীনা তইয়্যেবায় পৌঁছেন এবং নিয়মমাফিক মাদরাসা উলূমে শরইয়্যায় অবস্থান শুরু করেন।

১৩৯৫ হিজরীতে আবারও হিন্দুস্তান সফরের সুযোগ হয়। এ সফরের পিছনে শায়খুল হাদীসের কিছু গায়বী ইশারাও ছিল। তাই তিনি এ বছরের রামাদান হিন্দুস্তানেই করার মনস্থ করেন। ২৮ রজব ১৩৯৫ হিজরী (৬ আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রি. মুতাবেক) সনে মক্কা মুররমা থেকে যাত্রা করে সেদিনই বোম্বে পৌঁছে যান। ১ শা'বান, ১৩৯৫ হিজরী (৮ আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রি. মুতাবেক) সনে বোম্বে থেকে নিযামুদ্দীন পৌঁছেন। ৩ শা'বান, ১৩৯৫ হিজরী (১২ আগস্ট, ১৯৭৫ ক্রি. মুতাবেক) সনে বুখারী খতম হয়। প্রথমে 'মুসালসাল বিল আওয়ালিয়্যা'র হাদীস পড়া হয়। তারপর মৌলভী ইউনুস বুখারীর শেষ হাদীস পড়েন। উভয় হাদীসের মতন শায়খুল হাদীস পাঠ করেন।

১ রামাদান, রোজ সোমবার, ৮ ডিসেম্বর মুতাবেক শায়খুল হাদীস নিয়ম মাফিক আসরের পরই নতুন ছাত্রাবাসে পৌঁছে যান। রামাদানের প্রথম দশকে মৌলভী যোবায়ের, দ্বিতীয় দশকে মৌলভী খালেদ এবং তৃতীয় দশকে মৌলভী সালমান কুর'আন মাজীদ খতম করেন। সাহরানপুর থেকে রওয়ানা হয়ে কান্ধালা, পানিপথ, সারহিন্দ হয়ে গাড়িযোগে রায়অন্ড পৌঁছেন। সেখানকার তাবলীগী ইজতিমায় শরীক হয়ে ঢাড়িয়া, রাওয়ালপিণ্ডি এবং সেখান থেকে উড়োজাহাজযোগে করাচি চলে যান। করাচি থেকে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে সোজা জিদ্দায় রওয়ানা হন। জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছে উমরা পালন করেন। অতঃপর সেখানে হজ্জ সম্পন্ন করে মদীনায় চলে আসেন।

১৩৯৬ হিজরীতে আবরও হিন্দুস্তান সফরের প্রয়োজন হয়ে পরে। ১৪ জুমাদাছ ছানি, ১৩৯৬ হিজরী (১২ জুন, ১৯৭৬ খ্রি. মুতাবেক) সনে সফর হয় ২২ যিলকদ, ১৩৯৬ হিজরী (১৫ নভেম্বর, ১৯৭৬ খ্রি. মুতাবেক) সনে সফর সম্পন্ন হয়। এ সফরেও রামাদান নতুন ছাত্রবাসেই অতিবাহিত হয়। রামাদানের

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

প্রথম দশকে মৌলভী সালমান, দ্বিতীয় দশকে মৌলভী খালেদ এবং তৃতীয় দশকে মাওলানা ইন'আমুল হাসানের পুত্র মৌলভী যুবায়ের কুর'আন মাজীদ খতম করেন। রামাদানের পর করাচি হয়ে জিদ্দা চলে আসেন। জেদ্দায় ভিড় ও জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকার কারণে 'উমরা পালন সম্ভব হয়নি। এজন্য জিদ্দা থেকে সোজা মদীনায় চলে যান।

১৩৯৭ হিজরী (২৪ মে, ১৯৭৭ খ্রি. মুতাবেক) সনে সা'দী সাহেবের পত্র থেকে জানা যায় যে, শায়খুল হাদীসের জন্য সৌদী বাদশাহ্ বরাবর তাবেয়িআর জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছিল, সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। ২১ জুন, ১৯৭৭ খ্রি. তাবেয়িআ শায়খুল হাদীসের হাতে পৌঁছে যায়। তাবেয়িআ হাতে পেয়েই তিনি হিজরতের নিয়ত করে ফেলেন। তিনি তাবেয়িআ হাতে পেয়ে আনন্দের পরিবর্তে চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। কে জানে, নাগরিকত্বের আদব রক্ষা করতে পারবো কি না? এবারই প্রথম লেখা হয় শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী।

১৩৯৭ হিজরীর জুমাদাছ ছানী মাসে তাবেয়িআ হাতে পেয়ে শায়খুল হাদীস আবারও হিন্দুস্তান সফরে যান। তিনি করাচি ও দিল্লি হয়ে সাহারানপুর পৌঁছেন। ১০ শা'বান, ২৮ জুলাই মুসালসালাত ও বুখারী খতম অনুষ্ঠান হয়। এই বছর রামাদানের আগেই ভিড় বাড়তে থাকে। রামাদানের প্রথম দশক ও তৃতীয় দশক ছিল মৌলভী সালমানের এবং দ্বিতীয় দশক মৌলভী খালেদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। তাঁরা এ দশকে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করবেন। এবার হিন্দুস্তানে অবস্থানরত ভক্তবৃন্দ ও শাগরেদ্গণ অনেক মুবারক স্বপ্ন দেখেন এবং অনেক সুসংবাদও পান। এ বছর সাহারানপুরের রামাদানের আয়োজন মুলতবী করা হয় এবং এ বিষয়ে ভক্তবৃন্দেদের জানানো হয়। আর প্রত্যেককে যার যার স্থানে রামাদান পালনের জন্য বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়।

শায়খুল হাদীস রামাদানের পর ১৩৯৭ হিজরীর যিলকদ (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস মুতাবেক) মাসে সরাসরি জিদ্দা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

১৩৯৮ হিজরী সনেরও হিন্দুস্তানের সাহারানপুরে পূর্বের ন্যায় রামাদান অতিবাহিত করেন।

১৩৯৯ হিজরী সনে রামাদানের প্রায় এক হাজার লোক ই'তিকাফ করেন। এজন্য জায়গা সঙ্কট দেখা দেয় এবং রামাদানের এক দশকের বেশি কাউকে ই'তিকাফ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ বছর শুধু মৌলভী সালমান একাই কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করেন।

১৪০০ হিজরী (জুলাই, ১৯৮০ খ্রি. মুতাবেক) সনের রামাদান পাকিস্তানী খাদেম ও ভক্তবৃন্দের অনুরোধে ফয়সালাবাদের লয়েলপুরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানের রামাদানের ব্যবস্থা করেন মাওলানা মুফতী যাইনুল আবেদীন। তিনি ছিলেন শায়খুল হাদীসের বিশিষ্ট খলীফা ও তাবলীগী জামাতের অন্যতম যিম্মাদার।

শায়খুল হাদীস এ বছরের রামাদান পাকিস্তানে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ খবর পাকিস্তানের সকল ভক্তবৃন্দ, 'আলিম-উলামার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তাঁরা শায়খুল হাদীসের আগমণকে অত্যন্ত গনীমত মনে করেন। পকিস্তান সফরের কর্মসূচি–

যোহরের নামাযের পর খতমে খাজেগাঁ, দু'আ ও যিকিরের হালকা বসত। 'আসরের নামাযের পর মাজলিস হত। এ মাজলিসে মৌলভী মুঈনুদ্দীন রামাদানের তা'লীম উপলক্ষে কিতাব ও রিসালা পড়ে শুনাতেন। এ তা'লীম ইফতারের ১০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত চলত।

ইশার আযানের আধা ঘণ্টা পূর্বে মজলিস হত। শায়খুল হাদীস এ সময় মুরাকাবায় থাকতেন। মাজলিসের ধরণ ছিল গোলাকার। তিনি মুরাকাবার পর নবাগতদের বাই'আত করতেন। প্রত্যহ বাই'আতের সংখ্যা ছিল ৩০-৪০ জনের মত।

১. মদীনায় হিজরত (নাগিরকত্ব)-এর অনুমতিপত্র।

শায়খুল হাদীসের পক্ষ থেকে মৌলভী ইহ্সান (শিক্ষক, মাদরাসা 'আরাবিয়া, রায়অন্ড, লাহোর) বাই'আতের পূর্বে জরুরি এ'লান করেন। শায়খুল হাদীস আস্তে আস্তে বাই'আতের বাক্যমালা বলতেন এবং তা মৌলভী ইহ্সান উচ্চ আওয়াজে দ্বিত্ব করতেন। জনাকীর্ণ মাজমা' তাকে অনুসরণ করে বাই'আতের বাক্যমালা যবানে আদায় করতেন। এ বছর তারাবীতে সোয়া পারা কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করা হয়। তারাবীর পর সূরা ইয়াসীনের খতম অনুষ্ঠিত হত। তারপর দু'আ হত এবং কিতাব পড়ে শোনানো হত। অতঃপর শায়খুল হাদীস কামরার হুজরা বন্ধ করে দিতেন। আর লোকজন তাদের ব্যক্তিগত কাজ সেরে ফেলতেন।[১]

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অমিয় বাণী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অমিয় বাণী

উলামায়ে রব্বানী ও মাশায়েখে রূহানী তাঁদের জীবনকথার চেয়ে দীনের বিশুদ্ধ শিক্ষাবলী, আপন পড়াশোনার নির্যাস, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ঐকান্তিক উপদেশ ও পরামর্শগুলো প্রচারের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যেগুলোর উপর আমল করে তাঁদের জীবনে তাঁরা নিজেরা সফলকাম হয়েছেন এবং অন্যারাও দীনী ও রূহানী তরক্কী অর্জন করতে পেরেছেন এবং অনেক সংকট ও ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে। এ সত্যের প্রতি লক্ষ্য করে আমি নিচে শায়খুল হাদীসের কয়েকটি অমূল্য বাণী (মালফূযাত) এবং বিখ্যাত জনপ্রিয় উর্দূ কিতাবগুলো থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। আমার এ অভিসন্দর্ভে শায়খুল হাদীসের অমিয় বাণী'র দ্বারা অনেকেই উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করি।

হাজীদের বৈষয়িক উপহার আনার ওপর শায়খুল হাদীসের অসন্তুষ্টি প্রকাশ

শায়খুল হাদীস বলেন, হাজীগণ আমার জন্য যেসকল বৈষয়িক উপহার– যেমন: জায়নামায ইত্যাদি– নিয়ে আসে, তা আমার মনঃপূত নয়। কেননা এর বেশিরভাগই বিদেশী জিনিস। সবসময় প্যাকেট বন্দি থাকে বলে সেগুলো মক্কা-মদীনার বাতাসও পায় না। এজন্য হাজীদের আমি সবসময় এ কথাই বলি, আমার জন্য কোনো জিনিস আনবে না। যদি আমার প্রতি তোমার মুহাব্বত থাকে, তাহলে আমার জন্য হজ্জ ও উমরা এনো। আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন। আমার উমরার সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ ও হজ্জের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যা আমার পক্ষ থেকে আমার বন্ধুগণ সম্পন্ন করেছেন। কুরবানীর অবস্থাও অনুরূপ।[১]

শায়খুল হাদীস আরো বলেন, তোমার ওপর কারো ইহসান থাকলে তার বিনিময়ে সবসময় তারজন্য দু'আ করবে। হাদীস শরীফে এসেছে, ইহসানকারীর জন্য 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বলে দাও। আল্লাহ্র সমান বিনিময় কে দিতে পারবে? এটা আমার অসিয়ত। এটাই আমার নসীহত। এটাই হলো আমার অমীয় বাণী। সবসময় তোমার ওপর ইহসানকারীদের জন্য দু'আ করবে। আমরা যদিও প্রার্থনার ঢং ধরিনি। তারপরও প্রার্থনাকারী হয়েই বসে আছি।[২]

শায়খুল হাদীস আরো বলেন, খেজুর ও যমযম ছাড়া অন্যকিছু আমার পছন্দ নয়। আমি যখনই হিজাযের পবিত্র মাটিতে হাজির হয়েছি, আমার ঘরের সদস্যদের জন্য সেখান থেকে কাপড় বা এ জহাতীয় কোনো কিছু আনিনি। মাওলানা ইউসুফ সাহেব-এর সাথে যখন সেখানে হাজির হয়েছি, তখন দেখতাম, তিনি প্রতিদিন মসজিদে নববীতে তিন-চার ঘণ্টা বয়ান করতেন। আমি তাঁর সেই বয়ানে বসতাম। ঐ সফরে মরহুম ইউসুফ (রহ.) আধ্যাত্মিক অনেক উন্নতি করেছিলেন। অনেক ঊর্ধ্বে উটে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বসে বসে মসজিদে নববীর কবুতরগুলোর ছেড়া পালকগুলো একত্র করতেন। সেগুলো হাদিয়া হিসেবে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। এরপরের সফরে তিনি হুদায়বিয়া ও উহুদ পাহাড়ের আশে-পাশের পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। খাদেমদের ওপর তার কড়া নির্দেশ ছিলো, সেগুলোকে তারা যেনো যত্নের সাথে বাক্সবন্দি করে রাখে। ঐ সময় রওযা শরীফের কাছে একটি ছোট নালা তৈরি হচ্ছিল। এজন্য সেখানকার মাটি তোলা হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করে মুম্বাইয়ের হাজি ইয়াকুবের কাছে এক থলে প্রেরণ করেছিলেন। এখানে এসে তা বিভিন্ন বন্ধুদের মাঝে বন্টন করে দেন।[৩]

---

১. মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নাদবী সংকলিত, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক অনূদিত, *মাজালিসে যাকারিয়া* (ঢাকা: মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৪৯

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

পশুসুলভ পাপাচার থেকে শয়তানী পাপাচার জঘন্যতর

পাপাচার দুই প্রকার: (১) পশুসুলভ পাপাচার (২) শয়তানী পাপাচার।

পশুসুলভ পাপাচার হচ্ছে পানাহার ও কামজনিত পাপাচার। আর শয়তানী পাপাচার হচ্ছে অহংকার, অন্যকে হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেকে শ্রেয় জ্ঞান করা। শায়খুল হাদীস বলেন, *“রিসালায়ে স্ট্রাইক”* নামক গ্রন্থে আমি এ কথাই লিখেছি। আমার এ ধরনের আলোচনায় মুফতী মাহমূদ এই বলে আপত্তি তুলেছেন যে, প্রথমোক্ত পাপাচারগুলোকে লাঘব করে দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ঠিক নয়। কেননা, প্রথমোক্ত পশুসুলভ পাপগুলো তো কান্নাকাটির দ্বারা মাফ হতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত পাপাচারগুলো থেকে তওবা খুব কমই নসীব হয়। মানুস একে পাপাচার বলে মনেই করে না। এর ক্ষমা অনেক বিলম্বে হয়। এর দলীল হচ্ছে, আদম (আ.)-কে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ভুলক্রমে তিনি বৃক্ষের নিকটে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তওবা করলেন এবং সে তওবা কবুলও হলো।

ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো অহংকারবশে। প্রথম ধরনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিনীত ভাব এবং দ্বিতীয় ধরনে আল্লাহ্ তা'আলার মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলো। আমি স্বচক্ষে অনেক লোককে অনেক উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত দেখেছি যাতে ঈর্ষার উদ্রেক হতো, কিন্তু অন্যদের সমালোচনা ও তাদেরকে হেয় জ্ঞান করার কারণে তাঁরা নিজেরাই হতবাক হয়ে গেছেন।[১]

ভারসাম্য রক্ষা

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মৃত ব্যক্তিদেরকে মন্দ বিশেষণে স্মরণ করো না; বরং তাদের গুণাবলীর আলোচনা করো। আমরা ভারসাম্য হারিয়ে এমনিভাবে সীমা অতিক্রম করে যাই যে, কাউকে তো প্রশংসা করে আকাশে উঠিয়ে দেই, আবার কারো নিন্দ করতে করতে তাকে পাতালেরও নিচে নামিয়ে আনি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنِ قَوْمٍ عَلٰى أَنْ لَا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

“কারো প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিচ্যুত না করে। ন্যায়পন্থা অবলম্বন কর, কেননা, এটাই তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির নিকটবর্তী।”[২]

আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পথ খুবই সহজ

হাদীস শরীফে আছে, অনেক এলোকেশী আলুথালু বেশধারী ধুলাচ্ছন্ন ব্যক্তি, যাদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়– এমনও আছেন, তাঁরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বসেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন। রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারাই মানুষ এ মর্যাদায় উপনীত হতে পারে।

অপর হাদীসে আছে,

مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إلى بِالنَّوَفِلِ حَتّٰى اُحِبَّه

> “আমার বান্দা নফল ইবাদতের দ্বারা ক্রমেই আমার নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি তাকে মাহবুব বা প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করি।”[৩]

---

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
২. আল-কুর'আন, ৫: ৮।
৩. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬৫০২

শায়খুল হাদীস আরো বলেন,

> "আল্লাহ্‌র পথ বড়ই সহজগম্য। নিজের অভিজ্ঞতায়ও তাই জেনেছি এবং অন্যদেরকেও প্রত্যক্ষ করেছি। দেখো ভাই! যাই করো না কেন, আল্লাহ্‌র মরজি অনুযায়ী করবে, নিজের মনচাহি ও অভিরুচি অনুযায়ী করবে না। কিছু করে নেও। রামযানুল মুবারকে এর অনুশীলন করে নাও। আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে কেউই এ বলেন না যে, চাকুরী-বাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করো না।"[১]

মাওলানা ইলয়াসের মুজাহাদা

শায়খুল হাদীস বলেন, মাওলানা ইলিয়াস তথা আমার চাচাজান আমাকে শৈশবে একবার বলেছিলেন, "যদি তুমি ছয় মাস চুপ থাকতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে ওলী বানিয়ে দেব।" তখন বুঝিনি, চাচাজান কেন এ কথা বলেছিলেন, আজ অক্ষরে অক্ষরে বুঝে আসছে। চাচাজান কেন আমাকে চুপ থাকার আমল দিয়েছিলেন।

আল্লামা রূমী বলেন,

لب بند، و چشم بند، و گوش بند

> "মুখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ রাখ আর কানটাও বন্ধ করো।" এই তিনটি কাজ করতে পারলে হাকীকত তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস যখন নিযামুদ্দীনের মুরুব্বী হলেন, তখন আমার মামাজান মাওলানা লতীফ এক রামাদানে নিযামুদ্দীনে এসে উপস্থিত হন। তখন আমি সেখানেই ছিলাম। আমি মনে করেছিলাম আজ হয়তো ধুমধামের সাথে ভুরিভোজন করা যাবে। কিন্তু ইফতারের সময় দেখা গেলো, সেখানে কোনো আয়োজনই নেই। চাচাজান বাইরে থেকে কয়েকটি ডুমুর ফল এনে দিলেন। মাগরিবের নামাযের পর চাচাজান নফল নামাযে মগ্ন হয়ে গেলেন। এশার নামাযের পর তারাবীর নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঐদিকে মামাজানের তো আফসোসের অন্ত নেই যে, ভাইজানের এখানে তো খাওয়া-দাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই। সাহরীর সময়ও দুই-চারটি ডুমুর ফল নিয়ে আসা হলো। পরেরদিন সকালে মামাজান বললেন, আমি দিল্লিতে যাবো, সেখানে আমার কাজ আছে। চাচাজান তাকে জোর করে বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে দিলেন। দেখা গেলো, ঐদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে এক ডেগ পোলাও চলে এসেছে। চাচাজান তখন মামাজানকে ডেকে ভালো করে খাইয়ে দিলেন। এখানে বুঝার বিষয় হলো, মুজাহাদা দু-ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো আরোপিত। আরেকটি হলো ঐচ্ছিক। দ্বিতীয়টিই অধিক তাৎপর্যবহ।"[২]

বুযুর্গদের জীবনের প্রথমাংশের দিকে যে তাকাবে সে সফলকাম হবে, আর তাঁদের জীবনের শেষাংশের দিকে যে তাকাবে সে ব্যর্থ

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "একবার নিযামুদ্দীনে চার সদস্যের একটি তুর্কি জামাত এসেছিলো। সেখানে তখন আমেরিকারও একটি জামাত ছিলো। তখন হযরতের বয়ান একজন তুর্কি ভাষায়, অরেকজন ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলো। (প্রবাদ বাক্য আছে, যবানে ইয়ারে মান তুর্কী ও মান তুর্কী

---

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২. মাওলানা তাকিয়ুদ্দীন নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

নমী দানম– বন্ধুর ভাষা তুর্কী, অথচ আমি তুর্কী জানি না। তাবলীগের মেহনতের বদৌলতে আজ তুর্কী ভাষারও প্রয়োজন পড়ছে।)

বয়ান হচ্ছিল যে, হযরত রায়পুরী বলতেন, যখন দাঁত ছিলো, তখন চানাবুট ছিলো না। আর যখন চানাবুট এলো, তখন আর দাঁত নেই। অর্থাৎ যখন খাওয়ার যুগ ছিলো না, তখন ছিলো আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও দৈন্যদশার প্রকোপ। এরপর যখন স্বচ্ছলতার যুগ এলো, তখন আর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রইল না।

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি বুযুর্গদের জীবনের শেষভা দেখবে, সে ব্যর্থ হবে; আর যে আমাদের জীবনের সূচনাকাল দেখবে, সে সফলকাম হবে। কারণ, প্রথম জীবন কেটেছে মেহনত ও মুজাহাদার মাধ্যমে। আর শেষ জীবনে আর্থিক সঙ্গতির বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নেমে এসেছে। এখন যদি কেউ সেই বাঁধভাঙ্গা অর্থের জোয়ার দেখে এবং এটিকেই তার নিজের জন্য আদর্শ বানায়, তাহলে তো সে ব্যর্থ হবেই।

উপরের এ কথাটির আরেকটি প্রমাণ হলো, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মাহাজিরে মাক্কী-এর জীবনেও প্রচুর স্বচ্ছলতা এসেছিলো। অথচ তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিলো প্রচণ্ড অভাব-অনাটনে। এমনকি একদিন তিনি তাঁর এক ঘনিষ্ট বন্ধুর কাছে দুই পয়সা ঋণ চান। বন্ধু সেই ঋণ দিতে অপারগতা জানিয়ে দেয়। পরে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন যে, কেনো আমি তার কাছে ঋণ চাইতে গেলাম। যিনি দানের প্রকৃত মালিক, তাঁর কাছে কেনো হাত পাতলাম না। রাতের বেলা যিয়ারত নসীব হলো। তখন এ সুসংবাদ এলো, পরীক্ষার দিন শেষ। এরপর থেকে তাঁর জীবনে স্বচ্ছলতার সবগুলো দুয়ার খুলে যায়।

তিনি আরো বলেন,

رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گڑ جانے کے بعد

"দেখ, মেহদীর পাতাকে যখন পাথরে পিষে দেয়া হয়, তখনই তা রঙ্গীন করে দেয়। পাথরে না পিষে এমনিতেই পাতাগুলোকে রেখে দিলে তাতে কিছুই হবে না।"[১]

প্রিয় বন্ধুগণ! মানুষ মুজাহাদার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

ہم خداہی وہم دنیاے دوں اس خیال است، ومحال است، وجنوں

নিজেকে একদিকে কোদান্বেষী বলবে, অন্যদিকে দুনিয়াপুঁজারীও হবে– এটি নিরেট অবাস্তব কল্পনা, অসম্ভব চাওয়া ও উন্মাদনা।"[২]

প্রতিটি কাজের একটি নীতিমালা আছে। ডাক্তারদের জন্য যেমন জরুরি হলো, নিজেকে সফল করতে হলে অবশ্যই ডাক্তারির নিয়ম-নীতি শিখে তদানুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলবে। তদ্রূপ সুলূকের পথেও কম খাওয়া, কম কথা বলা ও কম ঘুমানো-এর উপর আমল করা অত্যধিক জরুরি।"[৩]

মুসলিম জাতির মুক্তি ও উন্নতির একমাত্র পথ

'উমর ইব্ন খাত্তাব (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) যখন সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে এক স্থানে কর্দমাক্ত পানি সম্মুখে পড়লো। তিনি উট থেকে নেমে গেলেন। মোজা পা থেকে খুলে কাঁধের উপর

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
২. মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩. প্রাগুক্ত।

রাখলেন এবং সেই পানির মধ্যে নেমে পড়লেন। উটের লাগাম তাঁর হাতে ধরা ছিলো এবং সে তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিল। আবূ 'উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) চিৎকার করে উঠলেন, আমীরুল মু'মিনীন, সর্বনাশ করছেন। সিরিয়াবাসীরা তো এমনটি করাকে খুবই দূষণীয় মনে করে থাকে। আমার মন চায় না যে, এ অবস্থায় আপনি শহরে গিয়ে উঠুন, আর শহরবাসীরা আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পাক। 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) তখন তাঁর বুকে একটি হাত মেরে বললেন, আবূ 'উবায়দা! এমন কথা যদি তুমি ছাড়া আর কারো মুখে উচ্চারিত হতো, তবে আমি অবশ্যই তাকে শিক্ষণীয় শাস্তি দিতাম। আমরা হতমান ছিলাম, উপেক্ষার পাত্র ছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তু দ্বারা আমাদেরকে সম্মানমণ্ডিত করেছেকন, তা' ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে আমরা যদি সম্মান খুঁজি, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হতমান করে ছেড়ে দিবেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্মান ও মর্যাদা। দুনিয়অবাসীদের চোখে হতমান হলেই বা কি, আর সম্মানিত হলেই বা কি?

একটি ঐকান্তিক নসীহত

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমার একটি উপদেশ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুন, সর্বদা এমন ব্যাপারেই কেবল মন্তব্য করবে, যার অন্দর বাহির সবদিক তোমার পুরাপুরি জানা আছে। দুই বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল তখনই সালিশী করা সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষের সমস্ত দলীল-প্রমাণ জানা থাকবে। অবশ্য, শরীয়তের কোনো স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে যদি কিছু হয় তবে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না, কেননা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খেলাফ কোনো বক্তব্যই বিবেচনাযোগ্য নয়; বরং মুকাল্লিদ বা কোনো মাযহাবের ইমামের অনুসারী ব্যক্তির জন্য প্রাচীন যুগের ফিক্‌হবিদ ইমামগণের অভিমতের বিরুদ্ধাচারণেরও কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু যেখানে মাসআলাটি ইস্তিম্বাত-ইজতিহাদ বা শরয়ী গবেষণার উপর নির্ভরশীল এবং বিবদমান প্রত্যেকের বক্তব্যের পক্ষেই কুর'আন-সুন্নাহর দলীল থাকে, সেখানেও সবদিক চিন্তা না করে হুট করে পক্ষে বা বিপক্ষে একটা মন্তব্য করে দেওয়া একটা বোকামি বৈ কিছুই নয়। আমি কঠোরভাবে তোমাদেরকে বারণ করছি, হকপন্থীদের বিরুদ্ধাচারণ অনেক অনেক চিন্তাভাবনা করা ছাড়া কখনো করবে না। বহু চিন্তাভাবনার পরই কেবল তাঁদের ব্যাপারে মন্তব্য করবে এবং যতদূর সম্ভব তা এড়িয়েই চলবে।

'উমর ইব্‌ন 'আবদুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যাঁকে দ্বিতীয় 'উমর বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে– সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে তিনি কী উত্তম মিমাংসাই না দিয়েছেন। তিনি বলেন,

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللّٰهُ اَيْدِيْنَا مِنْهَا فَلَا نُلَوِّثُ اَلْسِنَتَنَا بِهَا

> "তাঁদের রক্তপাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাতসমূহকে পবিত্র রেখেছেন, সুতরাং আমাদের রসনাকে আমরা এর মধ্যে জড়িয়ে অপবিত্র ও কলংকিত করবো না।"[১]

যদি বলা হয়, সাহাবায়ে কিরামের শান ও মর্যাদা যেহেতু অনেক উঁচু, তাই অন্যদেরকে তাঁদের সাথে তুলনা করা চলে না, তবে আমি বলবো, সেখানে মন্তব্য থেকে আত্মরক্ষাকারীও হচ্ছেন 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযের মতো জলিলুল কদর ও মহাসম্মানিত তাবেয়ী। হযরত খিযির ও হযরত মূসা ('আলায়হিস সালাম)-এর ঘটনা সুবিদিত। কুর'আন মাজীদে তা বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর রহম করুন, তিনি যদি মৌনতা অবলম্বন করতেন তবে হযরত খিযির-

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

এর আরো অনেক রহস্যজনক ঘটনা জানা যেতো। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হযরত ঈসা ('আলায়হিস্ সালাম)-এর বাণী: ঘটনাগুলো তিন প্রকার হয়ে থাকে–

প্রথমত: যেগুলোর হিদায়াত ও কল্যাণকর হাওয়াটা সুস্পষ্ট, এগুলোর অনুসরণ করো।

দ্বিতীয়ত: ঐ সমস্ত বিষয় যেগুলো গুমরাহী ও অনিষ্টকর হওয়াটা সুস্পষ্ট, সেগুলোকে পরিহার করো।

তৃতীয়ত: ঐ সমস্ত বিষয় যেগুলোর হিদায়েত বা গুমরাহীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। সেগুলোর বিষয়ে অভিজ্ঞমহলের হাতে ছেড়ে দেওয়া বাঞ্চণীয়।

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে বেশি সাহসী ও বেপরোয়া, সে জাহান্নামের ব্যাপারে বেশি সাহসী ও বে-পরোয়া।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবেই ফতোয়া দিয়ে বসে সে একটা আস্ত পাগল।[১]

এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো– অনেক মানুষ অনর্থক প্রশ্ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে এই প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। আমল করার নিয়তে খুব কমই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অন্যকে অপদস্ত করার জন্য, অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য। এজন্য কিছু জানার প্রয়োজন হলে খুব সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। তারপরও অনেক সময় মাসআলার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে। তাই এমন সব মাসআলার সমাধান দিতে যাওয়াও বোকামি। একাধিক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একটি বাণী এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, এই দুয়ের মাঝে রয়েছে অনেক অস্পষ্ট বিষয়। সুতরাং সেগুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। তাই এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হলে সবসময় ঐ দিকটিই গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে সতর্কতা রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

> "যখন কাজের জিম্মাদারী অযোগ্যদের উপর অর্পিত হবে তখন থেকে তুমি কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকবে।"[২]

মুসলমানের গীবত ও মানহানি

আল্লাহ্‌র রাস্তায় কেবল জিহাদ, নফল নামায ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জরুরি আমল ও ইবাদতের পডবো নেক নিয়্যাতে যে-কোনো কাজ করলেই তার দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কাম্য হয়, মানুষের হক আদায় করা তার উদ্দেশ্য হয় তবে তাও আল্লাহ্‌র রাস্তা। যারা মনে করেন যে, দীনদারী কেবল ইবদতে মশগুল থাকার্ নাম, আর দুনিয়অদারী কাজে মশগুল হওয়াটা তার পরিপন্থী, তাঁরা ভুলে মধ্যে রয়েছেন। নির্ভরযোগ্য আলিমগণের কেউই এ কথা বলেন না যে, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় অবলম্বনাদি গ্রহণ করা যাবে না বা বর্জন করতে হবে। অবশ্য সেসব দুনিয়াদারী কাজও দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে– মান-মর্যাদা বৃদ্ধি, গর্ব, অহংকার বা লোকচক্ষে সম্মানিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। এতসব সত্ত্বেও অপর দিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রত্যেকের সম্পর্কেই তার উদ্দেশ্য ভাল নয় বলে কুধারণা পোষণ করাটাও ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস সম্পাদিত, *আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল* (ঢাকা: মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩২

২. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৬

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

> "হে ঈমানদারগণ! অনেক অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, অনেক ধারণাই পাপ এবং তোমরা একের অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না অর্থাৎ গোপনে গোপনে করা দোষের অনুসন্ধান করে বেরিয়ো না এবং তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"[১]

সাধারণভাবে আমাদের অবস্থা হলো এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের মন মত চলে সেই সরলমনা, মুত্তাকী, পরহেযগার, কিন্তু যখনই ঐ ব্যক্তিই আমাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু একটা করে বসে তখনি সে দালাল, ইংরেজের পা-চাটা গোলাম, হিন্দুঘেঁষা, স্বার্থপর, মতলববাজ, মীরজাফর, মক্করবাজ, প্রতারক, ইংরেজের বেতনভুক্ত বা কংগ্রেসরে বেতনভুক্ত, হেন এমন কোনো দূষণীয় শব্দ নেই– যা, তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় না। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ প্রকাশ করে দেন; এমন কি সে তার নিজ ঘরে (গোপনে) কোনো দোষ করলেও তিনি তাকে অপমানিত করেন।[২]

চারটি হাদীস মেনে চললে দীনের ওপর আমল হয়ে যায়

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

> "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র পাঁচটি হাদীস চয়ন করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) তাঁর কিতাবের জন্য পাঁচ লক্ষ হাদীসের ভাণ্ডার থেকে চার হাজার আটশ' হাদীস নির্বাচন করেছেন। সেগুলো থেকে মাত্র চারটি হাদীস চয়ন করেছেন। যে হাদীসগুলো মেনে চললে দ্বীনের উপর আমল হয়ে যায়। এ চারটি হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নির্বাচন করেছেন। পঞ্চমটিকে উল্লেখ করবো না। কারণ, এর মর্ম অন্যগুলোতে বলা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইনতিকাল করেছেন, ১৫০ হিজরীতে। আর আবূ দাঊদ জন্মগ্রহণ করেছেন ২০২ হিজরীতে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ৫২ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। বুঝা গেলো যে, ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) ইমাম আবূ হানীফার কথাটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ঐ চারটি হাদীসের মাঝে সম্পূর্ণ দ্বীন চলে এসেছে। যদিও কিছু কিছু আলেমের অভিমত হলো **النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ** হাদীসের মাঝে গোটা দ্বীন চলে এসেছে। সেই চারটি হাদীস হলো:
>
> ১। **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** "সমস্ত আমলের গ্রহণযোগ্য নিয়তের ওপরই নির্ভরশীল।"[৩]
>
> প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'আলাকে রাজি করার উদ্দেশ্যে করবে। যদি কোনো ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে– মানুষ আমাকে বুযুর্গ বলবে, তাহলে তার সেই নামায তার মুখের ওপর ছুড়ে মারা হবে। জমিনের উপর সিজাদার কপাল রাখতেই জমিন বলবে, লোক দেখানো সিজদা করে দিলে তো আমায় নোংরা করে দিলে।
>
> যদি এ সিজদাটিই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি সর্বোত্তম ইবাদত। *মাযাহিরে হক* গ্রন্থের লেখক, **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** এর ওপর আলোচনার এক পর্যায়ে লিখেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দুরাকাত নামায আদায়ের

---

১. আল-কুর'আন, ৪৯: ১২

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ০১

সাথে সাথে ইতিকাফের নিয়ত করে নেয়, আল্লাহওয়ালাদের যিয়ারত করার নিয়ত করে নেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে শুধু এই নিয়ত করার কারণে তার সাওয়াব বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

২। لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَرْضى لِأَخِيْهِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِه "নিজের জন্য যা পছন্দ, তা নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করা পর্যন্ত কোনো মুমিন সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না।"[১]

যদি প্রত্যেক মানুষ এ হাদীসের ওপর আমলকারী হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদ ও কলহ শেষ হয়ে যাবে। নিজের জন্য শোয়া শের আর অন্যের জন্য আধা সের– এই যদি হয় আমাদের মনোবৃত্তি, তাহলে ঝগড়া কীভাবে শেষ হবে? উক্ত হাদীসে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারের কথা এসেছে। কাজেই اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه "ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও মুখ থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"[২]– এ হাদীসটির ভাষ্য উপরিউক্ত হাদীসে চলে এসেছে। এটিকে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) স্বতন্ত্র গণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) এটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

৩। مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَا لَا يَعْنِيْهِ "সেই ব্যক্তির ইসলাম তখনই সুন্দর হবে, যখন সে অনর্থক বিষয়গুলো ছেড়ে দেবে।"[৩]

অনর্থক কাজগুলো যেমন দীনের ক্ষেত্রে কোনো উপকার বয়ে আনে না, তদ্রূপ দুনিয়াবী কোনো উপকারেও আসে না। একবার আমার কাছে এক ব্যক্তি চিঠি লিখে কয়েকজনের ব্যাপারে অহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে উত্তর দিলাম, কবরে কি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে? মুনকার-নাকীর কি এগুলো নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? তাহলে কেনো এগুলোর পেছনে পড়লে? যার প্রতি তোমার ভক্তি আসে, তার হাতে তুমি বায়আত হয়ে যাও। তুমি যাই করো না কেন? কবরে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে– তোমার ধর্ম কী? তাই প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেন আল্লাহ্ তা'আলার যিকির চালু থাকে।

৪। اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الخ "হালাল ও হারাম উভয়টাই স্পষ্ট।"[৪]

তবে এ দুটির মাঝখানে বেশ কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো থেকে বেঁচে থাকবে, তার দ্বীন ও ইয্যত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এরই নাম তাকওয়া। যেমন, কোনো জিনিসের ব্যাপারে সবাই একমত নন। কিছু 'আলিম জায়েয বলেন। আর কিছু 'আলিম নাজায়েয বলেন। তাহলে তা ছেড়ে দাও। নিজেকে ঝগড়ার মাঝখানে ফেলার কোনো দরকার নেই।

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ

"যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা ছেড়ে দাও।"[৫]

---

১. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১৩
২. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪০
৩. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩১৭; *ইব্ন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৯৭৬
৪. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৫২; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৫৯৯
৫. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ২৫১৮

ঐ জিনিস গ্রহণ করো, যার ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ নেই। হালাল ও হারাম উভয়টাই স্পষ্ট– এই হাদীসেও ঠিক সে কথাই বলা হয়েছে। وَلِكُلِّ مَلِكٍ حُمى প্রত্যেক রাজার একটি বিশেষ রক্ষিত জায়গা থাকে। যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রক্ষিত জায়গা হলো– 'হারাম'। সেগুলো থেকে নিজেকে অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। এটিকেই বলে তাকওয়া। এটাকেই বলে বুযুর্গী। এরই নাম তাসাওউফ।"[১]

প্রথম হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, সমস্ত ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় হাদীসের মাধ্যমে সমস্ত অধিকার জানা হলো– নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি ও পরিচিত লোকদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে?

তৃতীয় হাদীসে জীবনের মহামূল্যবান মুহূর্তগুলো হিফাযত করার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। মোটকথা, এ চারটি হাদীস একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক ও গুরুর ভূমিকা পালন করেছেন।[২]

তাকদীর ও তাদবীরের সংঘাত

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন,

"আমি আমার আব্বাজান মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধালবীর নিকট শুনেছি। একবার তাকদীর ও তাদবীরের মাঝে বিবাদ লেগে যায়। তাদবীর বলছে, মানুষ কাজ করে অব্যবস্থাপনার সাথে। যদি সে ব্যবস্থাপনার সাথে কাজ করত, তাহলে আর সে অসুস্থ হতো না। এভাবে সে ব্যবস্থাপনার একটির পর একটি উপটকারের ফিরিস্তি শোনাতে লাগল। তাকদীর তার লেকচার শুনে যেতে লাগল। সবশেষে সে চুপিসারে এতটুকু কথা যোগ করল, শর্ত হলো আমাকেও সঙ্গে থাকতে হবে। উভয়ের মাঝে লড়াই বেঁধে গেলো। তাকদীর ও তাদবীর উভয়ের মাঝে তিনদিনের একটি মেয়াদের ওপর দুজন একমত হলো– দেখা যাবে, কে বিজয়ী হয়?

পথে এক জেলের সাথে দেখা হলো। তাদবীর মানুষের আকৃতি ধারণ করে ঐ জেলের কাছে এসে বলল, "খামাখা কেনো এতো কষ্ট করছো? আমি তোমাকে একটি হীরা দিচ্ছি। এটি এত দামী হীরা যে, শুধু রাজা-বাদশাহ বা জহুরীদের পক্ষেই এর মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব। কোটি টাকার মাল। জেলে ভাবল, এভাবে ময়লা শরীরে রাজ দরবারে যাওয়া ঠিক হবে না। কাজেই গোসল সেরে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করলে ভালো হয়। তাই সে নদীর পাড়ে এসে ঐ হীরা ও কাপড়-চোপড় রেখে নদীতে নেমে পড়ল। হঠাৎ জোয়ার এসে তার সেই হীরা ও কাপড় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। মনের দুঃখ ঐ জেলে তখন নদীর পাড়ে বসে কাঁদতে লাগল।

পরদিন তদবীর পুনরায় মানুষের আকৃতি ধারণ করে ঐ জেলের সামনে হাজির হলো। তার দুঃখের ঘটনা শুনে সমবেদনা জানাল। এরপর তার হাতে একটি স্বর্ণের হার দিলো। এতে একটি লাল রঙের দামী পাথর ছিলো। অতঃপর তাদবীর বলল, আজ আর কালকের মতো বোকামি করো না। গোসলের প্রয়োজন নেই। এই হারটি খুবই দামী। চিল পাখি লাল বর্ণের প্রতিটি জিনিসকে গোশত মনে করে থাকে। এক চিল উড়ে এসে ঐ জেলে স্বর্ণের হারকে ছো মেরে নিয়ে গেলো।

---

১. মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
২. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, *বুস্তানুল মুহাদ্দসীন* (দারুল গরবিল ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ১১৯

যা-হোক তৃতীয় দিন তাকদীর এসে হাজির হলো। বলল, তুমি দেখি মহাগর্দভ। অনেকক্ষণ জেলেকে বকা-ঝকা করে একশ' রুপি দিয়ে বলল, যাও। এ টাকা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করো।

জেলে লোকটি তার হাত থেকে ঐ একশ' টাকা নিয়ে পরনের কাপড়ের মধ্যে শক্ত করে বেধে নিলো। ঘরে হাজির হয়ে জানতে পারল, স্ত্রী নেই। পার্শ্ববর্তী এক প্রতিবেশির বাড়িতে গেছে। সে তাড়াতাড়ি চুলার মাঝখান থেকে আগুন সরিয়ে তার মাঝে মুদ্রাগুলো রেখে স্ত্রীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। আগের যুগে সাধারণত ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। ততক্ষণে পাশের বাড়ির এক মহিলার আগুনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সে এসে সবকিছু উঠিয়ে নিজের সাথে নিয়ে গেলো। জেলে লোকটি ঘরে এসে দেখে, তার মুদ্রসমেত পুরো চুলো গায়েব। লোকটি তখন ঘরের মাঝখানে বসে কাঁদতে লাগল।

এভাবে তাদবীরের ব্যর্থতা প্রমাণিত হলো। স্ত্রী বলল, তোমার ওসব ঝারি-ঝুরি রাখ। ঘরে খাবারের কিছুই নেই। জেলে নদীতে এসে মাছ শিকার করে বাড়ি নিয়ে এলো। চুলোয় লাকড়ি নেই। লাকড়ির প্রয়োজনে সে জঙ্গলে যায়। দৈবচক্রে সেখানে একটি পাখির বাসা পেলো। বাসা ভাঙ্গতেই সেখানে সে তার হারিয়ে যাওয়া হারখানা পেয়ে গেলো। আনন্দের সে চিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে এলো। জেলে মুখে চিৎকার ও হম্বি-তম্বি শুনতে পেয়ে পাশের বাড়ির মহিলা মনে করলো, জেলে মনে হয় আমার চুরির কথা জানতে পেরেছে। সাথে সাথে মহিলাটি ঐ একশ' টাকার ধাতব মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, কেউ কি এতগুলো টাকা এভাবে ফেলে রাখে? ওদিকে স্ত্রী মাছ কাটার সময় মাছের পেটে হারানো হীরা পেয়ে গেলো। তখন তাকদীর বলল, আমার কাজ এভাবে আঙ্গুলির তুড়িতেই হয়ে যায়।

এ ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারলাম প্রয়োজন মাফিক আসবাব অবশ্যই গ্রহণ করবো, কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। তিনিই দাতা। আমি এ কথা বলি না যে, আসবাব ছেড়ে দাও। কিন্তু আসবাবকে মূল লক্ষ্য বানানো যাবে না।"[১]

১. মাওলানা তাকিয়ুদ্দীন নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষক, খলীফা ও সমকালীন 'আলিমগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষকগণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র খলীফাগণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সমকালীন 'আলিমগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষকবৃন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র শিক্ষকবৃন্দ

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন তাঁর পিতা। তিনি সিলেবাসভিত্তিক পড়ালেখা তথা মক্তব থেকে দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেছেন তাঁর পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী[১]'র নিকট এবং তাঁর চাচা মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবী[২]'র নিকট। এছাড়া তিনি আরো যাদের কাছে পড়েছেন।

১০ যিলকদ ১৩৩৪ হিজরী সনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার ইনতিকালে মুহ্যমান যোগ্য সন্তান মাওলানা যাকারিয়া পুনরায় হাদীস পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন করেই আদেশ করলেন, কোনো গড়িমসি করা চলবে না, *তিরমিযী* ও *বুখারী* পুনরায় আমার কাছে পড়তে হবে।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছে না। কিন্তু সাহারানপুরীর নির্দেশের অবজ্ঞা করারও কোনো সুযোগ নেই। সেদিন স্বপ্নে দেখি যে, শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী আমাকে বলছেন, যাকারিয়া ! তুমি আমার কাছে *বুখারী* পড়ো। ঘুম থেকে উঠে ভাবনায় পড়ে গেলাম, শায়খুলহিন্দ তো সুদূর মাল্টায় বন্দীজীবন যাপন করছেন। তাঁর কাছে কীভাবে পড়তে যাবো! মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, তুমি পুনরায় আমার কাছে *বুখারী শরীফ* পড়বে।"[৩]

অবশেষে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পুনপাঠ শুরু হলো। এ বছরটি ছিলো সীমাহীন মেহনত ও অধ্যাবসায়ের বছর। শায়খুল হাদীস বলেন, যতদূর আমার মনে পড়ে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ দুই-আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমাতাম না। সারারাত হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাদীসের দরসে বসতাম। এই অক্লান্ত সাধনা, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায় ও সীমাহীন শ্রমদান আমাকে খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নয়নমণি হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এর ফলশ্রুতিতে শায়খুল হাদীস লাভ করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য ও পূর্ণ আস্থা। ফলে শায়খুল হাদীসের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো– যাতে তাঁর পরবর্তী জীবনের সাফল্য, সমসাময়িকদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী এবং ইতিহাসের অমর পাতায় জুড়ে দেয় শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়ার স্বর্ণখোচিত নাম।[৪]

শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান

জন্ম

শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান হলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র উসতাযুল আসাতিযা বা ইলহামী শিক্ষক।[৫] মাওলানা যুলফিকার 'আলী বৃটিশ সরকারের ইন্সপেক্টর অব কলেজেস-এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বদলি করা হয়। ১৮৫১/১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পদে পরিবার পরিজনসহ বেরেলীতে যখন বসবাস করছিলেন তখন সেখানে তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

---

১. তাঁর জীবনী অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. তাঁর জীবনী অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪. মুহাম্মদ মাস'উদ 'আযীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৫. কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শায়খুল হাদীস স্বপ্নে দেখেছেন যে, শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান তাঁর কাছে হাদীস পড়তে বলেছেন। দ্র. সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী হাসানী, *সাওয়ানেহে মাওলানা ইউসুফ কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

এতে তিনি প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম রাখেন মাহ্মূদ হাসান। ভারতের অভিজাত শ্রেণির রীতি মুতাবিক তিনি মাতৃবাৎসল্যে লালিত-পালিত হন।[১]

শিক্ষা

শায়খুলহিন্দ অতি শৈশবেই লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন বলেন, "ছয় বছর বয়সে এই নেকবখ্ত্ শিশুটি 'আলিফ-বা' পড়তে বসেন।" বর্ষীয়ান বুযুর্গ মিয়াঁজী মঙ্গলূরীর কাছে কুর'আন মাজীদের অধিকাংশ পাঠ করেন। আর কুর'আন মাজীদের বাকী অংশ এবং ফারসি ভাষার প্রাথমিক স্তরের বই মিয়াঁজী 'আবদুল লতীফের কাছে পড়েন। অতঃপর তিনি ফারসি ভাষার উচ্চ কোর্সের গ্রন্থসমূহ এবং 'আরবী ভাষার প্রাথমিক স্তরের কিতাবসমূহ তাঁর সম্মানিত পিতৃব্য এবং প্রসিদ্ধ উস্তাদ মাওলানা মাহ্তাব 'আলীর কাছে অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দের সমবয়স্কগণ তাঁর শৈশবের চরিত্র সম্পর্কে বলেন- "তিনি অলিগলিতে অনর্থক ঘুরাফেরা করতেন না এবং অহেতুক খেলাধুলায় সময় কাটাতেন না।"[২]

পনেরো বছর বয়সে ১২৮৩ শায়খুলহিন্দ যখন *কুদূরী*, *শরহুত তাহ্যীব* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নরত ছিলেন তখন ১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরী, রোজ বৃহস্পতিবার। কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যক্তির মাধ্যমে তথা- (১) মাওলানা কাসেম নানুতবী, (২) হাজী সায়্যিদ 'আবিদ হুসায়ন,[৩] (৩) মাওলানা ইয়া'কূব নানুতবী, (৪) মাওলানা রফী'উদ্দীন, (৫) যুলফিকার 'আলী দেওবন্দী ও মাওলানা মাহ্তাব 'আলীসহ অন্যান্য 'উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল 'উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৪] উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক নির্বাচিত হন মাওলানা মুল্লা' মাহ্মূদ[৫] এবং প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান।[৬] অত্র দারুল 'উলূমে মুল্লা' মাহ্মূদ-এর কাছে তিনি ১২৮৩/১৮৬৬ খ্রি. থেকে ১২৮৬/১৮৬৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।[৭] যুলহিজ্জা ১২৮৩/১৮৬৬

---

১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, "মাহ্মূদ হাসান, মাওলানা," *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৮৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩. দারুল 'উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম মুহতামিম ছিলেন হাজী সায়্যিদ 'আবিদ হুসায়ন। তিনি ছিলেন চিশ্তিয়া সাবিরিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। তিনি রামপুরের বিশিষ্ট বুযুর্গ মিয়াঁজী করীম বখ্শ সাবিরীর খলীফা মাজায ছিলেন। তদুপরি তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেছিলেন। তিনি মুহাররম ১২৮৩/১৮৬৭ খ্রি. থেকে রজব ১২৮৪/১৮৬৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে সর্বপ্রথম মুহ্তামিম পদে বরিত হন। অতঃপর ১২৮৬/১৮৭০ খ্রি. থেকে ১২৮৮/১৮৭২ খ্রি. এবং সর্বশেষ রবী'উল আওয়াল ১৩০৬/১৮৮৯ খ্রি. থেকে শা'বান ১৩১০/১৮৮৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট তিনবার উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। ২৭ যুলহজ্জ ১৩৩১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন এবং ২৮ যুলহজ্জ ১৩৩১ হি. সনে শুক্রবার দেওবন্দে সমাধিস্থ হন। দ্র. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, (করাচি: ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৯৪; মাওলানা নসীম আহ্মদ ফরীদী, "জাওয়াহির পারে", *আল্-ফুরকান পত্রিকা*, (লক্ষ্মৌ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৯৪

৪. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫. মুল্লা' মাহ্মূদ দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও স্বনামধন্য বুযুর্গ। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন শাহ্ 'আবদুল গণী মুহাদ্দিস দেহ্লবী (মৃ. ১৮১২ খ্রি.)-এর কাছে। মুফতি মুহাম্মদ শফী' বলেন, "আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি যে, একবার মুল্লা' মাহ্মূদ বলেছিলেন, ইব্ন মাজার যে টীকা শাহ্ 'আবদুল গণীর নামে মুদ্রিত হয়েছে উক্ত টীকার অধিকাংশ সম্মানিত উস্তাদ শাহ্ 'আবদুল গণীর নির্দেশে আমি রচনা করি।" মুল্লা' মাহ্মূদ ছিলেন হাদীস ও ফিক্হ্ শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মীরঠের হাশিমী মুদ্রণালয়ে চাকুরিরত ছিলেন। যখন দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর উপদেশে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান। মুল্লা' মাহ্মূদ ১৩০৪-১৮৮৬ খ্রি. ইন্তিকাল করেন এবং দেওবন্দেই তিনি সমাধিস্থ হন। দ্র. মুফতি মুহাম্মদ শফী', *মেরে ওয়ালিদ মাজিদ*, (করাচি: ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৫১

৬. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *'উলামায়ে হক*, (মুরাদাবাদ: কুতুব খানা ফখরিয়া, ১৯৪৬ খ্রি.), খ-১, পৃ. ৬৭

৭. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তাযকিরা মাশায়িখে দেওবন্দ*, (বিজনৌর: মদনী দারুত্তালীফ, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৫৯

খ্রি. মাওলানা ইয়া'কূব 'আলী নানূতবী[১] উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস হিসেবে নিয়োগ লাভের পর তিনি তাঁর কাছেও দারুল 'উলূমের পাঠ্যভুক্ত উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর কাছে ১২৮৩/১৮৬৭ খ্রি. থেকে ১২৮৬/১৮৬৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে পড়াশুনা করেন।[২] ১২৮৮/১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের পরে স্বীয় পিতা যুলফিকার 'আলী (১২৩৭-১৩২২ হি.)-এর কাছে 'আরবী সাহিত্যের *দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, *হামাসা*, *আস্‌সাব্‘উল মু'আল্লাকাত* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ পড়েন।[৩] মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর[৪] কাছে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' এবং বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ ১২৮৬/১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। মাওলানা কাসেম নানূতবী এ সময়ে মীরঠের মুন্সী মুমতায 'আলী মুদ্রণালয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা লিখন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুদ্রণালয়টি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলে তিনিও সেখানে স্থানান্তরিত হন। কখনও তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে অবস্থান করতেন। আবার কখনও তিনি স্বীয় বাসভবন নানূতাতে বসবাস করতেন। মাওলানা মাহ্‌মূদ হাসান মীরাঠ, দিল্লি, নানূতা এবং দেওবন্দে তাঁর সাথে অবস্থান করে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বোধ্য গ্রন্থসমূহ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।[৫]

---

১. মাওলানা ইয়া'কূব নানূতবী ১৩ সফর ১২৪৯/১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দিল্লি সরকারি কলেজের 'আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাওলানা মামলূক 'আলী নানূতবী (মৃ. ১৮৫০ খ্রি.)। ইয়া'কূব নানূতবী দিল্লি সরকারি কলেজ থেকে 'আরবী বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি হাদীসের সনদ লাভ করেন শাহ্ 'আবদুল গণী (১৮১৯-১৮৭৮ খ্রি.)-এর কাছ থেকে। সর্বপ্রথম তিনি ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি হওয়ায় দেড়শত টাকা বেতনের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পঁচিশ টাকা বেতনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সদর মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন শাহ্ 'আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.)-এর স্থলাভিষিক্ত। তিনি ১২৮৩/১৮৬৭ খ্রি. থেকে রবী'উল আউয়াল ১৩০২/১৮৮৬ খ্রি. পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি অত্র দারুল 'উলূমের ফত্ওয়া বিভাগের প্রধান মুফতীও ছিলেন। তিনি অত্র বিভাগে ১২৮৩ হি. থেকে ১৩০১ হি. পর্যন্ত ফত্ওয়া বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (১৮১৭-১৮৯৯ খ্রি.)-এর কাছে বায়'আত হন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। তিনি ২ রবী'উল আউয়াল ১৩০২/১৮৮৬ খ্রি. নানূতা নগরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। দ্র. সায়্যিদ মাহ্‌বূব রিযবী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দিল্লি, পৃ. ১৪৪-১৪৫

২. মুফ্‌তী 'আযীযুর রহমান বিজনৌর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪. মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার ছোট্ট একটি ঐতিহাসিক নানূতা নগরে ১২৪৮/১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আসাদ 'আলী সিদ্দীকী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নানূতা নগরীতে লাভ করার পর দেওবন্দে মাওলানা মাহ্‌তাব 'আলীর বিদ্যালয়ে 'আরবী ও ফারসীর প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ১২৬০ হি. সনে দিল্লি সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে মাওলানা মামলূক 'আলীর কাছে উক্ত কলেজের সিলেবাসভুক্ত প্রায় সব গ্রন্থের পঠন সমাপ্তির পর শাহ্ 'আবদুল গণী মুহাদ্দিস (মৃ. ১৮৭৮ খ্রি.)-এর কাছে সুনান আবূ দাউদ ব্যতীত 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর সকল হাদীস গ্রন্থ এবং মাওলানা আহ্‌মদ 'আলী সাহারানপুরী (১৮১০-১৮৮০ খ্রি.)-এর কাছে সুনান আবূ দাঊদ অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়নেও তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। হাদীস অধ্যয়নের সাথে সাথে তিনি হাদীসের গূঢ় রহস্য প্রণয়নে তাঁর সহায়তা করেন এবং সহীহ্ বুখারীর শেষ পাঁচ পারার টীকা রচনা করেন। এই পারাগুলোর কিছু অংশ এমন যেখানে ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (জ. ৮০ হি.)-এর সমালোচনা করেছেন। তিনি এই অংশগুলোর টীকায় কুর'আন ও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং যৌক্তিক ও অকাট্য প্রমাণ দিয়ে ইমাম আবূ হানীফার উপর আরোপিত সমালোচনার খণ্ডন করেন এবং হানাফী মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর হাতে বায়'আত হয়ে তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। প্রথমে তিনি দিল্লি কলেজে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর মুন্সী মুমতায 'আলী মুদ্রণালয়ে টীকা লিখন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ বয়সে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে আগমন করত ১২৯৭/১৮৮০ খ্রি. পর্যন্ত আমৃত্যু উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠদানে রত থাকেন। তিনি উক্ত দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও দারুল 'উলূমের উন্নতি ও প্রসিদ্ধি তাঁরই হাতে হয়েছিল এবং তিনিই দারুল 'উলূমকে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করেছিলেন। দ্র. *বাংলা বিশ্বকোষ*, (ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯; শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার*, (লাহোর, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ২০০

৫. মুফ্‌তী 'আযীযুর রহমান, *তায্‌কিরা শায়খুলহিন্দ*, (বিজনৌর: মদনী দারুত তালীফ, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯

১৯ যুলকা'দা ১২৯০ হি./১৮৭৩ খ্রি. দারুল 'উলূমের শিক্ষা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শায়খুলহিন্দ সর্বশেষ সনদ ও দস্তারে ফযীলত (পাগড়ী) লাভ করেন।[১]

কর্মজীবন

দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই শায়খুলহিন্দ ১২৮৮-৮৯/১৮৭১-৭২ খ্রি. উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনারারি সহকারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে পাঠ দান করতে থাকেন।[২] শিক্ষার্থীদের ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে দারুল 'উলূমের পরিচালকবৃন্দ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেন। দারুল 'উলূম থেকে চূড়ান্ত সনদ লাভকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহ্তামিম মাওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন[৩] শিক্ষক হিসেবে মাওলানা মাহ্মূদ হাসানকে মনোনীত করেন। তিনি ১২৯২/১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত স্থায়ী চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আল্লাহ তা'আলা শায়খুলহিন্দের পিতা মাওলানা যুলফিকার 'আলী (১২৩৭-১৩২২)-কে কুর'আন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান দান করার সাথে অগাধ ধন-দৌলত দান করেছিলেন। তদুপরি তাঁর অন্তরও ছিল ঐশ্বর্যশালী। যখন শায়খুলহিন্দ দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন তখন তাঁর পিতা বিনা বেতনে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। তিনি নীরব ভূমিকা পালন করেন এবং শায়খুলহিন্দ-এর জন্য মাসিক পনেরো টাকা বেতন ধার্য করা হয়। শায়খুলহিন্দের নিয়োগ লাভের ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানে মোট চারজন শিক্ষক নিম্নলিখিত ধারাবাহিকতায় বরিত হন:

১) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব নানূতবী (১২৪৯-১৩০২হি.) সদর মুদার্‌রিস
২) মাওলানা সায়্যিদ আহ্মাদ দেহলবী (মৃ. ১৩৩১ হি.) দ্বিতীয় মুদার্‌রিস
৩) মাওলানা মুল্লা' মাহ্মূদ (মৃ ১৩০৪ হি.) তৃতীয় মুদার্‌রিস
৪) শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান (১৮৫১-১৯২০ খ্রি.) চতুর্থ মুদার্‌রিস।[৪]

শায়খুলহিন্দ বলেন,

> "শিক্ষক হিসেবে স্থায়ীপদে যোগদান করার সময়ে আমি কুত্বী ও কুদূরী পাঠদান করাকেই আমার জন্য গণীমত বলে মনে করতাম"।[৫]

শায়খুলহিন্দ পাঠদানের অভিনব কৌশল ও জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ১২৯৩/১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মিশকাতুল মাসাবীহ্, হিদায়া এবং সিহাহ্ সিত্তাহ্-এর গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগ্রন্থ *জামি'উত্ তিরমিযী* পড়াবার অনুরোধ করেন। সে মতে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ পাঠ দান করেন। অতঃপর ১২৯৫/১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর বিশুদ্ধতম হাদীসগ্রন্থ *সহীহ বুখারী*র পাঠদান শুরু করেন।[৬]

১২৯৪ হি. সনে মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নেতৃত্বে উপমহাদেশের বুযুর্গ 'আলিমগণের এক কাফেলা হজ্জব্রত সমাপনের জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে গমন

---

১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩. মাওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ফরীদুদ্দীন 'উসমানী। তিনি শাহ্ 'আবদুল গণীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে খিলাফত লাভ করেন। শাহ্ রফী'উদ্দীনের খলীফাদের মধ্যে মুফতী 'আযীযুর রহমান (১২৭৫-১৩৪৭) এবং মাওলানা সায়্যিদ মুরতাযা হাসান (ম. ১৯৫১ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম। তিনি হাজী 'আবিদ হুসায়ন (মৃ. ১৩৩১ হি.)-এর পর উক্ত দারুল 'উলূমের মুহতামিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১২৮৪ হি. থেকে ১২৮৫ হি. পর্যন্ত একবার এবং ১২৮৮ হি. থেকে ১৩০৬ হি. পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। ১৩০৮ হি. সনে মদীনা মুনাওয়ারাতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং জান্নাতুল বাকী'তে সমাধিস্থ হন। দ্র. মাওলানা কারী তায়্যিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; মাওলানা নসীম আহ্মদ ফরীদী, *জাওয়াহির পারে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪. মুফতী 'আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৫. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

করেন। শায়খুলহিন্দও উক্ত কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হন। হজ্জক্রিয়া সমাপন করে তিনি ১২৯৫ হি. সনের রবী'উল আউয়াল মাসে দারুল 'উলূম দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

হজ্জব্রত সমাপনের জন্য শায়খুলহিন্দের ছয় মাস অবকাশকালীন সময়ে উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর স্থলে মাওলানা 'আবদুল 'আলী[২] শিক্ষকতা করেন।[৩] তিনি দারুল 'উলূমে প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব রুটিন মাফিক অধ্যাপনায় পাঠ দানে লিপ্ত হন। ১৩০৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ক্রমশ উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করে সদর মুদার্‌রিস পদে অধিকৃত হন।[৪] এই সময়ে তিনি সদর মুদার্‌রিসের পদ অলঙ্কৃত করার সাথে সাথে শায়খুল হাদীসের পদের অধিষ্ঠিত হন। ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ১৯২০ খ্রি. পর্যন্ত আমৃত্যু তেত্রিশ বছর সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস এ উভয় পদেই সমাসীন থাকেন। তাঁর এ সময়েই সেই মাদ্‌রাসার চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং মুসালিম বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৫] শায়খুলহিন্দের পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, প্রসিদ্ধি, মাহাত্ম্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রচিত্ততা এবং অভ্যন্তরীণ সাহসিকতার ফলে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৬]

দারুল 'উলূমের সাথে শায়খুলহিন্দের সম্পর্ক ছিল গভীর। তাঁর পিতা উক্ত দারুল 'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শায়খুলহিন্দই ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষার্থী। আবার তিনিই ছিলেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস। আবার কখনও দেখা যায় যে, তিনিই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[৭] এমনিভাবে তিনি দারুল 'উলূম পরিচালনা করে ১৩৩৩ হিজরী সন পর্যন্ত *সহীহ্ বুখারী*র পাঠদান প্রদান করেন। ১২৮৯ হিজরী থেকে ১৩৩৩ হি. পর্যন্ত চুয়াল্লিশ বছরে শায়খুলহিন্দের প্রত্যক্ষ শাগরেদ্‌গণের সংখ্যা ছিল প্রায়

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪

২. মাওলানা 'আবদুল 'আলী মীরঠে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শায়খ নসীব 'আলী। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, মাওলানা আহমদ 'আলী সাহারানপুরী এবং মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী (১৮১৬-১৮৮৭ খ্রি.)-এর কাছে কুর'আন, হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে তিনি দিল্লির "মাদ্‌রাসা 'আবদুর রব"-এর সদর মুদার্‌রিস হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর তিনি ১২৯৪ হি. থেকে ১২৯৭ হি. পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৩১২ হি. সনে দিল্লির "মাদ্‌রাসা হুমায়ূন বখশ্"-এ আমৃত্যু শিক্ষকতা করেন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় ১৩ জুমাদাল ঊলা ১৩৪৭/২৯ অক্টোবর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্‌তিকাল করেন। ওয়ালিউল্লাহী পরিবারের কবরস্তান মাহানদিয়ূনে তিনি সমাধিস্থ হন। দ্র. মাওলানা 'আবদুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, (হায়দারাবাদ, ১৯৭০ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *মাশাহীরে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, ১৯৭০, পৃ. ৫৯-৬০; মাওলানা আশ্‌রাফ 'আলী থানবী, *হুসনুল 'আযীয*, থানাভুন, ১৩৮৬ হি. খ-২, পৃ. ৯৪-৯৫

৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০। ১৩০২ হি. মুতাবিক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব নানূতবী পরলোকগমন করেন তখন মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ দেহলবী মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সদর মুদার্‌রিস এবং মুল্লা' মাহ্‌মূদ মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক, শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ত্রিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে মাওলানা 'আবদুল 'আলী নির্বাচিত হন। ১৩০৪ হি. সনে প্রায় দু'বছর পর যখন দারুল 'উলূমের সর্বপ্রথম শিক্ষক মুল্লা' মাহ্‌মূদ ইন্‌তিকাল করেন তখন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস ১৩০৫ হি. মুতাবিক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে সদর মুদার্‌রিসের পদ থেকে ইস্‌তফা দিয়ে দারুল 'উলূম ত্যাগ করে ভূপাল চলে যান। শায়খুলহিন্দ ১২৯৫ হি. সন থেকে সহীহ্ বুখারীসহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিষয়সমূহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে অত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় নির্বিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে দারুল 'উলূমের কর্তৃপক্ষ শায়খুলহিন্দকে সদর মুদার্‌রিসের পদে বরণ করেন। দ্র. ফয়যুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৬-৬২৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৬. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৭. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

এগারশত। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থী, কিছু কিছু পাঠে অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ শাগরেদগণের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।[১]

শায়খুলহিন্দের রচনাবলী

শায়খুলহিন্দের রচনা তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আদিল্লা-ই কামিলা (ادلہ کاملہ)

এ রচনাটি *'ইয্হারুল হক'* নামেও অভিহিত। এ রচনাটি দুই অংশে লিখিত একটি পুস্তিকা। হিজরী ১২৯৪ খ্রি. শায়খুলহিন্দের দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার পঞ্চম বছরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নির্দেশে রচনা করেন। পুস্তিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র চব্বিশ। পুস্তিকাটি রচনার কারণ ছিল হিজরী ১২৯০ খ্রি. জনৈক গায়রে মুকাল্লিদ 'আলিম মাওলানা মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী 'রফ্'উল ইয়াদায়ন', ফরয নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ, ফরয নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে মুক্তাদীদের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ইত্যাদি দশটি মাস্আলায় হানাফী মাযহাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং বলেন, "কোনো হানাফী 'আলিম তাঁদের মতের সপক্ষে কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হলে তাঁকে প্রতি মাস্য়ালার বিনিময়ে দশ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

এ চ্যালেঞ্জটি হানাফী মতাদর্শের উপর একটি মারাত্মক আক্রমণ। চ্যালেঞ্জ পাওয়া মাত্রই পাঞ্জাবের জনৈক হানাফী 'আলিম মোটামুটি এর একটি উত্তর প্রদান করেন।[২] চ্যালেঞ্জের ঘোষণাপত্রটি দারুল 'উলূম দেওবন্দে পৌঁছে। এ চ্যালেঞ্জ পেয়ে শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁরা অনুভব করলেন যে, এ চ্যালেঞ্জ মূলত ইমামকুল শিরোমণি ইমাম আবূ হানীফা (৮০ হি.-১৫০ হি.) কে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য। যদি এ চ্যালেঞ্জের বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক কোন জবাব না দেয়া হয় তবে চ্যালেঞ্জকারীরা প্রতারণা করে হানাফী মাযহাব থেকে সর্বসাধারণকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পাবে। তাই শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা নানূতবীর ইঙ্গিতে শায়খুলহিন্দ উক্ত চ্যালেঞ্জের উত্তর রচনায় প্রবদ্ধ হন। তিনি এ রচনাটি অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখে চ্যালেঞ্জকারীকে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেন। পুস্তিকাটি দু'অংশে রচিত হয়েছিল: (ক) প্রথমাংশ ছিল চ্যালেঞ্জকারীর প্রশ্নের উত্তর এবং (খ) শেষাংশে শায়খুলহিন্দ চ্যালেঞ্জকারী মাওলানা বাটালবীকে সম্বোধন করে এমন দুর্বোধ্য এগারোটি প্রশ্ন করেন যেন চ্যালেঞ্জকারী নিজের মতবাদ ত্যাগ করে কোন মাযহাবের অনুসরণ করেন নতুবা প্রশ্নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চুপ থাকেন।[৩] মাওলানা নানূতবী এ পুস্তিকাটিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা হিসেবে আখ্যায়িত করে তা' প্রকাশ করে দেন।[৪]

মাওলানা বাটালবীর চ্যালেঞ্জের উত্তর 'আদিল্লা-ই কামিলা' প্রকাশিত হওয়ার পর শায়খুলহিন্দ মাওলানা বাটালবীর প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছিলেন যে, তিনি সত্যের সন্ধান পেয়ে তা' গ্রহণ করেন কিনা। মাওলানা বাটালবী উত্তর পেয়ে তার 'ইশা'আতুস্ সুন্নাহ' মাসিক পত্রিকায় বরাবর অঙ্গীকার করে আসছিলেন যে, অনতিবিলম্বেই তিনি এর উত্তর প্রদান করবেন। পরবর্তীতে আর কখনও মাওলানা

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২. Barbara Daly Metcalf, *Islamic Rcvival in British India: Deoband, 1860-1900*, (Princeton: Princeton University Press, 1982), pp. 212-213. He said that fellow Hanafis found his effort something of an embarrassment. The Panjabi Hanafi 'Alim was Probably Maulawi Muhammad 'Umar Rampri (d. 1878), Who is noted as having written an answer to Batalwi. "তিনি বলেন, সহকর্মী হানাফীর কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে পাঞ্জাবী হানাফী 'আলিম মাওলানা মুহাম্মদ 'উমর রায়পুরী (মৃ. ১৮৭৮ খ্রি.) তিনি বাটালবীকে একটি জবাব দিয়েছেন এই বলে উল্লেখ করেছেন।"

৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৪. প্রাগুক্ত।

বাটালবী আদিল্লা-ই কামিলার উত্তর প্রদান করেননি। অনাকাঙ্খিতভাবে জনৈক আহ্‌লে হাদীস 'আলিম মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্‌সান আমরূহী শায়খুলহিন্দ রচিত *'আদিল্লা-ই কামিলা'*-এর প্রতি উত্তরে *'মিস্‌বাহুল আদিল্লা লিদফ'ইল আদিল্লা'* লিখে প্রকাশ করেন। শায়খুলহিন্দ এ প্রতিউত্তর পেয়েও মাওলানা বাটালবীর অঙ্গীকারকৃত প্রতিউত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি প্রতিউত্তরের একত্রে একসঙ্গে উত্তর দেয়া। পরবর্তীতে যখন মাওলানা বাটালবী তাঁর মাসিক পত্রিকায় ব্যক্ত করলেন যে, আমি শায়খুলহিন্দ রচিত *'আদিল্লা-ই কামিলা'*-এর একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জবাবী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এজন্য আমি এর প্রতিউত্তরের যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা' নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। মাওলানা বাটালবীর এ ঘোষণা পাওয়ার পর শায়খুলহিন্দ মাওলানা নানূতবীর নির্দেশে 'আদিল্লা-ই কামিলা'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করেন। এ ব্যাখ্যার ফলে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্‌সানের অভিযোগ খণ্ডন এবং তাঁর বিভ্রান্তিসমূহ অপনোদন হয়ে যায়।[১] আর শায়খুলহিন্দ এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম রাখেন *'ঈযাহুল আদিল্লা'*।

ঈযাহুল আদিল্লা (ایضاح الادلہ)

উপরোল্লিখিত কারণে শায়খুলহিন্দ এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান। তিনি দিনের বেলায় দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যাপনা এবং রাতের বেলায় পাঠাগারে অধ্যয়ন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমাধা করে গভীর রাতে এ গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন। রচিত অংশটুকু প্রত্যহ দিনের বেলায় তিনি শ্রদ্ধেয় উস্‌তাদ মাওলানা নানূতবীকে পড়ে শুনাতেন। তাঁর এ ক্ষুরধার লেখা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করতেন। গ্রন্থের কিয়দাংশ লেখার পর মাওলানা নানূতবী হজ্জপালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্‌তিকালে শায়খুলহিন্দ বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অধ্যাপনাসহ যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দেন। ফলে এ রচনাও বন্ধ হয়ে যায়।[২]

দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্‌তামিম মাওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন (১৮৩৬-১৮৯০ খ্রি.)-এর তাওয়াজ্জুহ, আন্তরিকতা ও পরামর্শে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় তিনি দারুল 'উলূমে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। পক্ষান্তরে উল্লিখিত রচনার কাজ এভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দীর্ঘ সময় এভাবে অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সাহেবযাদা হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ[৩]-এর বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩০

২. প্রাগুক্ত।

৩. হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরে ১২৭৯/১৮৬২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী। নয় বছর বয়সে কুর'আন মজীদ হিফ্য্ করার পর তিনি বলন্দ শহর জেলার গালাওঠীতে মান্‌বাউল 'উলূম মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুরাদাবাদের শাহী মাদরাসায় মাওলানা আহ্‌মদ হাসান আমরূহী (১৮৫০-১৯১১ খ্রি.)-এর কাছে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে শায়খুলহিন্দের কাছে 'আরবী সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কূব নানূতবী (১৮৩৪-১৮৮৬ খ্রি.)-এর কাছে জামি' তিরমিযীর কিছু অংশ পড়েন। সর্বশেষ মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫ খ্রি.)-এর কাছে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। ১৩০৩/১৮৮৫ খ্রি. দারুল 'উলূমের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ, তাফসীরুল জালালায়ন, সহীহ্ মুসলিম, সুনান ইবন্ মাজা, মীর যাহিদ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পড়াতেন। দশ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৩১৩/১৮৯৫ খ্রি. মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর পরামর্শক্রমে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্‌তামিম নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু ১৩৪৭/১৯২৮ খ্রি. পর্যন্ত উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মুহ্‌তামিম হওয়ার পরও যথারীতি তিনি উল্লিখিত সমুদয় কিতাবের পাঠ দান করতেন। তাঁর সময়েই দারুল 'উলূমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সময়কাল ছিলো দারুল 'উলূম দেওবন্দেও স্বর্ণযুগ। ১৩৪৭/১৯২৮ খ্রি. দারুল 'উলূম দেওবন্দের বিশেষ কোনো কাজে তিনি হায়দারাবাদ গমন করেন। এখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে দেওবন্দে ফেরার পথে নিযামাবাদ রেল স্টেশনে ৩ জুমাদাল ঊলা ১৩৪৭/১৯২৮ খ্রি. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৪ জুমাদাল ঊলা হায়দাাবাদের 'খিত্তা সালিহীন' কবরস্তানে সমাধিস্থ হন। দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্‌তামিম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (রহ.) তাঁরই কৃতি সন্তান ছিলেন। দ্র. নাসীম আহ্‌মদ আমরূহী, 'মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ,' *মাসিক আল্-ফুরকান*, (লক্ষ্ণৌ: মার্চ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ২৬-২৭

শায়খুলহিন্দ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ-এর বারংবার পীড়াপীড়িতে রচনার কাজ পুনরায় আরম্ভ করতে বাধ্য হয়ে উল্লিখিত গ্রন্থের লেখা সম্পন্ন করেন।[১]

শায়খুলহিন্দ *'ঈযাহুল আদিল্লা'* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "আহলে হাদীস 'আলিম মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্‌সান নিজেকে মুজতাহিদ দাবি করা সত্ত্বেও আমার লিখিত প্রমাণসমূহের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হননি। এজন্য আমি 'আদিল্ল কামিলা'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গ্রন্থটিকে প্রামাণিকভাবে বোধগম্য করে দেই। যেহেতু রচিত গ্রন্থটি 'আদিল্লা-এ-কামিলা'-এর ব্যাখ্যা তাই এর নাম রাখা হলো *'ঈযাহুল আদিল্লা'*।"[২] রচিত গ্রন্থখানিতে হাদীসের অর্থসমূহের বিশ্লেষণ, বর্ণনাসমূহের সামঞ্জস্য বিধান এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় মুজতাহিদগণের মতামতসমূহের সমন্বয় সাধনে তিনি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত অসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। মৌলিক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এমন উন্নত ধরনের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা মধ্যম মেধাসম্পন্ন লোকের কল্পনায়ও আসতে পারে না। এভাবেই কুর'আন, হাদীস এবং মুজতাহিদগণের মতামতসমূহের ব্যাখ্যা এমন নিপুণতার সাথে করেছেন যে, পাঠকের মুখ থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ে ان هذا لهو الحق المبين অর্থাৎ নিশ্চয় এটা অবশ্য প্রকাশ্য সত্য।[৩] 'ঈযাহুল আদিল্লা'-এর মৌলিক বিষয়সমূহ এই–

১) ফকীহ্ 'আলিমগণের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা
২) হাদীসশাস্ত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের স্থান
৩) رفع اليدين অর্থাৎ নামাযে উভয় হাত কোন্ সময়ে কান পর্যন্ত উঠাতে হবে তার বর্ণনা
৪) امين بالجهر অর্থাৎ নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে মুক্তাদীগণের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা
৫) নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা
৬) قراءة خلف الامام অর্থাৎ নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরা'আত পাঠ করা
৭) জুমু'আ ওয়াজিব হওয়া এবং এর শর্তাবলী
৮) 'তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব
৯) 'তাকলীদ'-এর প্রকারভেদ এবং এর বিধানাবলী
১০) যুহরের নামাযের সময় এবং 'মিস্‌লায়ন'-এর বর্ণনা
১১) ঈমানের হাকীকত
১২) ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি এবং শরী'অতগত মর্মার্থ
১৩) মুরজিয়া এবং খারিজী সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য
১৪) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যাদান খণ্ডন
১৫) কাযীর রায়ের প্রয়োগ ও কার্যকর করার শর'ঈ ও যৌক্তিক আলোচনা
১৬) ইসলামী হুকূমতের হাকীকত
১৭) ইসলামী হুকূমত ও ইলাহী হুকূমত এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য
১৮) রাষ্ট্রের উপকরণ এবং এর হাকীকত
১৯) شرعى قبضه অর্থাৎ শরী'অতগত স্বামিত্ব বা মালিকানার হাকীকত
২০) ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্লেষণ
২১) ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় এবং বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য

---

১. সায়্যিদ আসরগ হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
২. শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান, *ঈযাহুল আদিল্লা*, (দেওবন্দ: কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.), পৃ. ৬; 'ঈযাহ্' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আদিল্লা-এর অর্থ প্রমাণাদি। আর *'ঈযাহুল আদিল্লা'*-এর অর্থ 'আদিল্লা'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। অতএব গ্রন্থটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।
৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত।

২২) قلتين অর্থাৎ দু'মটকি পানি এবং ১০ در ১০ অর্থাৎ একশ' বর্গহাত পানি সম্পর্কিত বর্ণনা

২৩) ماء كثير অর্থাৎ অধিক পরিমাণ পানি সম্পর্কে ইমামত্রয়ের মতামত এবং বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন

এই মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনায় শায়খুলহিন্দ এ ধরনের অতুলনীয় সূক্ষ্ম গবেষণা ভাণ্ডার উন্মোচিত করেছেন 'যা' পাঠমাত্র পাঠকের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে যায় যে, এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলহাম বা ঐশী ইঙ্গিত। এর পাশাপাশি উর্দূ ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। এর সাথে সাথে অনেক উর্দূ ও ফারসী কবিতা যথাস্থানে সংযোজিত হয়েছে। তিনি এ অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার চারশ' পৃষ্ঠায় লিখে হিজরী ১২৯৯ সনে সমাপ্ত করেন। আর তখনি মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে আসে এবং সকলের কাছে তা সমাদৃত হয়। শায়খুলহিন্দের পাণ্ডিত্য, বৈশিষ্ট্য এবং কীর্তিকে জীবিত রাখার জন্য তাঁর এ গ্রন্থটিই যথেষ্ট।[১]

হিজরী ১২৯৯ সনে *'ঈযাহুল আদিল্লা'* গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মীরাঠের হাশিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল তিনশত ছিয়ানব্বই। সায়্যিদ আসগর হুসায়ন[২] এর সম্পাদনায় হিজরী ১৩৩০ সনে অন্য একটি সংস্করণ কাসিমী প্রেস দেওবন্দ থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল তিনশত ছিয়ানব্বই। অবিকল এ সংস্কারণই মুদ্রিত হয় মুলতানের ফারূকী কুতুবখানা থেকে। দারুল 'উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আহ্মদ মুরাদাবাদী (১৮৮৯-১৯৭২ খ্রি.)-এর সম্পাদনা এবং 'আরবী বাক্যের উর্দূ অনুবাদসহ মুরাদাবাদের ফখরিয়া কুতুবখানা থেকে গ্রন্থটি চতুর্থবার মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারশ'। পঞ্চমবার প্রকাশিত হয় দেওবন্দের কুতুবখানা রহীমিয়া থেকে। ষষ্ঠবার মুফতী আহ্মদুর রহমানের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে কারাচির এইচ. এম. সা'ঈদ কোম্পানি থেকে।

'আহ্সানুল কুরা ফী তাওযীহি 'আওসাকিল 'উরা (احسن القراء في توضيح أوثق العرى)

গ্রামে কি জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে? এ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি দিল্লির এক আহ্লে হাদীস 'আলিমের কাছে ফত্ওয়া প্রার্থনা করলে উত্তরে আহ্লে হাদীস 'আলিম বলেন, "জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য কোন স্থানের শর্ত নেই; বরং দু'ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যে কোন স্থানে গ্রামে হোক বা শহরে হোক আদায় কতে পারবে।" এ ফত্ওয়ায় স্বাক্ষরদাতা জনৈক আহ্লে হাদীস 'আলিম হানাফী মায্হাবকে অশালীন ভাষায় গালমন্দ করেন।[৩]

এ-ফত্ওয়াটি যখন মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর খিদমতে পেশ করা হয় তখন তিনি এ ফত্ওয়াটিকে অশুদ্ধ এবং ভ্রান্ত ফত্ওয়া বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর তিনি বিশুদ্ধ রিওয়ায়ত দ্বারা গ্রামে জুমু'আ

---

১. জুবাইর আহ্মদ আশ্রাফ, "শায়খুলহিন্দ ও তাঁর রচনাবলী," *ফয়যুল 'উলূম স্মরণিকা*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫

২. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন হি. ১২৯৪ সনে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ মুহাম্মদ হাসান (মৃ. ১৩১২ হি.)। তিনি তাঁর পিতার কাছে কুর'আন মজীদ এবং গুলিস্তাঁ পর্যন্ত ফারসী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ১৩১০ হি. সনে ফারসীর চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তাঁর ফারসীর উস্তাদ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ য়্যাসীন (১২৮২-১৩৫৫ হি.) এবং মাওলানা মনযুর আহ্মদ। অতঃপর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের 'আরবী বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৩২০ হি. সনে শায়খুলহিন্দের কাছে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদমণ্ডলীর মধ্যে মাওলানা হাবীবুর রহমান (মৃ. ১৯২৯ খ্রি.), মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদ (১৮৬২-১৯২৮ খ্রি.), মুফতী 'আযীযুর রহমান (১২৭৫-১৩৪৭/১৯২৮ খ্রি.) এবং গোলাম রসূল বাফভী (১৮৫৪-১৯১৯ খ্রি.)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩২১ হি. সনে জৌনপূরের 'আটালা মাদ্রাসা'য় সদর মুদার্‌রিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৩২৭ হি. পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। অতঃপর তিনি শায়খুলহিন্দের পরামর্শক্রমে সেখান থেকে আগমন করে দারুল 'উলূম দেওবন্দের মাসিক 'আল-কাসিম' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি ১৩৩০ হি. সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। উর্দূ ভাষায় ফিক্হ, ফারায়িয এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। গুজরাট-এর 'রান্দের' নামক স্থানে হি. ১৩৬৪ সনের ২২ মুহাররম সোমবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তথায় তিনি সমাধিস্থ হন। দ্র. ফুয়ূযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

নাজায়িয হওয়া সম্পর্কিত একটি প্রামাণিক ফত্ওয়া প্রদান করেন। এ ফত্ওয়াটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আহ্লে হাদীস 'আলিমদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে মাওলানা মুহাম্মদ সা'ঈদ স্বতন্ত্রভাবে 'আওসাকুল 'উরা' পুস্তিকার উত্তর প্রদান করে মাওলানা গঙ্গূহীর ফত্ওয়াটিকে খণ্ডন করার অপপ্রয়াস চালান। অপরদিকে মাওলানা আবুল মাকারিম জুমু'আর নামায গ্রামে অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে মাওলানা যহীরুল হাসান রচিত ফত্ওয়াকে খণ্ডন করে একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এ রচনার শেষভাগে *'আওসাকুল 'উরা'* পুস্তিকা সম্পর্কে অমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেন।

উপরোক্ত দু'টি পুস্তিকায় বিভ্রান্তিকর ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় শায়খুলহিন্দ এর একটি উত্তর রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রচনা না লিখে তিনি গঙ্গূহী রচিত *'আওসাকুল 'উরা'*-এর বিশ্লেষণ এবং এর উপর কিছু সংযোজন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম রাখেন *'আহ্সানুল কুরা ফী তওযীহি আওসাকিল 'উরা'*। এ গ্রন্থটি মাওলানা গঙ্গূহীর জীবদ্দশায় তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া প্রকাশ করেন।[১]

জুহ্দুল মুকিল্লি ফী তানযীহিল মু'ইয্যি ওয়াল মুযিল্লি (جهد المقل في تنزيه المعز والمذل)

শায়খুলহিন্দের এ রচনাটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি রচনা। মূলত এ রচনাটি বিদ'আত এবং বিদ'আতীদের অপনোদন এবং সুন্নত ও শরী'আতের ধারক ও বাহকবৃন্দের সপক্ষে রচিত। এ গ্রন্থটি মুনাযারা শাস্ত্রের একটি জ্ঞানভাণ্ডার। গ্রন্থটি রচনার কারণ এই যে, মাওলানা ইসমা'ঈল শহীদ (১৭৮১-১৮৩১) *'তাকবিয়াতুল ঈমান'* গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইমকান-ই নযীর'[২] ও 'ইমকান-ই কিয্ব'[৩]-এর উপর ক্ষমতাশালী হওয়া প্রমাণ করেছেন।

পরবর্তীতে রামপুরের মাওলানা 'আবদুস সমী' নামক জনৈক 'আলিম হি. ১৩০৩ সালে মাওলানা ইসমা'ঈল শহীদের উল্লিখিত বিষয়দ্বয় চ্যালেঞ্জ করে *আন্ওয়ার-ই সাতি'আ* নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে এর প্রতিউত্তরে শায়খুলহিন্দ *'আল-জুহ্দুল মুকিল'* রচনা করেন।

আজ-জুহ্দুল মুকিল গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো ইমকান-ই নযীর ও ইম্কান-ই কিয্বে বারী তা'আলা বিষয়দ্বয়ের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কালাম শাস্ত্রের কতিপয় সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়।

কুর'আন মাজীদের অনুবাদ (ترجمة القرآن)

বিশিষ্ট কয়েকজন 'আলিমের অনুরোধে এবং বিশিষ্ট বুযুর্গ দারুল 'উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরের পৃষ্ঠপোষক মাওলানা 'আবদুর রহীম রায়পুরী (মৃ. ১৩৩৭/১৯১৯ খ্রি.)-এর উদ্দীপনায় শায়খুলহিন্দ-এর কুর'আন মজীদ অনুবাদ করার আগ্রহ জন্মে। তিনি মৌলিকভাবে নতুন অনুবাদ না করে শাহ্ 'আবদুল কাদির (১৭৫৩-১৮২৭)-এর উর্দূ অনুবাদের সংস্কার সাধন করেন। অনুবাদে তিনি অপ্রচলিত শব্দের স্থলে সহজবোধ্য শব্দ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং দুর্বোধ্য বাক্যকে সহজ

---

১. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *আহ্সানুল কুরা*, (দেওবন্দ: কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.) পৃ. ৪

২. *Imkan-I nazir*: Whether God could create another prophet of the status of Muḥammad. Isma'īl had argued in the "Taqwwiat" that he could: " Verily the power of this king of kings is so great, that in a twinkling, solely by pronouncing the word 'Be', he can, if he like, create scares of apostles, saints, ganii and angels of similar ranks to Gabriel and Moḥammad. (*Barbara Daly Metcalf*, Islamic Revival in British India: Decband, 1860-1900, p 65) "ইমকান-ই নাযীর: আল্লাহ্ মুহাম্মদের অবস্থানে অন্য নবী সৃষ্টি করতে পারেন। ইসমা'ঈলের তাকওয়াতে তিনি যুক্তি পেশ করেছেন। বাদশাহ্র বাদশাহ্-এর ক্ষমতা এতই বড় যে, তিনি যদি "বে" শব্দটি উচ্চারণ করে জিবরাইল ও মুহাম্মদের অনুরূপ এবং ফেরেশতাদের ভীতি প্রদর্শন করতে তাহলে করতে পারেন।"

৩. ইমকান-ই কিয্ব: আল্লাহ্ তা'আলা কি মিথ্যা বলতে পারেন? মাওলানা ইসমা'ঈল 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে বলেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনি প্রত্যেক বিষয়োপরি ক্ষমতাশীল। তিনি মন্দ ও গর্হিত কাজ করা থেকে পবিত্র বিধায় তিনি মিথ্যা বলেন না। দ্র. শাহ্ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল, *তাক্বিয়াতুল ঈমান*, (কানপুর: মুন্শী নওয়াল কিশোর, ১৮৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৯৯

সরল করে সকলের বোধগম্য করার প্রয়াস চালান। কুর'আনের বিভিন্ন অনুবাদ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ পর্যালোচনা করে উল্লিখিত কাজের সূচনা করেন। প্রতিটি শব্দের পর্যবেক্ষণ ও স্থানোপযোগী সঠিক শব্দ প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ার পর অনুবাদে তা' ব্যবহার করতেন।

অনুবাদের সাথে সাথে টীকায় সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, গূঢ়রহস্য এবং বিধিবিধান রচনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কুর'আনের টীকা লিখতে সক্ষম হননি; বরং সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার টীকা সমাপন করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। টীকার অবশিষ্টাংশ শায়খুল ইসলাম মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী সমাপন করেন।[১]

আল্-আব্ওয়াবু ওয়াত্‌তারাজিমু লিল বুখারী (الابواب والتراجم للبخاري)

শায়খুলহিন্দের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *الأبواب والتراجم* গ্রন্থটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি *সহীহ্ বুখারী*র জটিল বিষয়বস্তু *ترجمة الباب*-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীস শাস্ত্রে শায়খুলহিন্দ পারদর্শী, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। তদুপরি *সহীহুল বুখারী*র সাথে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান ভাণ্ডারের সূক্ষ্মতত্ত্ব, গূঢ়রহস্য ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তিনি *সহীহুল বুখারী*র *باب*-এর সাথে *ترجمة*-এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মূল্যবান ব্যাখ্যা আলোচনাসহ নিজের উদ্ভাবিত মূল্যবান সমাধানও বর্ণনা করতেন। মাল্টার বন্দীশালায় কুর'আন মজীদের অনুবাদ সম্পন্ন করার পর শায়খুলহিন্দ *সহীহ্ বুখারী*র *ترجمة الباب* রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তাঁর কাছে শুধু টীকাবিহীন *সহীহুল বুখারী*র একটি মিসরীয় কপি বিদ্যমান ছিল। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উর্দূতে *باب*-এর সাথে *ترجمة*-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও গূঢ় রহস্য স্বীয় স্মৃতিশক্তির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লিখতে শুরু করেন। শুরু থেকে একশত সাতষট্টি *باب* পর্যন্ত পৌঁছার পর মাল্টা বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করে স্বদেশ ভারতে চলে আসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সাক্ষাতের জন্য দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড সমাগম এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান এবং বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় মাত্র পাঁচ মাস জীবিত থাকার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে এ-রচনা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।[২] শায়খুলহিন্দের চৌষট্টি পৃষ্ঠা সম্বলিত এ রচনাটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন না হলেও এটি অনন্য ও উপকারী জ্ঞানভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। হাদীস শাস্ত্রের সাথে জড়িত অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপকবৃন্দের জন্য এটি সমভাবে সহায়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের শুরুতে মাওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ দু'পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ভূমিকা লিখেন এবং মাওলানা 'উযায়র গুলের তত্ত্বাবধানে এটা প্রকাশিত হয়।

তাস্‌হীহ-এ আবূ দাউদ

শায়খুলহিন্দ বহুকাল যাবত দারুল 'উলূম দেওবন্দে *সুনান আবূ দাঊদে*র পাঠদান করেন। পাঠদানকালে হাদীসের 'মতন'-এর বাক্যসমূহে যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কপিগুলোকে একত্রিত করার পর যে বিভিন্নতা গোচরীভূত হয় তা' দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে একটি সূচির আকারে একত্রিত করে হাদীসের মতনকে শুদ্ধ করে দেন। এ সম্পর্কে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন বলেন, "শায়খুলহিন্দ *'সুনান আবূ দাউদ'*-এর মুদ্রিত, অমুদ্রিত, নতুন ও পুরাতন বিভিন্ন কপি সামনে রেখে একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাঠদান শেষে অবকাশকালীন সময়ে নির্বাচিত কয়েকজন অধ্যয়নোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে এ মহান দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন। বাক্যের প্রতিটি শব্দ ও হরকত ইত্যাদি নিরীক্ষা করে বিশুদ্ধ বাক্য লিপিবদ্ধ করতেন। আর যে সকল বাক্য মুদ্রণের প্রমাদজনিত কারণে

১. জুবাইর আহ্‌মদ আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২. শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান, *আল-আব্ওয়াব ওয়াত্‌তারাজিম*, (বিজনৌর: মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৪

হাদীসের মূল 'মতন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল সেগুলোকে তিনি একটি সুন্দর বিন্যাসের সাথে টীকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেন। কোথাও কোনো বাক্যে কোনো শব্দ বাদ পড়ে গেলে তা'ও তিনি সন্নিবেশ করে দেন। এ ব্যাপারে *সুনান আবূ দাঊদ* ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি প্রচুর শ্রম ব্যয়ে হিজরী ১৩১৮ সালে *সুনান আবূ দাঊদে*র হাদীসের 'মতন' শুদ্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি দিল্লির মুজতবায়ী মুদ্রণালয়কে ছাপার দায়িত্ব প্রদান করেন।"[১]

হাশিয়া-এ *মুখতাসারুল মা'আনী*

এটি 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফ্তাযানী (রহ.) রচিত '*মুখতাসারুল মা'আনী*'-এর একটি অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিস্ময়কর টীকা। পাকভারত উপমহাদেশে এ গ্রন্থটি ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। শায়খুলহিন্দ ১২৯২/১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর মা'আনী ও বালাগত তথা অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *মুখতাসারুল মা'আনী* পড়াতে থাকেন।

মুখতাসারুল মা'আনী মূলত মা'আনী ও বালাগত শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ '*তালখীসুল মিফ্তাহ্*'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। কোনো কোনো স্থানে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটির ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য। তদুপরি কোনো কোনো বাক্য এত জটিল যা বিদ্যার্থীদের জন্য বোধগম্য নয়। শায়খুলহিন্দ দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা ও জটিল বাক্য এবং শব্দসমূহের টীকা রচনা করে গ্রন্থটিকে সহজবোধ্য ও কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের টীকায় '*দসূকী*' গ্রন্থের পঁচানব্বই ভাগ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন আর পাঁচভাগ উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'তারজীদ' ও 'চল্পী' গ্রন্থ থেকে। টীকায় তিনি *দসূকী* গ্রন্থের উদ্ধৃতি এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন যে, এ দ্বারা বুঝা যায় যে, 'মা'আনী,' 'বালাগাত' তথা অলঙ্কার শাস্ত্র বোধগম্যের জন্য দসূকী গ্রন্থের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু 'দসূকী' গ্রন্থটি অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর বিস্তারিত ও বিশাল একটি গ্রন্থ। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থটি অধ্যয়নের জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন। তিনি টীকায় 'দসূকী'-এর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়সমূহকে সহজ ও সরল করে দিয়েছেন। যদি কেউ '*দসূকী*' গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করতে চায় তবে তার জন্য তা' হবে সোনায় সোহাগা। তিনি '*মুখতাসারুল মা'আনী*'-এর টীকায় '*দসূকী*'-এর সারবস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করে অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর এক বিরাট অবদান রেখেছেন।

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থটি পাঁচশত চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এ গ্রন্থের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে টীকায় পূর্ণ আলোচনার সার সংক্ষেপ বলে দেয়া হয়েছে।[২]

তাকরীর-এ *তিরমিযী*

এ গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বায়ান্ন। সাইজ বড়। এ গ্রন্থটি শায়খুলহিন্দের তকরীর থেকে মাওলানা 'আবদুশ শকূর (মৃ. ১৯৬৩ খ্রি.) 'আরবীতে লিপিবদ্ধ করেন। এতে ইমাম তিরমিযীর ব্যবহৃত পরিভাষার উপর আলোচনা করা হয়েছে। *তিরমিযী*র এ 'আরবী তাকরীর *জামি' তিরমিযী*র শেষ ভাগে কিতাবুল 'ইলাল-এর সঙ্গে পরিশিষ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

আল্ওয়ারদুশ শাযী

এ গ্রন্থটি জামি' তিরমিযীর উর্দূ ভাষায় রচিত শায়খুলহিন্দের তাকরীর। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা একশত বিরানব্বই। শায়খুলহিন্দের পাঠদানের সময়ে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন অতি সতর্কতার সাথে *জামি' তিরমিযী*র তকরীর উর্দূ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এতে ইমাম তিরমিযীর ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের

---

১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০

২. এ গ্রন্থের সমাপ্তিতে শায়খুলহিন্দ লিখেন, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে ও অপার মহিমায় যা' লিখতে ইচ্ছে করেছিলাম তা' পূর্ণ হল। বর্ষিত হোক দরূদ ও সালাম সায়্যিদুল বাশার ও তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর। শায়খুলহিন্দ টীকার সমাপ্তিতে 'আরবীতে যা' লিখেছেন তা' এই: "وقدتم ما اردناه بمنه ونوا له والصلواة والسلام – على سيد البشر وآله بنده محمود حسن عفى عنه ديوبندى" দ্র. জুবাইর আহ্মদ আশ্রাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

ব্যাপক আলোচনা এবং অধ্যায়ে হাদীস সম্পর্কিত বিষয় এবং তার অর্থের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর *জামি' তিরমিযী* গ্রন্থটি ফিক্হী পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত বিধায় শায়খুলহিন্দের তাকরীরও ফিক্হী পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। এটি ১৯৫০ খ্রি. দেওবন্দের কুতুবখানা আসগরিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।[১]

আল-ফায়যুল জারী

এটি *সহীহুল বুখারী*র 'আরবী ভাষায় লিখিত শায়খুলহিন্দের তাকরীর। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বিরানব্বই। সাইজ মধ্যম। দারুল 'উলূম দেওবন্দের উস্তাযুল হাদীস মাওলানা 'আবদুল আহাদের তত্ত্বাবধানে লেখকের ভূমিকাসহ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।[২]

শায়খুলহিন্দের অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর অবস্থার চরম অবনতি হয়। এ দিন কিছু সময় চেতনা ফিরে পেলে মাথা উত্তোলন করে বলতে লাগলেন– "মৃত্যুর জন্য দুঃখ করছি না, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। আকাঙ্ক্ষা ছিল জিহাদের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করবো এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করব।"[৩]

১৮ রবী'উল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরী মুতাবিক ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বরে অপরাহ্ন সাতটায় অচেতন হয়ে পড়েন। উপস্থিত দর্শনার্থী লোকজন দু'আ, দরূদে লিপ্ত ছিলেন। হঠাৎ এ-সময়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলেন। তাঁর শিরোপরি 'সূরা ইয়াসীন'-এর তিলাওয়াত হচ্ছিল। রাত আটটায় 'সূরা ইয়াসীন' শেষ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি নিজে নিজেই শরীর সোজা করে শুয়ে পড়লেন এবং চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত করে মুখে (কালিমা) উচ্চারণ করতে লাগলেন।

অতঃপর সূরা ইয়াসীন পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং কিবলামুখী হয়ে এ জগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।[৪]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ নভেম্বর রাত ৯ টায় দেওবন্দে মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর সমাধির পার্শ্বে এবং শায়খুলহিন্দ-এর পিতা মাওলানা যুলফিকার 'আলী'র কবর সংলগ্ন স্থানে তিনি সমাধিস্থ হন।[৫]

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ১২৬৯ হিজরীর সফর মাসের শেষে মুতাবেক ১৮৫২ খ্রি. ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে সাহারানপুর জেলার নানুতা উপশহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিতা মাতা বিবি মুবারকুন নিসা দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসা'র সদরুল মুদাররিস মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী-এর আপন বোন এবং মাওলানা মামলূক 'আলী'র কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামী মাজীদ 'আলী বিভিন্ন এস্টেটে চাকরী করার কারণে মুবারকুন নিসা নিজ পিত্রালয়ে বসবাস করতেন।[৬]

যময সন্তান জন্ম

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী'র মাতা যমষ সন্তান প্রসব করেন। তাঁর জন্মের এক ঘণ্টা পূর্বে তাঁর ভাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই দেখতে সুন্দর ও সবল ছিলো। তাই সকলে তার দেখা-শোনা ও আদর যত্নে ব্যস্ত ছিলো। অথচ কেউ শিশু খলীল আহমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না। অন্যদিকে

১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, "তকরীর-এ তিরমিযী," *মাসিক আল্-কাসিম*, দেওবন্দ, ১৯৪৭ খ্রি., পৃ. ১৮৭

২. জুবাইর আহমদ আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

৩. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৪. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-১৮৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৬. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, মুফতী ইমরান ইব্ন ইলিয়াস অনূদিত, *তাযকিরাতুল খলীল* (ঢাকা: মুকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৬০

তিনি দুর্বল ও কমজোর শরীর নিয়ে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি ধাত্রীমাতা তাকে ঠিকমত গোসলও করায়নি। পাতলা একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে পৃথক একটি খাটের উপর রেখে দিয়েছিলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কিছুক্ষণ পরেই প্রথম শিশুটি মৃত্যুবরণ করে। এবার সবাই খলীল আহমদের কদর বেড়ে যায়। সকলেই যেন তাকে আদর-স্নেহ ও সোহাগ করতে লাগলেন।[১]

প্রাথমিক শিক্ষা

মাওলানা খলীল আহমদের বয়স যখন ৫ বছর। তখন তিনি মক্তবে আসা-যাওয়া করেন। তাঁর নানা মাওলানা মামলুক 'আলী বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়ে তাঁর আরবী কায়দার সবক শুরু করে দেন। জন্মগতভাবে তিনি অত্যান্ত মেধাবী ছিলেন। সেজন্য অল্প সময়ে কুর'আন মাজীদ নাযেরা সমাপ্ত করে ফেলেন। এরপর মাতৃভাষা উর্দূ পড়তে শুরু করেন। ঐ সময় ১৯৫৭ খ্রি. এমন একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে; যা হিন্দুস্তানের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা[২] হিসেবে প্রসিদ্ধ।

উর্দূ ফারসী শিক্ষার সূচনা

মাওলানা খলীল আহমদ আম্বাঠা ও নানুতার বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট কুর'আন মাজীদ শিক্ষা করেন। পাশাপাশি তিনি উর্দূ ও ফারসী ভাষার প্রাথমিক স্তরের কিতাব অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে শেখ সা'দীর *বুস্তাঁ* ফারসী কিতাবটি তিনি আয়ত্ব করে ফেলেন।

চাচার স্নেহ-মমতা ও আরবী শিক্ষার সূচনা

একবার মাওলানা খলীল আহমদের চাচা মৌলভী আনসার আলী (গোয়ালিয়ার এস্টেটের গভর্নর) ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। এ সময় ভাতিজা খলীল আহমদের মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি ও আগ্রহ দেখে তিনি তাঁকে গোয়ালিয়ায় নিজের কাছে নিয়ে যান এবং 'আরবী ও দ্বীনীয়াত শিক্ষা দেন। সেসময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ১১ বছর। তিনি চাচা'র নিকট আরবী ব্যাকরণের বই *মীযানুস্ সরফ*, *সরফে মীর* ও *পাঞ্জেগাঞ্জ*সহ আরবী ব্যাকরণের আরো কয়েকটি বই পড়ে সমাপ্ত করেন।[৩]

দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি

মাওলানা খলীল আহমাদ ও তাঁর চাচাতো ভাই মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ উপশহরের একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তারা ৬ মাস ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ১২৮৩ হিজরী সনের মুহার্‌রমমাসে ঐতিহাসিক দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পান। তিনি আরো জানতে পারেন যে, সেখানে তাঁর সম্মানিত মামা মাওলানা ইয়া'কূব নানুতুবী সদরুল মুদাররিস তথা প্রধান শিক্ষকের স্থান অলঙ্কৃত করেছেন। সেখানে তিনি মামা'র নিকট চলে আসেন। মাওলানা ইয়া'কূব তাঁকে জামাতে কাফিয়ায় ভর্তি করিয়ে দেন।

মাযাহিরে 'উলূম মাদরাসায় ভর্তি

১২৮৩ হিজরীতে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ৬ মাস পর রজব মাসে মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ৬ মাস অধ্যয়নের পর মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসার সদরুল মুদাররিস তথা প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাযহার নানুতুবী ছিলেন। তিনিও মাওলানা সাহারানপুরী'র নিকটতম আত্মীয়তার দিক থেকে মামা হতেন। সেসময় মাযাহিরুল 'উলূমে কাফিয়া ও শরহে জামী' জামাত ছিলো না। তাই তাঁর মামা মাওলানা মাযহার নানুতুবী তাঁকে মুখতাসারুল মা'আনী তথা শরহে জামী' জামাতে ভর্তি করেন। এভাবে যখন ১২৮৪

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২. ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এটি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। নতুবা এটি ছিলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। এর ফলে পাকিস্তানের গোড়াপত্তন হয়। কেননা বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা আন্দোলন নামে জিহাদ চলতে থাকে। অনেক 'আলিম এতে শাহাদাত বরণ করেন। অনেক আলে হিজরত করে দেশ ত্যাগ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী উক্ত জিহাদের সমাপ্তির পর হিন্দুস্তান ত্যাগ করে মক্কা-মদীনায় হিজরত করেন। অনেক 'আলিমকে বন্দী করা হয় এবং অনেককে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। বড় বড় ইসলামী পাঠাগারগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য কুরআন মাজীদের কপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঙ্গিকে আকমণ চালানো হয়। দ্র. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

হিজরী সনে তিনি ১৯ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন দরসে নিযামী বা কওমী শিক্ষা সিলেবাস সমাপ্ত করেন এবং মাত্র ৫ বছরের মধ্যে দাওরায়ে হাদীস পাসের সনদ অর্জন করেন।[১]

_মিশকাত শরীফ_ ও সিহাহ সিত্তা গ্রন্থের অধ্যয়ন

মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুর মাদারাসার অতীত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, হাদীসশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ *মিশকাতুল মাসাবীহ* তিনি ১২৮৫ হিজরীতে অধ্যয়ন করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হন। এ বিরল কৃতিত্বের জন্য তিনি *মুখতাসারুল মা'আনী* ও *শরহে 'আকায়িদ* নামক দুটি কিতাব পুরস্কার পান। অনুরূপভাবে ১২৮৬ হিজরীতে *সহীহুল বুখারী* ও *আল-হিদায়া* ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করেন। এজন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে তাঁকে *জামি' তিরমিযী* কিতাবটি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।[২]

হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ

যদিও তিনি কুর'আন, হাদীস ও যুক্তিবিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু তবুও রাসূলের হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রের প্রতি তাঁর যে আগ্রহ ছিলো তার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। একথা প্রমাণের জন্য তাঁর সংকলিত হাজার হাজার ফতোয়ার ঐ সংকলন এখনো বিদ্যমান; যা মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় বড় বড় ৪ খণ্ডে লিখিত ও সংকলিত।[৩]

লাখনৌতে _আবূ দাঊদ_ অধ্যয়ন

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী সিহাহ সিত্তার অধিকাংশ কিতাব মাওলানা মাযহার নানুতুবী'র নিকট সমাপ্ত করেন। কিন্তু সেসময় তিনি *আবূ দাঊদ* পড়েননি। সুতরাং *বাযলুল মাজহূদ* রচনার সময় শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া'র জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমি দাওরায়ে হাদীস পড়ার সময় *আবূ দাঊদ* শরীফ পড়িনি; বরং চাকুরীতে যোগদান করার পরে পড়েছি। আমি যেখানে চাকুরী করতাম না কেনো, রমযান মাসে বাড়িতে আসতাম এবং আমার সম্মানিত শিক্ষক রমযানের ছুটিতে লাখনৌতে তাঁর শ্বশুরালয়ে আসতেন। এক বছর আমিও রমযানে লাখনৌতে অবস্থান করি এবং তাঁর নিকট *আবূ দাঊদ* অধ্যয়ন করি।[৪]

হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা

তিনি মাওলানা মাযহার নানুতুবী-এর নিকট থেকে প্রথম সনদ অর্জন করেন। এটা দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়নকালীন সময়ের সনদ। যার ধারাবাহিকতা এরূপ: তাঁর উসতায (১) মাওলানা মাযহার নানুতুবী, তাঁর উসতায (২) মাওলানা মামলূক 'আলী, তাঁর উসতায (৩) মাওলানা রশীদুদ্দীন খাঁন দেহলবী, তাঁর উসতায (৪) মাওলানা শাহ্ 'আবদুল 'আযীয দেহলবী, তাঁর উসতায (৫) হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী। তাঁর সনদ (হাদীস বর্ণনার সূত্র) উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় সনদ: মাওলানা 'আবদুল কাইয়ুম থেকে

তিনি ১২৯৩ হিজরী সনে যখন তিনি ভূপালে শিক্ষকতায় নিয়োজিত তখন তিনি বুধানার অধিবাসী মাওলানা 'আবদুল কাইয়ুম-এর নিকট থেকে পুনরায় *বুখারী শরীফ*, *শামায়েলে তিরমিযী* ও *মুসলিম শরীফে*র কিছু অংশ পড়েন যিনি মাওলানা শাহ্ ইসহাক-এর সুযোগ্য ছাত্র ও জামাতা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৩. উক্ত ফতোয়া সংকলনকে মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মাযহার নানুতুবী দিকে সম্বন্ধ করে ফতোয়ায়ে মাযহারী নামকরণ করা হয়। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৪. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

ছিলেন। এছাড়া হাদীসে মুসালসালা[1]তে হুজ্জাতুল্লাহ্, নাওয়াদের, দুররে সামীন[2] ইত্যাদি অধ্যয়ন করে তিনি যাবতীয় হাদীসের কিতাবের ইজাযত ও সনদ অর্জন করেন।[3]

তৃতীয় সনদ: শায়খ আহমাদ দাহলান থেকে

তিনি ১২৯৩ হিজরীর শেষ দিকে তিনি সর্বপ্রথম হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ সফর তাঁর ফরয হজ্জ আদায়ের সফর ছিলো। মক্কায় তিনি শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা শায়খ আহমাদ দাহলান[4]-এর নিকট হাদীস বর্ণনা ও পড়ানোর ইজাযত অনুমতি লাভ করেন।[5]

চতুর্থ সনদ: শাহ্ 'আবদুল গণী মুজাদ্দেদী থেকে

তিনি মদীনায় মাওলানা শাহ্ 'আবদুল গণী মুহাজির মুজাদ্দেদী নকশেবন্দী-এর নিকট সংক্ষেপে সকল হাদীসের কিতাবের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনিয়ে ইজাযত ও মুলতাযামে দু'আ কবুল হওয়ার হাদীসের বিস্তারিত ইজাযত লাভ করেন।[6]

পঞ্চম সনদ: শায়খ ইসমা'ঈল রূমী থেকে

মদীনাতে শায়খ ইসমা'ঈল ইব্ন ইদরীস রূমী[7] নিজের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টচিত্তে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীকে সিহাহ সিত্তার সকল কিতাব বর্ণনা ও পড়ানোর ইজাযত দেন। উক্ত পাঁচ উসতাযের সনদ বিস্তারিতভাবে সংকলন করে একটি স্বতন্ত্র বই আকারে ছাপানো হয়। বইটির নামকরণ করা হয় "*আল-ইয়ানিউল জানী*"।[8]

কর্মজীবন

১৩০৮ হিজরী সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হন। তারপর ১৩১৪ হিজরী সনে সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরে নিয়োগ হন।[9]

বায়'আত

তিনি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হজ্জব্রত পালনের সময় তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী'র সাথে সাক্ষাতের পর খিলাফত পান এবং পাগড়ী প্রাপ্ত হন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী বলেন,

تم (خلیل احمد سہارنپوری) میرے سلسلے کے فخر ہو، مجھے تم سے بہت خوشی اور مسرت ہے

---

১. হাদীসে মুসালসালাত হলো এমন হজাদীস যা রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাহাবীহগণ পেয়েছেন। অতঃপর ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরায় বিশেষ পন্থায় যে হাদীস পৌঁছে তাকে মুসালসাল হাদীস বলে। বিশেষ পদ্ধতি বলতে মুসাফাহার সাথে, যমযমের পানি ও খেজুর খাওয়ানোর দাওয়াতের মাধ্যমে, কখনো বা মুলতাযামে (হাজরে আসওয়াদ থেকে কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত অংশকে মুলতাযাম বলে। এ স্থানে দু'আ কবুল হয়) দু'আ কবুলের ঘটনার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এসেছে। এ বিষয়টি (হাদীসে মুসালসালাত) পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২. দুররে সামীন এমন হাদীস, যা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে সরাসরি পেয়েছেন। কোনো শিক্ষকের মাধ্যমে পাননি। তা স্বপ্নেও হতে পারে অথবা জাগ্রত অবস্থায় মুশাহাদা বা দর্শন লাভের মাধ্যমেও হতে পারে। দ্র. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. তিনি শাফী' মাযহাবের বড় মুফতী ছিলেন।

৫. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৬. প্রাগুক্ত।

৭. তিনি ম্যাকডোনিয়া নামক স্থানের প্রখ্যাত "আলিম ছিলেন। দ্র. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৮. প্রাগুক্ত।

৯. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

"তুমি আমার সিলসিলার গর্ব আমি তোমাকে অত্যন্ত মুহাব্বত করি এবং আমি তোমার উপর খুশি আছি।"[১]

রচনাবলী

তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে–

১) *হিদায়াতুর রশীদ*

২) *মিতরাকাতুল কারামাহ*

৩) *ইতমামুন নিয়াম*

৪) *তানশীতুল আযান*

৫) *আল মুহান্নাদ*

৬) *বাযলুল মাজহূদ* এ গ্রন্থটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। তবে এ গ্রন্থটি রচনায় শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র অবদানও উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ উস্তায শাগরেদ উভয়ের বদৌলতে এ গ্রন্থটি আজ আমাদের মাঝে বিদ্যমান।[২]

শাগরেদবৃন্দ

এছাড়াও তাঁর ইসলাহী ও রূহানী কার্যক্রমের আওতায় তাঁর অবদান হচ্ছে, তাঁর বিশিষ্ট খলীফাগণ। খলীফাগণের অন্তরে তিনি আল্লাহ্‌র ভালোবাসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন। এ ধারাও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাঁর খলীফাগনের তালিকা নিম্নরূপ–

১) সর্বপ্রথম খলীফা হলেন, হাফেয কমারুদ্দীন, সাহারানপুর মসজিদের ইমাম।

২) মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধালবী, তিনি মাওলানা রশীদ আহামদ গাঙ্গুহী-এর ইনতিকালের পরপরই মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট থেকে ইজাযত পান।

৩) মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ গাঙ্গুহী, তিনি ১৩২৭ হিজরীতে খলীফা হিসেবে ইজাযত লাভ করেন। তোপখানাতে ইনতিকাল করায় কান্ধালা কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৪) নকশবন্দিয়া তরীকায় তিনি মক্কা মুকাররমায় মাত্র একজন হাজীকে ইজাযত দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হলো– হাজী মুহাম্মাদ হুসায়ন হাবশী। কিন্তু তুরস্কের বিপ্লবের সময় তিনি তথায় চলে যান তা আর জানা যায়নি।

৫) খলীলিয়া সিলসিলার বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন, শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস।
৬) মাওলানা 'আশেক এলাহী মিরাঠী
৭) জনাব হাফেয ফখরুদ্দীন, রেলওয়ে কর্মকর্তা, গাজিয়াবাদ।
৮) মাওলানা জাফর আহমাদ 'উসমানী, তিনি মাওলানা আশ্রাফ 'আলী থানবী'র খানকার মুফতী ছিলেন।
৯) মাওলানা হাফেয ফয়যুল হাসান গাঙ্গুহী, কানপুরী।
১০) মাওলানা বদরুল আমীন মিরাঠী
১১) মুফতী জামিল আহমাদ থানবী
১২) মাওলানা রশীদ আহমাদ, আঞ্জুমানে হেদায়েতুর রশীদ মাদরাসার শিক্ষক, গুরুট শহরতীল, হিলকর এস্টেট।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
২. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

১৩) শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীসহ আরো অনেকে।[১]

ওফাত

৭৭ বছর বয়সে ১৫ রবিউস সানী ১৩৪৬ হিজরী সনে যুগশ্রেষ্ঠ ‘আলিম ও বুযুর্গ মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজি‘উন। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকী‘তে ওসমান জিন্নুরাইন-এর পাশে সমাহিত করা হয়।[২]

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম রশীদ আহমাদ, পিতার নাম: মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্। তিনি পিতা ও মাতা দুই দিকেই প্রসিদ্ধ সাহাবী মেজবানে রাসূল আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযী আল্লাহু আনহু)-এর বংশের ছিলেন। ৬জিলকাদা ১২৪৪ হিজরী, মুতাবিক ১৮২৯ খ্রি. ভারত বর্ষের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহ এলাকাতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ ঘরে পিতার কাছেই অর্জন করেছেন। পিতার ইনতিকালের পর তাঁর মামা শিক্ষা ও তারবিয়াতের জিম্মাদারী নিয়েছিলেন। গাঙ্গুহী-এর নানাবাড়ি ছিল গাঙ্গুহতে। দাদাবাড়ি ছিল রামপুরে, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর দাদা কাযী পীর বখ্শ গাঙ্গুহ-তে এসে বসবাস শুর করেন। তিনি ফার্সী কিতাবগুলো তাঁর মামা মাওলানা মুহাম্মদ গাউসের কাছেই পড়েন।

পরবর্তীতে তাঁর দাদা রামপুরের বিজ্ঞ ‘আলিম মিয়াজী মুহাম্মদ বখ্শ-এর নিকট পঠিয়ে দেন। মাওলানা সাহেব গাঙ্গুহকে ‘আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা *হেদায়াতুন নাহু* পর্যন্ত পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য দাদাজান কাযী পীর বখ্শ তাঁকে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন এবং প্রতি মাসে খরচের জন্য তিন রুপি পাঠিয়ে দিতেন।

গাঙ্গুহী দিল্লিতে যাওয়ার পর বেশিরভাগ কিতাবে তা‘লীম মাওলানা মামলূক ‘আলী-এর নিকট অর্জন করেন। কিন্তু কিছু কিছু কিতাব মুফতী সদরুদ্দীন-এর নিকটও পড়েন। প্রথম অবস্থায় কাযী আহমদ উদ্দিন পাঞ্জাবী দেহলবী-এর নিকটও পড়েছিলেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন ‘উলূম ও ফুনূন বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দের নিকট পড়েন। তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে ১২৬৪ হিজরী সনে শাহ্ ‘আবদুল গনী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর নিকট হাদীস সমাপ্ত করে নিজ গ্রামে গাঙ্গুহে ফিরে আসেন।

ওফাত

এ ইলমের সাগর ৯ জুমাদাস সানী ১৩২৩ হিজরী, মুতাবিক ১১ আগস্ট ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জুমু‘আর আযানের পর ৭৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। গাঙ্গুহতেই শাহ্ ‘আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী-এর মাযারের একটু সামনে নিজ বাগানে দাফন করা হয়।[৩]

মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী

তিনি উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সুফি, লেখক ও ইসলামি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯২০ খ্রি. কংগ্রেস-খিলাফত জোট তৈরিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ভারতীয় উলামা ও কংগ্রেসের যৌথ আন্দোলনের পথটি তিনি তৈরী করে

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন* (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৪-৬৬

দিয়েছিলেন ১৯২০-১৯৩০ খ্রি. জুড়ে তার বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে। তিনি ভারত ভাগ, দ্বিজাতি তত্ত্বের বিপক্ষে ছিলেন এবং সংযুক্ত ভারতের অভ্যন্তরে সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলেন। রাষ্ট্র গঠনের জন্য আঞ্চলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তিনি জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি এবং দারুল 'উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস ছিলেন। তার সময়কালে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষাক্রম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি দেওবন্দ আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সমাদৃত। ইসলামী শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য ও অবদানের জন্য তাকে শায়খুল ইসলাম উপাধি দ্বারা সম্বোধন করা হয়।[১]

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত করে। ভারতের এই তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননায় যাদেরকে প্রথম ভূষিত করা হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ২০১২ খ্রি. ২৯ আগস্ট ভারতীয় ডাক বিভাগ তাঁর সম্মানে একটি স্মারক ডাকটিকিট বের করেছে।[২]

তিনি ১৮৭৯ খ্রি. ভারতের উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৮৯২ খ্রি. তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। মাহমূদ হাসান দেওবন্দির তত্ত্বাবধানে তিনি ইসলামী শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে ১৮৯৯ খ্রি. তিনি মদীনা চলে যান এবং মসজিদে নববীতে অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করেন। মসজিদে নববীতে তিনি ১৮ বছর শিক্ষকতা করেছেন যার কারণে তাঁকে 'শায়খুল হারাম' বলা হয়। ১৯১৫ খ্রি. মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে মদীনায় আগমন করলে তিনিও তাঁর সাথে যোগ দেন। ১৯১৬ খ্রি. মক্কার শরীফ হুসাইন ইব্ন আলির বিদ্রোহের কারণে হিজাযের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে চলে গেলে দেওবন্দী গ্রেফতার হয়ে মাল্টায় নির্বাসিত হন। দেওবন্দীর বার্ধক্যের কথা চিন্তা করে মাদানী তাঁর সাথে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। প্রথমবারের বন্দি জীবনে তিনি দেওবন্দীর সান্নিধ্যে থেকে তার চিন্তাধারা ও রাজনীতি গভীরভাবে আত্মস্থ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করেন। ১৯২০ খ্রি. মুক্তি লাভের পর তিনি দেওবন্দীর সাথে ভারতে চলে আসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। এর ছয় মাস পর দেওবন্দী মৃত্যুবরণ করলে তিনি দেওবন্দীর উত্তরসূরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এ কারণেঁ তাকে 'শায়খুলহিন্দ' বলা হয়।[৩]

১৯২০ খ্রি. কলকাতায় আবুল কালাম আজাদ নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে দেওবন্দীর নির্দেশে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এখান থেকেই তার পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯২১ খ্রি. জুলাই মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খেলাফত সম্মেলনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করা হারাম ঘোষণা করেন। ফতোয়াটি একইসাথে মুদ্রিত হয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হন এবং দুই বছর পর ১৯২৩ খ্রি. মুক্তি পান। এরপর তিনি সিলেটে চলে এসে শিক্ষাদীক্ষায় নিয়োজিত হন। তিন বছর পর ১৯২৭ খ্রি. তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে চলে যান এবং সদরুল মুদাররিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রি. পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপিত হলে তিনি এতে সমর্থন করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২ খ্রি. পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে কংগ্রেস ও জমিয়ত বেআইনি ঘোষিত হয়। তাই জমিয়ত কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে একটি 'অ্যাকশন কমিটি' গঠন করে যেখানে তিনি তৃতীয় সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। একারণে ১৯৩২ খ্রি. তিনি তৃতীয়বারের মতে গ্রেফতার হন। ১৯৩৬ খ্রি. নির্বাচন উপলক্ষে তার সাথে মুসলিম লীগের সম্পর্ক গঞে ওঠে। তার সাথে বৈঠকের পর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য জমিয়তের ২০ জনসহ মোট ৫৮ জন নিয়ে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিম লীগ ভালো ফলাফল করলেও সারাদেশে কংগ্রেস

১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, তা.বি.), খ-২, পৃ. ৫১১
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে উভয় দলের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে চলে যায়। মুসলিম লীগও জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে সরে গিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এ কারণে তার সাথে মুসলিম লীগের দূরত্ব সৃষ্টি হলে তিনি পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে ইস্তফা দেন এবং অখণ্ড ভারতের পক্ষে জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি ভারত বিভাজনকে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র মনে করতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ সমর্থিত পত্রিকাগুলোর বিরূপ প্রচারণার কারণে তাকে কাফের ফতোয়াও দেওয়া হয়। এসময় আল্লামা ইকবাল তাকে বিদ্রূপ করে কবিতা প্রকাশ করলে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়, ইতিহাসে যা মাদানী-ইকবাল বিতর্ক নামে পরিচিত।[১]

নানামুখী সমালোচনার জবাবে ১৯৩৮ খ্রি. তিনি তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ সম্মিলিত *জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম* প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রি. তিনি জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের তৃতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রি. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের সাহায্য করা হারাম ঘোষণা করে তিনি চতুর্থবারের মতো গ্রেফতার হন এবং ২ বছর ২ মাস পর ১৯৪৪ খ্রি. মুক্তি পান। ১৯৪৫ খ্রি. নির্বাচনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে তাঁকে সভাপতি করে 'মুসলিম পার্লামেন্টারি বোর্ড' গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচন-উত্তর ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সাথে স্বাধীনতার রূপরেখা ও পদ্ধতি আলোচনায় জমিয়তের পক্ষ থেকে 'মাদানী ফর্মুলা' পেশ করা হয়। ১৯৪৭ খ্রি. ভারত স্বাধীনের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। তিনি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর কাছ থেকে চার তরিকার খেলাফত পেয়েছিলেন। তার লক্ষাধিক মুরিদ ছিল, তন্মধ্যে ১৬৭ জনকে তিনি নিজের খলিফা বা উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন। তিনি নকশে হায়াত, হামারা হিন্দুস্তান আওর উসকে ফাজায়েল, আশ শিহাবুস সাকিব সহ বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে মাজারে কাসেমিতে দাফন করা হয়। ২০১৯ খ্রি. সিলেটে তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানে মাওলানা মাদানী চত্বর নির্মিত হয়েছে।

জন্ম ও বংশ

তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর (১২৯৬ 'হিজরীর ১৯ শাওয়াল) ভারতের উত্তরপ্রদেশের আন্নাও জেলার বাঙ্গারমৌ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাইদের সাথে নামের ধারাবাহিকতা মিলিয়ে তার নাম রাখা হয় হুসাইন আহমদ। জন্ম সাল স্মরণ রাখার জন্য সংখ্যামান অনুযায়ী তার অপর নাম রাখা হয়েছিল "চেরাগ মুহাম্মদ"। উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এই নামটিও তিনি কখনো কখনো ব্যবহার করতেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাবিবুল্লাহ এবং মাতার নাম নুরুন্নিসা। তারা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর মুরিদ ছিলেন। তাঁর পিতা উর্দু, ফার্সি ও হিন্দি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন এবং এলাহদাদপুরের নিকটস্থ একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।[২] বংশগতভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেই তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর বংশধর। পঞ্চম পূর্বপুরুষ শাহ্ মুদনে গিয়ে উভয়ের বংশধারা মিলিত হয়। হুসায়ন ইব্ন 'আলী ছিলেন তাঁর ৩৩তম পূর্বপুরুষ। সৈয়দ মুহাম্মদ মাদানী ছিলেন ২৭তম পূর্বপুরুষ।[৩]

মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানীর প্রথম স্ত্রীর সাথে সংসারে তার দু'জন কন্যা ছিলো। স্ত্রী, কন্যাদের মৃত্যুর পর তিনি মুরাদাবাদের হাকিম গোলাম আহমদের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই সংসারে তিনি দুই পুত্রের জনক হন। মাদানী মাল্টায় কারাবন্দি থাকা অবস্থায় স্ত্রী, পুত্রদের মৃত্যু ঘটে। এরপর তিনি হাকিম গোলাম আহমদের দ্বিতীয় কন্যাকে বিয়ে করেন। তৃতীয় বিবাহের এ সংসারে তিনি দুই সন্তানের জনক হন। আস'আদ মাদানী এবং মাজেদা। মাজেদা শৈশবেই মারা যান এবং

১. ড. মুশতাক আহমদ, *শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১১৩
২. মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী, *নকশে হায়াত* (করাচি: দারুল ইশা'আত, তা.বি.), পৃ. ০৯
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর তাঁর এই স্ত্রী মারা যান। তাঁকে মাজারে কাসেমিতে সমাহিত করা হয়। এসময় আস'আদ মাদানীর বয়স ছিলো মাত্র ৯ বছর।[১]

পরবর্তীতে চাচাত ভাই বশিরুদ্দিনের মেয়ের সাথে তার চতুর্থ বিবাহের প্রস্তাব করা হয়। বয়সের বড় ব্যবধানের কারণে তিনি প্রথমে এ বিয়েতে সম্মত ছিলেন না। এই সংসারে তিনি দুই পুত্র ও পাঁচ মেয়ের জনক হন। দুই পুত্রের নাম আরশাদ মাদানী ও আসজাদ মাদানী। পাঁচ কন্যার নাম রায়হানা, সাফওয়ানা, রুখসানা, ইমরানা এবং ফারহানা। তাঁর স্ত্রী ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষাজীবন

১৮৮৩ সালে ৪ বছর বয়সে বাড়ির মক্তবে মায়ের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। বছরখানেক পর তাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। যেখানে তার পিতা শিক্ষকতা করতেন। ১৮৯২ পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করার পর তাঁকে দারুল 'উলূম দেওবন্দ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দারুল 'উলূম দেওবন্দে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তখন তার বয়স ছিলো ১৯ বছর। বাড়ির মক্তবে ও স্কুলে ৮ বছর আর দেওবন্দ মাদরাসায় ৭ বছর মোট ১৫ বছর ছিলো তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ব্যাপ্তি। তবে ১৯০৮ খ্রি. মদীনা থেকে ফিরে এক বছর মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর নিকট পুনরায় হাদীস অধ্যয়ন করেন। সে হিসেবে তাঁর অধ্যয়নকাল ১৬ বছর।[২]

মায়ের কাছে তিনি কুরআনের প্রথম ৫ পারা পড়েন। তারপর পিতার উপর তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁর পিতা এলাহদাদপুরের নিকটস্থ একটি স্কুলে চাকরি করতেন। তিনি পিতার কাছে সকালে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। তৎকালে স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণিকে প্রথম শ্রেণি এবং সর্বনিম্ন শ্রেণিকে অষ্টম শ্রেণি বলা হতো। হুসায়ন আহমাদ মাদানী অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এবং মাতৃভাষা উর্দু, ইতিহাস, ভূগোল, বীজগণিত, পাটিগণিত ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু স্কুল শিক্ষা তার পছন্দ না হওয়ায় স্কুলের শিক্ষাজীবন সমাপ্তির এক বছর পূর্বে তাঁকে দারুল 'উলূম দেওবন্দে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তখন দেওবন্দ মাদরাসার সদরুল মুদাররিস (প্রধান অধ্যাপক) ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, মুহতামিম (মহাপরিচালক) সৈয়দ মুহাম্মদ 'আবেদ ও পৃষ্ঠপোষক রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। প্রধানত মাহমূদ হাসান দেওবন্দী তাঁর শিক্ষার কাজে তত্ত্বাবধান করতেন। তার বড় ভাই ছিদ্দিক আহমদ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর খাদেম হওয়ার সুবাদে প্রথমদিন থেকেই তিনি দেওবন্দীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। *মীযান* ও *গুলিস্তাঁ* থেকে তাঁর অধ্যয়ন শুরু হয়। পাঠ উদ্বোধনের জন্য তাঁকে মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে নেওয়া হলে সেখানে খলিল আহমদ সাহারানপুরী উপস্থিত ছিলেন এবং দেওবন্দীর অনুরোধে সাহারানপুরী তাঁর পাঠ উদ্বোধন করেন।[৪]

দেওবন্দে তার অধ্যয়নকাল ছিলো সাড়ে ছয় থেকে সাত বছর। এই সময়ে তিনি দারসে নিজামির অন্তর্ভুক্ত ১৭টি বিষয়ের ৬৭টি কিতাব অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ১১জন শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে তিনি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২৪টি কিতাব পড়েছেন। তন্মধ্যে ১০টি শ্রেণিকক্ষে এবং ১৪টি ব্যক্তিগতভাবে। মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর এই অতিরিক্ত যত্নের কারণে মাদানী দেওবন্দের শিক্ষাকোর্স স্বল্প সময়ে সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫]

---

১. ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
২. নিযামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, *মা'আসিরে শায়খুল ইসলাম* (দেওবন্দ: দারুল মু'আল্লিফীন, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪. সৈয়দ মেহবুব রেজভী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ* (ভারত: ইদারায়ে ইহতেমাম, ১৯৯২ খ্রি.), খ-২, পৃ. ৮২
৫. প্রাগুক্ত।

তিনি যে বছর দেওবন্দে ভর্তি হন সেটি ছিলো দেওবন্দের ২৭তম শিক্ষাবর্ষ। তখন পর্যন্ত সেখানে মাতবাখ বিভাগ (রান্নাঘর) চালু করা সম্ভব হয়নি। ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও স্থানীয়দের সহযোগিতার ভিত্তিতে হতো। সে অনুসারে মাদানীর আহারের ব্যবস্থা হয় মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবির পুত্র হাফেয মুহাম্মদ আহমদের গৃহে।

শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) ও ফালসাফা (গ্রীক দর্শন) অধ্যয়নের প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক ছিলো। পরবর্তীতে তিনি 'আরবী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং *মাকামাতে হারীরী, দিওয়ানে মুতান্নবি, সাব'আ মু'আল্লাকা*সহ প্রভৃতি গ্রন্থ আয়ত্ত করেন। হাদীসের অধ্যয়ন শুরু হলে তিনি হাদীস নিয়েই আগ্রহী হয়ে পড়েন।

দেওবন্দ মাদরাসায় একটি পরীক্ষায় পরীক্ষক 'আব্দুল 'আলী তাঁকে মোট নাম্বার ৫০ এর মধ্যে ৭৫ নাম্বার প্রদান করেন, যা ছিলো দারুল 'উলূম দেওবন্দের ইতিহাসে বিরল। শিক্ষাজীবনে 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধি, সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমদ, মানাজির আহসান গিলানী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দস্তারে ফযীলত তথা পাগড়ী লাভ করেন। প্রথমে পাগড়ী দেওয়া হয় আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরিকে। তারপর মাদানীকে। সবাইকে একটি করে পাগড়ী দেওয়া হলেও মাদানীকে তিনটি পাগড়ী প্রদান হয়।[১]

মদীনা গমন

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর পিতামাতার সাথে তিনি মদীনা চলে যান। তখন তার বয়স ১৯। পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র তার পিতা হিজরতের নিয়ত করেছিলেন। মাদানী মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি আরও একবছর দেওবন্দ মাদরাসায় হাদীস অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতার অনড় সিদ্ধান্তের কারণে নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

তিনি ১৯১৬ খ্রি. পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। মাঝখানে তিনবার ভারতে এসেছিলেন। ১৯০০ খ্রি. তার পীর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর তলবের কারণে প্রথমবার ভারতে আসেন এবং দুই বছর গাঙ্গুহীর সান্নিধ্যে থাকার পর ১৯০২ খ্রি. মদীনায় চলে যান। ১৯০৮ খ্রি. তার স্ত্রীবিয়োগের কারণে দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন এবং তিন বছর ভারতে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে প্রথম বছর মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বিবাহের কাজ সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় বছর দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৃতীয় বছর দস্তারবন্দী সম্মেলনের কার্যক্রম শেষ করে ১৯১১ খ্রি. মদীনা চলে যান। ১৯১২ খ্রি. তৃতীয়বারের মতো ভারতে এসেছিলেন এবং চার মাস অবস্থান করেছিলেন।

পিতার নেতৃত্বে পরিবারের ১২ সদস্যকে নিয়ে তিনি ১৮৯৯ খ্রি. মদীনায় পৌঁছেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি মসজিদে নববীতে অবৈতনিক শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পাশাপাশি তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা মিলে মদীনার বাবুর রহমত ও বাবুস সালামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায় শুরু করেন। শিক্ষকতার অবসরে তিনি নিজ দোকানে সময় দিতেন। ক্ষুদ্র ব্যবসা দিয়ে বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ না হওয়ায় পাশাপাশি খেজুরের ব্যবসায় শুরু করেন। তাতেও সফল না হওয়ায় তিনি মদীনার সরকারি গ্রন্থাগার কুতুবখানা মাহমুদিয়া ও কুতুবখানা শায়খুল ইসলামে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে গ্রন্থ নকলের কাজ শুরু করেন।[২]

১৯০২ খ্রি. তিনি মদীনায় মুহাম্মদ খাজা কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত শামসিয়্যাবাগ মাদরাসায় মাসিক ২৫ টাকা বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। গ্রন্থ নকল বাদ দিয়ে মাদরাসার চাকুরি ও মসজিদে নববীতে বিনা বেতনে শিক্ষাদান চালিয়ে যান। মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানের কয়েক মাসের মধ্যে

১. নিযামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

২. ড. রশীদুল ওয়াহেদী, *শায়খুল ইসলাম মাদানী: হায়াত ও কারনামে* (ভারত: আল-জমিয়ত বুক ডিপো, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৫০

চারদিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু শিক্ষার্থী জড়ো হয়। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুহাম্মদ খাজা শিক্ষার্থীদের মসজিদে নববীর পরিবর্তে তৎপ্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। মসজিদে নববীর বরকত লাভের আশায় এবং শিক্ষার্থীদের অসম্মতির কারণে মাদানী ওই নির্দেশ পালন করতে পারেননি। খাজা তাতে অসন্তুষ্ট হলে তিনি মাদরাসার চাকুরি ছেড়ে দেন এবং মসজিদে নববীতে বিনা বেতনে শিক্ষকতা চালিয়ে যান।

পরবর্তীতে ভূপালের নবাব সুলতান জাহান বেগম মদীনার কিছু সংখ্যক 'আলিমদের জন্য মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে মাদানী ও তার অপর দুই ভাই প্রত্যেকে মাসিক ১০ টাকা মোট ৩০ টাকা ভাতা পেতেন। বণ্টনের দায়িত্ব ছিলো মদীনার শেখ হাসান আব্দুল জাওওয়াদের উপর। জাওওয়াদ উর্দু না জানায় মাদানীর উপর তার সহযোগিতার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং এজন্য তিনি অতিরিক্ত ১৫ টাকা বেতন পেতেন। মসজিদে নববীতে শুক্রবার ও মঙ্গলবার ছুটি থাকত; এই ছুটির দিনে তিনি জাওওয়াদের কাজে সহযোগিতা করতেন। একবার বাহাওয়ালপুরের নবাব মদীনায় জিয়ারতে আসলে মাদানীর জন্য বার্ষিক ১২০ টাকা ভাতা মঞ্জুর করে যান। ফলে মাদানী পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং সকলেই শিক্ষাদান ও ধর্মপালনে পূর্ণ মনোনিবেশের সুযোগ পান। মদীনাবাসীদের প্রতি ভিনদেশীয় মুসলিম সরকারগুলোর এ ধরনের ভাতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পর পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। বিদ্রোহী গভর্নর শরীফ হুসায়নের হাতে মদীনার কর্তৃত্ব চলে গেলে সর্বপ্রকারের ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।[১]

মদীনায় আগমনের প্রথম বছর মাদানী-পরিবার হরমে নববীর অন্তর্গত বাবুন নিসার নিকটে একটি কাঁচা বাড়ি ভাড়া নেন। বাড়িটি ছোট হওয়ায় পরবর্তী বছর হাররাতুল আগাদাত মহল্লার একটি বড় বাড়িতে বার্ষিক ১২০ টাকা ভাড়ায় চলে যান। কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে এই ভাড়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় তারা নগরের বাইরে অবস্থিত শহরতলিতে চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে আলবাব আলমজীদীর নিকটে নির্মাণ-অসম্পূর্ণ একটি বাড়িতে চলে যান। অর্থাভাবে বাড়িটির নির্মাণকাজ বন্ধ ছিলো এবং পুনরায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই বাড়িতে থাকার সুযোগ পান যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুহাম্মদ খাজা। এ সময় শহরের বাইরে মদীনার অদূরে একটি পরিত্যক্ত জমি বিক্রি করা হবে বলে জানা যায় যেটি ইসলামের নবীর হুজুরার খাস খাদেমদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি। এ ধরনের সম্পত্তি পরিত্যক্ত হলে স্থানীয় কাজীর অনুমোদনক্রমে পত্তন নেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। মাদানীর পিতা সেখানে প্রয়োজনানুসারে কিছু জায়গা পত্তন নিয়ে রেখেছিলেন। শিক্ষকতা সংক্রান্ত কারণে মুহাম্মদ খাজা মাদানীর উপর অসন্তুষ্ট হলে তাদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেন। এ কারণে তারা পত্তন নেয়া জায়গায় একটি মাটির বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেন। প্রায় ২২ দিন পর তাদের বাড়ি নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তারা খাজার বাড়ি ছেড়ে দেন।

পরবর্তীতে বাড়িটি পাকা হয়ে গেলে মাদানীর পিতা বাড়িটি সন্তানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন যাতে সন্তানদের কেউ বাড়ি বিক্রি করে মদীনা ত্যাগ করতে না পারে। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে ৩০ সহস্রাধিক লোকের বসতি গড়ে ওঠে। শরীফ হুসায়নের বিদ্রোহের পর (১৯১৬) অরাজকতা শুরু হলে অনেকে নগরের ভিতরে চলে আসেন। সে সময় মাদানীও নিজ পরিবার নিয়ে বাবুন নিসার একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।[২]

তাসাউফ

১৮৯৮ খ্রি. দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষা সম্পন্ন করেই তিনি তাসাউফের প্রতি মনোযোগী হন। ঐ বছর শা'বান মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে তিনি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। গাঙ্গুহী সাধারণত যাচাই ব্যতীত কাউকে মুরিদ না করলেও তাকে মুরিদ হিসেবে গ্রহণ করেন কিন্তু তাকে কোন সবক দেননি। তিনি মাদানীকে মক্কায় পৌঁছে ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কির কাছে

---

১. হুসায়ন আহমাদ মাদানী প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮৩
২. প্রাগুক্ত।

প্রথম সবক নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেমতে আড়াই মাস পরে জ্বিলকদের শেষদিকে মক্কায় পৌঁছে তিনি মুহাজিরে মক্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন। মুহাজিরে মাক্কি তাকে কয়েক দিন পর্যন্ত তাসাউফের শিক্ষা দেন।[১]

৬ মাসের মাথায় মুহাজিরে মাক্কি মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তীতে মদীনা থেকে গাঙ্গুহীর কাছে পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত রাখেন। ১৯০০ খ্রি. গাঙ্গুহীর এক চিঠির মাধ্যমে তিনি ভারতে আসার নির্দেশ পান। সে মোতাবেক পরবর্তী বছর তিনি ভারতে গাঙ্গুহীর সান্নিধ্যে চলে আসেন। গাঙ্গুহীর সান্নিধ্যে আড়াই মাস ব্যাপৃত থাকার পর তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২২।[২]

তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিলো তাকে ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর কাছে বায়'আত করাবেন। কিন্তু ইতঃপূর্বে গঞ্জে মুরাদাবাদীর মৃত্যু হওয়ায় মাদানী তার শিক্ষক মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে বায়'আত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। দেওবন্দীকে এটি অভিহিত করা হলে তিনি মাদানীকে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর কাছে পাঠিয়ে দেন। গাঙ্গুহী মাহমূদ হাসান দেওবন্দীরও পীর ছিলেন।

মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা

তিনি আজীবন শিক্ষকতা করেছেন। তার শিক্ষকতার সূচনা হয় মসজিদে নববীতে। দেওবন্দ থেকে বিদায়ের মুহূর্তে মাহমূদ হাসান দেওবন্দী তাকে শিক্ষকতা অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন। মদীনায় ১৮ বছর অবস্থানকালের মধ্যে মাদানী তিনবার ভারতে এসেছিলেন। সে হিসেবে মদীনায় তার শিক্ষকতাকাল ১৩ বছর ৯ মাস। ১৮৯৯ খ্রি. মুহররম মাসে কয়েকজন ভারতীয় ও আরবিয় ছাত্র নিয়ে 'আরবী ব্যাকরণ ও অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাব পড়ানো আরম্ভ করেন। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দোকান পরিচালনা ও গ্রন্থ নকলের কাজ করার কারণে শিক্ষকতায় অপার্যপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারত থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে ১৯০২ খ্রি. দ্বিতীয় বারের মতো মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এ সময়ে মদীনায় শামসিয়্যাবাদ ওরফে তূতিয়া মাদরাসায় শিক্ষক পদে চাকুরি নেওয়ার পর অবসর সময়ে নিজের পূর্বেকার অবৈতনিক শিক্ষকতাও চালু করেন। পরবর্তীতে তাঁকে শুধু মাদরাসায় শিক্ষকতা করার আদেশ দেওয়া হলে তার পক্ষে এই আদেশ মানা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মাদরাসার চাকরি ছেড়ে দিয়ে মসজিদে নববীতে অবৈতনিক শিক্ষকতার কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।[৩]

মদীনায় মালিকী ও শাফি'ঈ ফিকহের প্রচলন ছিলো। বিপরীতে ভারতে হানাফি ফিকহের প্রচলন ছিলো। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী ভারতে লেখাপড়া করার কারণে মালিকি ও শাফি'ঈ ফিকহের কিছু কিতাব তার অপঠিত ছিলো। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি এগুলো আয়ত্তের পিছনে সময় দিতেন। তাতে তাসাউফের সবকগুলো তার পক্ষে আদায় করা সম্ভব হতো না। বিষয়টি গাঙ্গুহীকে চিঠি মারফত জানালে উত্তরে তিনি শিক্ষকতা অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন।

দ্বিতীয়বারের মতো মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা শুরু করার পর তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে কিছু লোক তার বিরোধিতা শুরু করেন। তৎকালে ওয়াহাবি মতবাদীদের অনেকেই ঘৃণার চোখে দেখত। মাদানীর বিরোধিতাকারীরা তাকে ওয়াহাবি মতবাদের প্রচারক হিসেবে প্রচারণা করা শুরু করে। এক পর্যায়ে বিষয়টি মদীনার গভর্নর 'উসমান পাশাকেও জানানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর উপর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ মিথ্যা প্রমাণিত

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
২. ড. রশীদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৩. হুসায়ন আহমদ মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

হয় এবং তার জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। এভাবে ৭ বছর অধ্যাপনার পর তিনি আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

১৯১১ খ্রি. ভারত থেকে মদীনায় আগমন করে করে তৃতীয়বারের মতো তিনি মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। মসজিদে নববীতে অনেক ক্লাস চালু থাকলেও তার ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হতো। ছাত্রদের পাশাপাশি মদীনার ওলামা, কাযী, মুফতী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা ও আমলাগণের অনেকে উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষাদানে তিনি মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর অনুসরণ করতেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত আব্দুল হামিদ ইবনে বাদিস ও তার সহযোগী মুহাম্মদ বশীর ইব্রাহিমী হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন এবং মাদানীর ক্লাসে যোগ দেন। তিনি তাদেরকে কিছুদিন নিজের সাথে রাখেন। তাদেরকে তিনি মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সংগ্রামের জন্য পুনরায় আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

১৯১৩ খ্রি. ভারতে গিয়ে কয়েক মাস অবস্থান করে আবার মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচিতে মদীনায় আগমন করলে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী প্রত্যক্ষ জিহাদ ও রাজনীতিতে যোগ দেন। পরবর্তী বছর (১৯১৬) ইংরেজ সরকারের সহযোগী তুর্কি বিদ্রোহী গভর্নর শরীফ হুসায়ন কর্তৃক বন্দি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মসজিদে নববীতে হাদীসের অধ্যাপনা অব্যাহত রেখেছিলেন।[২]

মদীনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা করার কারণে তার ছাত্রদের নিয়মতান্ত্রিক কোনো তালিকা পাওয়া যায় না। যে ক'জনের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে: প্রসিদ্ধ কবি 'আব্দুল হক মাদানী, মদীনার সরকারি উচ্চ পরিষদের সদস্য 'আব্দুল হাকিম আল-কুর্দি, নায়েবে কাযী ও মুফতী আহমদ আল বাসাতি, পৌরসভার চেয়ারম্যান মাহমূদ 'আব্দুল জাওওয়াদ প্রমুখ।

প্রথম কারাবরণ

১৯১৫ খ্রি. মাহমূদ হাসান দেওবন্দী মদীনায় আসলে মাদানী তার সাথে আন্দোলনে যোগ দেন। তখন তার বয়স ৩৬। এরপর এক বছরের মাথায় মদীনায় তার প্রথম কারাবরণ শুরু হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের সফর মাসে তিনি দেওবন্দীর সাথে মাল্টায় নির্বাসিত হন। ৩ বছর ৭ মাস মাল্টায় নির্বাসনে থাকার পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের রোযার মাসে মুক্তি পান। মদীনায় তিনি মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর বিপ্লবের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। প্রথমদিকে গভর্নর বসরি পাশা কতিপয় মিথ্যা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেওবন্দীকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। মাদানীর প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হয় এবং কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তুর্কি সরকারের যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক সর্বাধিনায়ক জামাল পাশা মদীনায় আগমন করলে তাদের সাথে তিনিই মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর একান্তে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি উপলক্ষে মদীনায় আয়োজিত মাশায়েখ সম্মেলনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি দেওবন্দীর মক্কা ও তায়ফ সফরে সঙ্গে ছিলেন। মক্কার বিদ্রোহী গভর্নর শরীফ হুসায়নের বিদ্রোহের পর দেওবন্দী তায়ফে অবরুদ্ধ হলে তারই প্রচেষ্টায় বেরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। তারপর ইংরেজদের সহযোগী শরীফ কর্তৃক দেওবন্দীকে গ্রেফতারের আদেশ জারী করা হলে তিনিই তাকে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দেন। পুলিশ দেওবন্দীকে খুঁজে না পেয়ে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানীকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। এরই মধ্যে দেওবন্দীকেও গ্রেফতার করে জেদ্দায় প্রেরণ করা হয়। মাদানীর উপর তখন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের বড় ধরনের কোন অভিযোগ না থাকায় মাদানী মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু

---

১. মাওলানা ফরীদুল ওয়াহেদী, *শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী: এক সাভানি বা তারীখী মুতা'লা* (নয়া দিল্লি: কওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৬০

২. ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

দেওবন্দীর বার্ধক্য ও কারাজীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি মদীনায় ফিরে যাননি। তিনি কৌশলে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে দেওবন্দীর সাথে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন।[১]

১৯১৬ খ্রি. সফর মাসে তাদেরকে মিশরের রাজধানী কায়রো প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে নীলনদের অপর তীরে অবস্থিত জীযার প্রাচীন জেলখানা আল-মাকালুল আসওয়াদের সামরিক আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার করা হয়। আদালতে মাদানীর জিজ্ঞাসাবাদ ২ দিন অব্যাহত ছিলো। ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে প্রেরিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ট্রাইবুনাল কর্মকর্তাদের ইচ্ছা ছিলো তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের। এ লক্ষ্যে কারাগারে পূর্বেই তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের সেলে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হয়। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকারের দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তার উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী বলেন,

> "মাল্টার জীবনে এটাই ছিলো আমাদের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত। কারণ পারস্পরিক সাক্ষাৎ বন্ধ থাকায় কার উপর কখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে তা জানারও সুযোগ ছিলো না।"[২]

এক মাস পর সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি উদ্ধারে ব্যর্থ হলে আদালত তাদেরকে দ্বীপান্তরের রায় দেয়। ১৯১৭ খ্রি. তারা মাল্টা দ্বীপে প্রেরিত হন। সেখানে তখন বিভিন্ন দেশীয় প্রায় ৩০০০ যুদ্ধবন্দী বিদ্যমান ছিলো। মাদানী আজীবন রাজনীতিতে মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর নীতি অনুসরণ করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। ১৯০৯ খ্রি. প্রথমবার তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যখন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করছিলেন। ১৯১৫ খ্রি. আগ পর্যন্ত তিনি দেওবন্দীর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারেননি কারণ তা গোপনে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মুহররম মাসে দেওবন্দী মদীনায় পৌঁছে তাঁকে ও খলীল আহমদ সাহারানপুরীকে বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলে উভয়ই তাতে সংযুক্ত হন।[৩]

মদীনায় এই বৈঠকের পর মাদানীর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। তিনি মদীনায় হাদীস অধ্যাপনার বদলে ইংরেজ বিরোধী জিহাদকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্থির করেন। মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর সাথে স্বেচ্ছায় কারাবরণের পর মুক্তি পেলে তিনি মদীনায় না গিয়ে দেওবন্দীর সাথে ভারতে চলে আসেন। এর প্রায় ছয় মাস পর মাহমূদ হাসান দেওবন্দী মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী তাঁর উত্তরসূরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মিসরের আল আসওয়াদ জেলখানায় তাঁকে ও তার সহবন্দীদের প্রত্যেককেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মাল্টা গমনকালে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিজ স্ত্রী, ১ কন্যা, ২ পুত্র ও পিতাকে রেখে যান। মা ইতোপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বন্দী জীবন শেষ করে ফিরে এসে পরিবারে তাদের কাউকে জীবিত পাননি। বন্দী জীবনে তিনি মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার সেবা করতেন। এর মাধ্যমে তিনি দেওবন্দীর চিন্তাধারা ও রাজনীতি গভীরভাবে আত্মস্থ করে নেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করেন। বন্দী শিবিরে সহস্রাধিক রাজদ্রোহীদের মধ্যে অর্ধেক ছিলো জার্মান। অবশিষ্টরা ছিলো অস্ট্রেলিয়ান, বুলগেরিয়, মিশরীয়, সিরিয় ও তুর্কি। মাল্টায় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবস্থান করায় তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করেন। শৈশবে তিনি কুর'আন হিফ্য করার সুযোগ পাননি। মাল্টায় প্রথম বছরেই তিনি কুর'আন হিফ্য করেন এবং রমযানে মেহরাবে শোনান। এখানে তুর্কী বন্দীদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তিনি তাদের ভাষা আয়ত্ত করেন।[৪]

---

১. হুসায়ন আহমাদ মাদানী, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃ. ৬৫৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
৪. ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

মাল্টায় মুসলিম কয়েদীদেরকে যন্ত্রের সাহায্যে বধকৃত জন্তুর গোশত খেতে দেওয়া হত। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং অকাট্য দলীলের দ্বারা এ পদ্ধতির যবাহকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ প্রমাণ করেন। তার প্রবল আপত্তির কারণে কর্তৃপক্ষ দাবী মেনে নেয়। মুসলিম কয়েদীদের কেউ মারা গেলে ইংরেজদের সরকারি নিয়মেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হত। এখানেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে জেলের ভিতর আন্দোলন গড়ে তোলেন। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সেই দাবীও মেনে নেয়। ফলে তার সহকর্মী হাকিম নসরত হুসায়ন মাল্টা মৃত্যুবরণ করলে ইসলামী পদ্ধতিতে তার গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। তার উদ্যোগের দ্বারা মাল্টায় নামাযের সময় আযান ও জামা'আতের ব্যবস্থা হয়। তারপর নামায শেষে যিকির, তালীম ও তালকীনের কাজও চলে। এভাবে বন্দীখানা একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[১]

মাহমূদ হাসান দেওবন্দী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু বছর পূর্বে রেশমি রুমাল আন্দোলনের গোপন তৎপরতা শুরু করেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনের সন্ধান পেতে বিলম্ব হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ জোটভুক্ত মিত্রশক্তি এবং জার্মান জোটভুক্ত অক্ষশক্তির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বাধে। ঐ বছর নভেম্বরে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দেয় এবং যুদ্ধ ইউরোপ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিত্রশক্তির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু এরপূর্বেই মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঐ বছর শেষ দিকে গোয়েন্দা বিভাগ তার এই গোপন আন্দোলনের সন্ধান পায়। গোয়েন্দা বিভাগ রেশমি রুমালের সূত্র ধরে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করে। এ আন্দোলনের দ্বারা কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বৃটিশের নির্দেশে মদীনা থেকে মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও হুসায়ন আহমদ মাদানীসহ ৫ নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়।[২]

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। তখন অনেক রাজবন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাল্টার বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। ১৯১৯ খ্রি. ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ান ওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলিমের এক যৌথ জনসভায় পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নির্দেশে জনসাধারণের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে গণহত্যা করা হয়েছিল। তাতে অনেক লোক হতাহত হয়। রাওলাট আইনের বলে ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ ঘটনা সংগঠিত হয়। ফলে সারা উপমহাদেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিকে খিলাফত আন্দোলনের কারণে উপমহাদেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ খ্রি. ৬ ডিসেম্বর জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ অমৃতসর অধিবেশনে বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব পাস করে। ঐ বছর খেলাফত কমিটির আমন্ত্রণ ক্রমে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও খেলাফতে যোগ দেন। এভাবে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ, খেলাফত কমিটি ও জাতীয় কংগ্রেস মিলিতভাবে প্রতিবাদ শুরু করলে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দেশ ও বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় সকল রাজবন্দীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এ সময় মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও হুসায়ন আহমাদ মাদানীসহ মাল্টার বন্দীগণ মুক্তির পরওয়ানা লাভ করেন। ফলে ১৯২০ খ্রি. ৮ জুন তাদেরকে মাল্টা থেকে প্রিজন জাহাজে করে বোম্বাই বন্দরে এনে বেড়ী খুলে দিয়ে মুক্তি প্রদান করা হয়।[৩]

খেলাফত কমিটির শওকত 'আলীসহ জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কেফায়াতুল্লাহ দেহলভি, দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ প্রমুখ সহ বহু লোক বন্দরে তাদের স্বাগত জানান। তখন স্থানীয় মিনার মসজিদ মাঠে খেলাফত কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ নিজেদের বাড়ি না গিয়ে খেলাফত অধিবেশনে যোগ দেন। বোম্বাইয়ে তাদের

---

১. প্রাগুক্ত।
২. ড. রশীদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

অবস্থানকাল ছিলো ২ দিন। এ সময়ে আব্দুল বারি ফিরিঙ্গি মহল্লী ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও তাদের সাক্ষাতে মিলিত হন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

মাল্টার কারাগার থেকে মুক্তির আদেশ পাওয়ার পর তিনি নতুনভাবে নিজের অবস্থানের ক্ষেত্র নির্ধারণের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ইতঃপূর্বে তিনি নিজ দেশ ত্যাগ করে ২১ বছর বয়সে মদীনায় বসবাস শুরু করেছিলেন। সেখানে বসবাস করার কিছুটা ব্যবস্থা থাকলেও কারাগারে আসার পর তা লুণ্ঠিত হয়ে যায় এবং তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন তার বয়স হয়েছিল ৪১। তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ মসজিদে নববীতে হাদীসচর্চার কাজে অতিবাহিত করার মনঃস্থ করলেন। সে মোতাবেক তিনি মুম্বইয়ে আসার পর স্থায়ীভাবে মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার এই ইচ্ছা মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে ব্যক্ত করলে দেওবন্দী তাতে অনুমতি দেননি।[১]

ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে সুয়েজ অতিক্রম করার সময় মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর কাছে এ মনোভাব ব্যক্ত করলে উত্তরে দেওবন্দী বলেন, "আমি *বুখারী শরীফে*র 'তারাজিমুল আবওয়াব' এর ভাষ্য রচনা করতে ইচ্ছুক। এ কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি দেওবন্দীর সঙ্গে তারাজিমের কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুম্বাই পৌঁছার পর তিনি দেখলেন ভারতে খিলাফত আন্দোলনের তোড়জোর চলছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেওবন্দীকে ঘিরে রেখেছেন এবং দেওবন্দীও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্মের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছেন। এমতাবস্থায় তারাজিমের কাজ শীঘ্র শুরু করা আদৌ সম্ভব হবে না অনুমান করে তিনি দেওবন্দীকে আবারো মদীনার চলে যাওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। উত্তরে দেওবন্দী শরীফ সরকারের আমলে কোনোক্রমেই তার মদীনায় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না বলে মন্তব্য করেন।[২]

দেওবন্দে পৌঁছার পর মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর পূর্ণ সময় ও পূর্ণ মনোযোগ স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিবেদিত দেখে তিনিও নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতে আসার পর মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রাজনীতিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। তখন হুসায়ন আহমাদ মাদানী তার অন্যতম সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে আমরুহা মাদরাসার পরিচালক হাফেজ জাহিদ হাসান মাদানীকে তার মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুরোধ করেন। দেওবন্দী অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাওলানা মাদানীকে শিক্ষকতা করার অনুমতি প্রদান করেন। শিক্ষকতা শুরুর পর মাওলানা মাদানী তৃতীয় বিবাহের কাজ সম্পন্ন করেন। ইতঃপূর্বে তার দুই স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছিল। শিক্ষকতা শুরুর ২ মাসের মাথায় দেওবন্দী মাদানীকে তাঁর নিকট চলে আসার নির্দেশ দেন। সংবাদ পেয়ে মাদানী তাঁর সাথে দেখা করেন এবং আমরুহা মাদরাসায় তার পদে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য ১ মাস সময় নিয়ে যান। ঐ সময় মাহমূদ হাসান দেওবন্দী তাকে নিয়ে পুরো ভারত সফর করার মনঃস্থ করেন। এরই মধ্যে দেওবন্দী জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার উদ্বোধনের জন্য আলিগড়ে আগমন করেন এবং মাদানীকে তার সাথে আলীগড় সম্মেলনে মিলিত হওয়ার আদেশ দেন।[৩]

এ সম্মেলনের পর দেওবন্দী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে চিকিৎসা করার জন্য দিল্লি নেওয়া হলে মাওলানা মাদানীও তার সাথে দিল্লিতে যান। তখন দিল্লিতে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ২য় বার্ষিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থতা নিয়ে দেওবন্দী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে সর্বশেষ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার নির্দেশ দেন। ঐদিকে খিলাফত আন্দোলনের কলকাতা শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদও স্বাধীনতা সংগ্রামকে

---

১. হুসায়ন আহমাদ মাদানী, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৬৭১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

৩. নিজামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২

বেগবান করার লক্ষ্যে শহরের নাখোদা মসজিদে একটি জাতীয় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আজাদ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীকে সেই মাদরাসার প্রধান হওয়ার অনুরোধ করেন। দেওবন্দী বার্ধক্যে উপনীত হওয়ায় সে অনুরোধ পালন করতে পারেননি। অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর মাহমূদ হাসান দেওবন্দী মাওলানা মাদানীকে সেই পদে যোগদানের নির্দেশ দেন।[১]

মাদানী কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলে পথিমধ্যে আমরুহায় যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হন। সেখানে শিয়া-সুন্নি বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। মুহাম্মদ আলি জওহরের মত জনপ্রিয় নেতাও তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ফলে খলিল আহমদ সাহারানপুরির অনুরোধে তিনি সেখানে একদিন যাত্রা বিরতি করেন। তিনি সেখানে শিয়া-সুন্নি প্রসঙ্গে না গিয়ে সবাইকে ব্রিটিশদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং দেশ স্বাধীন না হলে ধর্ম টিকবে না বলে বক্তব্য দেন। তার এই বক্তব্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পরদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে পথিমধ্যে মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর মৃত্যু সংবাদ পান। ফলে কলকাতা না গিয়ে তিনি দেওবন্দে চলে যান। দেওবন্দীর মৃত্যুর পর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাকে কলকাতা না গিয়ে দেওবন্দে থাকার পরামর্শ দেন, দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার জন্যও তার প্রয়োজন ছিলো। তিনি দেওবন্দীর জীবদ্দশায় তার নির্দেশকে অলঙ্ঘনীয় মনে করতেন। তাই সবার পরামর্শ গ্রহণ না করে কলকাতায় চলে যান এবং মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন।

দেওবন্দীর মৃত্যুর পর মাদানী তার স্থলাভিষিক্ত হন। দেওবন্দীর পরিবার, ছাত্র-শিষ্য ও ভক্তরা সবাই তাকে "জানাশীনে শায়খুলহিন্দ" উপাধিতে ভূষিত করে। পত্র-পত্রিকায় তার নামের পূর্বে এই শব্দটার অবশ্যই উল্লেখ থাকত।[২]

কলকাতায় অধ্যাপনা ও রাজনৈতিক কার্যক্রম

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী কলকাতায় পৌঁছেন। এখানে আবুল কালাম আজাদ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর উপস্থিতিতে নতুন মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি এই মাদরাসায় হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপনা শুরু করেন। এখান থেকেই তার পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি খিলাফত আন্দোলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভায় প্রধান অতিথি কিংবা সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

এই ব্যাপারে তিনি বলেন,

> "আমি মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করি এবং স্বাধীনতার কাজে নিজেকে জড়িত রেখে সর্বদা দেশবাসীর জেল-জুলুমের কষ্টও বরণ করতে থাকি।"[৩]

১৯২১ খ্রি. **২০-২১** ফেব্রুয়ারি ভারতের সিউহারায় খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের একইস্থানে উভয়ের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং তৎকালীন ভারতে ইংরেজদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের অবস্থা উপস্থাপন করেন। দুই বছর পর তিনি **১৯২৩** খ্রি. অক্টোবর মাসে মুক্তিলাভ করেন। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হলেও তিনি সংবর্ধনায় অংশ নেননি।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৩. হুসায়ন আহমাদ মাদানী, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃ. ৬৯২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

সিলেটে অবস্থিত তার অনুসারিগণ তার অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সিলেটে আগমনের প্রস্তাব দেন যেন সেখানকার ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন করতে পারেন। কেননা তখন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা আলিয়া মাদরাসা বা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হতো।

তাই তারা মাদানীকে লিখেছিলেন,

> "সুবা আসাম ও বঙ্গদেশে তিন কোটি মুসলমান বসবাস করে। কিন্তু এখানে মুসলমানদের শিক্ষাগত অবস্থা খুব নিম্নমানের। বিশেষতঃ ধর্মীয় ও ইলমে হাদীসের শিক্ষাব্যবস্থা খুবই দুর্বল। তাই আপনাকে একবার এখানে এসে অবস্থান করা এবং সিহাহ সিত্তাহর পাঠদান করা আবশ্যক। যার মাধ্যমে আমরা হাদীস অধ্যয়ন করতে পারব।"[১]

অন্য জায়গা থেকে তার কাছে শিক্ষকতার প্রস্তাব আসলেও সিলেটিদের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি ২ বছরের জন্য সিলেটে আগমন করেন। ১৯২৪ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে তিনি সিলেটে আগমন করেন এবং মানিক পীরের টিলা মহল্লায় নয়া সড়ক মসজিদের নিকট অবস্থিত "খেলাফত বিল্ডিং মাদরাসায়" শিক্ষকতা শুরু করেন। দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার ক্লাসে তিনি *শারহু নুখবাতিল ফিকার, আল ফাওযুল কাবীর, জামি তিরমিযী* ও সিহাহ সিত্তার প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠদান করতেন। তিনি এখানে তাসাউফের কাজও চালিয়ে যান। তার জীবনে তাসাউফের কাজ প্রধানত সিলেটেই সম্পাদন করেন। এছাড়া নানা সমাবেশে বক্তৃতাও দিতেন। ৩ বছর পর তার প্রত্যাবর্তনকালে অনুসারীদের তিনি প্রতি রমযান মাসে সিলেট আগমনের অঙ্গীকার করেন এবং ১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তা পালন করেন।[২] ১৯২৮ খ্রি. দারুল 'উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের জরুরি নির্দেশনার কারণে সিলেট থেকে দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখানে 'সাদরুল মুদাররিস' (প্রধান অধ্যাপক) পদে যোগদান করেন।

দেওবন্দ যাত্রা

১৯২৮ খ্রি. মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী যখন দারুল 'উলূম দেওবন্দে আসেন, তখন মাদরাসার অভ্যন্তরীন কিছু মতানৈক্য চলছিল। যার মূল বিষয়টি ছিল, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির প্রশাসনিক বিষয়াদিতে মতামত প্রদানের অধিকার নিয়ে। এই মতানৈক্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলে এক পর্যায়ে কাশ্মীরি অনুসারীদের নিয়ে মাদরাসা ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি সব দাবি মেনে নেয়ার শর্তে মাদরাসায় প্রত্যাবর্তন করলেও তার অনুসারীদের অনুরোধে তিনি পুনরায় মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় মাওলানা মাদানী বাধ্যতাপূর্বক মজলিশে শূরার ১৯টি শর্তে "সদরুল মুদাররিসিন" পদ গ্রহণ করেন। যেহেতু আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন, সেহেতু এই মতানৈক্যের সূত্র ধরে এই ধারনার জন্ম নেয় যে, দারুল 'উলূম দেওবন্দ খিলাফত আন্দোলন-বিরোধী মনোভাবধারী। পরবর্তীতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, মাদরাসার অবস্থা স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ গ্রন্থে বলা হয়েছে, মাদানী সদরুল মুদাররিসের দায়িত্ব পাবার পর মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৩৪৬ থেকে ১৩৭৭ 'হিজরী পর্যন্ত আনুমানিক ৩২ বছর যাবত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তার দায়িত্বাধীন অবস্থায় হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ ও হাবিবুর রহমান উসমানি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে মুহতামিম নিযুক্ত হন কারী মুহাম্মদ তৈয়ব। তিনি তার কাছেও পূর্বের ১৯টি শর্ত মঞ্জুর করে নেন।[৩]

'আলিমদের অগ্রযাত্রা

শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মাওলানা মাদানী পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯২০ খ্রি. জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসেবে কেফায়াতুল্লাহ দেহলভি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৮ বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৩৮ খ্রি. স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন। ১৯৩৮-

---

১. মাওলানা ফরীদুল ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
২. নিজামুদ্দীন আসীর আদ্রাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৩৯ খ্রি. ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিলো অত্যন্ত নাজুক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশকেও যুদ্ধদেশ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা একযোগে পদত্যাগ করে।[১]

কেফায়াতুল্লাহ দেহলভির পদত্যাগের পর মাদানী জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রি. ৭-৯ জুন জৌনপুরে জমিয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে। অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তিনি দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তার এই ভাষণ ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। ভাষণে তিনি কুর'আন ও হাদীসের আলোকে স্বাধীনতা জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং ব্রিটিশদের সাহায্য করা সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করেন।

১৯৩৯ খ্রি. কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠে। মাদানীর নেতৃত্বে জমিয়ত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে কোনো ধরনের সাহায্য প্রদান না করার জোর প্রচারণা চালান। জমিয়তের ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লি অধিবেশনেও এ সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করা হয়। বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে ব্রিটিশদের জন্য ভারতের সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে উঠে। এজন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভারতের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের জন্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠান। ক্রিপস ভারতের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সপ্তাহ আলোচনা করে একটি প্রস্তাব পেশ করে। সেই প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেস ও জমিয়ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। মাওলানা মাদানীর নেতৃত্বে জমিয়ত তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও তীব্র করে তুলে। ১৯৪২ খ্রি. ২২ মার্চ মাওলানা মাদানীর সভাপতিত্বে লাহোরে জমিয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে। লাহোর ছিলো পাকিস্তান আন্দোলনের রূপকার মুসলিম লীগের প্রধান ঘাঁটি। এখানেই লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল। এসব কারণে মাদানীর জন্য এখানে সমাবেশ করা ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সমাবেশের আগে মুসলিম লীগের সমর্থকরা নানারকম বিদ্রূপাত্মক পোস্টার ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং সমাবেশের দিন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে সমাবেশ পণ্ড করার প্রচেষ্টা চালায়। এ সম্মেলনে তিনি ব্রিটিশদেরকে সাহায্য না করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ওই বছর ২৫ জুন মুরাদাবাদে জমিয়তের অপর একটি সম্মেলনেও তিনি বক্তৃতা দেন। এই সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সাহারানপুর রেলস্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে এলাহাবাদের অন্তর্গত নৈনির জেলে প্রেরণ করা হয়।[২]

এটি ছিলো তার চতুর্থবারের মত গ্রেফতার। এর কয়েকদিন পর কোর্টে হাজির হয়ে তিনি ২৫ পৃষ্ঠায় একটি লিখিত জবানবন্দি দেন, যেখানে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে তার অবস্থানের কথা জোড়ালোভাবে ব্যক্ত করেন। এজন্য তাঁকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে মুরাদাবাদ জেলে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে নৈনি জেলে স্থানান্তরিত হলে ২৬ ডি.আই.আর ধারায় আরও ২ বছর কারাদণ্ড বৃদ্ধি করা হয়। ১৩ আগস্ট তার রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিলের শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও ওই তারিখে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে আপিলের শুনানি সম্ভব হয়নি।

১৯৪৩ খ্রি. শেষদিকে ভারত ছাড় আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিও মিত্রপক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূলে চলে আসে। ফলে ব্রিটিশ সরকার নীতির পরিবর্তন করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ক্রমে মুক্তি দেয়। ২ বছর ২ মাস কারাবরণের পর ১৯৪৪ খ্রি. ২৬ আগস্ট মাওলানা মাদানী মুক্তি পান। ১৪ রমযান তিনি দেওবন্দ পৌঁছান, এর ২ দিন পর রমযান কাটানোর জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিলেটে চলে আসেন।[৩]

---

১. মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হক আওর উনকি মুজাহিদানা কারনামে* (ভারত: জমিয়ত বুক ডিপো, ১৯৪৮ খ্রি.), খ-২, পৃ. ৭৯

২. প্রাগুক্ত, খ-২, পৃ. ১৯০

৩. নিজামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

১৯৪৫ খ্রি. ৭-৯ মে সাহারানপুরে মাদানীর সভাপতিত্বে ৩০ হাজার সদস্যের উপস্থিতিতে জমিয়তের এক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের ভাষণে তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল ও বর্বরতা, দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার করুণ পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন অপকৌশল এবং পাকিস্তানের নামে ভারত বিভক্তির চক্রান্ত ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ভাষণে তিনি মুসলিম লীগেরও কড়া সমালোচনা করেন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও বেগবান করতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান। অধিবেশনে জমিয়তের প্রস্তাবিত 'খসড়া সংবিধান ও তার মূলনীতি' এর মঞ্জুরী গ্রহণ করা হয়।[১]

ছেচল্লিশের নির্বাচন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরও গতি পায়। ব্রিটিশ সরকারের উপর বৈদেশিক চাপ ও ব্রিটিশ গণপরিষদ নির্বাচনে লেবার পার্টির বিজয় ইত্যাদি ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত করে দেয়। ছেচল্লিশের নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যত ভারতের স্বাধীনতা অবিভক্ত নাকি বিভক্ত করে দেওয়া হবে সেটির ফয়সালা হয়ে যায়।

মুসলিম লীগ পূর্ব থেকেই পৃথক নির্বাচন ও পৃথক ভূখণ্ডের জোর প্রচারণা চালিয়ে আসে। কংগ্রেস নেতারা অবিভক্তির পক্ষে ছিলেন। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দও ভারত বিভাজনের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল, এটি ব্রিটিশদেরই বানানো পলিসি। দেশ তো ন্যায্য বিভক্তি হবেই না, অধিকন্তু বিভক্তির শিরোনামে দাঙ্গা ও রক্তক্ষয়ের সূচনা হবে। যারা পাকিস্তানের ভূখণ্ডে হিজরত করে যাবে তারা সেখানে গিয়েও স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাবে না; বরং বিদেশি নাগরিক হিসেবে সর্বদা দ্বিতীয় কাতারে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে যারা নিরুপায় হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে রয়ে যাবে তারা বাস্তবিক অর্থেই সংখ্যালঘু হিসেবে আজীবন নিষ্পেষিত জীবন যাপনে বাধ্য হবে। বিভক্তির কারণে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত হাজার বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের সকল ঐতিহ্য বিধ্বস্ত হবে।[২]

এই নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুসলমানদের নিজেদেরই দুটি দলের মধ্যে। এটি ছিলো সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। ভোট প্রয়োগের দ্বারা মুসলমানগণ মুসলিম প্রতিনিধি আর হিন্দুগণ হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেয়। নির্বাচনে অবিভক্তির সমর্থক কংগ্রেস বহু কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাস করে। আর কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও সেটি ছিলো নামমাত্র। পক্ষান্তরে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন দুটি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে জাতীয়তাবাদী অপর দিকে বিভক্তির সমর্থক। এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি দিক এই ছিলো যে, ভোটে মুসলমানদের যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, সেটিই তাদের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী দল বিবেচিত হবে এবং সেই দলের রায় অনুসারে ভারতের বিভক্তি কিংবা অবিভক্তি সংক্রান্ত ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে।

মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বেই নতুন দল গঠিত হয়। পুরাতন জমিয়তের ভাঙ্গন ও নতুন জমিয়ত গঠনের দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় মুসলিম লীগ। নির্বাচন উপলক্ষে 'আলিমগণের সমর্থন পাওয়ার যে অভাব লীগের ছিল, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হওয়ার দ্বারা সেই সমস্যার উত্তম সমাধান সম্ভব হয়। ঐ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট 'আলিম মুহাম্মদ শফি' উসমানী 'কংগ্রেস আওর মুসলিম লীগকে মুতাআল্লাক শরয়ী' ফায়সালা' শিরোনামে ফতওয়া প্রকাশ করে লীগ সমর্থনের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করেন। অনুরূপে ৩ নভেম্বর জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি উসমানী কলকাতার ভাষণে বলেন,

> "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হলো আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এর অগ্রযাত্রা সবশেষে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মহান রাব্বুল আলামিনের প্রদত্ত ন্যায় নীতির শাসন প্রতিষ্ঠায় গিয়ে শেষ হবে।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত।
২. ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

নির্বাচন চলাকালে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি মাওলানা মাদানী মুসলমানদের বারবার বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা বিভক্ত না হয়ে সকলের ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত থাকার মধ্যেই অধিকতর কল্যাণ নিহিত আছে। মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে মাদানীকে এসময় খুন করার প্রচেষ্টাও হয়েছে। নির্বাচনি বছরের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাব যাওয়ার পথে অমৃতসর জংশন রেলওয়ে স্টেশন, জলন্ধর স্টেশনে তিনি হামলার শিকার হন। ভাগলপুরে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা চেষ্টা করা হয়।[১]

১৯৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সমগ্র ভারতে ব্যাপক বিজয় ও সরকার গঠনের উপযুক্ততা অর্জন করে। মুসলিম লীগ একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন সুবায় সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তবে এ নির্বাচনে লীগ নিজেকে মুসলমানদের বৃহত্তম দল প্রমাণে সক্ষম হয়। মুসলিম সীটগুলোর মধ্যে লীগ ৮৫% সীট অর্জন করে। অবশিষ্ট ১৫% সীট অর্জন করে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন। ফলে মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী একক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে লীগের যেই দাবী প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন ছিল, সেটি প্রমাণিত হয়।

ভারত বিভক্তির পর

১৯৪৭ খ্রি. ১৪ আগস্ট ভারত বিভাজন হয়। বিভক্তির পর উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এম. জে. আকবরের মতে এই সহিংসতার সূচনাপর্বে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ নিহত ও ১ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়। ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়ায় তারা নানারকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১৫ আগস্ট মাওলানা মাদানী দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে ভারতে অবস্থানরত ৩ কোটি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি দেওবন্দের জামে মসজিদে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন এবং আগ বাড়িয়ে কোনরূপ সহিংসতা না করার নির্দেশ দেন। কেউ সহিংসতা সৃষ্টি করতে চাইলে তাদেরকে প্রথমে ভালোভাবে বোঝাতে বলেন এবং তা সম্ভব না হলে শেষমেশ বীরত্বের সাথে লড়াই করতে বলেন।[২]

দেশ বিভাগের কারণে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের শক্তিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা মাদানী তাদেরকে আবার সংগঠিত করেন। তিনি হিফজুর রহমান সিওহারভি, আবুল কালাম আজাদ, হাবিবুর রহমান লুধিয়ানভি, মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দীসহ প্রমূখ 'আলিমকে সাথে নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করেন এবং নাজুক পরিস্থিতিতে ভারতের মুসলমানদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা মাদানী এই দুর্যোগের ভিতর থেকে সাহারানপুর ও দিল্লি গমন করেন। মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জওহরলাল নেহেরু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ায় তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পান্তের সাথে বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী দারুল 'উলূম দেওবন্দ রক্ষার জন্য সেনা পাঠাতে চাইলে মাওলানা মাদানী দেওবন্দে প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে সাহারানপুরের খোঁজখবর নিতে বলেন। পরবর্তীতে সাহারানপুরের প্রশাসনে রদবদল আনা হলে ক্রমে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বিভিন্ন মাজার ও সেখানকার কার্যক্রম নিয়ে মাওলানা মাদানীর ভিন্নমত থাকলেও সেই সময় তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। তাই তিনি দখল হয়ে যাওয়া বিভিন্ন মাজার ও তার প্রতিবেশীদের রক্ষার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। নিরাপত্তার প্রাথমিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পর লখনৌতে জমিয়তের উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া আজাদ মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[৩]

ভারতে অবস্থিত তাবলিগ জামাতের কেন্দ্র দিল্লির নিজামউদ্দিন মারকাজ মসজিদ নিয়েও জটিলতা দেখা যায়। সেসময় তাবলিগ জামাতের আমীর মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবীভিকে পাকিস্তানে হিজরত করার

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
২. নিজামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
৩. মাওলানা ফরীদুল ওয়াহিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৫

জন্য মানুষ জোড়াজুড়ি করতে থাকে। তখন তিনি নির্ভর করেন শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবির সিদ্ধান্তের উপর। পশ্চিম পাঞ্জাবের আরেকজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন আব্দুল কাদের রায়পুরী। ভক্তরা তাকে জোরাজুরি করলে তিনি এবং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবি মাওলানা মাদানীর নিকট পরামর্শের জন্য আসেন। তখন মাওলানা মাদানী জানান, তিনি কাউকে হিজরত করতে নিষেধ করেননি। কিন্তু মুসলমানদের এই দুর্যোগের ভিতর ফেলে রেখে নিরাপদে কোথাও যাওয়া তিনি পছন্দ করেন না। তার এই পরামর্শের ফলে রায়পুরী ও কান্ধালবি ভারতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের কারণে তাবলিগ জামাতের আমীর মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবিও হিজরত করেননি।[১]

মাওলানা মাদানী শেষ বয়সে ভারতীয় প্রশাসনের সাথে দেনদরবার করে এসব সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন। পাকিস্তানে হিজরতকারী মুসলমানদের স্থাবর সম্পত্তি যথানিয়মে সংরক্ষণ এবং ঐগুলো পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকার কাস্টুডিন নামে একটি নতুন বিভাগ খোলে। পরিস্থিতির দাবী অনুসারে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও শেষ পর্যন্ত এর মাধ্যমে মুসলমানরা নানারকম নিপীড়নের শিকার হন। এরকম নিপীড়নের আলোচিত একটি ঘটনা ছিলো দিল্লির ব্যবসায়ী মুহাম্মদ দীন ছতরী ওয়ালারা সঙ্গে। মাওলানা মাদানী কাস্টডিনের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধে আইনের আশ্রয় নেন এবং নিজে জওহরলাল ও অন্যান্য নেতার সাথে দরবার করে সমাধানের ব্যবস্থা করেন। ছতরী ওয়ালার ঐ মামলা তিনি জমিয়তের পক্ষ থেকে পরিচালনা করেন। কাস্টুডিনের সাথে লড়াইয়ের জের গড়ায় মন্ত্রিসভা পর্যন্ত। মন্ত্রিপরিষদ কাস্টুডিন মহাপরিচালক আচ্ছুরামের রায় বাতিল করে এবং ছতরী ওয়ালার সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত দেয়। আচ্ছুরাম ক্ষোভে চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। বিষয়টি পরে সংসদেও উত্থাপিত হয়। এভাবে মাদানীর নেতৃত্বে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের যে সকল বাড়িঘর, দোকানপাট বেআইনীভাবে ক্রোথ করা হয়েছিল, সেগুলো প্রত্যার্পণ করানো হয়। পানিপথ, লুধিয়ানা, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে তাদের পুনঃ বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তাদের মসজিদ, মাদরাসা, আওকাফ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথাসম্ভব দখলমুক্ত করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যে সকল স্থানে মুসলমানরা সমগ্র এলাকাই খালি করে চলে গিয়েছিল, সেখানকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।[২]

দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহতামিম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে যান। কিন্তু পাকিস্তানে তার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় ভারতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে করেন। ততদিনে ভারতে ফেরত আসার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ফেরত আসার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনের সাথে যোগাযোগ করেন কিন্তু কোন উপায় করতে সক্ষম হননি। অবশেষে পাকিস্তান থেকে মাদানীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলে তিনি তাকে ফেরত আনেন এবং দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহতামিম পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩]

পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় ভূমিকা ছিলো। দেশ ভাগের পর বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মাওলানা মাদানীর নেতৃত্বে 'আলিমদের একটি দল পরিশ্রম করে। কলকাতা 'আলিয়া মাদরাসা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি সাইদ আহমদ আকবরাবাদী সহ একটি দল পাঠিয়ে এটি রক্ষা করেন। স্বাধীনতার পর তিনি সরকারি কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা নেওয়া থেকে দূরে থাকেন। ভারতের স্বাধীনতায় অবদানের জন্য ভারত সরকার বহুজনকে নানাভাবে পুরস্কৃত করে। এজন্য মাদানীকেও ১৯৫৪ খ্রি. পদ্মভূষণ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। একটি চিঠির মাধ্যমে তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।[৪]

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
২. নিজামুদ্দীন আসির আদ্রাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

বিভক্তির পূর্বে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ৯ কোটির বেশি। কিন্তু বিভক্তির পর ভারতের মূল ভূখণ্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ৩/৪ কোটিতে নেমে যায় এবং তারা দুর্বল একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। মাওলানা মাদানী তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং ভাগ্য মেনে নেওয়ার উপদেশ দিয়ে তাদেরকে নতুনভাবে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠার সাহস যোগান। তার মতে শক্তির মানদণ্ড জনসংখ্যার আধিক্য নয়। শক্তির মানদণ্ড হলো খাঁটি ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদের অনুপ্রেরণা।[১]

শিশুশিক্ষা ও স্কুলশিক্ষা

পূর্ব থেকেই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে শিশুদেরকে জীবনের শুরুতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান পারিবারিক ঐতিহ্য রূপে চলে আসছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানরা সামাজিকভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে পড়লে ঐ ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। মাওলানা মাদানী সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন, ভারতের মত দেশে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের উপর ফেলে রাখা ভুল হবে। মুসলমানদের নিজেদেরকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে এবং নিজেরাই ব্যবস্থা করতে হবে।[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের যিনি কর্তা তার উপর পরিবারস্থ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আর্থিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় অনেক পরিবারের পক্ষেই সেই কর্তব্য পালন সম্ভব হয় না। তাই তিনি মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা চালু করতে উদ্যোগী হন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

শিশুশিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা উপলব্ধি করে মাদানী এ দিকে মনোযোগ দেন। শিক্ষকদের সুষ্ঠ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন। ১৯৫৫ খ্রি. জমিয়তে উলামার কলকাতা অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবদের জন্যও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মসজিদ মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাওলানা মাদানীর মতে, ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ব্যাপক ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের কাজ সহজে সম্পাদন করা যেতে পারে।[৩]

তার দৃষ্টিতে মুসলিম শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৈষয়িক বিষয়ের শিক্ষাদানও জরুরি। ধর্মীয় শিক্ষার নামে জাগতিক অন্যান্য শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ও বিমুখ করে রাখা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী। মক্তব শিক্ষাকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে তার নেতৃত্বে 'দ্বীনী তালিমী কনভেনশন' নামে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। তিনি এ বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করার জন্য ভারতের সকল মত ও পথের অনুসারী মুসলমানদের আহবান জানান। ১৯৫৫ খ্রি. জানুয়ারি মাসে বোম্বাইতে এ বোর্ড গঠিত হয়।

এ মর্মে কলকাতার ভাষণে তিনি বলেন,

> "শিক্ষা বোর্ড গঠিত হওয়া যে কোন জাতির জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের একটি শুভ লক্ষণ। আপনাদের কর্তব্য হবে, আপনারা যে যেই মত ও পথের সমর্থক হোন না কেন, বোর্ডকে সাহায্য করা এবং দ্বীনী তালিমী কনভেনশন নামে সকলের যে অভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেটিকে পারস্পরিক মতানৈক্য পরিহার করে দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।"[৪] তার এ প্রচেষ্টার ফলে গোটা ভারতে মক্তব শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. ড. রাশেদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
৩. মাওলানা ফরীদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯

উপমহাদেশের 'আলিমগণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চিন্তাধারা ও সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণের নিন্দা করেছেন। তবে তাদের ভাষা কিংবা তাদের উদ্ভাবিত বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করতে নিষেধ করেননি। এক্ষেত্রে মাওলানা মাদানীর দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বসূরিদেরই অনুরূপ ছিলো। তিনি ইউরোপীয় জড়বাদী সভ্যতা অপছন্দ করেছেন। তবে ইউরোপের ভাষা কিংবা তাদের উদ্ভাবিত বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে কখনো আপত্তি করেননি।তার মতে, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা ফরযে কেফায়া আর বৈষয়িক জ্ঞান শিক্ষা করা মুবাহ।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত স্কুল কলেজের শিক্ষা ইংরেজ আমল থেকে শুরু হয়। উপমহাদেশের পাঠ্যক্রম ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক রচিত ও প্রবর্তিত হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেয়ে সম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশি। উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার ইংরেজদের ঐ পাঠ্যক্রম বহাল রেখেছিল বলে মাদানী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক সংস্কারপূর্বক জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেন।[১]

ভারতীয় উপমহাদেশে উর্দু ভাষার প্রচলন বহু পূর্ব থেকে চলে আসে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের চেষ্টার ফলে উর্দু ভাষা অন্যতম সাহিত্যমান লাভে সক্ষম হয়। ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন হলো উর্দু। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভক্তির পর উর্দুর সাথে শুরু হয় বিমাতাসুলভ আচরণ। উর্দুর স্থলে হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা চালু করা হয়। ফলে মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায় এবং মন-মানসিকতার দিক থেকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হয়। মাওলানা মাদানী ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দুকে জীবন্ত রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জমিয়তে উলামার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে উর্দুকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবী জানান। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৮-২৯ অক্টোবর মাওলানা মাদানী জীবনের সর্বশেষ সভাপতির ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকোর্সে মুসলমানসহ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রাখার সুপারিশ করেন।[২]

মৃত্যু

১৯৫৫ খ্রি. তিনি হজ্জে গমন করেন, যা ছিলো তার জীবনের শেষ হজ্জ। এ হজ্জের পর তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। ঐ বছর জেদ্দা নৌবন্দরে তাকে রাজকীয় সম্মান জানানো হয় এবং তাকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় 'শায়খুল আরব ওয়াল আজম' খেতাব দিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ ছাপানো হয়। হজ্জ শেষে মদীনা থেকে বিদায়ের সময় তিনি মুআজাহা শরীফে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। এ সফরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ভারতে এসে পূর্বের ন্যায় একটানা সফর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৪ জুলাই তিনি দেড় মাসের সফর সূচি নিয়ে মাদ্রাজ গমন করেন। অত্যধিক অসুস্থতায় ১৫ দিন যেতেই সফর থেকে ফিরে আসেন। ২৫ আগস্ট হাদীসের অধ্যাপনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি এই দায়িত্ব সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমদের নিকট ন্যস্ত করে বাসায় অবস্থান করেন। ১ ডিসেম্বর তিনি কিছুটা সুস্থতা অনুভব করেন। ৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টা বাজে কামরা থেকে বের হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করে নিজ কামরায় বিশ্রামে চলে যান এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন শুক্রবার সকাল ৯টায় দারুল 'উলূম দেওবন্দ চত্বরে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবির ইমামতিতে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মাজারে কাসেমিতে শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ৬ মাস ২৪ দিন।

---

১. মাওলানা ফরিদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৪
২. প্রাগুক্ত।
৩. ড. রাশেদুল ওয়াহেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

মানতিক ও ফালসাফার শিক্ষকগণ

শায়খুল হাদীস মানতিক, ফালসাফা শাস্ত্রের পুস্তকাদি পড়েন মাওলানা 'আবদুল ওয়াহীদ সুম্ভলী[১] ও মাওলানা আবদুল লতীফের কাছে। এছাড়াও কুতবী পড়েছি চাচাজান মাওলানা ইলয়াসের নিকট। বিশেষকরে মাওলানা মাজেদ 'আলী'র নিকট অধ্যায়ন করেছেন।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "আমার মানতিকের শিক্ষক ছিলেন তিনজন। *কুতবী* (মীর) চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস-এর নিকট পড়েছি। *শরহে তুহাবী*সহ মানতিকের অন্যান্য কিতাব মাওলানা 'আবদুল লতীফ-এর নিকট পড়েছি। *সুল্লাম*, *মায়বুযী*, *মীর যাহেদ*, *উমূরে আম্মাহ* মাওলানা 'আবদুল ওয়াহিদ সাম্ভূলী-এর নিকট পড়েছি। এছাড়াও *মোল্লা জালাল* ও *মোল্লা হাসান* তো মাদরাসায় ক্লাসেই পড়েছি।"[২]

মাওলানা 'আবদুল ওয়াহীদ সাম্ভলী

তিনি মানতেক ও ফালসাফার ইমাম ছিলেন। এছাড়াও তিনি সৌরবিজ্ঞান খুব ভালো বুঝতেন। তিনি ১২৯০ হিজরী সনে মুরাদাবাদের সাম্ভুল এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর পিতা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে উর্দূ শিক্ষা দেন। এরপর ব্যবসার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমা তিনি তাকে বড় 'আলিম বানাবেন। এজন্য এক সময় তিনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মুরাবাদাদেরা 'আরাবিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন।

মাদরাসাটি ছিলো তাঁর ঘর থেকে আড়াই মাইল দূরে। আসা-যাওয়ায় অনেক সময় ব্যয় হতো। এজন্য সাহারানপুর মাদরাসায় মাওলানা আহমাদুদ্দীনের কাছে ছরফ ও নাহু শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর তার কোনো শাস্ত্রবিশেষজ্ঞের নিকট যুক্তিবিদ্যা পড়ার আগ্রহ জন্ম নিলো। সে সময় জানতে পারলেন, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ হলেন এ শাস্ত্রের বড় পণ্ডিত। তাই তিনি বাড়িতে না জানিয়ে হাসানপুর থেকে পায়ে হেঁটে এ শাস্ত্রের শিক্ষা অর্জন করেন। মাওলানা শাহ্ 'আব্দুল কাদের রায়পুরী ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি হাদীস পড়ার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। সেখান থেকে ফারেগ হয়ে প্রায় পাঁচ বছর সারায়ে তারীন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর অমৃতসার নো'মানিয়া মাদরাসায় সদর মুদাররিস নিযুক্ত হন। এরপর আলীগড়ে এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। সেখানে অবস্থানকালে মাদরাসার দরস্তারবন্দী জলসা হয়। এতে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, মাওলানা আহমাদ হাসান আমরূহী এবং মাওলানা 'আবদুর রহীম রায়পুরী অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা সাহারানপুরী তাঁকে সেখান থেকে মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরে নিয়ে আসেন।[৩]

মাওলানা মাজেদ আলী

মাওলানা মাজেদ 'আলী জৌনপুর জেলার 'মানি কিলাঁ'র অধিবাসী ছিলেন। তিনি মানতিক ও ফালসাফা মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। হাদীস পড়েছেন গাঙ্গুহে। হাদীসের এ দরসেই তিনি মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবীর সহপাঠী ছিলেন। 'মেন্ডোহ গিলাওয়াঠী' ও কলকাতা 'আলীয়ায় তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। বিশেষত তর্কশাস্ত্র ও মানতিকের কিতাবাদি তাঁর যিম্মাতেই থাকতো। ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রি. ঈদুল ফিত্‌রের দিন তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে নিজ মাতৃভূমিতেই সমাহিত করা হয়।[৪]

---

১. তিনি ছিলেন তৎকালীন সময় মানতিক ও ফালসাফার একজন বড় ইমাম।
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী রচিত, হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮৬
৩. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ. ৮৯
৪. মুহাম্মদ মাস'ঊদ 'আযীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র খলীফা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র খলীফা

জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন নিয়মে মানুষ দুনিয়া থেকে একদিন বিদায় হয়ে যায়। মহাপুরুষ ওলী-আউলিয়া এমন কি নবী-রসূলগণও এর ব্যতিক্রম নন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ ...

"মুহাম্মদ (স.) রাসূলই ছিলেন এবং তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েগেছে, সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন...।"[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীও জন্ম-মৃত্যুর এ সাধারণ নিয়মে নির্ধারিত সময়ে "ইয়া কারীমু, ইয়া কারীমু" উচ্চারণ করতে করতে চলে গিয়েছেন তাঁর কারীম মাওলার সন্নিধানে। শায়িত হয়েছেন তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন অনুসারে প্রিয় নবীর প্রিয় মদীনায় তাঁরই আসহাব ও আহলে বায়তের সাথে জান্নাতুল বাকীতে। পিছনে রেখে গেছেন তাঁর সারা জীবনের কীর্তি– তিনটি বস্তু: (১) মুসলিম সাধারণ ও বিশ্বের আলিম সমাজ ও হাদীস শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর সহজবোধ্য ও জ্ঞানগর্ভ দ্বিবিধ রচনাবলী ; (২) তাবলীগী জামা'আত; (৩) বিশ্বের প্রায় সবক'টি মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর অসংখ্য আধ্যাত্মিক শিষ্য ও সন্তান। এ তিনটি বস্তুর মধ্যে তিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন।

দাওয়াত, ইসলাহ, ওয়ায-নসীহত, তাসাওউফ, সুলুক ও ইহসানের ময়দানেও শায়খুল হাদীস সবিশেষ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর থেকে ইজাযত ও খেলাফত পেয়েছেন– তাঁর কাছে যাঁরা আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করে যথারীতি খিলাফত লাভ করেছিলেন, তার তালিকা দেখলেই সে সত্যটি পাঠকের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠবে। খলীফাদের তালিকা হলো কোনো আধ্যাত্মিক উস্তাদ বা শায়খের জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শায়খুল হাদীসের খলীফাগণ হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, আফ্রিকা, ইংল্যান্ডসহ দেশ-বিদেশে আত্মশুদ্ধি তথা তাযকিয়ায়ে বাতিনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে তাঁদের নাম[২] ও তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত যাঁরা তাঁদের জীবনী তুলে ধরা হচ্ছে–

১) মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (প্রধান মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত)

২) মাওলানা আবদুল লতীফ (সাবেক নাযিম, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর)

৩) মাওলানা মুনাওয়ার হুসায়ন, (শায়খুল হাদীস, জামেয়া লতীফিয়া কাঠিহার, জেলা পূর্ণিয়া, বিহার)

৪) মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ বলিয়াবী, (মুদাররিস, মাদরাসায়ে কাশিফুল উলূম, দিল্লি)

৫) মাওলানা 'আবদুল জাব্বার আজমী, (শায়খুল হাদীস শাহী মসজিদ, মুরাদাবাদ)

৬) মাওলানা সাঈদ আহমদ খান মুহাজিরে মাদানী, (আমীরে তাবলীগ, সৌদি আরব)

৭) মাওলানা উমর কান্ধালবী (কান্ধালা, মুজাফ্ফর নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৮) মাওলানা উমর পালনপুরী, (মুরব্বী, তাবলীগী মারকায, নিযামুদ্দীন, দিল্লি)

৯) মাওলানা মাসঊদ এলাহী, (মীরাঠ, মুজাফ্ফর নগর, ইউপি)

১০) কারী আবদুল মুঈয সাম্ভলী, (ইমাম, খোকাবাজার মসজিদ, বোম্বে)

---

১. আল-কুর'আন, ০৩: ১৪৪
২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, *হায়াতে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়াক কান্ধালবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

১১) মাওলানা ওয়াসিকুল একীন, (কুরসী, জেলা বারা বাঙ্কি)

১২) মাওলানা আবদুল্লাহ, (কুরসী, জেলা বারা বাঙ্কি)

১৩) মাওলানা মুফীত জয়নাল আবেদীন, (মুদাররিস, দারুল উলূম, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান)

১৪) মাওলানা কিফায়েত উল্লাহ, (বনাসকাঁটা, পালনপুর, গুজরাট)

১৫) মাওলানা মুফতী মাহমূদ, (সভাপতি, জামিয়াতুল উলামা, রেঙ্গুন, বার্মা)

১৬) মাওলানা মুঈনুদ্দীন, (শুক্কুর, সিন্ধু, পাকিস্তান)

১৭) কারী আমীর হাসান, (সেওয়ান, বিহার, ভারত)

১৮) মাওলানা আবদুর রহীম মাতালা সূরাটী, (মুদাররিস, আল-মাহাদুর রশীদী আল-ইসলামী, চাপটা, জাম্বিয়া, আফ্রিকা)

১৯) মাওলানা আলহাজ্জ মালিক আবদুল হাফিয, (মক্কা মুয়ায্যমা, সৌদি আরব)

২০) মাওলানা ইমামুদ্দীন, (মুদাররিস, জামিয়া লতীফী, কাঠিহার, জেলা পূর্ণিয়া, বিহার)

২১) জামীল আহমাদ, (মুদাররিস, জামিয়া মিল্লিয়া, হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণাত্য, ভারত)

২২) মাওলানা আবদুর রহীম, (ধামপুর, জিলা বিজনূর, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

২৩) মাওলানা ইউসুফ মাতালা, (স্টিঙ্গার, দক্ষিণ আফ্রিকা)

২৪) হাজী ইবরাহীম মাতালা (স্টিঙ্গার, দক্ষিণ আফ্রিকা)

২৫) সুফী মুহাম্মদ ইকবাল, (মুহাজিরে মাদানী, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব)

২৬) ডাক্তার ইসমাঈল মায়মনী, (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব)

২৭) মাওলানা ইহসানুল হক, (মুদাররিস, মাদরাসায়ে আরাবিয়া, রায়বিণ্ড, লাহোর)

২৮) মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ, (মুদাররিস, মাদরাসা বায়তুল উলূম, সরায়ে মীর, জেলা আজমগড়, উত্তর প্রদেশ ভারত)

২৯) মাওলানা মুঈনুদ্দীন, (শায়খুল হাদীস, মাদরাসা এমদাদীয়া মুরাদাবাদ, ভারত)

৩০) মাওলানা আহবারুল হক, (মুদাররিস, মাদরাসা নূরুল উলূম, রাহরাইচ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৩১) মিঞাজী মূসা, (ফিরোজপুর, নিমক, মেওয়াত)

৩২) মাওলানা মুনীরুদ্দীন (মেওয়াত, নিমক, মেওয়াত)

৩৩) মুফতী ইসমাঈল কাছুলভী, (মুদাররিস, জামিয়া ডাবিল, জেলা সূরাট, গুজরাট)

৩৪) আলহাজ্জ আহমদ নাখিয়া আফ্রিকী, (মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব)

৩৫) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া মাদানী, (মুদাররিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচি, পাকিস্তান)

৩৬) মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম পালনপুরী, (মুদাররিস, মাদরাসা তালীমুদ্দীন আনন্দ, জিলা খীড়া, গুজরাট)

৩৭) আলহাজ্জ মালিক আবদুল হক, (মুক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব)

৩৮) মাওলানা ইউসুফ মাতলা, (মুহাদ্দিস, দারুল উলূমিল আরাবিয়া ইসলামিয়া হোলকম্ববারী, ইংল্যান্ড)

৩৯) মাওলানা ইসমাঈল বিদাত, (মদীনা মুনাওওয়ারা, সৌদি আরব)

৪০)কাযী আবদুল কাদির, (ঝাউরিয়া, জিলা সারগোদা, পাকিস্তান)

৪১) মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফা, (ফিরোজাবাদ, জেলা আগ্রা, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৪২) মাওলানা আহমাদ লূলাত, (কারমীলী ভায়াপানূলী, জেলা সূরাট, গুজরাট)

৪৩)মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম, (বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ)

৪৪) মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়র, (মক্কী মসজিদ, করাচি, পাকিস্তান)

৪৫)মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান পাণ্ডুর, (মুদাররিস, মাদরাসা নিউটাউন, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

৪৬)মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ, (ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান)

৪৭) মাওলানা মুহাম্মদ হারুন, (ইব্ন জী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, নিযামুদ্দীন, দিল্লি)।

৪৮)মাওলানা ওয়ারিছ আলী, (মাদাররিস, মাদরাসায়ে আরাবীয়া এশা'আতুল উলূম, খায়রাবাদ, জেলা সীতাপুর, অযোধ্যা)

৪৯)মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দেশাই, (তারাকেশ্বর, জেলা সূরাট, গুজরাট, ভারত)

৫০) মাওলানা আবদুল হালীম, (মুদাররিস, মাদরাসা নিয়ামুল উলূম, গুরীনী চুকিয়া, খিতাসরাই, জেলা জৌনপুর)

৫১)মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ, (আন্দামান দ্বীপ, ভারত)

৫২) হাকীম সা'দ রশীদ আজমিরী, (রাণী তালাব, জিলা সূরাট, গুজরাট)

৫৩) মাওলানা আহমদ মিয়া, (আল-মা'হাদুল ইসলামী, বাওয়াতির ফাল, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

৫৪)মাওলানা মুহাম্মদ তালহা, (সাহারানপুর, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সাহেবজাদা)

৫৫) মাওলানা ইবরাহীম আবদুর রহমান মিয়া, (জামি' মসজিদ লিন্‌য, জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

৫৬) মাওলানা আমজাদউল্লা, (গোরখপুরী, মুহাজিরে মাদানী)

৫৭)কাযী মাহমুদুল হাসান, (ঝাউরিয়া, জিলা সারগোদা, পাকিস্তান)

৫৮) আলহাজ্জ হাকীম ইয়াসীন, (মাদরাসা সউলাতিয়া, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব)

৫৯) মাওলানা ইযহারুল হাসান কান্ধালবী, (মুদাররিস, মাদরাসা কাশিফুল উলূম, মারকাযে তাবলীগ, নিযামুদ্দীন, দিল্লি, ভারত)

৬০) হাজী আবদুল আলীম মুরাদাবাদী, (মুরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৬১)মাওলানা মুহাম্মদ ছানী হাসানী নদবী মাযাহিরী, (নদওয়াতুল উলামা, লাক্ষ্ণৌ, ভারত)

৬২) মাওলানা আবদুল আযীয খুলনবী, (আমীরে তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ)

৬৩) আলহাজ্জ গোলাম দস্তগীর, (৪৮ লুইর মাল রোড, লাহোর)

৬৪)হাকীম আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস দেওবন্দী, (মদীনা তাইয়্যিবা, সৌদি আরব)

৬৫) মাওলানা ইউনুস জৌনপুরী, (শায়খুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর)

৬৬) মাওলানা কুতবুদ্দীন গায়াভী, (মুদাররিস, শাখা মাদরাসা, মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৬৭)মিয়াজী মুহাম্মদ ঈসা মেওয়াতী, (ফিরোযপুর নিমক, মেওয়াত)

৬৮) মাওলানা শফীক দেওবন্দী, (মুহতামিম, মাদরাসা আরাবিয়া সীলম, মাদ্রাজ, ভারত)

৬৯) মাওলানা নাসীম আহমদ আফ্রিদী, (আমরুহা, জিলা মুরাদাবাদ, ভারত)

৭০)আলহাজ্জ মুহাম্মদ যকী ভূপালী, (মদীনা তাইয়্যিবা, সৌদি আরব)

৭১) মাওলানা আবদুল্লাহ্ (বাহ্‌লী শরীফ, শুজা আবাদ, পাকিস্তান)

৭২)আলহাজ্জ আনীস আহমাদ, (মদীনা মুওওয়ারা, সৌদি আরব)

৭৩)মাওলানা মুহাম্মদ আকীল, (সদর মুদাররিস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত)

৭৪) মাওলানা হাশিম হাসান প্যাটেল, (নায়েবে নাযিম, দারুল উলূম হোলকম্ব বারী, ইংল্যান্ড)

৭৫)কারী রহীম বখশ, (উস্তাযুল কুরা, মুলতান, পাকিস্তান)

৭৬)মাওলানা হাস্‌সান আহমাদ পাটনবী, (মদীনা মুনাওওয়ারা, সৌদি আরব)

৭৭) মাওলানা নজীবুল্লাহ চাম্পারনী, (মদীনা মুনাওওয়ারা, সৌদি আরব)

৭৮)মাওলানা মুযহির আলম মুজাফ্‌ফরপুরী, (কানাডা প্রবাসী)

৭৯)আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফাতিহ মুহাম্মদ, (আসানসোল, পশ্চিম বঙ্গ)

৮০) আলহাজ্জ মুহাম্মদ দাউদ, (এবেটাবাদ, পাকিস্তান)

৮১)সায়্যিদ মুখতারুদ্দীন, (কোয়েটা, পাকিস্তান)

৮২) মাওলানা যুবায়রুল হাসান, (আমীর, মারকাযে তাবলীগ, নিযামুদ্দীন, দিল্লি, ভারত)

৮৩) মাওলানা মুহাম্মদ ইশতিয়াক, (মুদাররিস, জামিউল উলূম, মুজাফ্‌ফরপুর, বিহার)

৮৪)মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাহেদ, (মুদাররিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন্নুরী, টাউন, করাচি, পাকিস্তান)

৮৫) মাওলানা মুহাম্মদ গার্ডি, (হোয়াইট রিভার, এলিস্টন্ন ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা)

৮৬) মাওলানা ফয়যুল হাসান কাশ্মীরী, (মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৮৭)মাওলানা আবদুল হাই, (বাহুলী শরীফ, শুজা আবাদ, পাকিস্তান)

৮৮) মাওলানা মুহাম্মদ তাহির মানসূরপুরী, (লাক্ষ্ণৌ, ভারত)

৮৯) মাওলানা সূফী আবদুল আহাদ, (মুজাফ্‌ফর পুর, বিহার, ভারত)

৯০)মাওলানা হাশিম বুখারী, (মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৯১)মাওলানা শাহেদ, (মুদাররিস, মাযাহিরুল উলূম, সাহারানপুর)

৯২) মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী, (মুদাররিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরী টাউন করাচি, পাকিস্তান)

৯৩) মাওলানা আশিক এলাহী বুলন্দশহরী, (মুহাজিরে মাদানী, সৌদি আরব)

৯৪)মাওলানা আবদুল্লাহ্, (শায়খুল হাদীস, জামিয়া রশীদিয়া সাহীওয়াল, পাকিস্তান).

৯৫) মাওলানা সায়্যিদ রশীদুদ্দীন, (মুহতামিম, মাদরাসায়ে শাহী, মুরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)

৯৬) আলহাজ্জ হাফিয সগীর আহমাদ, (মদীনা স্টেশনারী মার্ট, আনার কলি, লাহোর)

৯৭)মাওলানা আবদুর রব মদীনা হুজুর (মুহাদ্দিস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ)

৯৮) মাওলানা উমর ফারুক সন্দীপী, (সাবেক মুদাররিস, দারুল উলূম মাদানী নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ)

মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (১৯০৭-১৯৯৬ খ্রি.)

তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় ইসলামি পণ্ডিত, হানাফি 'আলিম এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাজাহির উলুম, সাহারানপুরের প্রাক্তন প্রধান মুফতী। তিনি সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বংশধর। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেওবন্দ আন্দোলনের প্রসারে তার ভূমিকা রয়েছে।

জন্ম

মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী ১৩২৫ হিজরীর ৮/৯ জমাদিউল সানি মোতাবেক ১৯০৭ খ্রি. ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত গাঙ্গুহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা হামেদ হাসান শায়খুল হিন্দের শাগরেদ এবং রশিদ আহমেদ গাঙ্গুহীর নিকট বায়'আত ছিলেন।

বংশ পরিচয়

মুফতী মাহমুদ হাসান ইব্ন মাওলানা হামেদ হাসান ইব্ন হাজী খলীল ইব্ন ওয়ালী মুহাম্মদ ইব্ন কলন্দর বুখশ ইব্ন মুহাম্মাদ আলী ইব্ন গোলাম রাসূল ইব্ন আবদুল হামিদ ইব্ন কাজী মুহাম্মদ ফাজেল ইব্ন জামিল মুহাম্মদ ইব্ন কাজী মুহাম্মাদ খলীল ইব্ন কাজী ওয়ালী মুহাম্মাদ ইব্ন কাজী কাবীর ইব্ন কাজী আমান ইব্ন খাজা ফরিদুদ্দিন ইব্ন খাজা আলাউদ্দিন ইব্ন খাজা রুকনুদ্দিন ইব্ন খাজা শরফদ্দিন ইব্ন খাজা তাজুদ্দিন ইব্ন খাজা ইসমাঈল ইব্ন খাজা হাশেম বুজুর্গ ইব্ন খাজা ইসমাঈল ইব্ন শায়খুল ইসলাম খাজা আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী ইব্ন খাজা আবু মানসুর ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন জাফর ইব্ন আবু মানসুর ইব্ন আবু আইয়ুব আনসারী (রহ.)।

শিক্ষাজীবন

মাহমুদ হাসানের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় শায়খুল হিন্দের নিকট রশিদ আহমেদ গাঙ্গুহীর কন্যার বৈঠকখানায়, সেখানে হাফেজ করীম বখশের নিকট কুর'আন কারিম হেফজ করেন। কুর'আন হেফজ শেষ করতে মাত্র সতেরো লাইন বাকি, এমতাবস্থায় হাফেজ করীম বখশ (যিনি অন্ধ ছিলেন) মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর গাঙ্গুহ জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ 'আব্দুল করীম সাহেবের নিকট হেফজ সমাপ্ত করেন। সে সময় নিজের আগ্রহে উর্দু ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। আর *আহমদনামা* ও *বুস্তা*'র কিছু অংশ পড়েছেন মাওলানা ফখরুদ্দীন গাঙ্গুহীর নিকট। ১৩৪১ হিজরীতে মাজাহির উলুম, সাহারানপুরে ভর্তি হয়ে *সরফে মীর* এবং *নাহুমীর* ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু করে মীর যাহেদ গোলাম ইয়াহইয়া, কাযী মুবারক *দিওয়ানে হামাসাহ*, *দিওয়ানে মুতানাব্বী* এবং *হামদুল্লাহ*সহ অন্য কিতাবগুলো পড়েন ১৩৪৭ হিজরী পর্যন্ত। ১৩৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে *হেদায়া আখেরাইন* এবং *মিশকাত শরীফ* অধ্যয়ন করেন। ১৩৪৯ হিজরীতে বায়যাভী, *আবূ দাউদ* এবং *মুসলিম শরীফ* পড়েন। আর ১৩৫০ হিজরীতে শায়খুল ইসলাম হুসায়ন আহমদ মাদানীর নিকট *বুখারী শরীফ* ও *তিরমিযী শরীফ* পড়েন। পরবর্তী বছরে মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুরে ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদিসের সব কিতাব পুনরায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মাজাহিরুল উলুমেই তাজভীদ এবং কিরাআত শাস্ত্র সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পরপর ১৩৫১ হিজরীর জিলকদের ৪ তারিখে মাজাহির উলুম, সাহারানপুরে মাসিক দশ রুপি বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১৩৫৩ হিজরীতে সহকারী মুফতী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৩৭০ হিজরী পর্যন্ত মাজাহির উলুম, সাহারানপুরে ওই পদে বহাল থাকেন। এ সময়ের মাঝে *মীযানুচ্ছরফ* থেকে *হেদায়া আওয়ালাইন* এবং *জালালায়ন* পর্যন্ত সব কিতাবের দরস প্রদান করেন। সে সময় তিনি মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী, মাওলানা আবদুল লতিফ এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী'র তত্ত্বাবধানে কামালিয়াতের সকল স্তর অতিক্রম করেন এবং শেষ পর্যন্ত যুগশ্রেষ্ঠ ফেকাহবিদ হতে সক্ষম হন।

মাজাহির উলুম সাহারানপুরে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৩৭১ হিজরী থেকে ১৩৮৪ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর যাবত জামেউল উলুম কানপুর মাদরাসায় মুহতামিম, মুফতী ও শায়খুল হাদীসের পদে দায়িত্ব পালন করেন।

কানপুরবাসীর ওপর মুফতী মাহমুদের তাকওয়া, পরহেজগারী বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জামেউল উলুম কানপুর কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন তিনি যেন এই মাদ্রাসায় থাকে। কিন্তু ১৩৮৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হিসেবে চলে আসেন। দারুল উলুম দেওবন্দে মুফতী মাহমুদ ফতওয়া প্রদানের কাজ ছাড়াও দীর্ঘদিন পর্যন্ত *সহীহ বুখারী*র দরস প্রদান করেন। ১৩৮৬ হিজরীতে তাকে মাজাহির উলুম, সাহারানপুরের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচন করা হয়।

তাসাউফ

মুফতী মাহমুদ ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালবীর উল্লেখযোগ্য খলিফাদের একজন। নিজের বাইআতের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন,

আমার বাইআতের ঘটনাটি ছিল ১৩৪৯ হিজরীতে। তখন আমি দেওবন্দে পড়তাম। আর আমি যখনই রায়পুরী এবং দেহলভীর খেদমতে উপস্থিত হতাম তখন আখেরাতের প্রতি আগ্রহ খুব বেশি হত। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ বেড়ে যেত। আর যখন যাকারিয়া কান্ধালবী'র নিকট যেতাম, তখন স্বীয় গুনাহ এবং দোষগুলো সামনে চলে আসত। আমি মনে করতাম আমার সংশোধন তার দ্বারাই হবে। শায়খকে প্রাধান্য দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, বয়সের বিবেচনায় শায়খ অন্যান্যদের থেকে ছোট ছিলেন, যার দরুন বেশ কিছু সময় হযরতের খেদমতে কাটানোর সুযোগ হয়ে যাবে। অতঃপর আমি শায়খের নিকট বাইআত হওয়ার দরখাস্ত করলাম। তখন তিনি শায়খুল হাদীস হুসাইন আহমেদ মাদানীর নিকট আমাকে বাইআত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন, ইস্তেখারা করে নাও, অথবা নিযামুদ্দিন,রায়পুর ও থানাভবন সফর কর এবং তিনজনের মজলিসে চুপিসারে বস, অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি কোথাও যাইনি। তখন শায়খ আমাকে বাইআত করে নিলেন। বাইআতের পূর্বে কছদুস সাবীল দেখে জিকির শুরু করেছিলাম। বাইআত হওয়ার পরে শায়খ যিকির ছাড়িয়ে দিয়ে তাসবিহাত বাতলে দিলেন। দীর্ঘদিন রিয়াযত ও মোজাহাদার পর খেলাফত লাভ করলাম।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবীর মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে তার খানকাহ ছিল। খানকাতে রিয়াযাত- মুজাহাদার কাজ করতেন। দেওবন্দ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে খানকাহ ছিল। এমনি ভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফ্রিকা, লন্ডন, বিভিন্ন দেশে তার খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব খানকাতে হাজার হাজার 'আলিম এবং সাধারণ মানুষের ইসলাহী কাজ করতেন।

মুফতী মাহমুদের খলিফাদের মধ্যে আবুল কাসেম নোমানী, ইব্রাহিম দেসাই, রহমতুল্লাহ মীর কাসেমী প্রমুখ উল্ললেখযোগ্য। বাংলাদেশে তার খলিফাদের মধ্যে রয়েছেন নূর হুসাইন কাসেমী, মুফতী শফিকুল ইসলাম, মুফতী মামুনুর রশীদ, মুফতী জাকির সাহেব টিকরপুর মুফতী মাহবুব ইব্ন মশাররফ বরিশালী, মাওলানা মোস্তাফাসহ আরো অনেকেই। তার খানকা এখনো বাংলাদেশে বিদ্যমান।

বাংলাদেশ সফর

তিনি ৪ বার বাংলাদেশে আগমন করেন। ১৯৯৬ খ্রি. মাহে রমযানে বাংলাদেশে তার সর্বশেষ সফর হয়েছিল। তখন তিনি ঢাকার মালিবাগ মাদরাসার জামে মসজিদে এক মাসব্যাপী কয়েক হাজার দেশী ও বিদেশী ভক্ত ও মুরিদদেরকে সাথে নিয়ে জিকির, তালকীন ও ই'তিকাফ করেন।

তিনি বাংলাদেশের ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার টিকরপুরে আল জামিয়াতুল মাহমুদিয়া টিকরপুর মাদরাসাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের ৬টি মাদরাসা এবং মালিবাগ মাদরাসা ও জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার প্রধান দুটি খানকাহও তার নেসবতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনা

মুফতী মাহমুদ সারাজীবনে যত ফতোয়া দিয়েছিলেন তা প্রকাশ হয়েছে "*ফতোয়া মাহমুদিয়া*" নামে। ৩২ খণ্ডে সংকলিত এই বিশাল গ্রন্থটি হানাফি মাযহাবের একটি রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইতিমধ্যেই তার ৯টি মালফুজাত এবং ৯টি মাওয়ায়েজ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে–

আল তাবারীর উর্দু অনুবাদ সীরাতে সায়্যিদুল বাশার

ফাহারসিল হাওয়া লিল হাশিয়াতুত ত্বহাবী

মনাজিলুল ইলম (জ্ঞান অর্জনের পর্যায়)

মালফুজাতে ফকিহুল উম্মাহ (২ খণ্ড) (উম্মতের ফকীহগণের উপাখ্যান)

মাওয়ায়েযে ফকিহুল উম্মাহ (৫ খণ্ড) (উম্মতের ফকীহগণের বক্তব্য)

পার্থক্যের সীমানা

মৃত্যু

তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী। হজলডেন থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে এলসবার্গে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১]

জুবায়েরুল হাসান কান্ধালবী

(৩০ মার্চ ১৯৫০-১৮ মার্চ ২০১৪ খ্রি.) ছিলেন একজন ভারতীয় ইসলামি পণ্ডিত। তিনি বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগের ভারত উপমহাদেশের নিজামুদ্দিন মারকাজের মাশায়েখদের মধ্যে অন্যতম একজন মুরুব্বি, এবং তৃতীয় হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হাসান কান্ধালবী এর পুত্র।

প্রথম জীবন এবং কর্মজীবন

জুবায়ের-উল-আসান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, ভারত শহরে কান্ধালা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের মাজাহির উলূম সাহারানপুর থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনি একজন শিষ্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তার খ্যাতিমান মাতামহ শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী-এর 'খলিফা' (স্বীকৃত উত্তরসূরী) তিনিও একজন খ্যাতিমান মুসলিম নেতা ছিলেন এবং প্রথম দিকে এবং জীবন-জীবন ছিলেন- তাবলিগী জামায়াতের বিশ্বায়নের দীর্ঘ বুস্টার। মাওলানা মুহাম্মদ জুবায়েরুল হাসান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক এবং তার পড়াশোনা শেষ করেন। মাওলানা জুবায়েরুল হাসান বিশ্বব্যাপী বিশ্ব ইজতেমা ঢাকা টঙ্গী, রাইওয়াইন্ড এবং ভোপাল আখেরী মোনাজাতের নেতা ছিলেন। স্থূলতার কারণে তাকে প্রায়শই হুইলচেয়ারে দেখা যেত। তিনি তাঁর পিতাসহ জামায়াতের নেতৃবৃন্দ হিসাবে তার দীর্ঘ সম্বোধন ও বক্তব্য রাখার চেয়ে দীর্ঘ প্রার্থনার চেয়ে তার শেষ প্রার্থনা এবং

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে পিতা মাওলানার ইনামুল হাসান কান্ধালবী মারা যাওয়ার পরে টেলেগি জামায়াতের বিষয় পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পণ্ডিত পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু এবং উত্তরাধিকার

১৯৮৯ খ্রি. মাওলানা মুহাম্মদ জুবায়েরুল হাসান শাহরানপুরের আল-হাফিজ ইলিয়াসের কন্যা তাহিরা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবীর জামাইদের অন্যতম। এই দম্পতির তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। বড় ছেলে হাফিজ মাওলানা জহিরুল-হাসান কান্ধালবী তাবলীগ আন্দোলনের সুপরিচিত কথোপকথনে পরিণত হয়েছেন। খবরে বলা হয় যে জুবায়ের স্থূলকায়, ডায়াবেটিস ছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য সুস্বাস্থ্যের মধ্যে ছিলেন না। দিল্লি শাহী জামে মসজিদের ইমাম, মাওলানা সৈয়দ আহমেদ বুখারী তার শ্রদ্ধা নিবেদনে বলেছিলেন যে, তাবলিগী জামাতের প্রয়াত প্রবীণ সদস্য মাওলানা জুবায়েরুল হাসান একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতা ছিলেন। যিনি সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করেছেন। "তিনি সারাজীবন অরাজনৈতিক থাকতেন এবং কেবল ধর্মের বিষয় নিয়েই নিজেকে উদ্বিগ্ন রাখতেন।"[১]

মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভি

মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভি (১৯৩২-২০০০ খ্রি.) ছিলেন একজন পাকিস্তানি সুন্নি মুসলিম পণ্ডিত, লেখক, মুহাদ্দিস, মজলিস-ই-আহরার-ই-ইসলামের নেতা, এবং আলমি মজলিস তাহাফ্‌ফুজ খতমে নবুওয়াতের সহসভাপতি। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ মে ২০০০ খ্রি. যোহরের নামাযের পূর্বে অফিসে যাবার সময় নুমাইশ চৌরঙ্গীতে তাকে হত্যা করা হয়।

জীবনী

ইউসুফ লুধিয়ানভি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার ইসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আল্লাহ বকশ ছিলেন 'নাম্বার দার' বা গ্রামের প্রধান। তার পিতা তৎকালীন ধর্মীয় নেতা আব্দুল কাদের রায়পুরীর অনুসারী ছিলেন। ইউসুফ লুধিয়ানভি ব্রিটিশ ভারতের লুধিয়ানায় প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন এবং মুলতানে খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরীর অধীনে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। পরবর্তিতে তিনি প্রথমে ফয়সালাবাদ ও সাহিওয়ালে এবং পরে করাচির জামিয়া বিন্নুরিয়ায় হাদীস-এর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

ইউসুফ লুধিয়ানভি ১০০ টিরও বেশি বই লিখেছেন যেগুলো বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। *আপকে মাসাইল আওর উনকা হল* (হানাফি ফিকহ বিষয়ক বই) এবং *ইখতিলাফে উম্মত ও সিরাত-ই-মুস্তাকীম* (উম্মাহর দলসমূহ এবং সরল পথ) তার স্মরণীয় রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম।

*আল-বায়ায়িনাতে*র সম্পাদক হওয়ার পাশাপাশি তিনি আলমি মজলিস তাহাফফুজ খতমে নবুয়ত (আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত রক্ষা পরিষদ) এবং ইকরা স্কুল চেনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত্তম মাদ্রাসা করাচিতে জামিয়া উলূমুল-ইসলামিয়ায় হাদীস পড়াতেন।

তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার কারণে জামিয়া বিন্নুরিয়ার সভাপতি মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী তাকে '*খতম-এ-নুবুওয়াত*' (সাপ্তাহিক পত্রিকা) এবং '*আল-বাইয়াইনাত* (মাসিক পত্রিকা)-এর সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন।

হত্যার আগে ইউসুফ লুধিয়ানভি সুন্নি ও শিয়া মুসলমানদের মধ্যে চলমান সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের সুন্নি সম্প্রদায়ের একজন সুপরিচিত 'আলিম ছিলেন এবং পুরো

১. মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হাসান, *হালাতে মাশায়েখে কান্ধালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

পাকিস্তানে তার সহস্রাধিক অনুসারী ছিলেন। তার শত শত সমর্থক তার হত্যার প্রতিবাদ করতে করাচির রাস্তায় নেমে এসেছিল এবং তার হত্যার সংবাদটিও দিন শেষে পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকে হ্রাস পেয়েছিল।[১]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী

জন্ম: মাওলানা আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ভারতবর্ষের জন্য তিনি ছিলেন ছালফে ছালিহীনের নমুনা। এছাড়াও তাঁর ইলম, যুহ্দ, তাকওয়া, তাওয়াযু', খুলূছিয়্যত, লিল্লাহিয়্যত ছিল মুসলিম সমাজের জন্য এক অনন্য বদন। তিনি ছিলেন প্রকৃত 'আশেকে রাসূল। তিনি আখলাক ও আওছাফের দিক দিয়ে আকাবেরে আসলাফদের অনুসরণ করতেন। তিনি আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বুলন্দশহর জেলার অন্তর্গত বাগরাসি এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হিজরী ১৩৪৩ মুতাবিক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরীর জন্মের উল্লেখিত সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। কিন্তু *ইয়াদগারে ছালিহীন* ও *তাযকিরায়ে 'উলামায়ে দেওবন্দ* কিতাব দু'টিতে উপরিউক্ত সন উল্লেখ করা হয়েছে। তবে *ইয়াদগারে ছালিহীনে* তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে স্পষ্ট করার জন্য বলেন, তিনি ১৩৫৫ হিজরী সনে হিফয সম্পন্ন করেন সেসময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। তিনি হিফয সম্পন্ন করেছেন ১৩৫৫ হিজরী সনে এ ব্যাপারে সকলেই একমত। হিজরী ১৩৫৫ সন-এর উপর ভিত্তি করে হিসেবে করলে তাঁর জন্ম সন ১৩৪৩ হিজরীই হয়।[৩]

নাম: মুহাম্মাদ 'আশিক, পিতার নাম: মুহাম্মাদ সিদ্দীক ও দাদার নাম: আসাদুল্লাহ খান। উপাধী বুলন্দশহরী, আল বরনী, আল মাযাহিরী এবং মুহাজিরে মাদানী।[৪]

বংশ পরিচয়: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র পিতা সূফী মুহাম্মাদ সিদ্দীক বিয়ে করেন কাড়াখিল বাসিন্দাস্থ শায়খ রহমাতুল্লাহ্ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাকে। বিয়ের পর তিনি তিন সন্তানের পিতা হন। তিন সন্তানের মধ্যে মাওলানা 'আশিক ইলাহি ছিলেন জৈষ্ঠ পুত্র। ১৩৪৩ হিজরী সনে জৈষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ সিদ্দীকের ঘর আলোকিত করল। এ খুশিতে তিনি তাঁর নাম রাখলেন মুহাম্মাদ 'আশিক।

মুহাম্মাদ 'আশিক যখন কিছুটা বুঝতে শিখেন তখন মাওলানা 'আশিক ইলাহী মিরাঠীর নাম তাঁর কর্ণগোচর হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। মাওলানা মিরাঠী ছিলেন তৎকালীন সময়ে অনেক বড় একজন 'আলিম। এজন্যই তিনি মাওলানা 'আশিক ইলাহী মিরাঠীর নামের সাথে মিল রাখার জন্য '*ইলাহী*' অংশ বাড়িয়ে দিয়ে মুহাম্মাদ 'আশিক ইলাহী হয়ে যান।[৫]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী মিরাঠীর ছেলের সাথে মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরীর সাথে সাক্ষাত হলে মিরাঠী'র ছেলে বলেন, আমার পিতার নামের সাথে আপনার নামের মিল থাকায় আমি আপনাকে আমার পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মহাব্বত করি। আপনার সাথে আমার পিতার নামেই শুধু মিল নয় বরং তাঁর কাজে ও কর্মেও মিল রয়েছে। তাঁর কলমে যেমন ছিল ধার আপনার কলমেও তেমনি রয়েছে ধার। তাঁর লিখনী দ্বারা মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছে আপনার লিখনী দিয়েও তেমনি উপকৃত হচ্ছেন। আমার পিতা মিরাঠী *তরজমাতুল কুরআনুল কারীম*, *তারীখে ইসলাম*, *তাযকিরাতুর রাশীদ* ও

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, *ইয়াদগারে ছালেহীন* (করাচি: মাকতাবায়ে আনওয়ারে তয়্যিবা, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫ ; হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, *তাযকিরা আওলিয়ায়ে দেওবন্দ*, (লাহোর: মাকতাবায়ে রহমানিয়া, তা. বি.), পৃ. ৭৮৫ ; মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, বিখ্যাত ১০০ ওলামা মাশায়েখের ছাত্রজীবন (ঢাকা: বাড কম্প্রিট এন্ড পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৮।

৩. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৪. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত।

৫. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

তাযকিরাতুল খলীল লিখেছেন, আপনিও কুর'আন মাজীদের তাফসীরসহ বিভিন্নভাবে তাঁর ন্যায় খিদমতের আঞ্জাম দিচ্ছেন। আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন আপনার এ খিদমত কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন। আমীন।[১]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র বহু গ্রন্থ সৌদী 'আরবসহ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ছাপানো হচ্ছে।

পিতা-মাতা: সূফী মুহাম্মাদ সিদ্দীক বিয়ে করেন কাড়াখিল বাসিন্দাস্থ শায়খ রহমাতুল্লাহ্ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাকে। বিয়ের পর তিনি তিন সন্তানের পিতা হন। এক ছেলে দুই মেয়ে। তিন সন্তানের মধ্যে মাওলানা 'আশিক ইলাহি ছিলেন জৈষ্ঠ পুত্র। মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র জন্মের চার বছর পর তাঁর মাতা ইনতিকাল করেন। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি মাতৃ হারা হন।[২]

সূফী মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম কন্যা বারো বা তেরো বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় কন্যা মাওলানা 'আশিক ইলাহির ইনতিকালের পনেরো দিন পর ইহধাম ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় কন্যার লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাওলানা 'আশিক ইলাহীর দাদী।[৩] আল্লাহ তা'আলা সূফী মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবকে দীর্ঘ হায়াত দান করেছেন। তিনি তাঁর জৈষ্ঠপুত্র মাওলানা 'আশিক ইলাহির লিখিত অনেক কিতাব পড়েছেন। তিনি ছেলের সাথে হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানের দারুল 'উলূম করাচিতে হিজরত করেন।

মাওলানা 'আশিক ইলাহি বলেন, আমার আব্বাজান (রহ.) হিন্দুস্তান থাকাবস্থায় বহুদিন মিরাঠের একটি মসজিদে ইমামতি করতেন। একদিন আব্বাজান (রহ.) প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় হিন্দুরা এসে মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। মসজিদের ভেতরে কয়েকজন মানুষ ছিল এমনকি আমার আব্বাজানের কামরাতেও একজন ঘুমাচ্ছিল। তারা এগুলো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর ভিতরের মানুষগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা সকলেই শহীদ হয়ে যায়। লোকে বলাবলি করছিল, মসজিদ পুরবি তো পুর, তাই বলে মানুষ পুরাবি! আবার ভেতরে ছিল ইমাম সাহেব, এখন কি করি! তাঁর উঠতি বয়সের একটি ছেলে আছে, সে মাদরাসায় পড়ে। তাকে কী জওয়াব দিবো।

লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে মসজিদের ইমাম সাহেব (আমার আব্বাজান) শহীদ হয়েছেন। আমি তখন মাদরাসায় পড়ছিলাম। খবর পেয়ে মিরাঠে চলে আসলাম। ট্রেন থেকে নামতেই এমন একজনের সাথে দেখা যিনি আব্বাজানকে চিনেন। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজানের অবস্থা কি? তিনি বললেন, উনি তো ভালই আছে। তার কথা শুনে আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ্। অতঃপর আমি মসজিদের কাছে গিয়ে দেখি মসজিদ পুড়ে ছাই কিন্তু আব্বাজান (রহ.) সহী-সালামতেই আছেন।[৪]

আব্বাজানের জীবিকা উপার্জনের জন্য একটি ছোট্ট দোকান ছিল। এ ছাড়াও তিনি কৃষিকাজ করতেন। একবার তরমুজের খুব ভালো ফলন হয়। তিনি নৌকা বোঝাই করে বাজারে যাওয়ার সময় নৌকাটি মাঝ নদীতে ভেঙ্গে যায়। পিতাজী সাঁতার জানতেন না বিধায় ডুবে যান। লোকজন তাড়াহুড়ো করে পানি থেকে তুলে এনে পেট থেকে পানি বের করে। মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া এখানেও তিনি আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে বেঁচে যান। প্রবাদ আছে– রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

পিতার ইনতিকাল: আব্বাজান (রহ.)-এর দিলের তামান্না ছিল তিনি শহীদী মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর মৃত্যু হয়–পেটের ব্যথা তথা পেটে পানি চলে এসেছিল। *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিমের* বর্ণনা মতে–

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. ড. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: اَلْمَطْعُوْنُ وَ الْمَبْطُوْنُ وَ الْغَرِيْقُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার– (১) প্লেগে মৃত ব্যক্তি (২) পেটের পিড়াজনিত কলেরায় মৃত ব্যক্তি (৩) পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি (৪) চাপা পড়ে মৃত্যু (৫) আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) শহীদ।"[১]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন, আব্বাজান (রহ.) আমার পড়ালেখার সুবাদে দারুল 'উলূম করাচিতে চলে আসেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম মুহূর্তে দারুল 'উলূম করাচির উস্তায ও নাযেম মাওলানা শামসুল হক খান কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সূফী মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেবের রুহ তাঁর দেহ থেকে চলে যায় তৎক্ষণাত তাঁর চেহারা মুবারক মহান আল্লাহ্‌র কৃপায় পশ্চিম দিকে ঘুরে যায়। তাঁকে দারুল 'উলূম করাচির কবরাস্তানে দাফন করা হয়।[২]

শিক্ষা অর্জন: মুহাম্মাদ আশিক ইলাহী সর্বপ্রথম নিজ গ্রামের মক্তবে কয়েকজন শিক্ষকের নিকট কুর'আন মাজীদের নাযেরা ও ১০ পারা হিফয করেন। এরপর গ্রামের জামে' মসজিদে মুহাম্মাদ সাদেক বাঙ্গালী নামক একজন দক্ষ ও পরহেযগার হাফেযে কুর'আনের তত্ত্বাবধানে অবশিষ্ট ২০ পারা মাত্র ৬ মাসে হিফয করেন।[৩] তিনি প্রত্যহ ফজরের নামায উস্তাযের সাথে পড়তেন এবং নামাযের পর পরই কুর'আন মাজীদের সবক ইয়াদ করতেন। বেলা এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তিনি মসজিদেই অবস্থান করতেন। তিনি ১৩৫৫ হিজরী সনে শা'বান মাসে মাত্র বারো বছর বয়সে কুর'আন মাজীদের হিফ্য সম্পন্ন করেন। যে বছর তিনি হিফ্য করেন সে বছর রমযান মাসে মহল্লার মসজিদে তারাবীহ নামাযে ইমামতি করেন। হিফ্যের সাথে সাথে তিনি উস্তাযে মুহতারামের কাছে উর্দূভাষা এবং হাতের লিখা শিখেন।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই করেন। তিনি হাফেয মাওলানা সাদেক-এর নিকটেই হিফ্য শেষ করে এক বছরে উর্দূ, ফারসীসহ *নাহবেমীর*, *সরফেমীর*, *দাস্তুরুল মুবতাদি*, *ফুসূলে আকবরি*, *হিদায়াতুন্নাহু*, *মুন্য়াতুল মুসাল্লী* কিতাব পড়েন। এছাড়াও তিনি ছোট বড় আরো অনেক কিতাব তাঁর কাছে পড়েন।[৫]

মাওলানা 'আশিক ইলাহি অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর মেধা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি মাওলানা সাদিক সাহবের কাছে মাত্র এক বছরে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সবগুলো কিতাব অধ্যায়ন করেন।

পরবর্তীতে তাঁর পিতা তাঁকে মুরাদাবাদের বিভিন্ন মাদরাসায় নিয়ে যান। কিন্তু বছরের মাঝখান হওয়ায় কেবল তাঁকে মুরাদাবাদ জেলার হাসানপুর কাদিরিয়া মাদরাসায় ভর্তি করতে সক্ষম হন। অত্র মাদরাসায় তিনি ১৩৫৬ হিজরী সনে ভর্তি হন। এ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মাওলানা ওলী আহমাদ

---

১. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন্ ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (দেওবন্দ: মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৭ হি.), খ-১, পৃ. ৯০ ; মুসলিম ইব্ন্ হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৯১৪।

২. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী রচিত, মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন অনূদিত, *বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৫০৪।

৪. সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ আল-হাসানি সাহরানপুরি, *'উলামাউ মাজাহিরিল 'উলূম সাহরানবুর ওয়া ইনজাযাতুহুম আল-'ইলমিয়া ওয়াত তা'লিফিয়্যা* (ভারত: মাকতাবাতুশ শায়খ আত তুযকারিয়া, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮।

৫. ওয়ালীয়ুর রহমান খান, "আল্লামা 'আশিক ইলাহি বুলন্দশহরি: ইসলামি শিক্ষায় তাঁর অবদান" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩২।

সাহেবের[১] কাছে তিনি পুনরায় নাহবেমীর পড়েন। এছাড়াও তিনি অত্র মাদরাসায় মাওলানা 'আবদুল 'আযীয টান্ডোবী'র কাছে বেহেশ্‌তী যেওর পড়েন।

১৩৫৭ হিজরী সনে তিনি মাদরাসা ইমদাদিয়া মুরাদাবাদে ভর্তি হন। অত্র মাদরাসার মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত সাম্ভলী ছিলেন মাওলানা সাদিক সাহেবের জামাতা। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন মাওলানা 'আশিক ইলাহির কাছে একজন পরিচিত শিক্ষক। এ মাদরাসায় তিনি মাত্র দুই বছরে *মুফীদুত্ ত্বলিবীন*, *নাফহাতুল 'আরব*, *নাফহাতুল ইয়ামান*, *কাফিয়া*, *শার্‌হে জামী*, *আল-মুখতাসারুল কুদূরী*, *কানযুদ্ দাক্বাইক্ব*, *উসূলুশ শাশী*, *নূরুল আনওয়ার*, *মীযানুল মানতিক*, *কুতবী*সহ আরো অনেক কিতাব বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দের কাছে অধ্যয়ন করেন। এখান থেকেই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[২]

১৩৫৮ হিজরী সানের শাওয়াল মাসে 'আলিগড় শহরের জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসাতুল খিলাফায় ভর্তি হন। মাওলানা 'আশিক ইলাহী অত্র মাদরাসায় মাওলানা মাওসূফ সাহেবের কাছে *মুখতাসারুল মা'আনী ও সিরাজী* (ফরায়েজ) অধ্যয়ন করেন।

অন্য আরেকজন শিক্ষকের কাছে তিনি *শার্‌হে হুসামী লিস্‌-সানবুনানী*, *হিদায়া-* ১, ২, (আউয়ালায়ন), *সুল্লামুল 'উলূম*, *শার্‌হে 'আকাইদ*, *মাইবুযী* ইত্যাদি কিতাব শিক্ষা লাভ করেন।[৩]

উচ্চ শিক্ষা'র উদ্দেশ্যে সফর: মাওলানা 'আশিক ইলাহি বুলন্দশহরী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পিতার সাথে নিজ গ্রাম বুলন্দশহরের বাহিরে মাদরাসায় ভর্তির জন্য বের হলেন। বাপ-বেটা একসাথে ঘর থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে চলছেন তো চলছেন, পথ আর ফুরায় না। মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন,

> "আমি যখন পিতাজী (রহ.)-এর সাথে ইলমে দীন অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলাম তখন আমরা দু'জন পায়ে হেঁটে বুলন্দশহর থেকে সাহারানপুর মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমে পৌঁছি। পথিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম। তখন আব্বাজান আমাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতেন। সে সময় আমাদের সংসারে অনেক অভাব-অনাটন চলছিল। কিন্তু পিতাজী (রহ.) কখনো তা বুঝতে দিতেন না। আর আমাকে দিয়ে উপার্জনের চিন্তা তো তিনি কখনো কল্পনাও করেননি। অনেকেই কান পরামর্শ দিয়েছেন, বাপ-বেটা দু'জনে মিলে সংসারের জোগান দাও। তাহলে আর অভাব-অনাটন থাকবে না। কিন্তু পিতাজী'র চিন্তা-চেতনা ছিল আমাকে একজন "আলিম বানাবেন।"[৪]

উচ্চ শিক্ষা: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী হিজরী ১৩৬০ সনে সাহরানপুরস্থ মাযাহিরুল 'উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৩৬৩ হিজরী সনে মাত্র তিন বছরে তিনি দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন।

এ মাদরাসায় প্রথম বছর পড়েন: হেদায়া ছালেছ, মুল্লা হাসান, *তাওযীহ তালউয়ীহ*, *দিওয়ানে মুতানাব্বী*, *দিওয়ানে হামাছা*, *'উরূযুল মিফতাহ* অধ্যায়ন করেন।

দ্বিতীয় বছর পড়েন: *জালালায়ন*, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, *শরহে নুখবাতুল ফিকার*, *শরহে সুল্লামুল 'উলূম* অধ্যায়ন করেন। মাওলানা 'আশিক ইলাহী *মিশকাত শরীফ* পড়েন মাওলানা কারী সাঈদ আহমাদ আজরবী[৫] (রহ.)-এর কাছে। তিনি যোহর থেকে 'আসর পর্যন্ত আত্যাহিয়্যাতুর সুরতে বসে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা দরস প্রদান করতেন। তাঁর দরসে যেন শব্দে শব্দে নূর চমকাতো।

---

১. তিনি মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন এবং কাদিরিয়া মাদরাসার যিম্মাদার ও সদরে মুদার্‌রিস ছিলেন।
২. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৫. তিনি *মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ*-এর লেখক হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত।

তৃতীয় বছর পড়েন: এ বছর মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমে দাওরায়ে হাদীসে উত্তীর্ণ হন। তিনি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র কাছে *বুখারী* আউয়াল (প্রথম খণ্ড) এবং *সুনান আবূ দাঊদ* পড়েন। মাওলানা 'আশিক ইলাহি তাঁর হাতেই হাত রেখে বাই'আত গ্রহণ করেন।

তিনি মাওলানা 'আবদুল লতীফে'র কাছে *বুখারী* ছানী (দ্বিতীয় খণ্ড) ও *বুখারী* আউয়াল (প্রথম খণ্ডের) কিছু অংশ পড়েন। *মুসলিম শরীফ* পড়েন মাওলানা আস'আদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে।

মাওলানা 'আবদুর রহমান কামেলপুরীর নিকট *জামি' তিরমিযী*, *শামায়েলে তিরমিযী*, *শরহে মা'আনিল আছার লিত্-তহাবী* পড়েন।

মাওলানা মানযূর আহমাদ সাহারানপুরীর কাছে তিনি *সুনানুন্ নাসায়ী*, *সুনানু ইব্ন মাজা*, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক* এবং *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ* পড়েন।[২]

ইলমে হাদীসের সনদ ও 'ইজাযত': 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী হাদীসশাস্ত্রের সনদ দশজন উসতাযের নিকট থেকে ইজাযত লাভ করেন। যাঁদের থেকে তিনি সনদ বা ইজাযত লাভ করেন তাঁরা হলেন–

১) মাওলানা 'আবদুল লতীফ

২) শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী

৩) মাওলানা মুহাম্মাদ আস'আদুল্লাহ্

৪) মাওলানা 'আবদুর রহমান কামিলপুরী

৫) মাওলানা শাহ্ আস'আদুল্লাহ রামপুরি

৬) মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত সম্ভলি

৭) মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ শফি

৮) মাওলানা জাফর আহমাদ 'উছমানী

৯) মাওলানা নাসির আহমাদ খান বরনি

১০)আবুল ফইয মুহাম্মাদ ইয়াসিন ইব্ন মুহাম্মদ ঈসা ফাদানি মাক্কি (রহিমাহুমুল্লাহ)[৪]

তন্মধ্যে মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ শফী, বিখ্যাত হাদীস বিশারদ জাফর আহমদ উসমানী ও প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলবী এঁরা ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট উসতাযবৃন্দ। তাঁদের থেকে মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী হাদীস, তাফসীর ও ইলমুল ফিকহেরও সনদ প্রাপ্ত হন।[৫]

এ ছাড়া এসব কিতাব পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উসতাযগণের প্রাতিষ্ঠানিক ইজাযত প্রাপ্ত হন। এসব বিষয়ে তিনি '*আল-আনাকীদুল গালিয়াহ ফি আসানীদিল 'আলিয়াহ*' নামে 'আরবী ভাষায় একটি কিতাব রচনা করেন।[৬]

১. তিনি সেসময় মাদরাসা মাযাহিরুল 'উলূমের নায়েম ছিলেন।
২. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৫ ; মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
৩. লিখিত অথবা মৌখিকভাবে হাদীস রিওয়ায়ত করার অনুমতি প্রদানকে ইজাযত বলা হয়।
৪. সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ আল-হাসানি সাহরানপুরি, *উলামায়ে মাজাহেরে উলূম সাহরানপুর ওয়া ইনজাযাতুহুম আল-ইলমিয়া ওয়াত তা'লিফিয়া* (ভারত: মাকতাতুশ শায়খ আত তুযকারিয়া, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮।
৫. সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ আল-হাসানি সাহরানপুরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।
৬. প্রাগুক্ত।

বিবাহ: ১৩৬৫ হিজরী সনে মোতাবেক ১৯৪৬ খ্রি. তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি পিরোজপুর চলে আসেন।

সন্তান-সন্ততি: আল্লাহ্ পাক তাঁকে তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তান দান করেন। (১) ড. আবদুর রহমান কাউছার[১], (২) আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ্ বারনী[২], (৩) মুহাম্মদ মাদানী[৩] এবং কন্যার নাম (৪) 'আয়েশা। তাঁর স্বামীর নাম হাফেয মাহবুবুল হক।

কর্মজীবন: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী (রহ.) পূর্ণ জীবন দরস-তাদরীস, তা'লীম-তা'আল্লুম, তাসনীফ-তা'লীফ এবং দা'ওয়াতে তাবলীগের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। ১৩৬৩ হিজরী সনে ছাত্রজীবন সামাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষকের আসনে সামাসীন হন। সর্বপ্রথম তিনি হাকীমুল উম্মত আশরাফ 'আলী (রহ.)-এর খলীফা মাওলানা ওলী মুহাম্মদ সাহেব প্রতিষ্ঠিত আছারুল ওলী মাদরাসা[৪]য় ছয়মাস শিক্ষকতা করেন।[৫] অতঃপর তিনি মিরাঠে মাদরাসা ইসলামিয়ায় প্রায় ছয়মাস শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। অত্র মাদরাসা থেকে শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে তিনি কয়েক মাস দিল্লিতে অবস্থান করেন। এরই মধ্যে 'আশিক ইলাহী'র বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর পরই তিনি পিরোজপুর হাফিযুল ইসলাম মাদরাসায় এক বছর দরস প্রদান করেন।[৬]

দিল্লিতে অবস্থান: ১৩৬৬ হিজরীতে পিরোজপুর ছেড়ে দিল্লিতে 'ইদারায়ে তাবলীগে ইসলাম'-এ লেখালেখিতে নিয়োজিত হন। দু'মাস পর ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়। পাক ও ভারত দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হাঙ্গামা চলতে থাকলে তিনি দিল্লি ছেড়ে পুনরায় বুলন্দশহর জেলায় বাগরাসীতে চলে আসেন। কয়েক মাস পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় দিল্লি চলে আসেন এবং লেখালেখি করেন ও 'ইয়াকিন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহন করেন। এ পত্রিকাটি ছয় মাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এখানে তিনি সময় দিতে না পারায় পরবর্তীতে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

নেযামুদ্দীন মারকায: কিছুদিন নেযামুদ্দিনে তাবলিগী মারকায ও নেযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) মহল্লায় ভাড়া বাসায় থেকে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত করেন।[৭] এখানে থেকে তিনি বেংলোর, ইউ.পি., মেওয়াত'সহ বিভিন্ন এলাকায় চলতে ফিরতে বিভিন্ন জামা'আতে সময় দিতেন।

কলকাতায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা: ১৩৭৩ হিজরীতে স্বীয় মুরশিদ শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-এর সাথে পরর্মাশ করে কলকতায় চলে আসেন। এখানে তিনি ১৩৮১ হিজরী পর্যন্ত অবস্থান

---

১. তিনি দারুল উলূম করাচিতে দাওরা ও ইফতা, তাফসীর ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বিশ শতকের খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ 'আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহসহ অনেক 'আরব মাশায়েখের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করেন। মসজিদে নববীর মা'হাদ ও জামি'য়া তায়্যিবাতেও তিনি অধ্যাপনা করেন। প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনি কিছুদিন করাচিতে ছিলেন। বর্তমানে বাহরাইনের জামে আলফাতেহ মসজিদে এবং মারকায আল জাযিরী ইসলামী বাহরাইনে হাদীসে মুসালসাল ও অন্যান্য বিষয়ে দরস প্রদান করেন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক 'আলিম, স্কলার তাঁর থেকে সনদের জন্য বাহরাইনের ইসলামিক সেন্টারে যান। দ্র. ড. ওয়ালীউর রহমান খান, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), পৃ. ৩৫৫।

২. তিনি হিফয শেষ করে মসজিদে নববী ও অন্যান্য মা'হাদে পড়াশোনা করেছেন। মদীনাতেই তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা ও লেখালেখির কাজ করেন। তার বেশ কিছু আরবী ও উর্দূ বই রয়েছে। তন্মধ্যে *সাহিবুল মাকামিল মাহমূদ*, শিরোনামে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি হালাল জীবিকার জন্য প্রকাশনা ব্যবসা করেন। দ্র. প্রাগুক্ত।

৩. তিনি করাচিতে জন্মগ্রহণকরেন। যে বছর মাওলানা আশিক ইলাহী মদীনায় হিজরতের মনস্থ করেন, সে বছরই তাঁর জন্ম হওয়ায় শায়খ তার নাম রাখেন, মুহাম্মাদ মাদানী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা মদীনাতেই করেছেন। তিনিও মেঝো ভাইয়ের ন্যায় ব্যবসা করেন। দ্র. প্রাগুক্ত।

৪. গুরুদাসপুর জেলার বাটালায় অবস্থিত।

৫. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী রচিত, মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৬. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮।

৭. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

করেন। বিভিন্ন দীনী মাদরাসার দরস-তাদরীস প্রদান করতেন এবং সুযোগ পেলেই লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। পাশাপাশি তিনি কলকাতায় কয়েকটি নতুন মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।[১] নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় সদরে মুদার্‌রিস, নাযেম ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের খিদমত একাই আঞ্জাম দেন। কয়েক বছর পর তিনি মাদরাসা'র দায়িত্ব ছেড়ে দীনি কিতাবাদি প্রকাশনা ব্যবসায় তিন বছর নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।[২]

মুফতি মুহাম্মদ শফি' (রহ.) ১৩৮৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরকে দারুল উলূম করাচিতে নিয়ে আসেন। এ মাদরাসায় তিনি ১৩৮৪ হিজরী থেকে ১৩৯২ হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হ ও হাদীসের দরস প্রদান করেন।[৩] মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর আগমণের খবর জানতে পেরে পরিবার পরিজন নিয়ে থাকার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করেন। মুফতী শফি' (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি তাঁকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলে-ফিকহ ও আদব ('আরবী সাহিত্য) ইত্যাদি দরসদানের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪]

ছাত্ররা তাঁর ইখলাস, ইলম, তাকওয়া, উত্তম আখলাক, বিনয় ও সরলতা দেখে মাদরাসার ছেটো-বড় সকল ছাত্র-শিক্ষক তাঁর প্রতি ছিল দারুণ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ। এ মাদরাসায় অসংখ্য ছাত্র তাঁর থেকে ইলমী ইসতিফাদা অর্জন করে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইলমে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন।[৫]

দারুল ইফতার দায়িত্ব লাভ: যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে মাওলানা মুহাম্মদ 'আশিক এলাহি (রহ.)-এর উপর এক পর্যায়ে মুফতিয়ে 'আযম মুহাম্মদ শফী' (রহ.) দারুল উলূম করাচি'র 'দারুল ইফতা'র দায়িত্বভার অর্পণ করেন। মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) তাঁকে দিয়ে ইফ্‌তা বিষয়ক বিভিন্ন কাজ করতেন। অতঃপর তাকে ইফ্‌তা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি মুফতি মুহাম্মদ শফী' (রহ.) এবং 'আল্লামা জাফর আহমদ 'উছমানী (রহ.)-এর নিকট থেকে হাদীস ও ইফতা বিষয়ে ইজাযত লাভ করেন।[৬]

ফিকহী মাসাইলে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান: দীর্ঘদিন ফিকহ ও ফাতাওয়া বিষয়ক কাজ করার ফলে 'আল্লামা 'আশিক ইলাহীর মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তৈরী হয়েছিল। তিনি দারুল উলূম করাচির ইফ্‌তা বিভাগের দায়িত্বও পালন করেন। সাধারণ মাস'আলা-মাসাইল সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তাৎক্ষণিক জবাব দিয়ে দিতেন। কারণ মাসাইলের শাখা-প্রশাখার ভাণ্ডার তাঁর মাথায় মওজুদ থাকতো। আর জটিল মাস'আলার জন্য কিতাবাদির শরণাপন্ন হতেন। জীবনের শেষ সময়েও তাঁর মধ্যে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র ড. 'আবদুর রহমান কাউছার বলেন, "আব্বা ফতওয়া প্রার্থীদের জিজ্ঞাসার জবাব সাধরণত তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দিতেন। কেননা, জুয্‌ই মাসয়েল তাঁর স্মৃতিতে উপস্থিত থাকত। বিরল ও নতুন মাসা'আলার জন্য কিতাবাদির প্রয়োজন হতো। জীবনের শেষ দিনগুলিতেও তাঁর এই দক্ষতা বজায় ছিল।" এই অনুগ্রহ আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।"[৭]

তাফসীরশাস্ত্রে অবদান: কুর'আন কারীমের তাফসীর বিষয়ে মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরীর যথেষ্ট আগ্রহ ও মহব্বত ছিল। তিনি ছাত্রদেরকে 'ইলমুত তাফসীর, ইলমুল হাদীস, ইলমুল ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন পারদর্শিতার সাথে পাঠদান করতেন, সর্ব-সাধারণের জ্ঞানার্জনের জন্য *'আনওয়ারুল বায়ান ফী কাশফি আসরারিল কুর'আন'* নামে নয় খণ্ডে পবিত্র কুর'আনের তাফসীর গ্রন্থ

---

১. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮
২. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত।
৩. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী তাঁর *তাযকিরায়ে আওলিয়ায়ে দেওবন্দে* ৭৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, মাওলানা আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী দারুল উলূম করাচিতে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করেছেন।
৪. হাফেয মোহর মিয়া নাওয়ালী, প্রাগুক্ত।
৫. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮
৬. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৭. প্রাগুক্ত।

রচনা করেন। ড. 'আবদুর রহমান কাউছার বলেন, তাফসীর *'আনওয়ারুল বায়ান'* নয় খণ্ডে সমাপ্ত করে তিনি পরকালের মুসাফির হয়েছেন। এই তাফসীর গ্রন্থটি 'ইলমি উপকারিতার বিচারে যথেষ্ট হওয়ার পাশাপাশি এই পরিমাণ সহজবোধ্য হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও এটি পাঠ করে উপকার লাভ করতে পারে।

তিনি উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা হায়াত সাম্ভলী'র মাদরাসা জামি'আ হায়াতুল 'উলূম মুরাদাবাদে মুহাদ্দিসের পদ অলঙ্কৃত করেন।[১] তিনি এ মাদরাসায় সহকারি নায়েম হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসার প্রশাসনিক কাজের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছাত্রদের দরস প্রদানে কোনো রকম অবহেলা করতেন না। তিনি এ মাদরাসায় *বায়যাবী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, ত্বহাবী শরীফ, মু'আত্তা ইমাম মালিক, মু'আত্তা ইমাম মুহাম্মাদ*-এর দরস প্রদান করতেন।[২]

লেখালেখি জগতে: লিখনি জগতে 'আল্লামা 'আশিক ইলাহি বুলন্দশহরীর যে অবদান রয়েছে তা অতুলনীয়। জগদ্বিখ্যাত এ ওলী কুল শিরোমনি লেখনি জগতে তাঁর যে অবদান রেখেছেন তা পূর্ণ আকারে ব্যক্ত করতে গেলে এ প্রবন্ধটি কলেবরে এতটাই বৃহদাকার ধারণ করবে যে, তা কয়েক খণ্ডের সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে তিনি তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ *'আনওয়ারুল কুর'আন ফী কাশফি আসরারিল কুর'আন'* নয় খণ্ডে সমাপ্ত। বিশাল তাফসীর গ্রন্থে তিনি শুধু তাফসীরই নয় বরং নতুন নতুন আধুনিক মাস'আলা-মাসাইলসহ হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসেরও বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থই অনন্য ও অতুলনীয়। বর্তমানে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষীর জন্য অনুবাদও হয়েছে। লেখালেখিতে তাঁর পাণ্ডিত দেখে মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁরই উসতায শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) নিজের তাসনীফাতের সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন কাজ করিয়েছেন।

তাঁরা ছিলেন, একে অপরের রূহানী পিতা ছিলেন। একেই বলে 'বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া।' নিম্নে গ্রন্থগুলোর তালিকা দেয়া হলো–

١) الصلاة الحنفية
٢) حفظ اللسان
٣) فضل مبين شرح حصن حصين
۴) بركات الصالحين
۵) إمداد الصلاة
٦) روضة الأحباب من الأدعية والآداب
۷) قصة حياة الشيخ محمد زكريا
٨) تفسير أنوار البيان في اسرار القرآن
٩) العناقيد الغالية من الأسانيد العالية
١٠) الشيعية وأسرارها
١١) دعوت فكر
١٢) كيف يقضي مسلم الحياة
١٣) حواشي المسلسلات
١۴) التسهيل الضروري لمسائل القدوري
١۵) التدابير والحيل

۵١) حياة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
۵٢) حياة سلمان الفارسي رضي الله عنه
۵٣) حياة معاذ بن جبل رضي الله عنه
۵۴) حياة أبي الدرداء رضي الله عنه
۵۵) حياة بلال البيشي رضي الله عنه
۵٦) حياة ابن أم مكتوم رضي الله عنه
۵۷) حياة أبي هريرة رضي الله عنه
۵٨) أمهات الأمة المسلمة
۵٩) حياة بنات النبي صلى الله عليه وسلم
٦٠) نضال الصحابة الكرام للإسلام
٦١) تذكرة أصحاب الصفة
٦٢) القصص الخمسون في رجال التفكير في الآخرة
٦٣) الكلمات الستة
٦۴) الأدعية المسنونة
٦۵) ذكر الله تعالى

১. হাফেয মোহর মিয়া নাওয়ালী, *মাহনামায়ে শার'ঈয়্যা*, (এপ্রিল সংখ্যা, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৯।
২. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৮।

٦٦) إكرام المسلمين
٦٧) إخلاص النية
٦٨) الحجاب الشرعي
٦٩) مصائبنا أسبابها وحلها
٧٠) فضائل العلم
٧١) أربعون حديثًا في الأخلاق
٧٢) أربعون حديثًا في إصلاح الأحوال
٧٣) حديقة الحديث
٧٤) صفات المؤمن
٧٥) فضائل كسب الحلال
٧٦) الآداب الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة
٧٧) نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم
٧٨) فضائل الأمة المحمدية
٧٩) فضائل الصلاة على النبي
٨٠) مرآة الصلاة
٨١) الصلاة السهلة للأطفال
٨٢) نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم
٨٣) تحفة النساء
٨٤) الدروس العشرون للنساء المسلمات
٨٥) مجموعة وصايا الإمام الأعظم
٨٦) الأحاديث الأربعون المنامية للشاه ولي الله المحدث الدهلوي
٨٧) قواعد العربية السهلة
٨٨) حقوق البهائم
٨٩) حالات جهنم
٩٠) أحوال برزخ
٩١) ميدان حشر
٩٢) جنة الله
٩٣) فضائل صلاة وسلام
٩٤) فضائل الدعاء
٩٥) فضائل رمضان وصيام
٩٦) كلمات في الحج
٩٧) جامع الفتاوى
٩٨) جامع المسائل
٩٩) حقوق الوالدين
١٠٠) إنعام الباري في شرح أشعار البخاري
١٠١) تكملة الاعتدال في مراتب الرجال
١٠٢) شرح خلاصة البيان
١٠٣) الضوء اللامع على السنن الجامع

١٦) المواهب الشريفة في مناقب الإمام أبي حنيفة
١٧) اللحية من شعائر الإسلام
١٨) فكروا في حقوق العباد
١٩) الحدود والقصاص الشرعي
٢٠) إرشاد الطالبين بكلام رسول رب العالمين
٢١) كتاب الحج
٢٢) لمحة فكرية لمشايخنا وعلماء البريلوية
٢٣) ترقي
٢٤) أكثروا في ذكر الله
٢٥) تحفة المسلمين
٢٦) فضائل التوبه والاستغفار
٢٧) كتاب العمرة
٢٨) معراج شريف
٢٩) نداء الحق
٣٠) الصلاة السهلة
٣١) حاشية تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة
٣٢) تحذير العشائر عن اقتراف الكبائر
٣٣) حاشية الخيرات الحسان في مناقب النعمان
٣٤) جواهر الحديث
٣٥) طريقة الحج والعمرة الصحيحة
٣٦) الأسماء الإسلامية
٣٧) أحكام الميراث
٣٨) نعم الجنة
٣٩) مرآة الصلاة
٤٠) المواد التبليغية والإصلاحية
٤١) مكتوبات نبوية صلى الله عليه وسلم
٤٢) تحذير الإنسان عن محاضر الشيطان
٤٣) إسعاد الطالبين بشرح كلمات كتاب الله المبين
٤٤) مجاني الأثمار من شرح معاني الآثار
٤٥) تبهيج الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي
٤٦) زاد الطالبين من كلام رسول رب العالمين
٤٧) الفوائد السنية في شرح الأربعين النووية
٤٨) تفسير سورة الفاتحة
٤٩) القاديانية ما هي؟
٥٠) التحفة المرضية في شرح المقدمة الجزرية

হজ্জব্রত পালন

অবশেষে মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলমীন মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র দু'আ কবুল করলেন। তাঁকে বায়তুল্লাহ্‌র মেহমান হিসেবে কবুল করলেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় পড়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আর বললেন, আয় রব্বে কারীম! তুমি আমাকে হজ্জে মাবরূর করার তাওফীক দান কর। হজ্জের বিধিবিধানসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করার তাওফীক দান কর। **১৩৮১** হিজরী মুতাবিক **১৯৭২** খ্রিস্টাব্দে তাঁর বায়তুল্লাহ হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়।

তিনি মদীনাতুল মুনাওয়ারায় গমণ করেই 'ইকামা' পাওয়ার জন্য তোড়জোড় চালাতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর পক্ষ থেকে সু-সংবাদের ঘোষণা এলো। মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী মদীনাতুল মুনাওয়ারা'য় এসে এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, "মিম্বরে নববীতে দাঁড়িয়ে একজন সাহেবে কিতাব দেখে দেখে খুতবা প্রদান করছেন।"
হাদীস শরীফে আছে–

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ

"সত্যস্বপ্ন নবুওয়তে'র ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।"[২]

নবী যুগের পরে ওহী বা প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যস্বপ্নের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। আর সত্যস্বপ্ন বুযুর্গ্ ও আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ইলহাম বা কাশ্‌ফ-এর ন্যায় কাজ করে।

এ সত্যস্বপ্ন দেখে তিনি বললেন, আমার খোদা আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তিনি আমার ফরয়াদ শুনবেন। ইনশাআল্লাহ, মদীনা তইয়িবায় থাকার বন্দবস্ত হয়ে যাবে। হজ্জের পরে ইকামার ভিসার ব্যবস্থা হবে।

হজ্জের পর নতুন করে ভিসা'র জন্য সৌদী 'আরবের বাহিরে অন্য রাষ্ট্র থেকে ভিসা প্রসেসিং করতে হয়। এদিকে পাকিস্তানে যেতে হলে অনেক খরচ, তাই তিনি পাকিস্তান না যেয়ে শাম দেশে সফর করলেন।

শাম ও তুর্কী সফর: হিজাজে থাকাবস্থায় একটি এজেন্টের মাধ্যমে শামের ভিসা নিয়ে সেখানে চলে যান। এবার এলো পরীক্ষার পালা। মাওলানা 'আশিক ইলাহি'র সাথে আরেকজন মুরব্বী হিজাজে ভিসা'র জন্য শামে গমন করেন। তাঁরা দু'জন শামের রাজধানী দামিশ্‌ক ইয়ারপোর্টে পৌঁছেই দেখেন সেখানে প্রচণ্ড শীত। তাঁরা উভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারেনি, এখন দামিশ্‌কে শীতের মৌসুম চলছে। তাঁরা উভয়ে চিন্তা করল যে, এজেন্ট আমাদেরকে কয়েকদিনের জন্য দামিশ্‌কে পাঠিয়েছে। কষ্ট করে দিনগুলো কাটাতে পারলেই আমরা আমাদের প্রতিক্ষীত লক্ষে প্রবিষ্ট হতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন,

> "আমরা নিজ চোখে দেখলাম যে, তুষারপাত হচ্ছে, সাথে সাথে বরফ খণ্ডও পড়ছে। এ দেশে এসে আমরা হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। যাইহোক, আমি বললাম, প্রতিক্ষিত গন্তব্যে পৌছতে হলে তো কষ্ট মেনে নিতেই হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নাই।"[৩]

---

১. নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে ওহী আর আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ইলহাম বা কাশ্‌ফ।

২. *সহীহুল বুখারী*, খ-২, পৃ. ১০৩৫ ; *সহীহ্ মুসলিম*, খ-২, পৃ. ২৪২ ; *সুনান আবূ দাঊদ*, খ-২, পৃ. ৩২৯; *সুনানুত্ তিরমিযী*, খ-২, পৃ. ৫৩ ; *মুসনাদে আহমদ*, খ-২, পৃ. ১৮ ; *সহীহুল বুখারী*'র 'কিতাবুত্ তা'বীর' অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দ শহরীর বড় ছেলে 'আবদুর রহমান বলেন, আব্বাজান নিজে আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

তিনি আরো বলেন,

> "দামিশকে ভয়াল এক রাতের ঘটনা। বিদ্যুৎ চলে গেল। তুফান শুরু হলো। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা ভয়ে কাঁপছি। বিদ্যুৎ না থাকায় আমরা একে অপরের অবস্থা বুঝতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, উভয়ে কাবু হয়ে গেলে, হাল ধরবে কে? এ চিন্তা করে আমি তাকে সান্তনা দিতে লাগলাম। তিনি ভয়ে কান্না করছেন, আর বলছেন, জীবনে কখনো এমন বিপদে পড়িনি।"[১]

মাওলানা সেখানে পনেরো দিন অবস্থান করেন, এ পনেরো দিনের মধ্যে বারো দিন যোহরের উযু দিয়েই ইশা'র নামায আদায় করেন। আর বাকি তিনদিন ফজরের উযু দিয়ে ইশা'র নামায আদায় করেন।

এদিকে শামে ভিসার মেয়াদও শেষ হতে চলল। কিন্তু মক্কাতুল মুকার্‌রমা থেকে এজেন্ট আসার কোনো খবর নেই। তাই তারা শাম থেকে বের হয়ে তুর্কীতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এজেন্ট মক্কা থেকে শামে এসে পৌঁছার সাথে সাথেই আমরাও তুর্কী থেকে শামে চলে আসি। এবার প্রতিক্ষার পালা শেষ। এখন শুধু গন্তব্যে পৌছার পালা। এজেন্ট আমাদের ভিসার কাজ শেষ করে বলল, আপনারা এবার হিজাজ যেতে পারেন। এ কথা শুনে আমি তৎক্ষণাত মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

দামিশ্‌ক থেকে হিজাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা: ১৩৯৬ হিজরী সনে তিনি দামিশ্‌ক থেকে হিজাজের ভিসা নিয়ে মক্কা মুকার্‌রমায় পৌছেন। সেখানে পৌছে তিনি স্থায়ীভাবে নিবাসের চিন্তা করেন। কিন্তু কোথায় নিবাসের ব্যবস্থা করবেন। মক্কাতে নাকি মদীনাতে ? এ বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করবেন ? কে তাঁকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে ? তিনি হিজাজে আসার পূর্বেই চিন্তা করেছিলেন, উসতাযে মুহতারাম শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সাথে দেখা করবেন। তিনি মক্কায় থাকতে শায়খের কাছে পরামর্শ চেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

উসতাযে মুহতারাম,

> "একামা নিয়ে আমি মক্কায় চলে এসেছি। আমি মক্কায় অবস্থান করবো নাকি মদীনাতুল মুনাওওয়ারাতে চলে আসবো।"

শায়খুল হাদীস উত্তরে বললেন, তুমি মদীনায় চলে আস। শায়খের এ পরামর্শ পেয়ে তিনি তৎক্ষণাত মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসেন।[২]

মক্কা থেকে মদীনায় গমন: শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ১৫ যিলকদ, ১৩৯০ হিজরী সনে (১৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ খ্রি. মুতাবেক) তারিখে হিজায সফর করে সেখানে মুকিম হন।[৩]

শায়খের সাথে মুলাকাত: তিনি মদীনাতুল মুনাওওয়ারায় পৌছেই উসতাযুল মুহতারাম মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সাথে মুলাকাত করেন। শায়খুল হাদীস তাঁর প্রিয় ছাত্রকে দেখে যারপর নাই খুশি হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাজের সহযোগী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী তাঁর কিছু কিতাবের ভূমিকা বা অভিমতে লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাওলানা 'আশিক ইলাহি'কে মদীনা মুনাওওয়ারায় আমার লেখালেখির সহযোগী

---

১. ড. 'আবদুর রহমান কাউছার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আশিক ইলাহী আল-বারনী আল-মাদানী লিখিত প্রবন্ধ, মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী, *আত্‌তাসহীলুয যরূরী লিমাসাইলিল কুদূরী ফী ফিক্‌হিল ইমাম আযম আবী হানীফা আন নু'মান ইব্‌ন ছাবিত আল কূফী*, (মদীনা মুনাওওয়ারা: মাকতাবাতু দারিয যামান, ১৪৩৪ হি.), পৃ. ৫৬৯।

৩. মুফতী মাসরুরুল হাসান, *শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী মুহাজিরে মাদানী (র)* (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ); পৃ. ২৫।

হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁদের চলাফেরা ও মতবিনিময় দেখে মনে হয় যেনো বাপ-বেটার সম্পর্ক। নতুন কেউ দেখলে বুঝতেই পারতো না যে, তাঁদের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক।

মাদানী জীবন: মাওলানা 'আশিলাহী বুলন্দশহরী মদীনার যেন্দেগীতে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় দীনী খিদমত করেছেন। বিশেষ করে তাসনীফাত ও তা'লিফাতের জগতে তিনি সকলের কাছে অবিস্মরণীয়। তিনি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শনরূপে সাজিয়েছেন। তাঁর কলমের এ খিদমত সকলের কাছেই সমাদৃত।

মদীনা মুনাওওয়ারায় 'উলামায়ে কিরাম ও জনসাধারণের ভক্তি: শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-এর ইনতিকালের পর মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী-কে আল্লাহ্ তা'আলা উস্তাযের মাকামে বুলন্দ করেন। আর এজন্যই হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফ্রিকাসহ 'আরব দেশের 'উলামায়ে কিরাম নিজেদের ইসতিফাদার জন্য তাঁর খানকায় আসা-যাওয়া করতেন। সবসময় তাঁর খানকায় 'উলামায়ে কিরামের সমাগম থাকত। হজ্জ ও 'উমরা'র সময় তো জনসাধারণ তাঁর পিছুই ছাড়তো না। কেননা তিনি ছিলেন মদীনা মুনাওওয়ারাতে একজন হানাফী মুফতী। জনসাধারণ তাঁর থেকে হজ্জ ও 'উমরা'র বিভিন্ন মাস'আলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করত।

হারাম শরীফে তিনি যেখানে বসতেন সেখানেই লোকজনের সমাগম হয়ে যেত। হারাম শরীফের ইনতেজামিয়াগণ এ সমাগম থেকে ঘাবড়ে যায় এবং তাঁকে বিনয়ের সাথে দরখাস্ত করলেন যে, হারাম শরীফে যেন এ ধরনের লোক সমাগম না হয়। এরপর থেকে তিনি নামায পড়ে হারাম শরীফে না বসে বাহিরে কোথাও বসে বাড়িতে চলে আসতেন।[১]

প্লেন ও ট্রেনে বসেও লেখনী: দারুল 'উলূম করাচিতে পঞ্চাশ সালা অনুষ্ঠানে প্লেনে যাওয়ার সময় চার ঘণ্টা একটি বিষয়ে মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেছেন আর মওলভী ইহসান ইলাহী ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। এ সফরের বিষয় ছিল "আয় মুসলমান তোমহারা কেয়া হোগায়া!" এভাবে তিনি ট্রেনে চলাকালেও বলতে থাকতেন আর সাথে যে থাকত সে লিখতে থাকত। এটাই ছিল মাওলানা 'আশিক ইলাহী'র সফরের চিরাচরিত নিয়ম।[২]

গীবত ও চোগলখোরী থেকে পরহেয: মাওলানা 'আশিক ইলাহী গীবত থেকে নিজেও বাঁচতেন এবং অন্যকেও বাঁচাতেন। কোনো মাজলিসে কেউ কারো গীবত শুরু করলে তিনি সেই গীবতকারীকে এমন হিকমাতের সাথে তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন যে, কেউ তা বুঝতেই পারতেন না কোথা থেকে কোথায় চলে গেল। আকাবের আসলাফগণ এমনই হয়ে থাকেন। তাঁরা নিজেরাও গুনাহ থেকে বাঁচেন অন্যকেও বাঁচান।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আন মাজীদে বলেন,

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ।"[৩]

তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

" হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

২. প্রাগুক্ত।

৩. আল-কুর'আন, সূরা হুমাযাহ, আয়াত: ০১

৪. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬০৫৬।

মদীনা মুনাওওয়ারাতে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা: মদীনাতুল মুনাওওয়ারাতে বিদ'আত হতে দেখলে, তিনি তার ঘোর বিরোধিতা করতেন। বিদ'আতের বিষয়ে কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলতেন না। ঈদের দিন মু'আনাকা করা বিদ'আত। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) থেকেও এই ফতোয়া 'ঈদের দিন মু'আনাকা' করা বিদ'আত। তিনি এ ধরনের মাস'আলার প্রতি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় রাখতেন। যেন এটা দেখে অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামও এ বিদ'আত থেকে বাঁচতে পারবে। তিনি বিদ'আতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা)-এর হাদীসটি সকলের কাছে বার বার বলতেন আর রোনাজারী করতেন। হাদীসটি হলো–

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার এ দীনে দীন বহির্ভূত কোনো কথা চালু করবে, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে।"[১]

মদীনাতে ইলমে হাদীসের খিদমত: মাওলানা ইলাহী বুলন্দশহরী মদীনা মুনাওওয়ারাতে ইলমে হাদীসের উপর প্রচুর খিদমত করেছেন। বিশেষ করে তিনি যখন মাসজিদে নববীতে নামায পড়তে যেতেন তখন উপস্থিত 'উলামায়ে কিরাম ও মুহিব্বীন তাকে বেষ্টন করে বসে পড়ত। সে সময় তিনি তাদের ইলমে হাদীসের আলোচনা করতেন। তিনি হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, সহীহ হাদীস নিয়ে তো কোনো কথা নেই। তবে সনদের দুর্বলতার কারণে যে হাদীসটি য'য়ীফ, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, দিরায়েতে[২]র ভিত্তিতে আমি এ হাদীসে নূরের ঘ্রাণ পাই। এটা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস। আর এ হাদীসের শব্দাবলীও এ কথার উপর দালালত করে। তিনি দেরায়েতের ভিত্তিতে য'য়ীফ হাদীসের উপরও 'আমল করতেন।

মসজিদে নববীতে রমাযানুল মুবারক: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী পরিবার-পরিজনসহ রমাযানুল মুবারক শুরু হওয়ার পূর্বেই মসজিদে নববী'র কাছে চলে আসতেন। প্রথম প্রথম তিনি মসজিদে নববীর কাছেই এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিতেন। পরবর্তীতে মসজিদে নববীর সন্নিকটে শায়খ রহমাতুল্লাহ্ বুখারী'র দুই কামরা বিশিষ্ট একটি রবাতের ব্যবস্থা হয়। এ রবাতে অন্যান্য 'উলামাগণও অবস্থান করতেন। শায়খ রহমাতুল্লাহ্ 'উলামায়ে কিরামের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এজন্য এ রবাতকে বুখারী রবাত বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার তাঁকে এর জাযা দান করুন। আমীন।

মসজিদে নববীর কাছে এ ধরনের 'রবাত' পাওয়াতে মাওলানা 'আশিক ইলাহী'র জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। রমযানুল মুবারকে অনেক মানুষ 'উমরা করতে এসে তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং বিভিন্ন মাস'আলা মাসায়েল সমাধান করে নিতেন। অনেকে এখানে তাঁর সহবত গ্রহণ করতেন।

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী রমাযানুল মুবারকে 'বুখারী রবাতে' দু'টি কামরায় থাকতেন। একটিতে পরিবার-পরিজন, অন্যটিতে বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো তিনি 'বুখারী রবাতে' ইফতার করতেন, আবার কখনো কখনো হারামের নির্দিষ্ট স্থানে ইফতার করতেন।

---

১. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৬৯৭ ; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৭১৮ ; মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী, মাওলানা আবূ তাহের রহমানী অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

২. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সূক্ষ্ম বিচার শক্তি। (দিরায়াত অর্থ 'আকল বা বিবেক নয় ; বরং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সত্য-মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ের যে যোগ্যতা তৈরি হয়, তাকেই দিরায়াত বলে।) মুহাদ্দিসগণের মতে দিরায়াত হলো, যে ব্যক্তি নবী চরিত সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, সকল নির্ভুল বর্ণনা তাঁর নখদর্পণে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সকল ঘটনা সম্পর্কেও সম্যক অবগত, তাঁর এক প্রকার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় একেই দিরায়াত বলে।

তিনি রমযানুল মুবারকে প্রত্যহ মেহমান নিয়েই ইফতার করতেন। মেহমানদের রবাতে নিয়ে এসে খানা খাওয়াতেন।

রমাযানুল মুবারকের 'আমল: তিনি রমাযানুল মুবারকে দিনে এবং রাতে পবিত্র কুর'আন মাজীদের তিলাওয়াতে মাশগুল থাকতেন। মুহিব্বীন ও শাগেরদের কুর'আন মাজীদ শুনাতেন। তাঁর সাথে রমাযান মাসে মাওলানা খালিদ খান গাড়হী সাথী হতেন। তিনি প্রত্যেক রমাযানের পূর্বেই রবাতে এসে পৌঁছে যেতেন। মাওলানা 'আশিক ইলাহী তাঁকে যোহর পর্যন্ত কুর'আন মাজীদের তিলাওয়াত শুনাতেন।

যোহর নামাযের জন্য হারামে চলে আসতেন। নামাযের পর পুনরায় রবাতে ফিরে আসতেন। রবাতে ফিরে কুর'আন মাজীদ তিলায়েত করতেন। 'আসরের পূর্বে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। এভাবে 'আসরের নামাযের পরও কুর'আন মাজীদের তিলাওয়াত শুনাতেন। ইফতারির কিছুক্ষণ পূর্বে হারামে চলে আসতেন। এখানে এসেই তিনি ইফতার এবং মাগরিবের নামায পড়তেন। নামায শেষে মেহমানদের রবাতে নিয়ে আসতেন এবং তাদের সাথে খাবার খেতেন। ততক্ষণে ঈশার নামাযের সময় হয়ে যেত। অতঃপর হারামে এসে ঈশা'র নামায ও তারাবীহ নামায আদায় করতেন। অনেক সময় তারাবীহ শেষ করে সাহরী পর্যন্ত হারামে বসেই কুর'আন মাজীদ শুনাতেন। এভাবেই তিনি পূর্ণ রমাযানুল মুবারকে কুর'আন মাজীদের তিলাওয়াত করেই কাটাতেন।

যখন ঈদের দিনের ঘোষণা করেন তখন তিনি ঘরে এসে পরিবার-পরিজনের সাথে দেখা করেন এবং ঈদের নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঈদের নামাযের জন্য দ্রুত হারামে চলে আসেন। ঈদের নামাযান্তে তিনি মেহমানদের নিয়ে ঘরে এসে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

ঈদের দিন তিনি কোনোভাবেই মু'আনাকা করতেন না। তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। আর বলতেন, ঈদের জন্য কোনো মু'আনাকা নেই। যদি ঈদের দিন কেউ মু'আনাকা করে তবে এটা বিদ'আত হবে। আর বিদ'আত করা গুনাহ। রমযান শেষে ঈদের নামায পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে গুনাহ মাফ করে, মসজিদ থেকে বের হতে না হতেই বিদ'আতে জড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।[১]

খ্রিস্টান মিশনারীর চক্রান্ত থেকে বাংলাদেশের 'উলামায়ে কিরামকে হুশিয়ারী: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী মদীনা মুনাওওয়ারায় থেকে পৃথিবী'র আনাচে-কানাচে মুসলিম বিরোধী কোনো ষড়যন্ত্র হতে দেখলে তা সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তিনি মাওলানা আস'আদ মাদানী'র একটি লেখা পড়ে জানতে পারলেন, বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী'র অপতৎপরতা। নিম্নে অপতৎপরতা সম্পর্কে সম্মক অবগত করা হলো–

> "সাইয়িদ মাওলানা আস'আদ মাদানী এর বাংলাদেশ সফরের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এদেশের জনগণকে বিশেষ করে 'উলামায়ে কিরামকে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করা। এদেশে খ্রিস্টানদের অপতৎপরতা সাইয়িদ আস'আদকে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ লক্ষে। অথচ গুরুতর এ বিষয়টি সম্পর্কে তৎকালীন 'উলামায়ে কিরাম ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। এজন্য এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করার জন্য ১৯৯৭ খ্রি. রমযান মাসে সাইয়িদ আস'আদ বাংলাদেশে ই'তিকাফ করার নিয়ত করেন এবং ঢাকার চৌধুরী পাড়া মাদরাসা মসজিদে ই'তিকাফ করেন। সাইয়েদ আস'আদের সাথে দুই হাজার দেশি-বিদেশী মেহমান ই'তিকাফ করেন। সে সময় তিনি পার্শ্ববর্তী মালিবাগ মাদরাসায় 'উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন, প্রায় এক হাজার 'উলামায়ে কিরাম তার ডাকে সাড়া দিয়ে একত্রিত হন। সেখানে তিনি 'উলামায়ে কিরামদেরকে খ্রিস্টানদের অপতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সক্রিয়ভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা ও তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার আহবান জানান। এভাবে বিভিন্ন সময়ে সাইয়িদ আস'আদ বাংলাদেশে এসে এখানকার মুসলমানদের ঈমান আমল রক্ষা করার বিষয়ে কাজ করেন।"

---

১. ড. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৯।

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরীও বাংলাদেশের 'উলামায়ে কিরামকে এ বিষয়ে পুনরায় সতর্ক করেন। তিনি মাওলানা জা'ফর আহমাদ'কে চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি লিখেন, "খ্রিস্টানরা যে জাল পেতেছে, তা থেকে সতর্ক হোন। পূর্বেও এ বিষয়ে বাংলাদেশের 'উলামায়ে কিরামকে সতর্ক করা হয়েছে। এরদ্বারা তাদের কী প্রভাব পড়েছে আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থার উপর আমি যে বিষয়ে আপনাদের অবগত করছি, আপনি তা ফটোকপি অথবা ছাপিয়ে বাংলাদেশের সকল 'অলিদের হাতে পৌঁছে দিন। চিঠির মূল বিষয় ছিল– "খ্রিস্টানদের অপতৎপরতার বন্ধ করতে হলে আপনাদের কঠিন মেহনত ও কুরবানীর প্রয়োজন, অন্যথায় সম্ভব নয়।"[১]

অসুস্থতা: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী প্রতি বছরের ন্যায় ১৪২২ হিজরী সনেও রমযানের শুরুতেই 'উমরার জন্য মক্কায় গমন করেন। সাধারণত রমযানের শুরুর দিকে হেরেম শরীফে ভীড় কম থাকে। রমযানের 'উমরার সবচেয়ে বড় ফযীলত হলো– সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রমযান মাসে 'উমরা করা আর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ্জ করা একই কথা। তিনি এ 'উমরা পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে এবং মেয়ের জামাতাকে সাথে নিয়ে করেছেন। সাথে বুলন্দশহরের একজন মুহিব্বীনও ছিলেন।

মাওলানা 'আশিক ইলাহী সকলকে বললেন, আমি ইসতিঞ্জার হাজত শেষ করে উযূ করে আসছি। তোমরা যাও, আমি হেরেমে নামায আদায় করে আসছি। তিনি পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে পায়ে হেঁটে হেরেম শরীফের কাছাকাছি এসে বসে পড়লেন। পায়ে হেঁটে আসার কারণে বুকের ব্যথা বেড়ে গেল। আগে থেকেই বুকে ব্যথা ছিল। হুইল চেয়ারে বসিয়ে 'উমরা করানো হলো। মাওলানা কারী খালীকুল্লাহ্ নিজ হাতে তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে দিলেন।

'উমরা শেষে মদীনা মুনাওওয়ারায় ফেরার পর বুকের ব্যথা, শারিরীক দুর্বলতা আরো বেড়ে যায়। অতঃপর তাঁকে বাদশাহ ফাহাদ হাসপাতালে আই.সি.ইউ-তে ভর্তি করানো হয়। সেখানে কয়েকদিন যত্নের সাথে চিকিৎসা করা হয়।

আই.সি.ইউ রুমে নাকে অক্সিজেন, বুকে কম্পিউটার, এমতাবস্থায়ও তিনি কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। আই.সি.ইউ রুমে রুগির সাথে সাক্ষাতের সময় সারাদিনে আধা ঘণ্টা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি বলতেন, বসো আমার কুর'আন তিলাওয়াত শোনো। একেই বলে কুর'আন প্রেমিক।

জেনারেল ওয়ার্ড: আই.সি.ইউ-তে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে রুগীদের জেনারেল বেডে দেওয়া হয়। তাঁকেও আই.সি.ইউ থেকে জেনারেল বেডে দেওয়া হলো। এখানে এসে তিনি কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করালেন। জেনারেল ওয়ার্ডে কেউ দেখা করতে আসলে, তাকে বলতেন, মাওলানা লিখেন। তারা লিখত। এভাবেই তিনি সময়ের মূল্য দিতেন এবং এ অবস্থায়ও তিনি দীনী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

হাসপাতালে 'উলামায়ে কিরামের সাক্ষাত: পাকিস্তানের কৌরাঙ্গী থেকে মাওলানা শরীফ এবং জনাব জালাল 'উমরা করতে এসে মাওলানা 'আশিক ইলাহীর সাথে হাসপাতালে দেখা করেন। তারা মাওলানা 'আশিক ইলাহী'র সাথে অনেকক্ষণ কথা বললেন, যাবার সময় জালাল সাহেব তাঁর খিদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করেন। মাওলানা 'আশিক ইলাহী বলেন, কোনো ভালো মানুষকে এ হাদিয়া দিতেন। জালাল সাহেব বলেন, ভালো মানুষ খুঁজতে খুঁজতে আপনার নিকট পৌঁছেছি। তিনি মুচকি হেসে হাদিয়া গ্রহণ করেন।

হাসপাতাল থেকে ছুটি: হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে গেল। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এক ডাক্তারের মাধ্যমে আর ছুটি হয়েছে আরেক ডাক্তারের মাধ্যমে। প্রথমোক্ত ডাক্তারটি তাঁর ছুটির বিষয়টি অবহিত হলে তিনি বলেন, আরো কয়েকদিন হাসপাতালে থাকলে ভালো হতো। মাওলানা 'আশিক ইলাহী'রও

---

১. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

হাসপাতাল ভালো লাগছিল না। হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানীতে ভুগছিলেন। তিনি চিন্তা করছিলেন, না জানি, হুদূদের বাহিরে হাসপাতালেই আমার ইনতিকাল হয়ে যায়। এ চিন্তায় তাঁর পেশার উঠা-নামা করছিল।

হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরেই দীনী খিদমাত শুরু করে দিলেন। হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরার কথা শুনে মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত বিনিময় করতে আসেন। মানুষের ভীড় দেখে তাঁর মেয়ের জামাতা হাফেয মাহবুবুল হক দরজায় লিখে দিলেন, অল্প সময়ে যিয়ারত শেষ করি। তারপরও মানুষের ভীড় সামলাতে পারলেন না। লোকজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসতে লাগলেন।

মাওলানা 'আবদুল্লাহ্ বাসতাবী'র যিয়ারত: মাওলানা বাসতাবীর সাথে মাওলানা 'আশিক ইলাহী'র খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অসুস্থতার কারণে কয়েকদিন যাবৎ দেখা-সাক্ষাত হয়নি। তাঁরা দু'জন বসে অনেক্ষণ কথাবার্তা বললেন। মাওলানা বাসতাবী কি জানতেন ! মাওলানা 'আশিক ইলাহী'র সাথে এটাই তাঁর শেষ সাক্ষাত।

অন্তীম মুহূর্ত: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র খাস ব্যক্তি মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ আশরাফ মিরাঠী নদবী মাদানী তার সাথে দেখা করতে আসলেন। ঘরে ঢুকতেই সালাম বিনিময় করলেন। মুসাফাহা করলেন। মাওলানা 'আশিক ইলাহী মুসাফাহা করে তাঁর হাত ছাড়লেন না ; বরং ধরে রাখলেন। এভাবে প্রায় বিশ মিনিট চলে যায়। মাওলানা জাবেদ আশরাফ অনুভব করলেন যে, তাঁর কষ্ট হচ্ছে, এটা দেখে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন। এটা মুসাফাহার একটি সুন্নত। কারো সাথে মাসাফাহা করলে তিনি হাত না নিলে তার কাছ থেকে হাত টেনে নেওয়া যাবে না।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত,

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا ودَّعَ رجلا أخذَ بيدِهِ فلا يدعها حتى يكونَ الرجلُ هو يدعُ يدَ النبي صلى الله عليه وسلم ويقولُ استودعُ اللهَ دينكَ وأمانتكَ وآخرَ عملكَ.

> "নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কাউকে বিদায় জানালে তার হাত ধরে রাখতেন। ঐ লোকটি যতক্ষণ পর্যন্ত হাত না ছাড়তো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি হাত ধরেই রাখতেন।"[১]

মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী জীবনের প্রতিটি দিক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করেই চলতেন। অন্তিম শয্যায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করতে ভুল করেননি।

তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র ড. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাওসার মাদানী বলেন, সেদিন রাতে আমাদের বাসায় মাওলানা 'আবদুল ওয়াহিদ-এর দা'ওয়াত ছিল। আমি তাঁর সাহরীর বন্দোবস্ত করে রবাত বুখারীতে চলে আসি। তিনি রবাত বুখারী'র পিছের গলি মাওলানানে সামানিয়াতে থাকতেন। আমি রবাত বুখারীতে এসে দেখি আব্বাজান (রহ.) সাহরী খেয়ে ফজরের নামাযের জন্য ওযূ করে মসজিদে নববীতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আমার জৈষ্ঠ পুত্র হাফিয সালামা-কে বললাম, দাদা-কে হারাম শরীফে নিয়ে যাও। আমিও ওযূ করে আসছি। সে তার দাদা-কে হুইল চেয়ারে করে মসজিদে নববীতে নিয়ে গেল। নামায শেষে আব্বাজান (রহ.)-কে সাথে করে সে বাড়িতে পৌঁছে গেল। মসজিদে নববীতে আমার সাথে আব্বাজানের দেখা হয়নি। বাড়িতে এসে আব্বাজানের সাথে দেখা হলো।[২]

ফজরের নামাযের পরে আহলে ইলমগণের সাথে মুলাকাত: মসজিদে নববীতে ফজরের নামায আদায় করে ঘরে চলে আসেন। মুফতী 'উমর জৈনপুরী যিয়ারতে 'উমরা করতে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত

---

১. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৪৪২।
২. ড. মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮২।

করেন। তিনি মুফতী 'উমর জৈনপুরীকে কয়েকটি কিতাব হাদিয়া দেন এবং তার সাথে আরো যারা ছিলেন তাদেরকেও তিনি তাঁর কিতাব ছাপানোর ওয়াদা করান।[১]

ইহধাম ত্যাগ: মাওলানা মুফতী 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র জৈষ্ঠপুত্র ড. মুফতী 'আবদুর রহমান বলেন, সেদিন আমাদের 'উমরায় যাওয়ার কথা ছিল। আব্বাজান (রহ.)-এর সাথে এটা আমার আখেরী মুলাকাত ছিল কল্পনাও করতে পারিনি। তিনি আমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিচ্ছেন, একথা আমি ভাবতেও পারিনি। সেদিন যোহরের নামাযের পর পরিবার-পরিজন নিয়ে 'উমরায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ফজরের পর আব্বাজান (রহ.)-এর কাছে অনুমতি ও দু'আর জন্য গেলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং দু'আ পড়লেন।

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لَا تُضِيْعُ وَدَائِعُهٗ

> "আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে তুলে দিলাম, আল্লাহ যার হিফাযত করেন কেউ তা নষ্ট করতে পারে না।"[২]

যাইহোক, আব্বাজান (রহ.)-এর সাথে কথা বলে রবাতে বুখারী থেকে বাসায় ফিরে আসলাম। আব্বাজান (রহ.) দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। দীনী কিছু লিখছিলেন।

সকাল নয়টায় ছোট ভাই ও বোন জামাই হাফেয মাহবুবুল হক নিজ নিজ কাজে বের হয়ে যান। আম্মাজান কয়েকবার আব্বাজানের কামরায় এসে বললেন, আপনিও আরাম করেন, ঘুমান। আব্বাজান বললেন, আমার ঘুম আসছে না যখন ঘুম আসবে তখন ঘুমিয়ে পড়বো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। ঘুম আসলে একা না ঘুমিয়ে আমাদের কাউকে সাথে নিয়ে ঘুমাবেন। আম্মাজান এবং আমার সহদরা বোন পাশাপাশি কামরায় থাকতেন।

যোহরের সময় উঠে পরিবার-পরিজন সকলকে ঘুম থেকে উঠালাম। 'উমরার জন্য প্রস্তুত হতে বললাম। আমি মনে মনে আবার চিন্তা করলাম, আব্বাজান (রহ.)-এর সাথে আবার দেখা করে আসি। আমার ভালো লাগছিল না যে, আব্বাজানকে ছেড়ে 'উমরা করতে যাবো। রবাত বুখারীতে গিয়ে দারওয়াজা কড়াঘাত করলাম, আম্মাজান দরজা খুলে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজানের শরীরিক অবস্থা কী ? বললেন, ঠিক আছে। তোমরা 'উমরায় চলে যাও। আর যোহরের নামাযের জন্য তোমার আব্বাজান-কে ডেকে 'উমরার জন্য রওয়ানা হয়ে যাও। আমি আব্বাজানের কামরায় প্রবেশ করে দেখলাম, আব্বাজান ডান কাত হয়ে শুয়ে আছেন। ডাক দিলাম, আব্বাজান ! কোনো জওয়াব আসলো না। ভয় পেয়ে গেলাম, আব্বাজান এক ডাকে উঠে যান, অথচ কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কাছে গিয়ে হাতের কব্জী ধরে দেখলাম, পালস নেই। তৎক্ষণাত আম্মাজান-কে ডাক দিলাম, আম্মা দেখেন, আব্বা'র কী হলো! মা এবং বোন উভয়ে দৌড়ে আসলেন। আমার দিল ধড়ফড় করছে, পেরেশানী বেড়ে গেল। আব্বাজানের বুকে হাত রেখে দেখি, সিনা গরম কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এটা বুঝতে পারলাম যে, বেশি বেশি যিকিরের কারণে বুক গরম হয়ে আছে। অতঃপর আমি মাওলানা আবূ বকর গাযীপুরী-কে ডাকলাম। তিনি এসে বললেন, তিনি তো ইহধাম ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন।[৩] তিনি বললেন,

(انا لله وانا اليه راجعون) إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

১. প্রাগুক্ত।

২. ইব্‌ন মাজা, হাদীস নং ২৮২৫।

৩. মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ (সম্পাদিত), মুফতী আশেক এলাহি বুলন্দশহরী (রহ.) শীর্ষক জীবন কথা মূলক নিবন্ধ, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মুসলিম মনীষীর জীবনী*, সংকলক মুহাম্মদ শামসিল হুদা, সোলায়মানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা ;, পৃ.৩৪৫-৩৪৮।

হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এম্বুলেন্স ডাকা হলো। এম্বুলেন্স আসতে অনেক দেরী করে ফেলে। এম্বুলেন্স এসে যখন আব্বাজানকে দেখল তখন তিনি বললেন, তাঁর তো ইনতিকাল হয়ে গেছে। আমরা হাসপাতালে নিয়ে কী করব ? আমরা তো রোগী হাসপাতালে নিয়ে যাই। এম্বুলেন্সওয়ালার কথাও মনে মানতে চায় না। কেননা বুক এখনো গরম, আর চেহারায় মৃত্যুর কোনো ছাপ নেই। অন্য আরেকটি এম্বুলেন্স ডাকা হলো, আনসার হাসপাতাল নিয়ে গেলাম। ডাক্তার এসে মেশিন দিয়ে চেকাপ করে বললেন, الله يرحمه আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। আমি বললাম, সীনা তো গরম। ডাক্তার বললেন, সীনা গরম হলে কী হবে ? তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। انا لله وانا اليه راجعون।

যখন এতমিনান হলাম, আব্বাজানের ওফাত হয়ে গেছে তখন সুন্নত মুতাবেক গোসল এবং দাফন করতে হবে। আব্বাজানের ইনতিকালের পর তাঁর চেহারা দেখে মনেই হচ্ছিল না যে, তিনি মারা গেছেন। তাঁর চেহারায় নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহওয়ালাদের চেহারায় এভাবে নূর চমকাতে থাকে। অতঃপর সকলকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো।[১]

গোসল ও দাফনের প্রস্তুতি: মানুষ ইনতিকালের পর অতি দ্রুত কাফন-দাফনের প্রস্তুত করা সুন্নত। মাওলানা 'আশিক ইলাহীর জৈষ্ঠ পুত্র ড. 'আবদুর রহমান বলেন, আব্বাজান (রহ.) জীবিতাবস্থায় সুন্নতের পাবন্দী করতেন। ছোট-বড় কোনো সুন্নত ছাড়তেন না। তাঁর মৃত্যুর পরও আমরা সুন্নত মোতাবেক তাঁকে কাফন-দাফন করবো ইনশাআল্লাহ্।

সৌদি 'আরবের নিয়মানুযায়ী দাফনের জন্য পাকিস্তান দূতাবাসের অনুমোদন প্রয়োজন। হাসপাতাল থেকে কার্যক্রম শেষ হতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। পাকিস্তান দূতাবাস এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আগামীকাল শুক্রবার ছুটির দিন। এ সকল বিষয় চিন্তা করলে তারাবীহ নামাযের পর জানাযা করা অসম্ভব।

সৌদি 'আরবের সকল নিয়মকানূনের বাধা পেরিয়ে আল্লাহ তা'আলার মদদ চলে আসলো। হাফিয মাওলানা কারী মুহাম্মদ আযহার[২] তাঁর কফীল[৩]কে দিয়ে সৌদি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোন করান। কফীল বলেন, মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরীকে দাফনের অনুমতি প্রদান করা হোক। পাকিস্তান দূতাবাস থেকে অনুমতিপত্র পরবর্তীতে জমা দেওয়া হবে।

গোসল: ড. মুফতী 'আবদুর রহমান কাওসার মাদানী বলেন, মুফতী 'আবদুর রউফ সাখারবী 'উমরা পালনের জন্য মদীনায় ছিলেন। তাঁকে আমি গোসলে অংশগ্রহনের জন্য আবেদন করি। তিনিসহ আরো অনেক আহলে ইলম এই গোসলে অংশগ্রহন করেন। আব্বাজান (রহ.)-কে জান্নাতুল বাকী'-এর গোসল খানায়[৪] গোসলের ব্যবস্থা করা হয়। গোসল ও কাফনের পর তাঁর চেহারায় নূর চমকাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল না যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি যেনো মুচকি হাসছেন।

গোসলের পর জানাযার জন্য মসজিদে নববীতে নেয়া হলো। সেখানে তারাবীর নামাযের পর তাঁর জানাযার নামায পড়ানো হয়। জানাযা নামাযের ইমামতি করেন, শায়খ হুসায়ন। তিনি মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব। নামাযের পর জান্নাতুল বাকী'তে নেওয়া হয়।

তাঁর জানাযায় মসজিদে নববী ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। এমন কাউকে দেখা যায়, যাদেরকে পূর্বে কখনো দেখেনি। দেখতে আমাদের মতোই। মাওলানা জামীল মাযাহেরী বলেন, আমার কাছে তো মনে হয়, মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী'র জানাযায় আসমান থেকে ফিরিশতা নেমে এসেছে।

দাফন: মাওলানা 'আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী-কে সাইয়্যিদুনা 'উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)[৫]-এর প্রতিবেশি তথা তাঁর গোত্রের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৬]

غفر الله له وطيب ثراه وجعل جنة الفردوس مثواه ومأواه. آمين يا ارحم الراحمين.

---

১. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৪

২. তিনি মসজিদে নববী'র মুদাররিস ছিলেন।

৩. সেসময় তিনি উহুদ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন।

৪. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার স্থান।

৫. যিনি জামি'উল কুর'আন ছিলেন।

৬. ড. মাওলানা মুফতী 'আবদুর রহমান কাউছার মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সমকালীন আলিমগণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র সমকালীন আলিমগণ

ইসলাম জীবন্ত ধর্ম এবং জাগ্রত-চেতনা মানুষের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইসলামের জন্য জাগ্রত-চেতনা মানুষেরই প্রয়োজন। আল্লাহ ইসলামের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, সব সময় তাঁর জন্য জাগ্রত চেতনাসম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে। কোনো গাছকে ততক্ষণ পর্যন্ত সবুজ ও প্রাণবন্ত মনে করা হয় না, যতক্ষণ না তা ফলদায়ক হয় এবং তাতে সবুজ ডাল-পাতা মেলে। আর প্রদীপের নিয়ম হলো প্রদীপ থেকে প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে এবং তা হতেই হবে। উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে জাগ্রত ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে যার জ্ঞানবৃক্ষ, চিন্তাবৃক্ষ, কল্যাণকামিতা ও আধ্যাত্মিকতার বৃক্ষ নতুন নতুন লতা-পাতার জন্ম দেবে, নতুন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করবে।

পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীদের কর্মযজ্ঞ, তাঁদের নিষ্ঠা ও সততা, আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, তাঁদের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের ইতিহাস পরবর্তীদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় ও পথপ্রদর্শক। আমরা সবসময় বলি, আমাদের পূর্বসূরিরা এমন ছিলেন, তাঁদের মুখস্থ শক্তি এত প্রখর ছিল এবং তাঁরা সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁদের জীবনচর্চায় এতটুকু যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন তাঁদের জীবনের বৈপ্লবিক চেতনা ও উম্মাহর নেতৃত্বে তাঁদের অতুলনীয় প্রজ্ঞাময় কর্মকাণ্ডও আলোচনা করা। ইসলামকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন আর অনাগত মানুষের সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রয়োজন জাগ্রত বোধ ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

কোনো জাতির বহু কিছু আছে; বড় বড় পাঠাগার আছে, সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে; কিন্তু জাগ্রত-চেতন ব্যক্তিত্ব নেই। যার হৃদয় থেকে, যার গবেষক মন থেকে, পাণ্ডিত্য থেকে ও যার দূরদৃষ্টি থেকে আমরা আলো গ্রহণ করব। এমন জাতির ভবিষ্যৎ কী?

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শত বছরে এই উম্মতের জন্য একজন ব্যক্তি প্রেরণ করেন, যিনি তাদের দ্বীনী বিষয় সংস্কার করেন।' অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন সংস্কারক পাঠান যে দ্বীনকে সজীব ও গতিশীল করেন এবং দ্বীনী সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেন। দ্বীনী সংস্কার কোনো সাময়িক বিষয় নয়, যা এক-দুই সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে; বরং তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু মনীষী আছেন, যাঁদের প্রভাব কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীসহ তাঁর পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে দ্বীনচর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় অবদান দ্বীনী চেতনা জাগ্রত করা। আর শায়খুল হাদীস তৎকালীন সময়ে সমকালীন 'উলামায়ে কিরামের নিকট ছিলেন হাদীস জগতের মুকুট বিহীন রাজা। তাঁর সময়ে আরো অনেক বড় বড় মনীষী হাদীসের খিদমত করেছেন। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হলো–

মাওলানা বেলায়েত হোসেন বীরভূমি

উপমহাদেশে যারা ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যের অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে শামছুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন অন্যতম। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক, সু-সাহিত্যিক বাগ্মী শারী'আতের বিশেষ পাবন্দ, স্পষ্টবাদী এবং মানব দরদী হিসেবে সুপরিচিত।[১]

জন্ম ও পরিচয়

মাওলানা বেলায়েত হোসেন ১৮৮১ খ্রি. পশ্চিম বাংলার বীরভূমি জিলার অন্তর্গত লাভপুর থানাধীন ছাও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মিসবাদ্দীন তাঁর প্রপিতামহ সৈয়দ আলাউদ্দিন বীরভূমের নগর নামক পাঠান রাজার একজন কাজী ছিলেন। তাঁর পুত্র মীর মুহাম্মদ কাবিল তদানিন্তত পাঠান রাজার শিক্ষক ছিলেন।[২]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট* (ঢাকা: ই. ফা. বা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৭০; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১০৭

শিক্ষা জীবন

মাওলানা বেলায়েত হোসেন মঙ্গল কোর্টে বর্ধমান ইশা'আতুল মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকায় আগমন করেন ১৯০৫ এবং ঢাকা মাদ্‌রাসায় বর্তমানে নজরুল কলেজ হেড মৌলবী মাওলানা ফযলুল করীম বর্ধমানীর নিকট কিছুটা শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯০৭ খ্রি. এ মাদ্‌রাসায় সিনিয়র তৃতীয় বর্ষে সিওম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ১৯০৯ খ্রি. কৃতিত্ব সহকারে জামা'আতে উলা পাস করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে রামপুর গমন করেন। কিছুদিন পর প্রাইভেটভাবে তিনি মানতিক, যুক্তিবিদ্যা, হিকমত, দর্শন ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন। ১৯১১ খ্রি. তিনি রামপুর 'আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিভাগের পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম হন। হাদীস অধ্যয়নের পর তিনি সেখানে তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন। এ সময় তিনি প্রখ্যাত আলিম ফজলে হক রামপুরীর মৃ: ১৯৪০ নিকট হিকমত ও আকায়িদ গ্রন্থসমূহ শিক্ষা করেন।[১]

কর্মজীবন

রামপুর 'আলিয়া থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৩ খ্রি. পহেলা মে তিনি ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর কিছুদিন চট্টগ্রাম শিক্ষকতা করে ১৯২৬ খ্রি. ১লা জুলাই তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী মৌলবী পদে যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রি. তিনি এ মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে উন্নীত হন। ১৯৩৮ খ্রি. তিনি এ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত হেড মৌলবী পদে নিযুক্ত হন। যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে ১৯৪২ খ্রি. তিনি এখানেই হেড মৌলবীপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৪৭ খ্রি. ১৬ জুন চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২]

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৪৮ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা বেলায়েত হোসেন পাকিস্তানের ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত পরপর দু'বার তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

খেতাব প্রদান

১৯৩৩ খ্রি. "ভারত সরকার তাকে শামসুল উলামা" আলিমগণের রবি তথা শিরোমনি খেতাবে ভূষিত করেন।[৩]

ইনতিকাল ও দাফন

৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রি. রবিবার ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় বংশালের মালিবাগ মসজিদ সংলগ্ন হাজীবাড়ি কবর স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রী ও অনেক নাতি-নাতনি ও অসংখ্য ভক্ত রেখে যান।[৪]

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-৭১

৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০- ২০৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ

জন্ম

মাওলানা মমতাজুদ্দীন আহমদ ১৮৮৯ খ্রি. নোওয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন মানিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- জলীশ ভূঁইয়া।[১]

শিক্ষাজীবন

স্থায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাওলানা মমতাযুদ্দিন আহমেদ ১৯০৭ খ্রি. কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি দাখিল, আলিম, ও ফাযিল ও কামিল যথাক্রমে ১৯১০, ১৯১২, ১৯১৪ ও ১৯১৬ খ্রি. পাস করেন। ১৯১৮ খ্রি. তিনি কলিকাতা বোর্ড হতে মেট্রিক পাস করেন।[২]

শিক্ষক মণ্ডলী

তিনি মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, ও মাওলানা নাছের হাছান দেওবন্দীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। মাওলানা 'আবদুল হক হাক্কানী, মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানী, মাওলানা ফজলে হক রামপুরীর ন্যায় ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদের নিকট অন্যান্য বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।[৩]

কর্মজীবন

তিনি ১৯১৯ খ্রি. কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯২১ খ্রি. কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী প্রভাষক নিযুক্ত হন। পুনরায় তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রভাষক রূপে যোগদান করেন। একটানা ৩৪ বছর এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে ১৯৫৩ খ্রি. ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা[৪] থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পেনসন প্রাপ্ত হয়ে তিনি ঢাকার কায়েতটুলিতে বসবাস করতে থাকেন।[৫]

হাদীসশাস্ত্রে মাওলানা মমতাযুদ্দীনের জ্ঞান ছিল ব্যাপক ও গভীর। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি প্রধানত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তিনি সরল, সদয় সদাচারী, আল্লাহভীরু, আলিম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ছিলেন।[৬]

তাঁর রচনাবলী

১) নি'মাতুল মুনইম-ফী-শারহী মুকাদ্দিমতি মুসলিম।

২) আল কওকাবুদ্ দুররী শারহু মুকাদিমাতিত দিহলবী।

৩) হাল্লুল উকদাহ শারহু সাব'আতিল মু'আল্লাকাহ।[৭]

৪) কাশফুল মা'আনী শারহু মাকামাতে হারীরী।
৫) নবী পরিচয়।
৬) কুর'আন পরিচিতি।[৮]

---

১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৭৪; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩- ১৯৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৬.প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৫
৭. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; মোঃ 'আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৮.ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯০

মৃত্যু

মাওলানা মমতাযুদ্দীন আহমদ ৬ জুলাই ১৯৭৪ খ্রি. দিবাগত রাত্র ১টার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মানিকপুরের নোয়াখালী পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত হন।[১]

মুফতি 'আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.)

জন্ম

মুফতি 'আবদুর রহমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন বান্দুআইন গ্রামে ১৮৮৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ আলী। দাদার নাম ফানাহ উল্লাহ মিয়াজী ও পরদাদার নাম মুহাম্মদ বখশ আলী মিয়াজী।

শিক্ষাজীবন

তার প্রাথমিক পড়াশুনা বান্দুআইন মধ্যপাড়া মোল্লাবাড়ির ফোরকানিয়া মক্তবে আরম্ভ হয়। এখানে তিনি ১৮৯২ খ্রি. থেকে ১৮৯৫ খ্রি. পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৮৯৬ খ্রি. পর তিনি ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমগঞ্জ দরসে নেযামী মতে পরিচালিত ফয়েজিয়া কওমী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কাফিয়া পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন। অতঃপর নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে জামীতে ভর্তি হয়ে জামা'আতে উলা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় দেখতে পান যে, বরিশাল নিউস্কীম হাই স্কুলে একজন হেড মৌলভীর প্রয়োজন। তখন তিনি ঐ চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং তিন বছর চাকরি করার পর পুনরায় 'উলূমে নববী আহরণে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে সমাপ্তির দ্বার প্রান্তে পৌঁছে তার সংগ্রামী শিক্ষা জীবন। তিনি বড়মাপের আলিম ও মুহাদ্দিসদের নিকট ইল্‌মে হাদীসসহ অন্যান্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন।

তাঁর ওস্তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন-

১) মাওলানা ইদ্রীস আলী।

২) মাওলানা গিয়াস উদ্দীন।

এছাড়াও তিনি প্রথমে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শর্শদির মাওলানা নযীর আহমদ শহীদ (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

মুফতী 'আবদুর রহমান ছাত্রজীবন শেষ করার পর প্রথমে কুমিল্লা জেলাধীন বটগ্রাম মাদ্‌রাসায় মুফতি ও হাদীসের ওস্তাদ হিসেবে সুদীর্ঘ সতের বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর কুমিল্লা কাসেমুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। এখানে তিন বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। লাকশাম উপজেলার অন্তর্গত কাশীপুর মাদ্‌রাসার অবস্থা তখন একেবারেই জড়সড়। অতঃপর তিনি কাশীপুর মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা হামীদ উল্লাহ, এলাকার আলিম-ওলামা ও নেতৃস্থানীয় দীনদার লোকদের বিশেষ অনুরোধে কাশীপুর মাদ্‌রাসায় নায়েবে মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছর যাবত মুফতি আবদুর রহমান এ গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মুফতি আবদুর রহমান-এর ছাত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন এবং দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

১) মাওলানা আবদুর রব।
২) মাওলানা সেকান্দার আলী, বড় কাটারা মাদ্‌রাসা, ঢাকা।
৩) মাওলানা সূফী সেকান্দার আলী, নবীনগর, ঢাকা।

---

১. মোঃ 'আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, ৭৮

৪) মাওলানা 'আবদুল আযীয, মুহতামিম, বটগ্রাম মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।
৫) মাওলানা আখতারুজ্জামান, অধ্যক্ষ পিপুলিয়া মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।
৬) মাওলানা 'আবদুল ওয়াদূদ।
৭) মাওলানা মোবারক করীম, মুহতামিম, খুলনা মাদ্‌রাসা।
৮) মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, ঢাকা।
৯) মাওলানা মুফতি শামছুদ্দীন, রংপুর।
১০) মাওলানা মুমতাযুল করীম, রাজশাহী।

মৃত্যু

মুফতি আবদুর রহমান ১৯৭৩ খ্রি. মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য ছাত্র, ভক্তবৃন্দ রেখে যান।[১]

মাওলানা 'আবদুল ওয়াহহাব (পীরজী হুজুর) (১৮৯০-১৯৭৬ খ্রি.)

মাওলানা 'আবদুল ওয়াহহাব কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আহসান উল্লাহ। তিনি 'পীরজী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বালক 'আবদুল ওয়াহহাব স্থানীয় মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর পড়ার পর তিনি ভারত গমন করে প্রথমে মাযাহেরুল 'উলূম সাহারানপুর ও দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদ্‌রাসা হতে তিনি দাওরায়ে হাদীস সনদ অর্জন করেন। পড়াশুনা শেষ করে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তথায় ৬মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কর্মজীবনের সূচনালগ্নেই তিনি একাধারে প্রতিভাবান মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে সমাজে পরিচিত হন। তিনি ১৯৩০-১৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ও খুলনার গজারিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত থেকে হাদীসের দরস দেন। পরবর্তীতে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর এর সাথে ঢাকায় আগমন করে বড় কাটারায় জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম মাদ্‌রাসাটি পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত মাদ্‌রাসায় তিনি আজীবন মুহতামিম পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষা দান করেন। তাঁর অক্লান্ত সাধনায় এ মাদ্‌রাসা অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লহ, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন তাঁর অসংখ্য কীর্তিমান ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মারা যান।[২]

মাওলানা আতহার আলী সিলেটী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা আতহার 'আলী সিলেটী তৎকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় এক সম্ভ্রান্ত দীনদার ঘরে ১৩০৯ হিজরী মুতাবিক ১৮৯১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

মাওলানা আতহার 'আলী 'কুর'আন মাজীদ' পিতা মৌলভী 'আযীম খানের কাছেই নাযেরা পড়েন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি মাদরাসায়ে বরদীস, নায়ানী বাজার ভর্তি হন। এ মাদরাসায় তিনি উর্দূ,

---

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, '*বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চা* (১৯০১-২০০০ খ্রি.)', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর-২০০৯ খ্রি.)

২. আমীরুল ইসলাম 'পীরজী হুজুর'-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, *স্মরণীকা*, ১৯৯৭, জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটারা, ঢাকা, পৃ. ৭-৮; মোঃ 'আবদুল করিম, *দেওবন্দ আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজে প্রভাব* (১৮৬৬-১৯৪৭), অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৩, পৃ. ২০০

ফারসী'র জ্ঞানার্জন করেন। এখানে মাওলানা 'ইরফান 'আলী ও মাওলানা শফীক ইসহাক বাহাদুরপুরী এ দু'জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য তিনি মাদরাসা কাসিমিয়া মুরাদাবাদ এবং মাদরাসা 'আলিয়া রামপুর-এ ভর্তি হন। অতঃপর হাদীস ও তাফসীরের জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি ইসলামী মারকায দারুল 'উলূম দেওবন্দে যান।

সেখানে তাঁর শিক্ষকবৃন্দ হলেন–

- ইমামুল 'আছর মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী
- শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ 'উসমানী
- 'আরিফ বিল্লাহ মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন দেওবন্দী
- উসতাযুল 'উলামা মাওলানা রসূল খান হাযরূবী

কর্মজীবন

মাওলানা আতহার 'আলী (রহ.) জাহেরী ও বাতেনী ইল্ম অর্জনের পর দেশে ফিরে প্রথমেই তিনি নিজ গ্রাম ঘুঙ্গাদিয়াতে ইল্মে হাদীসের দরস দান শুরু করেন। সিলেটের প্রাচীন ঝিঙ্গাবাড়ী 'আলীয়া মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এর কিছুদিন পর তিনি কুমিল্লার জামি'য়া কাসিমুল 'উলূম মাদরাসায় সদরে মুদার্‌রিসের পদ অলংকৃত করেন।

দরস ও তাদরীসের ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, কোনো ছাত্র তাঁর দর্‌সে বসলো কিন্তু কিতাব বুঝলো না ; তবে তার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। অতঃপর তিনি কিশওয়ারগঞ্জ (বর্তমান কিশোরগঞ্জ)-এর একজন র'ঈসের ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে কয়েক বছর তাবলীগ ও ইসলাহী কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখেন। কিশওয়ারগঞ্জে তিন বছর তাবলীগের মেহনত করার পর নিজ জেলা সিলেটে যাওয়ার মনস্থ করেন। অতঃপর সেখান থেকে সিলেট চলে আসেন। কিন্তু কিছুদিন পর হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহ.)-এর পরামর্শক্রমে তথা হযরতের কাছে তিনি নিজেকে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তাই থানবী (রহ.) যে আদেশ দিয়েছেন তা পালনার্থে তিনি তাবলীগ ও ইসলাহের কাজের জন্য পুনরায় কিশওয়ারগঞ্জে চলে আসেন এবং এখানেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিশওয়ারগঞ্জে তিনি একটি মসজিদে ইমামতের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এ মসজিদকে সম্প্রসারণের কাজেও তিনি অগ্রণি ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি তাবলীগ দাওয়াত ও ইসলাহের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসায়ে ইমদাদুল 'উলূম প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এ মাদরাসা জামি'য়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে রূপ নেয়। এ জামি'য়া থেকে হাজার হাজার ছাত্র দীনী শিক্ষার্জন করেন এবং আতহার 'আলী (রহ.)-এর হাজার ছাত্র, শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দ আজ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ইলমে দীন শিক্ষাসহ দীনী দা'ওয়াতের (তাবলীগ) মেহনত করে যাচ্ছে।

মৃত্যু

মাওলানা আতহার 'আলী (রহ.) ইলমে দীন, তাবলীগী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি ৫ অক্টোবর, ১৯৭৬ খ্রি. মুতাবিক ৯ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরীতে রাত ১০ টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। ৬ অক্টোবর ঈদগাহে তাঁর নামাযে জানাযা হয় এবং তাঁকে জামি'য়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহে দাফন করা হয়।[১]

১. হাফেয সায়্যিদ মুহাম্মদ আকবার শাহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০

আমীরে শরীয়ত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) (১৮৯৫-১৯৮৭ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আমীরে শরিয়ত মুজাহিদে মিল্লাত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) সাবেক নোয়াখালী বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে ১৮৯৫ খ্রি. দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমকি শিক্ষা

হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) শৈশব হতেই পিতামাতার নেক ভাগ্যবান সন্তান। চলাফেরা উঠাবসা কথাবার্তা আচার আচরণ সব কিছুতেই তার নেক ও ভাল স্বাভাব ফুটে উঠত।

ইসলামী শিক্ষার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার শিক্ষাজীবন। বিশিষ্ট 'আলিম বুযুর্গ একমাত্র চাচা মাওলানা মোঃ ইউসুফ সাহেবের নিকট তিনি বিসমিল্লাহ-এর ছবক গ্রহণ করেন। কায়দা আমপারা হতে শুরু করে মাসআলা মাসায়েল এবং ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দেখাশুনা এবং এলাকায় জনগণের দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিতেন চাচা মাওলানা মোঃ ইউসুফ সাহেব। নিজ সন্তানের মতই ভাতিজা-ভাতিজীদের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

যুবক হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) চাচা জানের নিকট প্রাথমিক আরবী ফার্সী শিক্ষা লাভের পাশাপাশী ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিত নামক জনৈক হিন্দু শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

উচ্চ প্রাইমারী স্কুল থেকে পাস করার পর তিনি আরবী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু কোথায় কিভাবে আরবী শিক্ষাগ্রহণ করবেন, সে সিদ্ধান্ত তখনো নেননি, ইতিমধ্যে, একদিন দাদার বাড়ি বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আব্বার সঙ্গে নোয়াখালীর চৌমুহনী রওয়ানা হন। চন্দ্রগঞ্জ পৌঁছার পর পশ্চিম বাজার রাস্তা সংলগ্ন মসজিদে জনৈক উস্তাদের নিকট কতিপয় ছাত্রকে পড়াশোনা করতে দেখতে পান, পাঁচ পারার মাওলানা ওসমান সাহেব তখন ঐ মসজিদে পড়াতেন। মাওলানা ওসমান সাহেবকে কেন্দ্র করে কয়েকজন ছাত্রের পড়ালেখার সুন্দর দৃশ্যটি দেখে যুবক হাফেজ্জী হুজুরের মনও তার নিকট পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখনি আব্বাজানের নিকট মনের আগ্রহের কথা তিনি প্রকাশ করেন ছেলের আগ্রহের কথা শুনে আব্বা সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

পিতার অনুমতি পেয়ে তিনি সেখানে ভর্তি হয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পড়ালেখা করলেন। মাওলানা ওসমান সাহেবের মাদ্‌রাসাটি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি মাদ্‌রাসা। এক উস্তাদ এক মাদ্‌রাসা, বিভিন্ন বিষয়ের পারদর্শী শিক্ষক মণ্ডলীর অনুপস্থিতির কারণে মাদ্‌রাসাটির প্রাতিষ্ঠানিক কোন রূপ ছিল না।

অতএব হাফেজ্জী হুজুর মনে মনে আরো একটি বিদ্যাপিঠ খুঁজেতে থাকেন, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পরদর্শী উস্তাদগণের তত্ত্বাবধানে পড়ালেখার সুযোগ এবং সমন্বিত একটি অধ্যয়নের পরিবেশ থাকবে।

তৎকালে লাকসামে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌদুরানীর মাদ্‌রাসাটি ছিল কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা, সেখানকার পড়া-লেখার সুনাম সুখ্যাতির কথা শুনে মাওলানা ওসমান সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে তিনি নবাব বাড়ির মাদ্‌রাসায় চলে আসেন।

খিল বাইছা মাদ্‌রাসা

লাকসাম মাদ্‌রাসা ছেড়ে এসে তিনি লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত খিল বাইছা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় মাওলানা আব্দুর রহমান ছিলেন একজন ওলিয়ে কামেল এবং স্বনামধন্য 'আলিম। মাওলানা 'আবদুর রহমান (বড় হুজুরের) বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) উক্ত মাদ্‌রাসায় তিন বৎসর অধ্যয়নরত ছিলেন। এখানে তিনি ফার্সী ভাষায় আল্লামা শেখসাদীর গুলিস্তা ও বোস্তা, আখলাকে মুহসেনী, ইউসুফ যোলায়খাঁ প্রভৃতি কিতাব এবং নাহু ছরফের মীযান, মুনশাইব, নাহুমীর, হিদায়াতুন্নাহুসহ সংশ্লিষ্ট জামা'আতগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবন

পড়াশেষে তিনি তার সাথী মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও মাওলানা 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রহ.)সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেওবন্দের নকসা অনুযায়ী নতুন নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তারা প্রথমে যোগ দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসায় ইউনুসিয়ায়। এরপর তাদের প্রচেষ্টায় বাগেরহাট ও ঢাকার বড় কাটারা, লালবাগ ও ফরিদাবাদে বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। পরে ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে হাফেজ্জী হুজুরের একক প্রচেষ্টায় প্রায় ১৮-২০ একর জমির উপর নূরীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৮১ খ্রি. তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। নির্বাচনের পর ১৯৮১ খ্রি. ২৯ নভেম্বর তিনি খেলাফত আন্দেলন নামে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

- শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুছাইন আহমদ মাদানী (রহ.)
- আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ.)
- আল্লামা শায়খুল আদব এযায আলী (রহ.) প্রমুখ।

শাগরেদবৃন্দ

- শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক (রহ.)
- আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমীনী (রহ.)
- মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই (রহ.)
- মাওলানা 'আবদুল হাই পাহাড়পুরী (রা.)
- পীরে কামেল মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ (দা. বা.)সহ প্রমুখ।

ওফাত

৭ মে ১৯৮৭ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা কামরাঙ্গীরচরে নূরীয়া মাদ্রাসার পার্শ্বে তাঁকে সমধিস্থ করা হয়।[১]

ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৮৯৬-১৯৭১ খ্রি.)

প্রখ্যাত আলিম রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ভুবন গ্রামে ১৮৯৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনওয়ারুদ্দীন একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। পিতার কাছে ও স্থানীয় শ্রীঘর মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে সিলেটের বাহুবল মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখান থেকে সিলেটের সরকারি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯১৮ খ্রি. ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে উলা পাস করেন। এরপর তিনি ১৯১৯ খ্রি. দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে তিনি ৪ বছর লেখাপড়া করে দাওরায়ে হাদীস ও দাওরায়ে তাফসীর সমাপ্ত করেন। মাওলানার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন যথাক্রমে মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, সৈয়দ আসগর হোসাইন, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মুফতি আযিযুর রহমান প্রমুখ। বাংলাদেশের যে কয়জন আলিম আরবীবিদ এবং আরবী ভাষা ও

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের জীবনী* (ঢাকা: ২০০৯, বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স), পৃ. ৮৫-৯৪

সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে আরবী কবিতা, গদ্য ও গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা তাজুল ইসলাম অন্যতম।[১]

মাওলানা দেওবন্দ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কুমিল্লার সুয়াগাজী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে স্বীয় কর্ম জীবন শুরু করেন। তারপর কুমিল্লা জামি'আ মিল্লিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত থেকে ১৯৬৩ খ্রি. জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়ায় মুহতামিম পদে যোগদান করে আমৃত্যু উক্ত পদে ছিলেন।[২] মাওলানা তাজুল ইসলাম দারুল 'উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সময়ই ধর্মীয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারকারীদের সাথে বিতর্কে ও তাদের মতবাদ খণ্ডনে বিশেষ নিপুনতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৩] তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা ও বাতিল মতবাদ খণ্ডনে অবদান রাখার সাথে সাথে তিনি জাতীয় রাজনীতিতেও জড়িত হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ মহান হাদীস বিশারদ ১৯৭১ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[৪]

মাওলানা 'আবদুল্লাহ নদবী (১৯০০-১৯৭২ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ঢাকা পার্শ্ববর্তী তেজগাঁও থানাধীন ফায়দাবাদ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মাওলানা 'আবদুল্লাহ নদবী বীরভূম জেলার নান্নুর থানাধীন নূরপুর গ্রামে ১৯০০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করনে।[৫] তার পিতার নাম মরহুম শায়খ আহমদ। মাওলানা 'আবদুল্লাহ নদবীর প্রকৃত নাম হলো আবু উবায়েদ 'আবদুল্লাহ্ নদবী।[৬]

শিক্ষা জীবন

স্থানীয় মাধবপুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করনে। এর পর তিনি কিরনহার মাইনর স্কুল থেকে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা পাস করেন। এরপর বীরভূমের ঘুরিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণের উচ্চ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন।[৭] এরপর দিল্লির হাজী আলীজান মাদ্‌রাসায় মাওলানা 'আবদুল্লাহ এলাহাবাদী ও মাওলানা 'আবদুর রহমান মাভবী প্রমুখের নিকট হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন কারেন।[৮] মাদ্‌রাসায় তিনি হাদীসের দাওরা ক্লাসে ভর্তি হন। মাত্র এক বছর সময়ে সিহাহ সিত্তাহ শেষ করেন। এরপর দিল্লির ফতেহপুর মাদ্‌রাসায় যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করেন। 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে 'আরবী সাহিত্যের সনদ লাভ করেন।[৯]

এরপর তিনি লক্ষ্ণৌর নুদওয়াতুল ওলামায় দরজায়ে তাকমীলে দ্বীনীয়াত কোর্স সমাপ্ত করেন। তাঁর এখানকার উস্তাদগণের মধ্যে সৈয়দ সুলায়মান নদবী, আমীর আলী মালিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী ছিলেন অন্যতম।

এছাড়াও তিনি অনেক প্রখ্যাত জ্ঞানী উস্তাদগণের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তারা হলো স্বীয় পিতা শায়খ আহমদ, মাওলানা 'আবদুল মান্নান বর্ধমানী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ এলাহাবাদী, মাওলানা 'আবদুর রহমান পাণ্ডবী, সৈয়দ সুলায়ামান নাহবী, আমীর মালিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী প্রমুখ।

---

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
২. মোঃ 'আবদুল করিম, *দেওবন্দ আন্দোলন: বাংলার মুসলিম সমাজের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
৪. প্রাগুক্ত।
৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৬.নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৭. নূর মোহাম্মদ আজমী প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৮.আরাফাত (সম্পাদকীয়) ঢাকা, ১৯জুন, ১৯৭২; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৯.নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, ২৩৯; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

কর্মজীবন

তিনি নুদওয়াতুল ওলামার শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯২৫ খ্রি. গোড়ার দিকে দেশে ফিরে 'আবদুল্লাহ নাদবী বীরভূমের বড় মিয়া ইরফানুল উলূম মাদ্‌রাসায় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রি. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আঞ্জুমান আহলে হাদীস কর্তৃক মাওলানা নাদবীকে কলিকাতার মিসরীগঞ্জ মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দু' বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের ভাবতা মাদ্‌রাসা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি বেশি দিন স্থায়ী থাকেননি। এখানকার আবহাওয়া তার ভাল লাগেনি বলে তিনি বীরভুমে তার শ্বশুর 'আবদুর রহীম পরিচালিত মাদ্‌রাসায় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এরপর খায়রাবাদ নিয়াজিয়া নিয়ামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করনে।[1] ১৯৩৪ খ্রি. নদবী সাহেব নিয়াজিয়া নিয়ামিয়া মাদ্‌রাসা ত্যাগ করে দিল্লির রহমানিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।[2]

১৯৩৯ খ্রি. মাওলানা নদবী কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ভারত বিভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সেখানেই বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কলিকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রি. তিনি ঢাকা থেকে সিলেট 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় বদলী হন। সেখান থেকেই ১৯৬০ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকার বংশাল রোডস্থ মাদ্‌রাসাতুল হাদীস ও দিনাজপুর নান্দারাইল মাদ্‌রাসায় কিছু দিন হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি শিক্ষা দেন। এরপর নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[3]

মাওলানা 'আবদুল্লাহ নদবী ছিলেন একজন বিজ্ঞ 'আলিম, বিশিষ্ট আরবী কবি ও সাহিত্যিক বঙ্গের আরবী কাব্যক্ষেত্রে মাওলানা 'আবদুর রহমান কাশগড়ীর পরেই তাকে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন সৃজনশীল স্বভাব কবি। নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাপ্রাপ্ত অপরাপর সেরা 'আলিমদের ন্যায় 'আবদুল্লাহ নদবী ও ছিলেন জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। তিনি ছিলেন প্যান ইসলামী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ। তিনি জিহাদকে ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন।[4]

মৃত্যু

৩১ শে মে, ১৯৭২ খ্রি. রোজ বুধবার ৭২ বছর বয়স ঢাকার পার্শ্ববর্তী টঙ্গী শিল্প শহর নিকটস্থ ফয়দাবাদে ইন্তেকাল করেন এবং নিজস্ব স্থানীয় গোরস্থানে সমাহিত হন।[5]

মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন (১৯০০-১৯৭৪ খ্রি.)

নাম পরিচয়

নাম দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন, লকব মুফতী, পিতার নাম নূরুল্লাহ খাঁন।[6] তাঁর পিতা ছিলেন, বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা ছিলেন সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান বাজুড় এলাকার অধিবাসী।

---

১. নূরুল্লাহ খাঁন প্রাগুক্ত, সীমান্ত প্রদেশের বাজুড় এলাকার বাসিন্দা এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। মনিপুরের যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি বাংলায় আগমন করেন এবং অবসরপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকায় বসবাস ইখতেয়ার করেন। এখানে তিনি ময়মসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর এই ঘরে ২ পুত্র দীন মোহাম্মদ খান, নূর মোহাম্মদ খান ও এক কণ্যা জন্মগ্রহণ করেন। দ্র. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

২. এসরার আহমদ খান, *মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান সাহেব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তা.বি.), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৬২; ড. মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

মনিপুরের আসাম যুদ্ধ চলা কালে তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করেন।[১]

জন্ম: মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন ১৯০০ খ্রি. জানুয়ারি মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন।[২]

শিক্ষা জীবন

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁন প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাদীসের "সিহাহ সিত্তাহ" পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন তদানীন্তন চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থানরত মাওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারী। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রি. তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর কাল ধরে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তিনি ফাযেল পরীক্ষায় ও অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লির আমীনিয়া মাদ্রাসায় মাওলানা মুফতী কিফায়তুল্লাহ দেহলভীর হাদীস শিক্ষা কোর্সে যোগদান করেন। দেওবন্দ অবস্থান কালে মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরির ঘনিষ্ঠ সান্বিধ্যে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[৩] ১৯২১ খ্রি. তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

কর্মজীবন

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে মুফতী সাহেব ঢাকায় হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর আরো দু' একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় একযুগ শিক্ষকতার পর তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করেন। সে সময় মাওলানা 'আবদুল করীম মাদানী বাংলার লোকসমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি আরবী ভাষাতে ওয়াজ নসীহত করতেন। বাঙ্গালী দুভাষীরা তা উর্দূ বা বাংলায় অনুবাদ করে লোকদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। মাওলানা মাদানীর সাথে মুফতী সাহেবের পরিচয় ঘটে ও তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে মাদানী সাহেবের সহযোগী রূপে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মাদানী সাহেব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করলে মুফতী সাহেব ও ১৯৩১ খ্রি. গোড়ার দিকে তাঁর সঙ্গে বার্মার রেঙ্গুনে যান। তথায় দোভাষীরূপে তাঁর আরবী বক্তৃতার উর্দূ অনুবাদ করে জন সাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন। কিছুকাল পর মুফতী সাহেব মাদানী সাহেব থেকে পৃথক হয়ে যান। রেঙ্গুনস্থ বাঙ্গালীদের জামে মসজিদে মুফতী ও খতিব নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি লোক সমাজে মুফতী নামে আখ্যায়িত হন। রেঙ্গুনে তিনি কেবল মুফতী আর খতীবই ছিলেন না। এ কাজের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ধর্ম প্রচার ও চালিয়ে যান। রেঙ্গুনে প্রায় এক যুগ অতিবাহিত করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ খ্রি. ফিরে আসেন।[৫]

১৯৪০ খ্রি. দেশে ফিরে তিনি ঢাকার চকবাজার মসজিদে তাফসীর বর্ণনা অব্যাহত রাখেন। এখানে ও তিনি কয়েক দফা আদ্যোপান্ত কুর'আনের তাফসীর প্রচার করেন। চক বাজার মসজিদে তাফসীর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি ঢাকা রেডিও থেকে ও কুর'আনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে কিছুকাল তাফসীর বর্ণনা করেন।[৬]

অতঃপর মুফতি সাহেব ১৯৪৬ খ্রি. থেকে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ঢাকা 'আলিয়া মাদ্রাসায় তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫০ খ্রি. ঢাকার লালবাগে জামে'আ-এ-কোরআনিয়া

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩; নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; ড. মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

৬. প্রাগুক্ত।

আরাবিয়া মাদ্‌রাসায় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তথায় হাদীস তাফসীরের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এর উপদেষ্টা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।[১]

তাঁর রচনাবলী

১) তাফসীরে সূরা-এ ইউসুফ

২) আহসানুল কাসাস (কুরআনের সুন্দরতম কাহিনী)

৩) মুশকিল আসান

৪) আযহারুল আরব ফিত তারজামাতি ওয়াল ইনশাই ওয়াল আদাবি।

ইন্তিকাল

১৯৭৪ খ্রি. ২ ডিসেম্বর সোমবার রাত ১২.৩৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনও তিনি একটি ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরদিন লালবাগ কিল্লার মাঠে তার জানাযায় বিভিন্ন স্তরে প্রায় লক্ষাধিক লোক যোগদান করেন। তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।[২]

মাওলানা 'আবদুল গফুর (১৯০০-১৯৭৩ খ্রি.)

আনুমানিক ১৯০০ খ্রি. দেবিদ্বার উপজেলার অন্তর্গত গণেশপুর গ্রামের এক দ্বীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফয়েজ উদ্দীন। মুন্সী ফয়েজ উদ্দীন তাঁর উভয় সন্তানকে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি করান। ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রথমে কুমিল্লার এক মাদ্‌রাসায় দু'বছর পড়াশুনা করেন। অতঃপর নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'দারুল 'উলূম দেওবন্দে' গমন করে একটানা পাঁচ বছর সেখানে অবস্থান করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীসের সনদ লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। দারুল 'উলূম দেওবন্দে অবস্থানকালে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সময়ে থানভী (রহ.)-এর দরবারেও যাতায়াত করতেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ধামতী মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ঐ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে বছর খানেক সময় অবস্থানের পর উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ইস্তেফা দিয়ে বাড়িতে এসে ১৯৩৩ খ্রি. কাসেমূল 'উলূম নামে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করে তা'লীম শুরু করেন। তিনি ১৯৭৩ খ্রি. মারা যান। মৃত্যুকালে চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান। তাঁর তা'লীমের ফল হলো:

১) মুফতি আনোয়ার আলী, সাবেক মুহতামিম, রামপুর মাদ্‌রাসা ও প্রতিষ্ঠাতা কাজিয়তলা মাদ্‌রাসা।

২) মাওলানা 'আবদুল জাব্বার, মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, রামকৃষ্ণপুর মাদ্‌রাসা।

৩) মোঃ সৈয়দ আলী, প্রতিষ্ঠাতা আশরা মাদ্‌রাসা (দেবিদ্বার)।

৪) হাফিয মাওলানা আবুল খায়ের, প্রতিষ্ঠাতা, রাণীর বাজার আযীযুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

৫) মাওলানা 'আবদুল লতীফ, মুহাদ্দিস, রামপুর মাদ্‌রাসা।

৬) মাওলানা 'আবদুল কুদ্দুস, প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, মিরপুর মহিলা মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

৭) কারী মু'মিনুল হক (তেগুরিয়া), মুহতামিম, গণীপুর মাদ্‌রাসা।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।

৮) মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী, প্রতিষ্ঠাতা, মদীনাতুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, চান্দিনা।

৯) মাওলানা আমীর উদ্দীন, মুহাদ্দিস, রামপুর মাদ্‌রাসা।[১]

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (১৯০০-১৯৭৩ খ্রি.)

কুর'আন-হাদীস ও ইসলামী দর্শন ও ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক, গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট আধ্যাতিক আলিম ও দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে উপমহাদেশে যে কয়জন প্রখ্যাত মনীষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ইসলামি জ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষানীতির সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম আধ্যাত্মিক পুরোধা হিসেবেই অধিক খ্যাত।[২]

জন্ম

তিনি ১৯০০ বর্তমানে ফেনী জেলা শহরের অদূরে সিলোনিয়া এলাকার নিজামপুর গ্রামে এক শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ আলী আজম ও মাতার নাম রহিমুন্নেসা। তাঁর প্রপিতামহ শেখ মুনীরদ্দীন ফরাযী ছিলেন হাজী শরীয়াতুল্লাহ ফারায়িযী আন্দোলনের সমর্থক।[৩]

শিক্ষা জীবন

বাল্যকালে তিনি তাঁর নানা মুন্সী মোহাম্মাদ হাতেম সাহেবের নিকট কুর'আন শরীফ শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর পিতা শেখ আলী আজম সাহেবের নিকট বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা লাভ করেন।[৪] এরপর ১৯১৪-১৫ খ্রি. আজমী নিজ গ্রামের এক নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রি. দাগন ভুঞা আযীযিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ৩বছর প্রাথমিক আরবী ফার্সি অধ্যয়ন করেন। ১৯২০-২১ খ্রি. তিনি নিজামপুরের চট্রগ্রামে ববুরহাট মাদ্‌রাসায় জামাতে সপ্তম (৭ম শ্রেণি) ও ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ শ্রেণি) পাস করেন। ১৯২২ খ্রি. তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় জামাতে পঞ্চম (৫ম শ্রেণি) বাদ দিয়ে জামাতে চাহারুমে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে জামাআতে উলা আজকের ফাজিল ২য় বর্ষ পাস করেন ১৯২৫ খ্রি.।

১৯৪৫-৪৬ এই দুই বছর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেক বিষয়ের বই, পুস্তক, বিশেষত, কুর'আন-হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।[৫]

কর্মজীবন

মাওলানা আজমীর কর্মজীবন শুরু হয় প্রথমে বালুয়া চৌমুহনী মাদ্‌রাসায় ১৯২৭ খ্রি. অধ্যপনার মাধ্যমে। এরপর ১৯২৮ খ্রি. থেকে ১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন।[৬]

মোট কথা মাওলানা আজমী বহুমুখী গুণ গরিমার মধ্যে সূধী সমাজে তার সর্বশেষ পরিচিতি ছিল একজন প্রথম শ্রেণির শিক্ষাবিদ হিসেবে। তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি এই শিক্ষা সংস্কারের চিন্তা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন।[৭]

---

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

২. মোঃ 'আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩

৩. এ.এস.এম আজিজুল হক আসারী (সংকলন ও সম্পাদনায়), *নূর মোহাম্মদ আজমী* (ঢাকা: ই.ফা.বা. মার্চ-১৯৮৭) পৃ. ১; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৪. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

৫. নূর মোহাম্মদ আজমী আমার জীবনী, পৃ. ৩-৫; এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ই,ফা,,বা-১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৫২৬

৬. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮; এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী প্রাগুক্ত, পৃ-৪; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ-১, (ঢাকা: ই,ফা,বা- ১৯৮৬) পৃ. ৫২৬

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাওলানা আজমী

মাওলানা আজমী শাহ্ ওলীউল্লাহর জীবনাদর্শে অনুপ্রানিত ছিলেন।[২] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার জীবনের ব্রত। তিনি বলেন ইসলামের আদর্শই আমার জীবনের আদর্শ এবং খাঁটি ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণের জন্য জন সাধারনকে উদ্বুদ্ধ করাই আমার লেখার উদ্দেশ্য। আমি মনে করি বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম নেই, অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে দুনিয়া স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হত এবং দুনিয়াতে কখনও শ্রেণি সংগ্রাম সৃষ্টি হত না।[৩]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদের ধারাকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং এমনি করে ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১) যুগ সৃষ্টি নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্ঠ সমাধানের উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদের ধারাকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং এমনি করে ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এমন সবলোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা বিশ্বের দুয়ারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুনাবলী ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আজমী ইজতেহাদ শীর্ষক দুটি জোরালো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় ১৩৬২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। দ্বিতীয়টি আত্ন প্রকাশ করে ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় ১৯৬৫ খ্রি. মার্চ সংখ্যায়।[৪]

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ও মাওলানা আজমী

তিনি নিজে ছিলেন অনেক মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে অসাধারণ অবদান রাখেন।[৫] ১৯২৯ খ্রি. তিনি ফেনী মাদ্রাসায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি একই উদেশ্যে "মাদারিযে আরাবিয়া-কো-নেযাম-এ-তালীম" শীর্ষক ৪৮ পৃষ্ঠার একটি উর্দূ পুস্তিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন যা মাদ্রাসা সংস্কারের জন্য গঠিত মোয়াজ্জম উদ্দীন কমিটি ১৯৪৬ এর নিকট পেশ করেন। তারই সুপারিশে কমিটি ১৯৪৬ খ্রি. মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে বাংলা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতি অর্থনীতিকে ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় তালিকাভুক্ত করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩০ খ্রি. জমিয়তুল মোদাররিসীন নামক একটি শিক্ষক সমিতি গঠন করেন।[৬] এই প্রতিষ্ঠানটি মাদ্রাসা শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে এখন বিদ্যমান। যা সব সময় মাদ্রাসার লেকচারার (সেই সময়ের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস) জনাব কামালউদ্দীন ছিলেন উক্ত জমিয়াতুল মোদাররেসিনের প্রথম সভাপতি।[৭] জমিয়াতুল মোদারবিসীনের মুখপাত্র স্বরুপ তিনি ফেনী থেকে "তালীম" নামক একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৫৫ খ্রি. থেকে ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত এর সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৮]

---

১. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬
৪. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৫. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৬. ড.মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৭. এ.এস.এম. আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৮. ড.মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

সাংবাদিক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী

তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনী শহর শাখার সভাপতি ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির একজন সদস্য ছিলেন।[১] তিনি ১৯৩৭ খ্রি. থেকে আজাদ নবযুগ পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। এরপর মাসিক মোহাম্মদী ঢাকা, মদীনা ইসলামী একাডেমী পত্রিকা ঢাকা, মীনার জাহান নত্ত ঢাকা, ইনসান প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক, মাসিক, ও সাময়িকীতে ইতিহাস বিষয়ক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার মূলক তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।[২]

মাওলানা আজমী বৈবাহিক জীবন

অনেকেই হয়তো মনে করতেন যে, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী চিরমুমার ছিলেন, তিনি যে ১১-১২ বছর কাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সে খবর অনেক বন্ধু-বান্ধবদেরই জানা ছিল না। মূলত তিনি ২৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিয়ের ছয় বছর পর তাঁর গর্ভে একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন। মেয়েটি চার বছর বয়সে কাল জ্বর হয়ে মারা যায়।

আর এক বিবরণী মতে তিনি এগারো বছর কাল বৈবাহিক জীবন যাপন করার পর একাকী হয়ে যান। তার স্বাস্থ্যগত কারনে তিনি স্ব ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দেন। তিনি সম্পূর্ণ খরচ বহন করে নিজেই অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেন।[৩]

রচনাবলী

বাংলা, উর্দু ও আরবী এই তিন ভাষায় তিনি লেখনী পরিচালনা করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সম্পর্কিত রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১) হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা। বাংলা ভাষার এটাই হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে সর্ব প্রথম গবেষণা গ্রন্থ। এতে হাদীস পরিচিতি, হাদীসের ইতিবৃত্ত ও হাদীসের পরিভাষা থেকে আরম্ভ করে উপমহাদেশে হাদীস চর্চা মুহাদ্দিসের জীবনালেখ্য পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি।[৪] বাংলাসাহিত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ডঃ মুহাম্মদ হোসেন এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন "আমার জ্ঞানানুসারে এরূপ হাদীস সম্বন্ধীয় পুস্তক ইহার পূর্বে রচিত হয় নাই"।[৫]

২) মেশকাত শরীফ বঙ্গানুবাদ (ব্যাখাসহ)। প্রসিদ্ধ হাদীস মেশকাত (আরবী) কিতাবটির ব্যাখাসহ বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী। ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ৭ম খণ্ড প্রকাশের পরে বইটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও এডিশনাল বিষয় হিসাবে পাঠ্য।[৬]

ইন্তিকাল

১৯৭৩ খ্রি. ১৬ আগস্ট রাত ৯টার সময় মাওলানা মোহাম্মাদ আজমী নিয়ামপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করাহয়।[৭] মাওলানা আজমী ছিলেন একজন জ্ঞান সাধক, ধর্মভীরু বিশিষ্ট আলিম। শিক্ষাসংস্কারক, গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার।[৮] মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ও অধ্যক্ষ, (সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসা) বলেন মাওলানা আজমী

---

১. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৬. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৭. ড.মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

সাহেব ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ইল্‌মে নবীর জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বাংলা ভাষার যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তজ্জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।[১]

মাওলানা 'আবদুল মজীদ (১৯০১-১৯৮৫ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে ১৯০১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী। বালক 'আবদুল মজীদ স্থানীয় মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় গমন করে ১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৩০ খ্রি. যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল পাস করেন। শামসুল ওলামা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহসারামী ও মাওলানা মুশতাক আহমদ কানপুরী হাদীসের উস্তাদগণের অন্যতম। ছাত্রজীবন শেষ করে মাওলানা 'আবদুল মজীদ ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা ও পশ্চিমগাঁও ফয়েজিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৩৫ খ্রি. কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন দৌলতগঞ্জে বিলুপ্ত প্রায় গাজীমুড়া মাদ্‌রাসাকে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করে এর অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। এ মাদ্‌রাসার বর্তমান নাম দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা। মাওলানা 'আবদুল মজীদ এ মাদ্‌রাসাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মাদ্‌রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি বিলিয়ে দেন। তিনি এখানে ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ খ্রি. যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল শ্রেণি চালু করেন। তাঁর যোগ্যতা ও নিষ্ঠার বদৌলতে অল্প সময়ে এ মাদ্‌রাসা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। মুলত: এখানকার ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর তিনি ১৯৫৭ খ্রি. কামিল (হাদীস) চালু করে এতদঞ্চলের হাদীস শিক্ষার্থীদের আশা পুরণে অনন্য ভূমিকা রাখেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনার ফলশ্রুতিতে কালক্রমে এ মাদ্‌রাসা সারাদেশে হাদীস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে তার কাছ থেকে অনেক ছাত্র ইল্‌মে হাদীসসহ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন:

১) মাওলানা রেজাউল হক, অধ্যক্ষ, রামগঞ্জ 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী।

২) মাওলানা আ.ন.ম. তাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) মাওলানা শাহ মোঃ মহিউদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৪) মাওলানা আবুল হাসান মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, উপাধ্যক্ষ, বোরহান উদ্দীন 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, ভোলা।

৫) মাওলানা মোঃ 'আবদুল কাদের, অধ্যক্ষ, আফসারুল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৬) মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াহীদুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

৭) মাওলানা শরিফ হোসাইন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বড়বাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।

৮) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তদীয়পুত্র।

৯) মাওলানা ছালেহ আহমদ, অধ্যক্ষ, সৈয়দপুর 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।[২]

আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) (১৯০১/১৩২৩হি.-১৩৮০হি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) ১৩২৩ হিজরী সনে পটিয়া থানার চরকানাই গ্রামে 'আলী মুন্সী বাড়ির এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর।

---

১. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; অফিস রেকর্ড, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা; সাক্ষাতকার: মাওলানা শাহ্ মোঃ মহিউদ্দীন, উপাধ্যক্ষ, অত্র মাদ্‌রাসা।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা মুফতী আজিজুল হক ১১ মাস বয়সে পিতৃহারা হন এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁর দাদা ১৩৩৩ হিজরী সনে তাঁকে দীনী শিক্ষার্জনের জন্য জিরি মাদরাসায় ভর্তি করেন। তাঁর মাঝে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিস্ময়কর প্রতিভা পরিদৃষ্টে মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম নিতান্ত স্নেহ ও যত্ন সহকারে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে তাঁর বিশেষ তত্ত্বধান করেন। এভাবে তিনি মাদরাসার অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৩৪৩ হিজরী সনে তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাজাহিরুল 'উলূম সাহারানপুর (ভারত) মাদরাসায় হাদীস, দর্শন, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জ করেন। অতঃপর ১৩৪৩ হিজরী সনে তিনি বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদে মিল্লাত ফকীহুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহ.)-এর সাহচর্যে প্রায় নয় মাস আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

কর্মজীবন

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফয়য ও বরকত লাভ করে ১৩৪৫ হিজরী সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই তিনি ১৩৪৫ হিজরী সনে জিরি মাদরাসায় মুফাস্সির ও মুফতী'র আসন অলঙ্কৃত করেন। এখানে তিনি ১৩৫৯ হিজরী সন পর্যন্ত দীনী খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন।

অতঃপর ১৩৫৭ হিজরী সনে পাটিয়াস্থ জমিরিয়া কাসেমুল উলূম নামে (বর্তমান নাম: আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম) একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র মাদরাসায় তিনি আজীবন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

মৃত্যু

আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) ১৩৮০ হিজরী সনে ১৫ রমযান পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।[১]

মাওলানা শায়খ 'আবদুর রহীম (১৯০৪-১৯৭৩ খ্রি.)

জন্ম

মাওলানা শায়খ 'আবদুর রহীম ১৯০৪ খ্রি. মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জাঙ্গীপুরের নিকটস্থ মোহাম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ ইয়াকুব।[২]

শিক্ষা জীবন

তিনি স্থানীয় মক্তব ও জুনিয়র মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯২৩ খ্রি. হাই মাদ্রাসা ও ১৯২৫ খ্রি. আই.এ পাস করেন। তিনি এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯২৮ খ্রি. তিনি এ বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি শামসুল উলামা মুনাওয়ার আলী রামপুরীর নিকট সিহাহ সিত্তাহ এর পাঠ্যভুক্ত অংশগুলো অধ্যয়ন করেন।[৩]

১৯৩২ খ্রি. তিনি বি. এল ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৩৮ খ্রি. স্যারে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হতে বি.টি পাস করেন। ১৯৪০-১৯৪৩ খ্রি. তিন বৎসর কাল তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদীস-তাফসীরের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেন ও শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

---

১. মুসাফির, *বিদায়ী স্মারক*, আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) (চট্টগ্রাম: আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া, ১৪২২-২৩: ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯৫

২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩. প্রাগুক্ত।

শিক্ষকমণ্ডলী

এদেশে তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে মাওলানা বেলায়েত হোসেন বীরভূমি, মাওলানা ইসহাক বর্দ্ধমানী ও মাওলানা আবুনসর ওহীদ। শামসুল উলামা মুনাওয়ারআলী রামপুরী। এছাড়া দেওবন্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এজাজ আলী, মাওলানা মুফতী শফী সাহেব প্রমুখ তাঁর হাদীসের উস্তাদ। মাওলানা ইদরীস (কান্ধালবী), মাওলানা মিঞা সাহেব সৈয়দ আজগর হোসাইন ও শিব্বীর আহমদ উসমানী তাঁর তাফসীরের উস্তাদ।[১]

কর্মজীবন

শায়খ 'আবদুর রহীমের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩০ খ্রি. ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে। তিনি সেখানে এক বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর বি. এল ডিগ্রি লাভের পর অল্প কিছু দিন তিনি জঙ্গীপুর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করেন। এরপর জঙ্গীপুর হাই মাদ্রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন।

১৯৩৯ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায় পাঠানো হয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের পর দেওবন্দ থেকে ফিরে তিনি ১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস, তাফসীর, আকাইদ ইত্যাদি শিক্ষা দেন।[২]

রচনাবলী

'আরবী ভাষা, 'আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সনদেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্য আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্য রচনা করেন।

১) তাছরীহুল বুখারীর প্রথম খণ্ডের অংশ বিশেষ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন।

২) তাছরীহুল বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের তরজমা ও সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩) ইমাম তিরমিযীর "শামায়েলে-ই-তিরমিযীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর টিকায় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের বরাত, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করেন। এ গ্রন্থে তার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় মেলে।[৩]

ইন্তেকাল

১৯৭৩ খ্রি. ১ মে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ৬৯ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন। আজীমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪]

মাওলানা ছফিউল্লাহ (১৯০৪-২০০৮ খ্রি.)

মাওলানা ছফিউল্লাহ নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর গ্রামের দ্বীনদার মুন্সী পরিবারে ১৯০৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম মানিকজান খানম। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই খুব পরহিযগার ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে পিতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গৃহশিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি তিনি গ্রামের মক্তবে মৌলভী সিরাজুল হক এর নিকট দ্বীনী ইল্ম অর্জন করেন। এরপর তিনি বাসনী আহসানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর বসুরহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পরীক্ষা দিয়ে ১ম স্থানের অধিকারী হন।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত।
৩.প্রাগুক্ত।
৪. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

তারপর তিনি ইসলামী শিক্ষা আর্জন করার জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৩২ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম, ১৯৩৪ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল এবং ১৯৩৬ খ্রি. ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। তিনি ছাত্রজীবনে অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন:

১. মাওলানা জিয়াউল হক, সাবেক অধ্যক্ষ, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

২. মাওলানা ইয়াইহয়া সাহসারামী, সাবেক শায়খুল হাদীস, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩. মাওলানা মমতাজ উদ্দনি, সাবেক মুহাদ্দিস, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রমূখ।

তিনি ১৯৩৬ খ্রি. কলকাতার হাওড়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে ১৯৩৮ খ্রি. পর্যন্ত অবস্থান করার পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর ১৯৩৮ খ্রি. থেকে ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত শেরপুর ফাযিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৪০ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত তিনি ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় যথাক্রমে হেড মাওলানা, শায়খুল হাদীস, উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদ অলংকৃত করেন। তিনি সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাবসহ তাফসীরের কিতাবগুলো পড়িয়েছেন। ১৯৮১ খ্রি. তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনও তিনি ধামতীতেই কাটিয়েছেন। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) প্রফেসর ড. সেকান্দার আলী, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২) মাওলানা হিফজুর রহমান, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩) প্রফেসর ড. 'আবদুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪) মাওলানা বদিউল আলম, মুহাদ্দিস, উত্তর বাড্ডা কামিল মাদ্‌রাসা।

৫) মাওলানা শহীদুল্লাহ, প্রধান মুফতী, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৬) মাওলানা নূরজ্জামান, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৭) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮) মাওলানা মাহবুবুর রহমান আশ্রাফী, মুহাদ্দিস, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্‌রাসা।

৯) মাওলানা দেলোয়ার ইব্‌ন মফিজ, অধ্যক্ষ, ভোলদীঘি কামিল মাদ্‌রাসা।

১০)মাওলানা 'আবদুল সাত্তার, মুহাদ্দিস, সোনইমুড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসা।

১১) মাওলানা আবুল কালাম, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদ্‌রাসা, মহিলা শাখা, ঢাকা।

১২)মাওলানা মোখলেসুর রহমান, হেড মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদরাসা, ঢাকা।

তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দীক-এর হাতে বায়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। কুর'আন-হাদীসে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। এলাকার কুসংস্কার ও নানা প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। মাওলানার সত্যপ্রিয়তা, তাকওয়া, পরহিযগারী এলাকার মানুষের মুখে মুখে প্রবাদে ন্যায় প্রচলিত। তিনি প্রখ্যাত সূফী ছিলেন। আরবী, উর্দূ, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সুমধুর কণ্ঠস্বরে তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার মাঝে আধ্যাত্মিকতার চাপ ছিল। তিনি জীবনে ২ বার পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। তিনি ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ খ্রি. মারা যান।[১]

১. ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা; অফিস রেকর্ড, অত্র মাদ্‌রাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন (রহ.) (১৯০৫-১৯৯৫ খ্রি.)

নাম

শায়খুল হাদীসের পূর্ণ নাম মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন। তবে বড় কাটরা মাদ্‌রাসার এক নম্বর কক্ষে বসতেন বলে তিনি 'এক নম্বর হুযূর' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্ম

তিনি বর্তমান কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দাউদকান্দি থানার কালাসাদারদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন।

বংশ পরিচিত

তাঁর পিতা মুন্সী 'আলীমুদ্দীন একজন একনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দাদা ছিলেন উক্ত থানার সনামধন্য আঞ্চলিক বিচারক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উম্মেদ 'আলী প্রধান। তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন। হজ্জ পালন শেষে স্বদেশে ফেরার পথে জেদ্দা স্টীমার ঘাটে গুরুতর অসুস্থ হয়ে জান্নাতবাসী হন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

শিক্ষা জীবন

শায়খুল হাদীস শৈশবে দাদার সাথে বিচারের বিভিন্ন মজলিসে যেতেন। তিনি সেখানে দাদার অবস্থান, আচরণ, কথা ও অন্যান্য লোকের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে পুলকিত হয়ে তাঁকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতেন। তখন থেকেই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রথম ধাপে পা রাখেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নিজ গ্রাম সংলগ্ন চরগোয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। তাঁর পিতা কালাসাদারদিয়া গ্রাম থেকে চাঁদপুর জেলায় কচুয়া থানার অন্তর্গত পালাখাল গ্রামের উত্তর প্রান্তে তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন।

শায়খুল হাদীস ১৯১৭ খ্রি. পালাখালের মুন্সী রওশন 'আলীর কাছে পবিত্র কুর'আন মজীদ, রাহে নাজাত, মিফতাহুল জান্নাতসহ আরো অনেক কিতাব পড়েন। এরই মাঝে তাঁর পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন। এতে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। অবশেষে তাঁর পিতা ১৯২০ খ্রি. ইহধম ত্যাগ করে পরপারে চলে যান। তাঁকে সেখানেই পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পিতার ইন্তেকালের পর অন্যান্য ভায়েরা তাঁকে ক্ষেত-খামারে কাজের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর অদম্য স্পৃহা ও দুর্বার আকাঙ্খা থাকায় বড় ভাই জনাব 'আবদুল হামীদ-এর সহায়তায় ১৯২৫ খ্রি. কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত সিংগাড্ডা গ্রামের বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা যয়নুল 'আবিদীন-এর কাছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর কাছে উর্দূ, ফারসী ও 'আরবী সাহিত্য তথা দরসে নিযামীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ছয় বছরের কোর্স উর্দূ পহ্‌লী থেকে শর্‌হে জামী পর্যন্ত মাত্র তের মাসে শেষ করেন।

এরপর তিনি ঢাকার নওয়াব বাড়ির প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় জামা'আতে পাঞ্জাম ও চাহারম-এ পড়াশুনা করেন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রি. উভয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় পরপর দু'বছর 'মুন্সী 'আয়নুদ্দীন রোপ্য পদক' অর্জন করেন। তারপর দু'বছর ফাযিল শ্রেণিতে লেখাপড়া করে ১৯৩২ খ্রি. সিলেট সরকারি 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে আসাম-বেঙ্গল বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নম্বরসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শাইখুল হাদীস চূড়ান্ত ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্য ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৩৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত সনদ (ডিগ্রি) লাভ করেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা

সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭) হাদীস পঠন ও পাঠনের জন্য তাঁকে খুসূসী সনদও প্রদান করেন।

উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ

- শায়খুল হাদীস মাওলানা আশরাফ 'আলী (রহ.) (কুমিল্লা)
- শায়খুল হাদীস মাওলানা ইলিয়াস দয়াপুরী (রহ.)
- মুফতী 'আবদুল বারী, মুহতামিম, জামিয়া আশরাফিয়া, সাইনবোর্ড, ঢাকা।
- শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম দা. বা. (বড় কাটারা মাদরাসা)

বায়'আত

দেওবন্দে অবস্থান কালে তিনি শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুলূক ও তাসাউউফের মানযিলগুলো অতিক্রম করে তাঁর একজন বিশিষ্ট শাগরিদ হিসেবে আস্থাভাজন হন।

দেশে ফিরার পর তিনি দীর্ঘদিন হাদীস পাঠদানে মত্য ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯৯২ খ্রি. হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-কে বিশেষ খাবে (স্বপ্ন) দেখেন। এই খাব বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বিশেষ খলীফা মাওলানা ইদ্রীছ সন্দীপী (রহ.)-এর কাছে বায়'আত হতে যান। সেখানে সন্দীপের শায়খুল হাদীসের মুখে এ স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, আমি আপনাকে বায়'আত করতে পারবো না। বরং আপনার সাথে আমি আমার কামরায় কিছু আলোচনা করতে পারি। প্রায় দীর্ঘ ২-৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর তিনি চলে আসেন। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায়নি তিনি বায়'আত গ্রহণ করেছেন নাকি ভিন্ন কোন সুলুকের পরামর্শ করেছেন?

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কুর'আন মজীদ হিফয করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে হিফয করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই তিনি হিফয করার উদ্দেশ্যে 'আলীগড়ের অন্তর্গত মেঞ্জুর নওয়াব বাড়ির হিফযখানায় ১৫ সফর ১৩৫৫ হিজরীতে ভর্তি হন। ১৩ রবী'উসসানী ১৩৫৬ হিজরীতে মাত্র এক বছর দু'মাস সময়ে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ হিফয করতে সক্ষম হন।

কর্মজীবন

তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩৭ খ্রি. ঢাকার নওয়াব বাড়ির ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে প্রায় চার বছর ছিলেন। এরপর ১৯৪০ খ্রি. ডিসেম্বরে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত চরশুবুদ্দি মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি প্রায় আড়াই বছর কর্মরত হেড মাওলানা-এর পদ অলঙ্কৃত করেন। উক্ত মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা সে সময়ে মাদ্‌রাসা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলোতে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন।

অবশেষে তিনি ঢাকা জেলার চকবাজারস্থ হুসায়নিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বছর যাবৎ শায়খুল হাদীস হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে ঢাকার নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করতে থাকেন।

চিন্তা-ভাবনা

শায়খুল হাদীস চকবাজারস্থ হুসায়নিয়া আশরাফুল 'উলূম বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় যোগ দানের পর উর্দূ রোডে কয়েকটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে (পরামর্শ সভা করার জন্য) বাংলাদেশের সকল উলামায়ে কিরামগণকে একত্রিত করে একটি কমিটি বানাবেন, প্রত্যেক জেলায় জেলায় উলামায়ে কিরামের একটি কমিটি থাকবে। চিন্তা ছিল বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামকে এক কাতারে দাঁড় করানো, কোন মসজিদ থেকে ইমাম, মু'আজ্জিনের চাকরি যেতে হলে এই কমিটির মাধ্যমে হতে হবে। কোন মসজিদে ইমাম বা মু'আজ্জিনের চাকরি নিয়োগ দিতে হলে এই কমিটির মাধ্যমেই দিতে হবে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শায়খুল হাদীসের যেমন ছিল বুদ্ধিমত্তা তেমনি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পরামর্শ শেষে তিনি রাতে প্রত্যেক কামরায় খোঁজ-খবর নিতে একজন গুপ্তচর পাঠান, খোঁজ নিয়ে দেখেন, প্রত্যেক কামরাতেই কেউ না কেউ বলাবলি করছে আমি আমার এলাকার সভাপতি হবো, অন্যজন বলছে আমি সেক্রেটারী হবো, অবশেষে শায়খুল হাদীস যখন দেখলেন, সকলেই পদ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে, তাহলে কাজ করবে কে? তাই তিন দিনের পরামর্শ সভাকে দ্বিতীয় দিনের মাথায় ইতি টেনে দিয়ে বললেন, আমি পদ বা অধিপত্তি বিস্তারের জন্য কাজ করিনি, বরং বাংলাদেশের উলামায়ে কিরাম যেন জনগণের হাতে জিম্মি না হয়, তারজন্য কাজ করতে চেয়েছি। কিন্তু আমি নিরাশ। কেননা সকলেই পদ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছেন। তাই আমি আজ এই পরামর্শ সভার সমাপ্ত ঘোষণা করলাম।

স্বভাব-চরিত্র

তিনি জালালী তবী'আতের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধর্ম বিরোধী কোন কাজ দেখলেই তিনি দৃঢ়ভাবে এত প্রতিবাদ করতেন। তা' কে করছে, সেদিকে না তাকিয়ে প্রথমে প্রতিবাদ করে পরে দেখতেন, কে করলো। বড়, ছোট, পদস্থ, কর্মকর্তা বা ইমাম আপামর যে কেউ কোন ভুল করলেই তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, বান্দার হক ও অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর মনোভাবের। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ছিলেন শতব্যস্ত। কিতাব ও বই পুস্তক সংগ্রহ ছিল তাঁর শখের কাজ। প্রতিদিন শেষ রাতে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। তিনি সালাত আদায়ের চেয়ে তিলাওয়াতই করতেন অধিক পরিমাণে। তিনি ১৯৭২ খ্রি. হজ্জ সমাপন করেন।

শায়খুল হাদীস বর্তমান সমাজের উপযোগী ও বাস্তব সম্মত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তাফসীর বর্ণনা

তিনি হাজারীবাগের কুলাল মহল মসাজিদে প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব কুর'আন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করে দীর্ঘ ১৬ বছরে তা' সমাপ্ত করেন।

পাঠদান পদ্ধতি: তিনি ছাত্রের মেধানুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করে পাঠদান করেন।

মাস'আলা প্রদান

তিনি মাস'আলার সাথে মাস'আলা সংক্রান্ত একটি ঘটনাও বলে দিতেন যেন মাস'আলাটি বোধগম্য হতে সহজ হয়।

তাহকীক

ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি বিষয়ের সমস্যা সমাধান পূর্ণভাবে তাহকীক করে নিজে তা' 'আমল করতেন ও অন্যকে করতে বলতেন।

গ্রন্থ রচনা

(ক) মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন।

(খ) মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): মু'জিযা ও দার্শনিক তাৎপর্য: এটি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মু'জিযা সম্বলিত প্রমাণ ভিত্তিক বৃহৎ গ্রন্থ।

(গ) শবে কদর ও শবে বরাত: কদর ও বরাতের রাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বহুল পুস্তক।

(ঘ) সৃষ্টি নহে প্রীতি বন্ধন: এটি খিদমতে খাল্ক্ সম্পর্কিত একটি মূলবান গ্রন্থ।

(ঙ) সুল্লামুল 'উলূম-এর শরাহ্: এটি উর্দূ ভাষায় লিখিত সুল্লামুল 'উলূমের বিস্তারিত ব্যখ্যা গ্রন্থ।

সম্পাদনা

(ক) তাফসীরে আশরাফী: তিনি এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বায়ানুল কুর'আন-এর অনুবাদ তাফসীরে আশরফী-এর সম্পাদনা করেন।

(খ) কুর'আন মজীদের অনুবাদ: তিনি এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত কুর'আন মজীদের বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা করেন।

(গ) সৌভাগ্যের পরশমনি: তিনি ইমাম গাযালী (রহ.) কর্তৃক কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থের মৌলবী 'আবদুল খালেক কর্তৃক অনূদিত সৌভাগ্যের পরশমণি-এর সম্পাদনা করেন।

(ঘ) পরিবার নহে কারাগার: মৌলবী মুজাফ্ফর আহ্মদ কর্তৃক লিখিত পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও এর ইসলাম সম্মত সমাধান মূলক বাস্তবধর্মী বইটির সম্পাদনা করেন।

মৃত্যু

তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে ঢাকার লালবাগ থানার অন্তর্গত হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন ২৫ বাড্ডানগর লেনের নিজ বাসভবনে ১০ মে ১৯৯৫ খ্রি. বুধবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ইহধম ত্যাগ করেন। সে দিন 'আসরের পর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।১ .

মাওলানা এ. করীম খান ফারুকী (১৯০৭ -১৯৭৭খ্রি.)

জন্ম

মাওলানা এ. করীম খান ফারুকী খুলনা জেলার বটিয়াঘাট থানার খায়রাবাদ গ্রামে ১৯০৭ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করনে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি ভারত গমন করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনি হাদীস বিষয়ে (কামিল) সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি খুলনা জেলার ইউসুফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৫ খ্রি. তিনি কলিকাতায় ক্যাথলিক মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আরবী এবং ইংরেজি বিষয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে অবসরকালীনে পর্যন্তদায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র:

১. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ।

২. মরহুম এম. মুমিন উদ্দিন.সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশ।

৩. মৌলভী মোসলেম উদ্দিন আহমদ,পীর, তালিমপুর রূপসা, খুলনা।

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, *মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৯৮), পৃ. ১১-১৩

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

মাওলানা এ. করীম খান ফারুকী উর্দূ এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

ইন্তেকাল: মাওলানা এ. করীম খান ফারুকী ১৯৭৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন (১৯০৮-১৯৭৭ খ্রি.)

তিনি কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন ফেনুয়া গ্রামে ১৯০৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী ইমামুদ্দীন এবং মাতার নাম আমেনা। তিনি স্থানীয় হাওলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর পিতৃ ও মাতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি স্বীয় চাচা মেহেরুল্লার তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা জেলাধীন দারুল 'উলূম বরুড়া'য় ভর্তি হন। তথায় পাঁচ বছর পড়ার পর তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ফাযিল পাস করেন। অল্প বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়েও অতি কষ্টে তিনি লেখাপড়া করেন। এতদসত্ত্বেও এ দারিদ্র্য তাঁর জ্ঞানার্জনের পথরোধ করতে পারেনি। তিনি দাওরা হাদীস পড়ার দুর্বার বাসনায় সকল সংকট উপেক্ষা করে দারুল 'উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং তথা হতে দাওরা হাদীস পাস করেন।

দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার পরপরই মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন নোয়াখালী ইসলামিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, মুক্তগাছা আলিয়া, নেত্রকোনা মিফতাহুল 'উলূম (কওমী) মাদ্‌রাসা ও ময়মনসিংহের ইসলাম (কওমী) মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে হাদীস শিক্ষাদান করেন। সর্বশেষে কুমিল্লার দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা (বর্তমান নাম আল-জামিয়া আল-ইলামিয়া বরুড়া) শায়খুল হাদীস মাওলানা কুরবান তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন উক্ত মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি এখানে কর্মরত থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সিহাহ্-সিত্তার পাঠদান করেন। ১৯৭৭ খ্রি. সিহাহ-সিত্তার মহান পণ্ডিত মারা যান। আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন।[২]

মৌলভী দ্বীন মুহাম্মদ (১৯১০-১৯৮৩ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন বান্দুয়াইন গ্রামে ১৯১০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ছমীর উদ্দীন এবং মাতার নাম নবী জাহান। তিনি পিতা মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন ইল্‌মে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর মামা মাওলানা আফতাব উদ্দীন-এর নিকট চলে যান। মামার তত্ত্বাবধানে তিনি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি পবিত্র কুর'আন শরীফ ও জরুরি মাস'আলাসমূহ শিক্ষা করেন। পরে তাঁকে তাঁর মামার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মুন্সীর হাট মাদ্‌রাসায় ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি বোছতা কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবসমূহ পড়েন। অতঃপর তাঁর মামা বটগ্রাম মাদ্‌রাসাতে পাঠিয়ে দেন। বটগ্রাম মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঝিঙ্গবাড়ী 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। ঐ মাদ্‌রাসায় তখন মুহাদ্দিস ছিলেন মাওলানা মোহসেন। ছাত্র জীবন শেষে কর্ম জীবনে পা রাখার পূর্বে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জনের জন্য শায়খুল আরব ওয়াল আযম মাওলানা সাইয়্যেদ 'আবদুল কারীম-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

লেখাপড়া শেষ করে তাঁর মামা ও উস্তাদ মাওলানা আফতাব উদ্দীন-এর পরামর্শ অনুযায়ী দ্বীনী খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। সর্ব প্রথম তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত খিলা ইউনিয়নের বাতাবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় তা'লীমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাতাবাড়িয়া মাদ্‌রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি রংপুর জেলার শোলমারীতে এক মাদ্‌রাসায় ১৮ বছর যাবত খিদমত করেন।

---

১. গবেষক ০৩/০১/২০২১ তারিখে মাওলানা এ.কারীম খান ফারুকীর সুযোগ্য পুত্র আশিক বিল্লাহ-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. মাওলানা হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২

সেখান থেকে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার সালেয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত সালেয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ ৩৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে খিদমত করে গেছেন। তিনি মাওলানা মাদানী-এর সাথে দ্বীনী সফরে সুদূর রেংগুন গিয়েছিলেন। ৩ বছর যাবত পীর সাহেবের সাথে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং তাঁর বয়ানের অনুবাদ করেন। এ সফর অবস্থায় তিনি আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, শাব্বীর আহমদ উসমানী ও যাফর আহমদ ওসমানী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের সাক্ষাত লাভ করেন।

তিনি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অনর্গল আরবী কথা বলতে পারতেন, ফার্সিতেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বার্ধক্য ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিশোরগঞ্জ সালেয়া মাদ্‌রাসা থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে আসেন এবং ৩০ জুন ১৯৮৩ খ্রি. মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। জানাযার শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।[১]

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রি.)

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.) পাক ভারত-বাংলাদেশের এক অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি ইসলামী জগতের বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমধিক পরিচিত। অধ্যয়ন, গ্রন্থ প্রনয়ন, গ্রন্থ সংগ্রহ, পুস্তক রচনা এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ অধ্যাপনা এ সকল কর্মে আজীবন মশগুল ছিলেন।

নাম ও বংশ পরিচয়

মূল নাম মুহাম্মদ, ডাকনাম আমীমুল ইহসান, তিনি ছিলেন হুসাইন সৈয়দ বংশীয়।[২] তাঁর পিতার নাম মৌলবী সৈয়দ 'আবদুল মান্নান ও মাতার নাম সৈয়দা সাজিদা। পিতৃ-মাতৃ উভয় সূত্রে তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র ইমাম যায়েদের সূত্রে আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অধঃস্তন পুরুষ। বংশ পরিক্রমা হুযুর (স.) বংশ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁর পুরোনাম সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দাদী-আল বারাকাতী; আল সাদী আল-হানাফী। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ অভিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠত্ব্য, শিষ্টাচার, আল্লাহ প্রেম ও বিশ্বস্থতার প্রতিক, আধ্যাত্মিকতা, আত্মশুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনে তাঁরা নিবেদীত প্রাণ সম্পাদনা পরিষদ।

শিক্ষকমণ্ডলী

১) স্বীয় পিতা আবুল 'আযীম মুহাম্মদ 'আবদুল মান্নান

২) স্বীয় চচা সৈয়দ আবুদ দাইয়া

৩) ভাবী শ্বশুর সৈয়দ বরকত আলী শাহ্ বিজওয়ারী পাঞ্জাবী

৪) শামছুল উলামা মহিদ আলী জৌনপুরী

৫) মাওলানা 'আবদুল মাজীদ মুরাদাবাদী

৬) মাওলানা 'আবদুর রহমান কাবুলী

৭) মাওলানা কারামত আলী

৮) শাহ্ পাঞ্জাবী

---

১. গবেষকের একান্ত সাক্ষাতকার: মাওলানা এ.এইচ. এম. নূরুল্লাহ, প্রভাষক, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা ও তদীয়পুত্র।

২. ড. আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, *মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, ৪র্থ, সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০১), পৃ. ৩১

৯) মুনশী মাজেদ আলা ও মুনশী 'আবদুর রশীদ খাঁ

১০) মাওলানা 'আবদুল রইফ দানাপুরী এছাড়াও তাঁর যুগ শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের কয়েকজন হলেন মাওলানা মুস্তাক আহমেদ আলি কানপুরী আল-মাক্কী (মৃ. ১৯৩৯) ইয়াহ সাহসারামী (মৃ. ১৯৫১) বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী (মৃ. ১৯৮৪) এবং মুহাম্মদ হোসেইন সিলেটী (মৃ. ১৯৭৪) প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীগণ।[১]

কর্মজীবন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯৩৩ খ্রি. মুফতি সাহেব কলিকাতস্থ বাসগৃহে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খ্রি. কলিকাতা না-খোদা মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক ও মসজিদের সহকারী ইমাম পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রি. এই মসজিদের দারুল-ইফতার প্রধান মুফতির পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রি. কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর এ মাদ্‌রাসার 'আরবী-ইংরেজি বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে অন্যান্য সহকর্মীসহ তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৫ খ্রি. ঢাকায় মাদ্‌রাসা 'আলিয়ার হেড মৌলবী তথা প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ খ্রি. উক্ত পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ খ্রি. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম খতিবের পদও অলঙ্কৃত করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম ট্রেনিং প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রি. মসজিদের খতীবের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি অসাধারণ মেধা পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্জ পালন করেন।

মরহুম মুফতী সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ধর্মীয় জ্ঞান সাধক। হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় টাইটেল ক্লাসে হাদীস-তাফসীর ও ফিকাহ শিক্ষা দিতেন।

মৃত্যু

১৯৭৪ খ্রি. ২৭ অক্টোবর রোজ রবিবার এ মহান শিক্ষক, ইসলামী পণ্ডিত, পরপারে পাড়ি জমান। তিনি তাঁর ঢাকাস্থ নিজস্ব আবাস সংলগ্ন মসজিদের পার্শ্বে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।[২]

মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী (১৯১২-১৯৯২ খ্রি.)

জন্ম

মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী ১৯১২ খ্রি. বিহার প্রদেশের পাটনা জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকার মক্তবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার সুবহানিয়া মাদ্‌রাসায় (ইলাহাবাদ) ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

সুবহানিয়া মাদ্‌রাসায় (ইলাহাবাদ) মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী কর্মজীবন শুরু করেন। মাওলানা জহিরুদ্দন বিহারীর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন তিনি মাওলানা শাহ্ এ. আজিজ (রহ.) মরহুম পীর, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা-এর সাথে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আখ্রি. এবং সাতক্ষীরা গুণাকরকাটিতে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন গুণাকরকাটি অবস্থান করার পর তিনি

১. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮; ড. 'আবদুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২. ড. 'আবদুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীমুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসায় (সাতক্ষীরা) হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। অত্র মাদ্রাসায় কয়েক বছর শিক্ষাকতা করার পর খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। এর পর তিনি পুনরায় খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসায় (সাতক্ষীরা) ফিরে আসেন এবং হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করে অবসরকালীন পর্যন্তদায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা রেদওয়ানুল কারীম, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

২.মাওলানা আবু তাহের, অধ্যক্ষ, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা,গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৩. মাওলানা আব্দুর রব,সাবেক অধ্যক্ষ, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৪.মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, প্রধান মুহাদ্দিস, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৫.মাওলানা আবু সাঈদ, মুহাদ্দিস, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

৬. মাওলানা নূরুল ইসলাম, আরবি প্রভাষক, খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা, গুণাকরকাটি, সাতক্ষীরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতে: মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী উর্দূ ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

ইন্তেকাল: মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারী ১৯৯২ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ (১৯১২-১৯৭৭ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি: মাওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ ১৯১২ খ্রি. বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার ওলামাগঞ্জ গ্রামে এক সম্ভ্রান্তমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: মাওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি ছারছিনা দারুস্সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ খ্রি. অত্র মাদ্রাসা থেকে (কামিল) হাদিস বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন: কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ছারছিনা দারুস্সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে প্রধান মুহাদ্দিস এবং উপাধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। উপাধক্ষ্য থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

২. মাওলানা রেদওয়ানুল কারীম, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

৩.মাওলানা মোনাওয়ার হোসাইন, প্রধান মুহাদ্দিস, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

৪. অধ্যাপক, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইবি।

৫.ড. এ. মালেক, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।

৬.ড. আলী হায়দার, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।

---

১. গবেষক ১৩/ ০১/২১ তারিখে মাওলানা জহিরুদ্দীন বিহারীর সুযোগ্য পুত্র এম. আমিনুল্লাহ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

৭. ড. এ. এচই. এম ইয়াহইয়ার রহমান, অধ্যাপক, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মাওলানা আবুল খায়ের এ.আজিজ উর্দু ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৪২ খ্রি. মাওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ ওলামাগঞ্জ নেছারুল উলূম আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন।

২. ১৯৬২ খ্রি. খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকাল: মাওলানা আবুল খায়ের এ. আজিজ ১৯৭৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

আল্লামা 'আবদুল লতিফ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) (জ. ১৯১৩-২০০৮খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

'আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) ১৯১৩ খ্রি. সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন ফুলতলী গ্রামে এক প্রখ্যাত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুফতী মাওলানা 'আবদুল মজিদ চৌধুরী (রহ.) ছিলেন একজন স্বনামধন্য ও বিখ্যাত আলিমে দ্বীন ও ফকীহ। তিনি অবিভক্ত ভারতের বাংলা আসামের একজন মশহুর আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন, দেশময় ছিল তার খ্যাতি। তিনি আজীবন মাদ্রাসায় শিক্ষকতাসহ দ্বীনের অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি আমলে সালেহের মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নাফসের মেহনতে উচ্চাসনে আসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

'আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম, সহচর শাহ কামাল (রহ.)-এর বংশের অধঃস্তন পুরুষ বিশিষ্ট বুযুর্গ শাহ আলা বখশ (রহ.)-এর বংশধর। তার বংশ তালিকা হলো শাহ্ মোহাম্মদ আলা বখশ (রহ.) শাহ্ মোহাম্মদ এলাহী বখশ, শাহ্ মোহাম্মদ সাদেক, শাহ্ মোহাম্মদ দানেশ, শাহ্ মোহাম্মদ হিরণ, মুফতী মাওলানা 'আবদুল মজিদ চৌধুরী, শামছুল উলামা আল্লামা 'আবদুল লতিফ চৌধরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) ।

শিক্ষাজীবন

'আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) ফুলতলী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন তাঁর বংশীয় চাচাতো ভাই মাওলানা ফাতির আলী (রহ.)। এ সময় তিনি কারী সৈয়দ আলী সাহেবের নিকট কিরাত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পিতা গঙ্গাজল মাদ্রাসার সুপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারই সুযোগ্য সাগরিদ হাইলাকান্দি রাঙ্গাউটি মাদ্রাসার সুপার প্রখ্যাত ওলী মাওলানা আব্দুর রশিদ তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তাদের নিকট ফুলতলী ছাহেবকে উক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে ১৩৩৬ বাংলায় তিনি উক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৩৩৮ বাংলায় বদরপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ভর্তি হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সুনামের সাথে সমাপন করেন। এরপর তদীয় উস্তাদ ও মুর্শিদ আবু ইউসুফ শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রহ.)-এর নির্দেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জনার্থে ভারতের বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে আলিয়া রামপুরে ভর্তি হয়ে ফনুনাত শেষ করে ইল্মে হাদীসের শিক্ষা হাসিলের লক্ষ্যে মাতলাউউলূমমাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদ্রাসায় সুনামের সাথে অধ্যয়নের পর হাদীসের চূড়ান্ত

১. গবেষক ০৯/০১/ ২০২১ তারিখে খুলনা মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা এম. মোনাওয়ার হোসাইন এ সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে ১৩৫৫ হিজরী সনে সনদ লাভ করেন। উক্ত মাদ্রাসায় তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা খলীলুল্লাহ রামপুরী (রহ.) ও আল্লামা ওয়াজীহ উদ্দীন রামপুরী (রহ.)।

ইল্‌মে হাদীস ছাড়াও তিনি ইল্‌মে তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা হিসেবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুর'আন তিলাওয়াত তথা ইল্‌মে ক্বিরাত। এ বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন তাঁরই পীর ও মুর্শিদ আবূ ইউসুফ শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রহ.)। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিরাতের আরো শিক্ষা গ্রহণ করেন, উপমহাদেশের বিখ্যাত কারী মাওলানা হাফিজ আব্দুর রউফ করমপুরী শাহবাজপুরী (রহ.)-এর কাছ থেকে। শাহবাজপুরী (রহ.) ছিলেন ইরকসুস মিশরী (রহ.)-এর ছাত্র। ১৯৪৪ খ্রি. আল্লামা ফুলতলী সাহেব কিবলাহ (রহ.), মক্কা শরীফ গমন করে কিরআতের আরো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন শায়খুল কুররা আহমদ হিজাযী (রহ.)-এর কাছ থেকে। আহমদ হিজাযী ছিলেন হারাম শরীফসহ তৎকালীন বিশ্বের খ্যাতিমান-কারীগণের উস্তাদ ও পরীক্ষক। যথারীতি তিনি শায়খুল কুররা আহমদ (রহ.)-এর কাছ থেকে ইল্‌মে কিরা'আতের সনদ লাভ করেন ১৯৪৬ খ্রি.।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের প্রারম্ভে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ (রহ.) ১৯৪৬ খ্রি. বদরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৫৪ খ্রি. গাছবাড়ি জামেউল উলূম আলিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে ছয় বছর সুনামের সাথে পাঠদান করেন। তিনি এ সময় ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল হিসেবে গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাযাহ, ইতকান, নূরুল আনোয়ার, আকাঈদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, হিদায়া, জালালাইন প্রভৃতি উঁচু পর্যায়ের কিতাববাদী নিপুণ দক্ষতার সাথে পাঠ দান করেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সপ্তাহে দুদিন ফুলতলী আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল জামাতে হাদীসের পাঠ দান করে গেছেন। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকতার জীবনে তার সুগভীর অনুভূতি ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন অগণিত শিক্ষার্থী।

ইল্‌মে কিরাতের খিদমত

ছাহেব কিবলাহ ভারতের উত্তর প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী রামপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় যখন শিক্ষকতায় নিয়োজিত, তখন তার মুর্শিদ মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রহ.) তাকে বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বদরপুরী ছাহেব উলামায়ে কিরামকে কিরাত বিশুদ্ধ করার জন্য তাকীদ দিতেন। কিরাত শুদ্ধ না হলে নামায হয় না, আর নামায বিশুদ্ধ না হলে কোন ইবাদতই কবুল হয় না, তাই কিরাত শুদ্ধ করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি, উলামা সাধারনের প্রতি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ-এর এক বিশেষ নসীহত ছিল এটি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কিরাতে বদরপুরী ছাহেব সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ ছাহেব কিবলার স্বীয় মুর্শিদ বদরপুরী (রহ.)-এর খিদমতেই কিরা'আতের তা'লীম নিয়েছিলেন। তবে ক্বিরাতে আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ফুলতলী ছাহেবকে ইল্‌মে কিরাতের মহান খেদমতের এক গুরুদায়িত্ব আনজাম দিতে হবে। আর এজন্য তাকে অর্জন করতে হবে এই বিষয়ে আরও উচ্চতর প্রশিক্ষণ। মুর্শিদ কিবলাহর নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রথমে বিশ্ববিখ্যাত কারী শায়খ আহমদ আদদারদীর শাগরিদ মিশরীয় বংশোদ্ভূত, রঈছুল কুররা আহমদ হিজাযী (রহ.)-এর নিকট ক্বিরাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর অনন্য সাধারণ গুণাবলী বা বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা জীবনে ১৮ বছর বয়সে মুর্শিদ থেকে

তরীকতের খিলাফত লাভ আর অন্যটি ছিল রঈছুল কুররা আহমদ হিজাযী (রহ.)-এর ভারত উপমহাদেশের সনদপ্রাপ্ত শীর্ষতম ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা।[১]

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ মক্কা শরীফ হতে ফিরে পুনরায় যথারীতি বদরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদান শুরু করেন। একদিন ছাহেব কিবলাহ ক্লাসে ছাত্রদের দরস দেয়ার সময় সেখানে মাওলানা আব্দুন নূর গড়কাপনী (রহ.) তাশরীফ নিলেন। সমকালীন খ্যাতনামা আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন তিনি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তাকে সমাদরে পাশে বসতে অনুরোধ করে পাঠদানে ব্যস্ত হলেন। ক্লাসের সময় শেষ হলে ছাহেব কিবলাহ তার কুশলাদি ও আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, সর্বসাধারণ তো দুরের কথা এতদঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক আলিমেরও কিরাত শুদ্ধ নয়। তাই ছাহেব কিবলাহ দরসে কিরাতের জন্য অন্তত সপ্তাহে এক ঘণ্টা সময় যেন দেন আমাদের। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ জবাবে বললেন, আমার হাতে সময় একেবারে কম, বিশেষ করে ক্লাসে ছাত্রদের পাঠদানের আগে নিজে ভালভাবে তা দেখে নিতে হয়, তাই সময় দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। এ কথার পর আব্দুন নূর ছাহেব চলে গেলেন।

পরদিন ঠিক একইভাবে উপস্থিত হয়ে এ কথারই পুণরাবৃত্তি করলে ছাহেব কিবলাহ আবারও অপরাগতা প্রকাশ করলেন। তখন আব্দুন নূর (রহ.) বললেন, আমি নিজে থেকে আপনার নিকট আসিনি। বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েই আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি। ফুলতী ছাহেব কিবলাহ তখন স্বীয় মুর্শিদ বদরপুরী (রহ.)-এর নিদের্শ কিনা জানতে চাইলে আব্দুন নূর (রহ.) বললেন, না, আরো বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েছি। ছাহেব কিবলাহর অনুরোধে তিনি বর্ণনা করলেন, 'স্বপ্নে হুজুর (সা.) কে দেখা গেল। আরজ করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুর'আন শরীফের তিলাওয়াত শুনতে চাই। রাসূল তিলাওয়াত করে শুনলেন। আরজ করলাম এই কিরাত কিভাবে শিখব। তখন নবী ডান দিকে ইশারা করলেন। সেদিকে চেয়ে দেখা গেল সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আপনি।' একথা শুনার পর সাথে সাথে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ কেঁদে ফেললেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠিক আছে আমি সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ১২টার পরে নিকটবর্তী আদম খাকী (রহ.) (তিনশত ষাট আউলিয়ার অন্যতম।) এর মাজার সংলগ্ন মসজিদে কিরাতের দরস দেওয়ার ওয়াদা দিলাম। এভাবেই ছাহেব কিবলাহর ইল্‌মে কিরাতের খিদমতের সূত্রপাত। যখনই যে অঞ্চলে যেতেন স্থানীয় ওলামা-মুদাররিসীন কিরাত শিক্ষার জন্য জমায়েত হয়ে যেতেন। ছাহেব কিবলাহ ধৈর্য সহকারে তাদেরকে কিরাতের মশক দিতেন। ফলে সিলেট ও আসাম অঞ্চলের খ্যাতনামা আলিমগণ তাঁর নিকট থেকে বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষা করে উপকৃত হয়েছেন। পবিত্র কালামের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ত্যাগ ও কর্মের বিশালতার কথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ীতে ইল্‌মে কিরাতের দরস প্রথম চালু করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের সুবিধার্থে ছুটির অবসরকালীন রামাযান মাসকে কিরাত শিক্ষার জন্য বেছে নেয়া হয়। উপরন্ত রমাযান মাস কুর'আন নাযিলেরও মাস। প্রতি বৎসর রামাযানে ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ীতে শিক্ষার্থী 'আলিমদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজ খরচে বহন করতে থাকেন। পঞ্চাশ হতে একশত এভাবে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি সকলকে তা'লিম দিয়ে এবং সমগ্র কুর'আন শরীফ নিজে শুনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে তবেই সনদ প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় অন্যান্যা স্থানে শাখা কেন্দ্র অনুমোদন ও একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সদস্যদের অনুরোধক্রমে ছাহেব কিবলাহ'র ওয়ালিদ মুহতারাম মাওলানা মুফতী 'আবদুল মজিদ চৌধুরী (রহ.)-এর নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট। ছাহেব কিবলাহ শুরু থেকেই এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে

---

১. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), *দ্বীনী খিদমতে ব্যক্তিত্ব আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.)* (ঢাকা: আলোর নিশান, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, ২০০৯) পৃ. ৩৫

কেন্দ্রীয় দপ্তর বা বোর্ড অফিস ফুলতলী ছাহেব বাড়ী থেকে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব বিল্ডিং থেকে বছরব্যাপী এর প্রস্তুতি চলে থাকে। বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে এ পর্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মোহাম্মদ ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী। ছাহেব কিবলাহর তাঁর ভূ-সম্পত্তির বিশাল অংশ প্রায় ৩৩ একর এই ট্রাস্টের নামে ওয়াক্ফ করে রেখেছেন। বর্তমানে এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রায় এক হাজার শাখা কেন্দ্র দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধশতাব্দী ধরে যারা ছাহেব কিবলাহ'র নিকট বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষা অর্জন করেছেন তারা সময়ে সময়ে বোর্ডের মাধ্যমে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হয়েছেন। সর্বশেষে ৩১ মার্চ ২০০২ খ্রি. তারিখে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েক সহস্র কারী সাহেবকে সনদ ও পাগড়ী প্রদান করেন।

লতিফিয়া দারুল মুতালাআহ

কুর'আন, হাদীসসহ সামগ্রিক ইসলামিক বিষয়ে, বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার নির্ভর বিষয়াবলী নিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য ছাহেব কিবলাহ স্থান করেছন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার করেছেন। পরবর্তীতে এর নামকরণ হল লতিফিয়া দারুল মুতালা'আ। এখানে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষার দূর্লভ-দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদির সমাহার ঘটেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে ছাহেব কিবলাহ কর্তৃক দেশ-বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত বহু মূল্যবান কিতাবে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারকে উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান গবেষণার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে তিনি চেষ্টা করে গেছেন। জ্ঞান-অন্বেষণ, গবেষণাপ্রিয় উলামা সাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তাদানের জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা। এছাড়া লতিফিয়া দারুল মুতা'আলায় যারা গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন, জ্ঞান চর্চা করবেন, সেই আলিমগণের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং গবেষণা কর্মের আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ছাহেব কিবলাহ তাঁর ভূ-সম্পত্তির একটি অংশ ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন।

হাদীসের খিদমত

ইলমে কিরাতের খিদমতের পাশাপাশি তিনি ইলমে হাদীসের খিদমতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। ইলাহী কিতাব আল-কুরআনকে ভাল ও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে হাদীস শরীফ চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেই উপমহাদেশের প্রখ্যাত দু'জন হাদীস বিশারদ মাওলানা খলীলুল্লাহ রামপুরী (রহ.) ও মাওলানা ওজীহ উদ্দীন রামপুরী (রহ.)-এর নিকট থেকে হাদীস শরীফের সনদ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ১৯৪৬ খ্রি. বর্তমান ভারতের কাছাড়ের বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে সেখানে ইলমে হাদীস শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে তিনি বৃহত্তর সিলেটের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদরাসায় প্রিন্সিপালের পদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের দারস দেন। তাছাড়া সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসায়ও দরস প্রদান করেন। সেখানকার রাস্তাঘাট তেমন উন্নত না থাকায় দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পানি-কাঁদা অতিক্রম করে অনেক কষ্ট সহ্য করে সৎপুর উপস্থিত হয়ে হাদীসে নববীর দারস দিয়েছেন দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ মহান ব্যক্তিত্ব।

গাছবাড়ী ও সৎপুর ছাড়াও তিনি ইছামতি কামিল মাদরাসা এবং ফুলতলী কামিল মাদরাসায় ইলমে হাদীস শিক্ষা দেন। এমনকি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফুলতলী কামিল মাদরাসায় হাদীসে নববীর দারস দেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তিনি হাদীস বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছয়খানা কিতাব তথা বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও ইবনে মাযাহ শরীফ-এর দারস প্রদান করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানে হাদীসের দারস দানকালে নির্দিষ্ট শাগরিদগণ ছাড়াও দেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর দারসে অংশগ্রহণ করে তাঁদের জীবনকে ধন্য মনে করতেন। এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের আশিকে রাসূল, তাজদারে মদীনা (রহ.)-এর মুহব্বতে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর। তাই তাঁর হাদীসের শিক্ষাদান এবং অন্যের হাদীস শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য থাকাটাই

স্বাভাবিক। উর্দু ভাষায় তিনি হাদীসের তাকরীর পেশ করতেন। বর্ণিত হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সবকিছু প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করাই ছিল তাঁর দারসে হাদীসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁর হাদীস শরীফের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই মওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গিয়েছেন। আর যাঁরা বর্তমানে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের অনেকেই তাঁর থেকে হাদীসের সনদ সংগ্রহ করেছেন। ২০০৬ খ্রি. আনুষ্ঠানিকভাবে ৮১৬ জন শাগরিদ এক সঙ্গে হাদীসে নববীর সনদ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর হাদীস শরীফের শাগরিদগণের অধিকাংশই আবার তাঁর নিকট থেকে ইলমে কিরাত ও ইলমে তাসাওউফের বায়'আত গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি একাধারে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, ক্বারী ও আহলে তাসাওউফের শায়েখ। অপরদিকে এই মহান ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইলমের সনদ যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর খিদমত সমকালে সীমাবদ্ধ মনে করলে ভুল হবে; বরং হাদীসে নববীর তাঁর এ খিদমত অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী আগামীতেও প্রভাব ভূমিকা রাখবে। কেননা তিনি দীর্ঘ কর্মময় জীবনে একাধিক হাদীস চর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেগুলোতে যুগ যুগ ধরে চলছে এবং চলবে হাদীসে নববীর দারস ও গবেষণা। আল্লাহর প্রিয় এ বান্দাহর হাদীসের খিদমত শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি; বরং স্বদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা দেশে। তাঁর সরাসরি নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত লন্ডনস্থ মাদরাসা দারুল হাদীস লতিফিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেও কামিল জামাত চালু রয়েছে, প্রতিষ্ঠানেও কয়েক বছর যাবত ইলমে হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাবসমূহের দারস প্রদান করা হচ্ছে।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার দরবারে সনির্বন্ধ গোজারিশ, এই শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামিলের অন্যান্য খিদমতের পাশাপাশি হাদীসে নববীর এ যুগান্তকারী খিদমতসমূহ যেন কবুল করেন, কিয়ামত পর্যন্ত যেন তা তরক্কীর সাথে অব্যাহত রাখেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকামে অধিষ্ঠিত করেন।

রচনাবলী: কর্মময় জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যে ছাহেব কিবলাহ দেশ-জাতি ও মিল্লাতের স্বার্থে তাঁর লেখনী শক্তিকেও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর প্রণীত কিতাবাদির মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে:

১) আততানভীর আলাত তাফসীর
২) মুনতাখাবুস সিয়র: ৩ খণ্ডে প্রকাশিত ঐতিহাসিক সীরাতগ্রন্থ
৩) আনওয়ারুস সালিকীন: তাসাউফ বিষয়কগ্রন্থ
৪) নালায়ে কলন্দর: হামদ, নাত, আধ্যাত্মিক বানীর কিতাব
৫) নেক আমল: দৈনন্দিন
৬) জীবনের আমল

ইন্তেকাল

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কেবলা ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. রোজ বুধবার লাখো অনুসারী রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।[১]

'আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব (১৯১৩ -২০০৮ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

১৯১৩ খ্রি. ঝালকাঠি জেলার বাসন্ডা (বর্তমান নেছারাবাদ) নামক গ্রামে আল্লামা নেছারাবাদী জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় পীর নেছারুদ্দীন (রহ.) নামানুসারে রাখা নেছারাবাদ গ্রামের বাসিন্দা হিসেবেই তাঁকে নেছারাবাদী বলা হয়। নেছারাবাদীর পিতা মফিজউদ্দিন (রহ.) ছিলেন বাহাদুরপুরের পীর বাদশাহ

১. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), প্রাগুক্ত।

মিয়ার (রহ.) খলীফা। পিতামহ কুরবান মুন্সী ইব্ন 'আবদুল আযীয মক্কা শরীফের জান্নাতুল মু'আল্লায় শায়িত আছেন। জনশ্রুতি অনুসারে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে আরব জাহান থেকে ১৭ জন হাদী (পথপ্রদর্শক) এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত আগমন করেন। তাঁদের একজন বরিশালে (ঝালকাঠীতে) বসতি স্থাপন করেন। নেছারাবাদী তাঁরই বংশধর। সুতরাং জন্মসূত্রেই তিনি সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা নেছারাবাদী স্থানীয় পাঠশালা থেকে অতি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করে তারপর ভোলা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (৫ম শ্রেণি/১৯২৫-১৯২৯), ছারছিনা মাদ্‌রাসায় (১৯৩০-১৯৩৭, পঞ্চম-জামাতে উলা) এবং কলিকাতা আলিয়ায় (হাদীস শাস্ত্র পাশ ১৯৪২) স্বীয় শিক্ষাজীবনকে বিস্তীর্ণ করে দেন।

শিক্ষকতা

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেবের কর্মজীবন শুরু হয় ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফিরে স্বীয় পীর ও মুরশিদ শাহ সুফী নেছারুদ্দীন (রহ.)-এর পরামর্শে ১৯৪২ খ্রি. সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বচনভঙ্গি ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার কারণে ছাত্ররা সহজেই তাঁর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হত। তিনি ছাত্রদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান ও আদর্শবান হওয়ার লক্ষ্যে তা'লীম প্রদান করতেন। এক সময় তিনি বোর্ডিং সুপারের দায়িত্বও পালন করেন।

তিনি ছাত্রদের লেখাপড়া ও নৈতিক শাসনের পাশাপাশি ছাত্রদের চিকিৎসাও করতেন। এজন্য তিনি প্রথমে হোমিওপ্যাথিক এবং পরবর্তীতে বায়োকেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন ছারছিনা মাদ্‌রাসায় ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৭ খ্রি. স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন- ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ আমজাদ হোসাইন (রহ.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. আ.র.ম. আলী হায়দার মুর্শিদী, প্রফেসর এম. এ. মালেক, প্রখ্যাত বক্তা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, অধ্যাপক আখতার ফারুক, সুফী মোঃ আব্দুর রশীদ প্রমুখ।

ইল্‌মে মারেফাত শিক্ষা ও বাই'আত

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছারছিনা দরবার ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর সোহবতে যেতেন এবং তাঁর আলোচনা, জিকির-আযকার ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় অংশগ্রহণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর কাছ থেকে চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকার সবক গ্রহণ করেন। আর কারাগারে থাকাকালীন ছারছিনার পরবর্তী পীর (ছাহেবজাদা) শাহ সূফী আবু জাফর মোঃ ছালেহ (রহ.)-থেকে কাদেরিয়া তরীকার সবক গ্রহণ করেন।

নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স ও ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসা

মাসিক নতুন বিকাশ-এর সম্পাদক লিখেছেন-"আল্লামা কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) নিজ বাড়ি ঝালকাঠিতে ছোট-বড় ৪২টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্বীয় শায়খ আল্লামা নেছারুদ্দীন (রহ.)-এর নামে নেছারাবাদে ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। যার মধ্যে নেছারাবাদ সালেহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি।

শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

প্রখ্যাত জ্ঞানসাধক আল্লামা কায়েদ সাহেব জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। নারী শিক্ষার বিস্তারে নিজ বাড়িতে জিনাতুন্নেছা মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত ও

প্রসারিত করতে ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্‌রাসাসহ বেশকিছু হেফজখানা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান তাঁর উৎসাহ, উদ্যোগ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

১) জিরাইল আযীযিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ।

২) কুতুবনগর আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ঝালকাঠী।

৩) উঃ জুরকাঠী আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নলছিটি।

৪) চণ্ডিপুর বাগেরহাট আযীযিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, পিরোজপুর।

৫) জিনাতুন্নেছা আযীযিয়া (বালিকা) আলিম মাদ্‌রাসা, ঝালকাঠী।

৬) জিরাইল মফিজিয়া (বালিকা) দাখিল মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ।

৭) তিমিরকাঠী ফাতেমিয়া (বালিকা) মাদ্‌রাসা, নলছিটি।

৮) বিকনা আযীযিয়া ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা।

৯) পিপলিতা আযীযিয়া নূরানী মাদ্‌রাসা।

১০) রূপাতলী আযীযিয়া নূরানী মাদ্‌রাসা।

১১) রহমানিয়া আযীযিয়া ইয়াতীমখানা, ঝালকাঠী।

১২) গরীবে নেওয়াজ আযীযিয়া কারীমিয়া ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।

১৩) দর্জিবাড়ি আযীযিয়া ছালামিয়া মাদ্‌রাসা (মক্তব ও হেফজখানা)।

এছাড়া তিনি আর্থসামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত জিনাতুন্নেছা আলিম মাদ্‌রাসায় ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

কায়েদ উপাধী

আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) তখন বয়সে তরুণ। তাঁর তারুণ্যদীপ্ত নেতৃত্বে অল্প দিনের মধ্যেই জমিয়তে হিজবুল্লাহ (তৎকালীন নাম 'হিযবুল্লাহ জমইয়াতুল মুজাহিদীন') দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রি. আগেই সারা দেশের সাতশ'র অধিক শাখা-জমিআত প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় তরুণ আযীযের (আযীযুর রহমানের) ধারাবাহিক কর্মসূচী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুশি হয়ে স্বীয় মুরশিদ নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) তাঁকে কায়েদ সাহেব বা মান্যবর নেতা অভিধায় ভূষিত করেন। পীর নেছারুদ্দীন (রহ.) বলতেন, 'আমার কায়েদ বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ'। আজ মূল নাম বাদ দিয়ে কায়েদ সাহেব নামেই তিনি বিখ্যাত। পীরে কামেলের সেই দু'আকে আল্লাহ হয়ত কবুল করে থাকবেন।

ঐক্য আন্দোলন

কায়েদ সাহেব (রহ.) সম্ভাব্য সব ধরনের ঐক্যের ব্যাপারে আগ্রহী এবং উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর রচনা ও কর্ম জীবনের রেকর্ড থেকে কয়েক রকমের ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায়।

১) ইসলামের স্বার্থে গোটা ইসলামী শক্তির ঐক্য।

২) নাস্তিক্যবাদ ঠেকাতে আস্তিকদের ঐক্য।

৩) ভূখণ্ড-ভিত্তিক জাতিসমূহের পারস্পারিক ঐক্য, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে।

৪) দেশকে দুর্নীতে ও সর্বজনস্বীকৃত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের গোটা দেশপ্রেমিক জন তার ঐক্য।

রচনাবলী

কায়েদ সাহেবের চিন্তা ও দর্শনশক্তি দেখে যুগশ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ বলেছিলেন- হুজুর আপনি শুধু কালির আঁচর দিয়ে যান, জাতি তা একদিন স্মরণ করবে।

জুলফিকার আহমদ কিসমতীর মন্তব্য অনুসারে- কায়েদ সাহেব একজন দায়িত্বশীল ও বিষয় সচেতন লেখক। ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনায় তিনি অনেক অবদান রেখেছেন।

আমরা এখানে তাঁর লেখনী, বক্তব্য ও ভাষণের অংশবিশেষ উল্লেখ করলাম:

১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় ও আকায়েদ।

২) ইসলাম ও তাছাওফ।

৩) ইসলামী জিন্দেগী।

৪) ওহাবী ও মওদুদী ভ্রান্ত মতবাদ।

সংকলন

১) খোতবাতে ছালেহিয়া।

২) ইসলামী জিন্দেগীর বুনিয়াদী চল্লিশ হাদীস।

জীবন ও জীবনী

১) মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.)-এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি।

২) ইমামুদ্দীন নোয়াখালভী (রহ.)-এর জীবনী।

শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক

১) হেদায়াতুল মুসলেমীন।

২) জিকরুন্নবী (দ.) [১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড]।

ভাষণ ও ভাষণ-সংকলন

১) ইসলাম ও জিহাদ।

২) ইসলাম ও রাজনীতি।

৩) ইসরাঈলী রাষ্ট্র মুসলমান।

৪) বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্তব্য।

৫) প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ।

৬) ঈমান তত্ত্ব

৭) শরীয়তী বিচার।

৮) মাতা-পিতা ও সন্তানের হক।

৯) দূর্নীতির বিরুদ্ধে তিনটি ভাষণ।

১০) জিয়া সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে নায়েমে হিযুবুল্লাহ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান সাহেবের মতামত।

কারামাত

কারামাত বা খাঁটি ওলি আল্লাহদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে একটি শ্রেণি অস্বীকার কিংবা উপহাস করলেও কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিরাট অংশ এই কারামাতের কথা উল্লেখ হয়ে আছে। তবে এটা সত্য যে কারামাত আল্লাহ সব ওলিকে দেন না। যাদেরকে দেন তাঁদেরকেও সমানভাবে দেন না। কায়েদ সাহেব (রহ.) থেকে দীর্ঘ হায়াতে অগণিত কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। এই কারামাতের কারণেও দক্ষিণবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শী।

ইন্তিকাল

অগণিত ভক্ত-অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিগত ২৮ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি. তারিখ সকাল সাতটা ১০ মিনিটে কায়েদ সাহেব কেবলা (রহ.) ঢাকাস্থ (ফার্মগেট) কমফোর্ট হাসপাতালে ইনতেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রজিউন)। পরদিন ২৯ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি. তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ২টায় তাঁর নামাযে জানাযা নেছারাবাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হুজুর কেবলার সুযোগ্য ছাহেবজাদা মাওলানা খলীলুল রহমান নেছারাবাদী হুজুর। হুজুর কেবলাকে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নেছরাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স সংলগ্ন মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।[১]

খলীফায়ে মাদনী শায়খুল হাদীস মাওলানা তাজাম্মুল আলী জালালাবাদী (রহ.)

(১৯১৪-২০০৬ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, খলীফায়ে মাদানী শায়খুল হাদীস মাওলানা তাজাম্মুল আলী জালালাবাদী (লাউড়ী হুজুর) (রহ.)। তিনি সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা শরাফত আলী (রহ.)।

শিক্ষাজীবন

স্থানীয় মক্তবে আরবী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে সিলেটের দেউল গ্রাম মাদ্রাসায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে কামিল (টাইটেল) পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৪১ খ্রি. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। দেওবন্দের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানে ২ বছর সুনামের সাথে লেখাপড়াকালে উপমহাদেশের সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীস, কুতবুল আলম, আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) শায়খুল আদব আল্লামা এজাজ আলী (রহ.), আল্লামা 'আবদুল আহাদ (রহ.), আল্লাম ইব্রাহীম বলিয়াভী (রহ.) প্রমুখের সাহচর্য লাভে ধন্য হন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে হাদীসের দরস প্রদান ছিল শায়খ তাজাম্মুল আলীর (রহ.) নেশা ও পেশা। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময় পবিত্র হাদীসের খিদমত আঞ্জাম দেন। দারুল উলূম থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানাধীন জামিয়া কাসেমুল উলূম দরগাহে শাহ্ জালাল (রহ.) সিলেট ও বিয়ানিবাজার বাহাদুরপুর মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত ৪০ বছর যশোর মণিরামপুর থানার লাউড়ী রামনগর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মাওলানা আহমদ আলী (রহ.) বাশকান্দির পর (১৯৪৩-৮৩ খ্রি. পর্যন্ত) তিনি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে ২ বছর ঢাকা যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় সুনাম ও দক্ষতার সাথে মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

রচনাবলী

সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আলিম সমাজের দুর্বলতার দিক নিয়ে তিনি ভাবতেন। এসব বিষয় মাথায় রেখে তিনি লেখার কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা বই, গোমর ফাক, এটা মওদুদি-জামা'আতের উপর লিখিত: এছাড়া কবিতাকারে মুনাজাতে মাকবুল, সালাসীলে তাইয়্যেবা নামক উর্দূ কিতাবের বাংলা অনুবাদ, আরো অন্যান্য বই লেখেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর শিক্ষকতার জীবনে অসংখ্য ছাত্র ও শাগরেদ রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে-

- মাওলানা হুসাইন আহমদ বারকুচি,
- শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, এম.পি.,
- মালিবাগ মাদ্‌রাসায় মরহুম কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ,

সিলেট দরগাহ মাদ্‌রাসার, মুহতামিম মাওলানা 'আবদুল হান্নান প্রমুখ।[১]

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)

(১৯১৬-১৯৯৩ খ্রি.)

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) একজন খ্যাতমান হাদীস বিশারদ, কুর'আনের দক্ষ ব্যাখ্যাদাতা ও বিশ্লেষক, ফিকহ শাস্ত্রবিদ, যুগের সংস্কারক, বাতিলের স্বরূপ উদঘাটক, বিদ'আত উচ্ছেদ, সুন্নী মতাদর্শের প্রচারক, সত্য সন্ধানীদের দিশারী, সুদক্ষ ও সুফল সংগঠক, সফল আদর্শ কর্মবীর ও কামিল অলী।[২]

জন্ম ও শৈশবকাল

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা বিভাগের অন্তর্গত হরিপুর জেলার সিরিকোট গ্রামের সৈয়্যদাবাদে সৈয়্যদ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তিনি ছিলেন রসূল (সা.)- এর সরাসরি চল্লিশতম অধঃস্তন পুরুষ।[৪]

শিশুকাল হতেই আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) আধ্যাত্মিক ব্যাক্তিত্বের অনুগত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চর্চা ও অনুশীলন শিশু অবস্থায়ই শুরু হয়। মাত্র দু'বছর বয়সেই তিনি মহান ওলী খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী[৫] এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। এ বয়সে তিনি একবার শিশু সুলভ অভ্যাসে

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

২. মোহাম্মদ 'আবদুল অদুদ, আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.): ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান, (কুষ্টিয়া: ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খণ্ড-৮ম, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর-১৯৯৯), পৃ. ৯১

৩. মুহাম্মদ জানআক মুসাযায়ী, *তাযকিয়া* (পাকিস্তান: রিদওয়ান প্রিন্ট, তা.বি.), পৃ. ৬

৪. শাজরা শরীফ, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া* (পাকিস্তান: দরবারে আলিয়া কদেরীয়া প্রিন্ট , তা. বি.), পৃ. ৩২১

৫. আল্লামা 'আবদুর রহমান চৌহরভী (রা.) হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার হরিপুর শহরে চৌহর শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় তিনি হলেন আলী (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর পিতা ছিলেন খাজা ফকীর মুহাম্মদ একজন বুযুর্গ। ৮ বছর বয়সে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। পবিত্র কুর'আনই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। পাকিস্থানের রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা তাঁর ইসলামী শিক্ষায় বৃহৎ অবদানরই স্বীকৃতি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আরবীতে ৩০ পারা দরুদ শরীফ সম্বলিত মাজমুআ-ই সালওয়াতির রসূল (স.) অদ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি ৮০ বছর বয়সে ১৩৪২ হি. রোজ শনিবার বাদ মাগরিব ইন্তেকাল করেন। দ্র. এম. সেলিম, বাগে সিরিকোট (চট্টগ্রাম: খান সম্পাদিত ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪), পৃ. ৯৫

মায়ের দুধ পান করতে চাইলে এ মহান ওলির নিষেধাজ্ঞায় আর দুধ পান করেন নি।[১] তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় পিতার সান্নিধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ ও ক্যাপটাউনে। তিনি পিতার সাথে ১৯২৪ খ্রি. ৮বছর বয়সে ভারতের আজমীর শরীফে গরীবে নেওয়াজ খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর মাযার যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[২]

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন

তিনি স্বীয় পিতা আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[৩] পিতার সাথে ১৯২৫ খ্রি. নয় বছর বয়সে বার্মায় (মায়ানমার) গমন করেন। ১৯২৭ খ্রি. এগার বছর বয়সে কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতিসহ হিফয সমাপ্ত করেন।

দীর্ঘ ষোল বছর সিরিকোটি (রহ.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বহুমুখী ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে বিদ্যা শিক্ষার স্তরগুলো ও অতিক্রম করতে সক্ষম হন।[৪] তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা বিভাগের অন্তর্গত হরিপুর শহরের রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায়। তিনি এতে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ইলমুন নাহু ওয়াছ ছরফ (ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব) ইলমুল হাদীস, ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিকহ, ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, ইলমুল কালাম, ইলমুল বাদী, ইলমুল মাআনী, ইলমুল বায়ান, ইলমুল ফিকহ, ইলমুল নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইলমুল নুযুল, ইলমুত তাওয়ারীখ ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৫] তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ মুফাস্‌সীরই-কুর'আন জারতুল আল্লামা সরদার আহমদ শাহ লায়ালপুরীর নিকট ধর্মীয় জ্ঞানের দরস গ্রহণ করেছিলেন। জগত বিখ্যাত 'আলিম হাকীমূল উম্মত আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীও ছিলেন তাঁর অন্যতম উস্তাদ। তিনি ২৭/২৮ বছর বয়সে ১৯৪৩/১৯৪৪ খ্রি. এর দিকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর মেধা দিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের খ্রি. শরী'আতের জাহেরী জ্ঞানের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।[৬]

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেই তিনি পাকিস্তানের হরিপুর শহরের হরিপুর রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় কুর'আন ও হাদীসের দরসে দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৭] তিনি ১৯৪২ খ্রি. সর্বপ্রথম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আগমন করেন। এ বছরেই চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মসজিদ আন্দরকিল্লা জামে মসজিদে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৌভাগ্য হয় তারাবীর নামাযে তাঁর মুখে খতমে কুর'আন শুনায়। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে মুসল্লিগণ সীমাহীন মোহিত ও মুগ্ধ হন।[৮] তিনি পিতার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের হরিপুর শহরের সিরিকোট শরীফের বৃহত্তম জামে মসজিদে ওয়াক্তিয়ানামাজের ইমামতি

১. সম্পাদক, *মাসিক তরজমান* (চট্টগ্রাম: দেওয়ান বাজার প্রেস, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ও জুলাই-১৯৯৩), পৃ. ১৭

২. কাজী 'আবদুল ওহাব সম্পাদিত ও গ্রন্থিত, *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ* (চট্টগ্রাম: প্রমিস কম্পিউটার এন্ড মোহনা ম্যানশন, ১ম প্রকাশ, ২১ আগস্ট, ১৯৯৪), পৃ. ২৮

৩. 'আবদুল হালিম আফগানী, *তাযকিরা-ই-আওলিয়া-ই-পাকিস্তান* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স প্রিন্ট, ১২ জুলাই ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ০৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৫. আল্লামা তৈয়্যেব শাহ স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ও ৪৮

৬. এ.এ. জামেয়ুল আকতার আশ্রাফী, মহাত্বে ভরা মহান মনীষা, আওলাদে রাসূল তৈয়্যব শাহ্ (রহ.), মাসিক তরজুমানে সংকলিত পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, মে-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১৬; *আল্লামা তৈয়্যব শাহ স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭. মাসিক *তরজুমানে সংকলিত* পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৬ ইং, পৃ. ২৮

৮. তাজকিরা, প্রাগুক্ত, ১২ জুলাই, ১৯৯৩, পৃ. ৭

করতেন। ১৯৬১ খ্রি. হতে পিতার নির্দেশে এতদাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাতে ইমামতি ও খোৎবা পাঠ শুরু করেন। এ দায়িত্ব ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত পালন করেন।

ইসলামী শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

তিনি ১৯৬১ খ্রি. হতে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকির জন্য প্রতি বছরই বাংলাদেশে আসতেন। তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে শুরায়ে রহমানিয়া সংস্থার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশে এর নাম আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া রাখেন। ১৯৫৬ খ্রি. এ সংস্থার গঠনতন্ত্র রচিত হয়। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা, মসজিদ, খানকা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিক ও সুনির্দিষ্ট কাঠোমোতে পরিচালনা করার প্রয়াস পান।[১]

তিনি একবার জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশে বলেছিলেন ধর্মীয় মাদ্‌রাসা হচ্ছে কোন দেশের বস্ত্র তৈরির কারখানার মত, যাদ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।[২] ১৯৬৮ খ্রি. ঢাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মুহাম্মদপুর কাদিরিয়্যা তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। তার জীবদ্দশায় এটা কামিল হাদীসে উন্নীত হয়। ঢাকায় এ প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে কুর'আন, হাদীস, আক্বাইদসহ সুন্নী মাযহাবের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।[৩] নরশিংদী জেলার মাঝরা নদীর পাড়ে তৈয়্যবিয়্যা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসাসহ বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে। আর এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ তাঁর পিতা, তাঁর সাহেব জাদাদ্বয় আল্লামা সৈয়দ তাহের শাহ ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্, আল্লামা খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ও সংশ্লিষ্ট এলাকার ইসলামী ব্যক্তিত্ব কিংবা তাঁর নামানুসারে করা হয়েছে।[৪]

ঢাকা কায়েৎটুলিস্থ খানকায়ে সৈয়্যদিয়্যা তৈয়্যবিয়্যা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত।[৫] ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত (১৯৮০ খ্রি. ব্যতীত) প্রতিবছরই তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে জশনে জুলুসের ধর্মীয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ জুলুসে শরীক হয় লক্ষ লক্ষ নবী প্রেমিক, ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাজপথ করে তোলে উৎসবমুখর, জাগিয়ে তোলে মানুষের ঈমানী চেতনা ও ঐক্য, প্রকম্পিত হয় বাতিলের হৃদয়, ধুলিস্যাত হয় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের পকিল্পনা, ধর্মীয় চেতনা ও নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ, আকৃষ্ট হয় মানুষ ইসলামের প্রতি।[৬]

ইন্তেকাল ও দাফন

বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ, মহান সংস্কারক, দক্ষিণ এশিয়ার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা সৈয়্যদ তৈয়ব শাহ (রহ.) ৭ জুন ১৯৯৩ খ্রি. সোমবার পাকিস্তান সময় প্রায় সাড়ে নয়টায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হরিপুর জেলার সিরিকোট শরীফে ৭৭ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। সিরিকোটি (রহ.)-এর মাযারের পার্শ্বে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৭]

---

১. তাযকিরা, প্রাগুক্ত, ১২ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৯
২. মোহাম্মদ 'আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৩. কাজী 'আবদুল ওহাব সম্পাদিত ও গ্রন্থিত *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, ২১শে আগষ্ট, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৩৫
৪. মোহাম্মদ 'আবদুল অদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৬. দৈনিক কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ১৪ আগস্ট, ১৯৯৫, পৃ. ১
৭. *মাসিক তরজমান*, প্রাগুক্ত, (ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন-জুলাই, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১, ৮; *দৈনিক পূর্বকোণ*, (চট্টগ্রাম: ৯ই জুন, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১ ও ৮

মাওলানা 'আবদুল হক দেওয়ান (১৯১৮-১৯৯৮ খ্রি.)

মাওলানা 'আবদুল হক ১৯১৮ খ্রি. পিতার কর্মস্থল মাদারীপুর জেলার হাজরাপুর হাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস চাঁদপুর সদর উপজেলার ইব্রাহীমপুর দেওয়ান বাড়ি। কালের আবর্তনে ঐ বাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 'আলিম পরিবারে জন্ম বিধায় নিজ ঘরেই লেখাপড়া শুরু। প্রাথমিক লেখাপড়া করেন কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায়। দেশ বিভাগের পর ছারছিনা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পাস করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষক হলেন:

১) মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী।

২) মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী।

৩) মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনের প্রথমে তিনি মাদারীপুর মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর চাঁদপুর ওসমানিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর চাঁদপুরে 'মোহাম্মদিয়া প্রেস স্থাপন করে দ্বীনী কিতাবাদি ছাপানোর খিদমতে নিয়োজিত হন। ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত চাঁদপুর পুরাতন বাজার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। এ সময় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করেন। এরপর তিনি পাকিস্তান সফরে যান। এরই মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৩ খ্রি. জাফরাবাদ মাদ্‌রাসায় মুহ্‌তামিম নিযুক্ত হন। এ মহান ব্যক্তি ১৯৯৮ খ্রি. ৭ মার্চ শনিবার জাফরাবাদ নিজ বাড়িতে মারা যান।[১]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (জ.১৯১৮-১৯৯৪খ্রি.)

জন্ম: ও পরিচয়

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্য সাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকের যে কজন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন আদর্শরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ১৩১৫ খ্রি. সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এ সম্ভ্রান্তমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

১৯৩৮ খ্রি. তিনি ছারছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গর্ভ রচনাবলী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ততিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কুর'আন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা করেন।

রচনাবলী

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কালেমা তাইয়্যেবা, সুন্নাত ও বিদআত, পরিবার ও পারিবারিক জীবন আল কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, আল কুর'আনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ, আল কুর'আনের আলোকে নবুওত ও রিসালাত, আল কুর'আনে রাষ্ট্র সরকার, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, হাদীস শরীফ (৩য় খণ্ড)। বিশেষ করে তাঁর হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ হাদীস সংকলনের ইতিহাস অন্যতম। মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনাবলীর পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোন জুড়ি

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা মওদূদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুর'আন, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীকৃত ইসলামের যাকাত বিধান (২য় খণ্ড) ও ইসলামের হালাল হারামের বিধান। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা ও ৬০ টির ও উর্ধ্বে।[1]

মাওলনা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ খ্রি. মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ খ্রি. কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশীয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ খ্রি. কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ পার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ খ্রি. তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ১৯৯৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার এই পৃথিবী ছেড়ে চেলে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।[2] আমীন।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী (১৯১৯-১৯৯৫ খ্রি.)

জন্ম পরিচিতি

ইসলামী শিক্ষা জগতের উজ্জল নক্ষত্র আবুল খায়ের মোহাম্মদ আইয়ুব আলী ১৯৯৯ খ্রি. ১ এপ্রিল পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার তেলিখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[2] পিতা হাজী 'আবদুল ওয়াহেদ ছিলেন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রচারক, দানশীল এবং পরহেজগার। মাতা আবিদা খাতুন ছিলেন আদর্শ গৃহিনী ও দ্বীনদার। তাঁদের ছিল তিন ছেলে। এদেরকে দ্বীনী পরিবেশে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট ছিলেন আদর্শ পিতামাতা।[3]

শিক্ষাজীবন

বালক আইয়ুব আলীর শৈশব সংগ্রাম তেলিখালিতেই কাটে। পিতা 'আবদুল ওয়াহেদের নিকট তাঁর পড়ার হাতেখড়ি। গ্রাম্য পাঠশালা হতে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী ড. আইয়ুব আলী প্রতিটি শ্রেণিতে মেধার পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি কলকাতায় গমন করেন এবং তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৩৩ খ্রি. এ মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে আলিম ১৯৩৬ খ্রি. ফাযিল পাস করেন। ১৯৩৮ খ্রি. কামিল (হাদীস) প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

জ্ঞান পিপাসু আইয়ুব আলী সাধারণ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। আজকের দিনে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা আলিম পাস করে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়, কিন্তু তখনকার দিনে এটা ছিল কল্পনাতীত। তিনি ঢাকা বোর্ডের ১৯৪০ খ্রি. উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৩ খ্রি. তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। এ পরীক্ষায় তিনি শুধু বিভাগেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেননি বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ তথা সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কালি নারায়ন স্কলারশীপ লাভ করেন এবং স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন। ১৯৪৪ খ্রি. একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন।

---

১. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৫ প্রকাশ, মার্চ, ২০১২) শেষ কভার পৃষ্ঠা।

২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ মে ১৯৯৮ খ্রি.।

৩. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

কর্মজীবন

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী আজীবন অধ্যপনা ও প্রশাসনিক (শিক্ষা) পদে চাকুরী করেন। তিনি এম.এ. পাস করার সাথে সাথেই ১৯৪৪ খ্রি. ২৪ আগস্ট ঢাকা কলেজে আরবী বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। মাত্র দেড় বছর চাকুরী করে এ একই খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর চাকুরীতে ইস্তফা দেন। এর প্রায় চার মাস পর তিনি হুগলিতে চলে যান। ১৯৪৫ খ্রি. ২৫ জানুয়ারি হুগলিতে রেভিন্যু অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু ধর্মভীরু পিতার চাকরিটি পছন্দ হয়নি। তিনি পুত্রকে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দেন। পিতার একান্ত বাধ্যগত সন্তান আইয়ুব আলী ক্ষণকাল দেরি না করে মাত্র দশ মাসের কিছু বেশি সময় চাকুরী করে ঐ একই সনের ৩ ডিসেম্বর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ৫ ডিসেম্বর ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে আরবী বিষয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর এ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৫১ খ্রি. পিএইচ.ডি করতে মিশরে চলে যান। ডিগ্রি শেষে ১৯৫৫ খ্রি. ৩০ মে দেশে ফিরে আসেন এবং একই কলেজে পুণঃ যোগদান করেন।

তিনি এ কলেজে ১৯৫৫ খ্রি. ২০ জুন হতে ১৯৫৮ খ্রি. ৪ জুলাই পর্যন্ত তিন বছরাধিকাল। ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৮ খ্রি. ৫ জুলাই ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে তিনি রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসায় প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে যোগদান করে। এখানে তিনি ১৯৫৯ খ্রি. ৩ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১১ বছর ১ মাস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৬৯ খ্রি. ৪ আগস্ট খুলনায় দৌলতপুর সরকারী বি.এল. কলেজে ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন-এর মাধ্যমে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে বদলী হন। ১৯৭০ খ্রি. ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অত্র কলেজে তাঁর চাকুরীকাল এক বছর তিন মাস।

১৯৭০ খ্রি. ২৭ অক্টোবর সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে বদলী হন। ১৯৭৩ খ্রি. ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের খিদমত করেন। ১৯৭৩ খ্রি. ২৩ জুলাই ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে বদলী হন। ১৯৭৭ খ্রি. ২৩ মে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. ৩১ মার্চ পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এবং পদাধিকারবলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রার হিসেবে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন।[১]

মৃত্যু

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রবীন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আইয়ুব আলী ১৯৯৫ সনের ১৭ নভেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ২ টা ৩০ মিনিটের সময় ঢাকায় উত্তরাস্থ স্বীয় বাসভবনে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ১৮ নভেম্বর শনিবার বেলা ১০.৩০ মিনিটের সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দুপুর ১.৩০ টার সময় উত্তরা ৩ নং সেক্টর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবিদ 'আলিম ও সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। তাঁকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ২ মেয়ে, জামাতা ও নাতি-নাতনী রেখে যান।[২]

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) (১৯১৯-২০১২ খ্রি.)

বাংলাদেশ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন জননেতা, বুখারী শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক, অর্ধ শতাব্দির অধিক কালব্যাপী বুখারী শরীফ দরস প্রদানে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি প্রেরণা। তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। নিরলস

১. Bio-Data of Dr. A.K.M. Ayub Ali, আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮
২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ মে, ১৯৯৮ খ্রি. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

পরিশ্রম, অদম্য স্পৃহা আর অসীম সাহস নিয়ে তিনি পথ চলছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:–

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তৎকালীন ঢাকা জিলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগনাস্থ লৌহজং থানার ভিরিচ খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্তকাজী পরিবারে ১৯১৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম: আলহাজ্ব এরশাদ আলী। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। ফলে নানা বাড়ীতে নানি ও খালার কাছে লালিত-পালিত হন।[১]

শিক্ষাজীবন

গ্রামের মক্তবে কিছুদিন পড়ার পর সাত বছরবয়সে ব্রাহ্মবাড়ীয়ার জামে’আ ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে ৪ বছর লেখা-পড়া করেন। ১৯৩১ খ্রি. ঢাকা বড় কাটারা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১২ বছর লেখা-পড়া করে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। এ সময়ে আল্লামা যাফর আহমদ উছমানী, আল্লামা রফিক কাশ্মীরী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), হাফেজ্জী হুজুর (রহ.), পীরজী হুজুর ও মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন (১নং হুজুর)সহ প্রমুখ বিজ্ঞ হাদীস বিশারদের কাছে কুর’আন-হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রি. উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের বোম্বের সরত জিলার ডাভেল জামে’আ ইসলামিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (রহ.) প্রমুখের কাছে শিক্ষা লাভ করে। শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বুখারী শরীফের যে আলোচনা করেন, তা তিনি নোট করে রাখেন। পরবর্তী জীবনে এ ব্যাখ্যাই তাঁর জীবনের বিশেষ সম্বল হয়ে উঠে। সর্বশেষ ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে মাওলানা ইদরীস কান্দলবী (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর উস্তাদ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর নির্দেশে ঢাকায় চলে আসেন।[২]

কর্মজীবন

ভারতের ডাভেলস্থ জামে’আ ইসলামিয়ায় উচ্চ শিক্ষা শেষে সেখানে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেওয়ারআহ্বান জানানো হলেও তার মুরুব্বীগণের নির্দেশে ঢাকাস্থ বড় কাটারা মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ মাদ্‌রাসায় দক্ষতার সাথে ১৯৪৬-৫২ পর্যন্তশিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ খ্রি. লালবাগ মাদ্‌রাসায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দরস দেন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে বুখারী শরীফের অধ্যাপনায় ব্যাপ্রিত থাকায় তাকে শায়খুল হাদীস খেতাব দেওয়া হয়। এ সময়েই বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। লালবাগে অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭১ খ্রি. থেকে ২ বছর বরিশাল জামি’আ মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করেন। ৩ বছর সেখানে এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. জামি’আ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া নামে মুহাম্মদপুরস্থ মোহাম্মদী হাউজিং এ একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৮ খ্রি. মুহাম্মদপুরস্থ সাত মসজিদের পার্শ্বে নিজস্ব জমির ব্যবস্থা হওয়ায় জামি’আ রহমানিয়া আরাবিয়া নামে স্থানান্তিরিত হয়। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের, প্রধান মুরুব্বী ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মালিবাগ জামে’আ শরইয়্যায়ও প্রিন্সিপাল হিসাবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। জামি’আ রহমানিয়া আরাবিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসের খিদমত

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক সম্পাদিত *রাহমানী পয়গাম*, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. স্মরণ সংখ্যা। অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২, সংখ্যা ২০৪ পৃ. ৭৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

করেন। তিনি ইতিপূর্বে মালিবাগ জামি'আ শরইয়্যাহ, সিরাগঞ্জের বেতুয়া, দারুল উলূম মিরপুর ১৩ ও নরসিংদী বৌয়াকুড় মাদ্‌রাসা শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়া, মিরপুর-১৪ জামেউল উলূম মাদ্‌রাসা, দারুস সালাম মাদ্‌রাসা, লালমাটিয়া জামে'আ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, সাভার ব্যাংক কলোনী ও বানানী জামি'আ ইসলামিয়া মোহাম্মদিয়া মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। তিনি হাদীসের একজন গবেষক হিসেবে অধ্যাপনার পাশাপাশি সারা দেশেই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হাজির হন। তাঁর বয়ান শুনতে হাজার হাজার লোক জমায়েত হন। তিনি লালবাগ কেল্লা জামে মসজিদ, মালিবাগ শাহী মসজিদ ও আজিমপুর স্টেট জামে মসজিদের খতীব হিসেবেও দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় ঈদগাহেও ঈদের ইমামতি করেছেন বেশ কয়েক বছর। তিনি আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের শরইয়্যাহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।[১]

লেখালেখি

শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর অনন্য অবদান হল, বুখারী শরীফেরে বঙ্গানুবাদ। প্রথমে ৭ খণ্ডে ও বর্তমানে ১০ খণ্ডে সমাপ্ত বুখারী শরীফের এ বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি 'আলিম ও সাধারণ শিক্ষিত সকলের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বুখারী শরীফ অনুবাদ ১৯৫২ খ্রি. পবিত্র হজ্জের সফরে শুরু করেন। ১৬ বছরের কঠোর সাধনায় তা সমাপ্ত করেন। এর অনেক অংশই তিনি রওজা শরীফের পাশে বসে অনুবাদ করেন।[২]

১) ছাত্র জীবনে বুখারী শরীফের উর্দূ ব্যাখ্যা (শরাহ) লিখেন। ১৮০০ পৃষ্ঠার এ বৃহৎ গ্রন্থটি ফজলুল বারী শরহে বুখারী নামে পাকিস্তান থেকে প্রাকশিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে থেকে ও প্রকাশের কাজ চলছে।
২) মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব নামে অনবদ্য এক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে বিষয়ভিত্তিক হাদীসসমূহ অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ের জনক। তাঁর পরিবারে প্রায় সকলেই হাফেজ। এমন কি নাতি-নাতনিসহ তাঁর পরিবারে হাফেজের সংখ্যা প্রায় ৭০ জন।

এ মহান পুরুষ (হিজরী বর্ষ অনুযায়ী) ৯৬ বছরে উপনীত হয়েও নিরলসভাবে হাদীসের দরস এবং দেশের প্রত্যন্তঅঞ্চল থেকে আসা 'আলিম-ওলামা ও সাধারণ লোকদেরকে নসিহত ও দু'আর মাধ্যমে নায়েবে নবীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইন্তিকাল: ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ মহান পুরুষ ৮ আগস্ট ২০১২ খ্রি. বুধবার বেলা ১২.৪০ মিনিটে ইহকাল ত্যাগ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।[৩] আমীন।

মাওলানা মতিউর রহমান (১৯২১-২০০৯ খ্রি.)

জন্ম: মাওলানা মতিউর রহমান ১৯২১ খ্রি. বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার গোলবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

শিক্ষা জীবন: মাওলানা মতিউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসা কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ খ্রি. হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক সম্পাদিত *শায়খুলহিন্দ থেকে শায়খুল হাদীস*, স্মৃতি স্মারক ১৪৩৫-৩৬ হিজরী, পৃ. ২৭৯

কর্ম জীবন: ১৯৪৯ খ্রি. মাওলানা মতিউর রহমান, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় (বরগুনা) অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ১৯৭৪ খ্রি. নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা "মসল্লিবাদি সিনিয়র মাদ্‌রাসায়" (পটুয়াখালী) সুপার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অবসরের আগ পর্যন্ত সুপার পদে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা আব্দুর সাত্তার, সাবেক অধ্যক্ষ, বাগেরহাট পিসি কলেজ।

২. মাওলানা হাবিবুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, বেতমোড় ফাজিল মাদ্‌রাসা, বরগুনা।

৩.মাওলানা আব্দুর রহিম, সাবেক অধ্যক্ষ মোড়লগঞ্জ ফাজিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

৪. মাওলানা এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫.মাওলানা শাহ্ সূফী এ. কাশেম রশিদ আহমদ, মরহুম পীর, আমতলী, মোড়লগঞ্জ বাগেরহাট।

৬. মাওলানা আবু বকর এম. আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

মাওলানা মতিউর রহমান আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. ১৯৭৪ খ্রি. তিনি মুসল্লিবাদ সিনিয়র মাদ্‌রাসা (পটুয়াখালী) প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ১৯৬০ খ্রি. শরণখোলা মঠেরপাড় দাখিল মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।

৩.১৯৬৪ খ্রি. রাজৈর আলিম মাদ্‌রাসা (বাগেরহাট) প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকাল: মাওলানা মতিউর রহমান ২০০৯ খ্রি. ৮ মে ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা আবুল কাশেম রশিদ আহমদ (১৯২২-২০০৮খ্রি.)

নাম ও জন্ম

রশিদ আহমদ। তিনি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ আমতলী গ্রামে ১৯২২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায়, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে তিনি আলিম ও ফাজিল পাস করেন। ফাজিল পাস করার পর ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাহ কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে যোগদান করেন। উক্তপদে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর তিনি আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় সহকারী, মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। পদোন্নতি পেয়ে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষর পদ অলংকৃত করেন এবং ১৯৯০ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন।

---

১. গবেষক ১০/০১/২০২১ তারিখে মাওলানা মতিউর রহমানের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা মুহিবুল্লাহ-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ।

২.মাওলানা এম. সালেহ. অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৩.মাওলানা আবু বকর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

মাও আবুল কাশেম রশিদ আহম্মদ আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা: তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৭৮ খ্রি. শরণখোলায় বিদ্যুতের লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্তেকাল: এ মহান ব্যক্তি ২০০৮ খ্রি. ২২শে জুলাই ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা এম. হাতেম আলী (১৯২৭-২০০৯ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়

এম. হাতেম আলী, পিতার নাম, মরহুম এ. কাদের। তিনি বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার কালমেঘা গ্রামে ১৯২৭ খ্রি. ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি নিজ থানার পাথর ঘাটা মাইনর স্কুলে ১৯৩৫ খ্রি. ভর্তি হন। উক্ত স্কুল থেকে মাইনর পাস করেন (বর্তমান ৬ষ্ঠ শ্রেণি) ১৯৩৭ খ্রি. তিনি চিংড়াখালী মাদ্‌রাসায় (পিরোজপুর) ভর্তি হন। ১৯৪০ খ্রি. তিনি ছারছিনা দারুসসুন্নাহ আলিয়া মাদ্‌রাসা ভর্তি হন। ১৯৪২ খ্রি. আলিম ও ১৯৪৩ খ্রি. ফাজিল পাস করেন। ১৯৪৫ খ্রি. অত্র মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস (কামিল) বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৪৫ খ্রি. আমতলী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট এ সহকারী মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। উপধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় ১৯৮৭ খ্রি. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা এ. কে এম. ইউসুফ, সাবেক নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।

২. মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সাবেক সংসদ সদস্য বাগেরহাট-৪।

৩.মাওলানা বুলবুল আহমদ, সাবেক অধ্যক্ষ, পি সি. কলেজ বাগেরহাট।

৪. মাওলানা এম. সালেহ, অধ্যক্ষ, পাথরঘাটা আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫.মাওলানা আবু বকর আব্দুল্লাহ, অধ্যক্ষ, ইসলামিয়া কামিল, মাদ্‌রাসা মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

৬.মাওলানা এ. হালিম সাবেক অধ্যক্ষ, বি. এম. কলেজ বরিশাল।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মাওলানা এ. হাতেম আলী আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

---

১. গবেষক ২২/০৩/২১ তারিখে তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা নাজির আহমদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১. তিনি ২০০৯ খ্রি. মোড়লগঞ্জ বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২.তিনি ২০০৯ খ্রি. এ. এইচ হাতেম আলী হাসপাতাল নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

ইন্তেকাল: মাওলানা এম হাতেম আলী ২০০৯ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।[২]

পীরে কামেল মাওলানা শায়খ শাহ্ 'আবদুল মান্নান সিলেটী (রহ.) (জ. ১৯২৭ মৃ. তা.বি.)

নাম ও বংশ পরিচয়

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্য নিয়ে ইলমুল ওহীর খেদমতে যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে করেছেন নিবেদতি তাঁদের মধ্যে মাওলানা শাহ্ 'আবদুল মান্নান অন্যতম।

জন্ম

তিনি ১৯২৭ খ্রি. হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার ঐতিহ্যবাহী গুনই (ফকির বাড়িতে) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-আলহাজ্ব শাহ্ শফিক আলী একজন পরহেজগার মুত্তাকী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। মাতা-মালিকজান বিবিও ছিলেন পর্দানশীল, দীনদার ও গুণবতী মহিলা।

প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি ৬ বছর বয়সে গুণই প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়ে ১১ বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপন করেন। পাশাপাশি মক্তবে প্রাথমিক আরবী জ্ঞানও হাসিল করেন। ১২ বছর বয়সে বানিয়াচং এল. আর হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে কয়েক বছর সুনামের সাথে অধ্যয়ন করেন।

'আরবী শিক্ষার গুরু: তিনি ইব্রাহীম সাহেবের তত্ত্বাবধানে আবার নতুনভাবে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ৬ মাসের মধ্যেই তিনি কুর'আন শরীফসহ অন্যান্য প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা অর্জন করেন। ইব্রাহীম সাহেব তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি দেখে উচ্চ শিক্ষা হাসিলের জন্য তাঁকে ও পরিবারকে পরামর্শ দান করেন। তখন তাঁর পরিবারের সদস্যগণ তাঁর উচ্চশিক্ষায় যাত্রার জন্য বিভিন্ন স্থানের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি বানিয়াচং যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি পারিবারিক নানা সংকটের মুখোমুখি হন। তাঁর পিতা-বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক তথা মিরাসদার হওয়ার সুবাদে মিশকাত জামাতে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তাঁকে বিবাহ করিয়ে দেন। পিতা-তাঁকে সংসার পরিচালনার ইঙ্গিত দিলে তিনি এতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় পিতা-তাঁকে পৃথক করে দেন, তবে ঘর, আসবাব, জমি কিছুই দেননি। তখন তিনি নিরূপায় হয়ে মসজিদে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হাত প্রসারিত করে দিলেন। গায়েবী আওয়াজ এল- তোমার রিজিক বানিয়াচং ও দিনারপুরের মধ্যখানে দেয়া হল, তুমি চিন্তা কর না। মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তাঁর সকল প্রয়োজন মেটাতে লাগলেন। তিনি কারো কাছে কিছুই চাননি। ১১ মাসের মধ্যে তিনি ১টি টিনের ঘর তৈরি করে নিলেন। মেহমানদারিতে এ ওলিয়ে কামিল অতুলনীয়। তাঁর বাড়িতে যে কোনো লোক পরিচিত কিংবা অপরিচিত হোক তাঁকে তিনি নাখাইয়ে ছাড়েন না। এমনকি পাশে বসে চামুচ দিয়ে নিজ হাতে মেহমানের থালায় একের পর এক খাবার তুলে দিতে থাকেন। এতে যে কোনো মেহমানই মনে করেন যে, হুযুর আমাকে খুব বেশি মহব্বত করেন।

তিনি ইল্‌মে দ্বীনের খিদমত হিসেবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ

১. গবেষক ২১/০৩/২১ তারিখে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

২. গবেষক ২০১২ খ্রি. ডিসেম্বর মাসের দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

শিক্ষকতা জীবনের ফসল হিসেবে অসংখ্য ইল্‌মে দ্বীনের খিদমতগার ফারেগ হয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে দ্বীনের খেদমতে রত আছেন। তিনি তার পরিবারে ২৬জন 'আলিম ২৫ জন হাফেজে কুর'আন ও ২ জন মুফতীসহ অসংখ্য মুরীদান রেখে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।[১] আমীন।

খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (১৯২৮-২০০৭ খ্রি.)

বংশ পরিচয়

মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদীর পিতা মাওলানা জহুরুল হক, দাদা মুনশী উমীদ রেযা এবং পরদাদা আদেল রেযা। মাওলানা জহিরুল হক পড়াশোনা সমাপ্ত করে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সঙ্গে এসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং থানবীর পক্ষ থেকে খেলাফত ও বায়'আতের ইজাযতপ্রাপ্ত হন।

জন্ম

মাওলানা ওবায়দুল হক সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন বারোঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ ১৯২৮ খ্রি. ২ মে।

শিক্ষাজীবন

তিনি প্রাথমিক পড়ালেখা ঘরোয়া পরিবেশে পিতার নিকট অর্জন করেন। এরপর তিনি সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে অবস্থিত মাদ্‌রাসায় গমন করে মাওলানা শামসুল হক শাহবাগীর নিকট কারীমা পন্দেনামা ইত্যাদি কিতাব পাঠ করেন। মাওলানা উবায়দুল হক এ মাদ্‌রাসাই দুই বছর পড়েন। হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) এর খলীফা মাওলানা আতহার আলী এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর দুই বছর হবিগঞ্জের মাওলানা মুদ্দাসসির আহমদ ও মাওলানা মুসীর আলীর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব পড়েন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন দেওবন্দ থেকে উত্তীর্ণ বিশিষ্ট 'আলিম। অতঃপর তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মুনশী বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত আয়ারগাঁও মাদ্‌রাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন। সর্বশেষ তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। তিনি সেখানে ১৯৪২ খ্রি. কাফিয়া জামা'আতে ভর্তি হন। হিজরী ১৩৬৪ সনে তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদ শুনে তিনি বাড়ী আসেন। এর আনুমানিক দশ-বার দিন পর তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। ইন্তিকালের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি পুনরায় দেওবন্দ তাশরীফ নিয়ে যান। সে সময় তাঁর বাড়ী থেকে দেওবন্দ পৌঁছার ভাড়া ছিল মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা।

মাওলানা উবায়দুল হক হিজরী ১৩৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীস, ১৩৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে তাফসীর এবং ১৩৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে ফনূনাতের কিতাব- হেদায়া আখেরাইন, কাযী মুবারক, সদরা, তাসরীহ, উকদীদাস ও তাওযীহ ইত্যদি কিতাব পড়েন।

দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রতি বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হন। জ্ঞাতব্য যে, প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নাম্বার ছিল ৫০। সে বছর দাওরায়ে হাদীসে প্রায় তিনশ ছাত্রের মাঝে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে

- শায়খুল ইসলাম কুতুবুল আলম মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানীর নিকট পরিপূর্ণ বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ প্রথম খণ্ড অধ্যয়ন করেন।

---

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

- মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াবীর নিট পড়েন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম শরীফ
- মাওলানা এযায আলী আমরূহীর নিকট পরিপূর্ণ আবূ দাউদ, তিরমিযী দ্বিতীয় খণ্ড, শামায়েলে তিরমিযী ও হেদায়া আখেরাইন
- মাওলানা ইদ্‌রীস কান্দলবীর নিকট তাফসীরে বায়যাবী ও তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর
- মাওলানা ফখরুল হাসানের নিকট নাসায়ী শরীফ
- মাওলানা 'আবদুশ শুকুর দেওবন্দীর নিকট ইব্‌ন মাজাহ শরীফ
- মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব সাহেবের নিকট হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা এবং
- মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জলীলের নিকট জালালাইন শরীফ পড়েন।

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে এ ছাড়া আরো যাদের নিকট বিভিন্ন কিতাব পড়েছেন তাঁরা হলেন-

- মাওলানা 'আবদুস্ সামী
- মাওলানা 'আবদুল আহাদ
- মাওলানা বশীর আহমদ
- মাওলানা মেরাজুল হক
- মাওলনা মুহাম্মদ শরীফ
- মাওলানা 'আবদুল হক হক্কানী
- মাওলানা মিয়াজী মুহাম্মদ সাঈদ গঙ্গোহী
- মাওলানা কারী মুহাম্মদ মিয়া
- মাওলানা ইশতিয়াক আহমদ ও
- মাওলানা হাবীবুল্লাহ বিহারী প্রমুখ।

কর্মজীবন

মাওলানা উবায়দুল হক দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনার শেষ বছর ঢাকাস্থ বড় কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা 'আবদুল ওহাব পীরজী হুযুরের আগ্রহে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উস্তাদগণের পরামর্শে বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য আগমন করেন। এ মাদ্‌রাসায় তিনি হিজরী ১৩৬৯ থেকে ১৩৭২ সন পর্যন্ত বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও বায়যাবী শরীফ প্রভৃতি কিতাব পড়ান। পীরজী হুযুর এক পত্রে মাওলানা উবায়দুল হকের তৎকালীন শিক্ষকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শিক্ষকতার চতুর্থ বছর হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে বছর তাঁর হজ্ব করা হয়নি। অবশেষে তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী ও শায়খুল আদব মাওলানা এযায আলীসহ অন্যান্য উস্তাদগণের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গমন করেন। শায়খুল আদব তাঁকে উত্তর প্রদেশস্থ শাজাহানপুরের এক মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর শায়খুল আদব তাঁকে ডেকে পাঠান। অতঃপর তাঁকে মুফতী শফী সাহেব প্রতিষ্ঠিত করাচীর দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় পাঠানো হয়। তিনি সেখানে শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৩ খ্রি. আবূ দাউদ শরীফ ও হেদায়া আখেরাইন ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেন।

অতঃপর মাওলানা আতহার আলী ও মুফতী শফী সাহেবের অনুমতিক্রমে উবায়দুল হককে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে নেজামে ইসলাম পার্টির রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এর অল্পদিন পরই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেয় এবং সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা দিয়ে যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে নেজামে ইসলাম পার্টির সকল তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময় মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার সিনিয়র শিক্ষকের একটি পদ খালি হয়। তাঁকে এ পদে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি তাঁর শায়খ ও উস্তাদ শায়খুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানীর অনুমতি নিয়ে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন।

তিনি ১৯৫৪ খ্রি. থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক, ১৯৬৪ খ্রি. থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত হাদীস বিভাগে লেকচারার, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত তাফসীর বিভাগে এসিস্ট্যান্ড প্রফেসর, ১৯৭৩ থেকে '৭৯ পর্যন্ত এডিশনাল হেড মাওলানা এবং ১৯৮০ থেকে ২ মে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত হেড মাওলনা পদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বছর ফরিদাবাদ এমদাদুল উলূম মাদ্‌রাসায় এবং ১৯৮৬ ও ৮৭ এক-দুই বছর পটিয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দরসী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। ঢাকা আলিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ঢাকার ইসলামপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ থেকে মৃত্যু অবধি ঢাকার মাদ্‌রাসায় ফয়জুল উলূমের শায়খুল হাদীস ও মুহতামিমের শূরার সভাপতি, কুমিল্লা কাসিমুল উলূম মাদ্‌রাসার মজলিসে শূরার সভাপতি এবং হাটহাজারী মাদ্‌রাসা, পটিয়া মাদ্‌রাসা ও সিলেট দরগাহ মাদ্‌রাসাসহ আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ খ্রি. থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সম্মানিত খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[১]

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ–

১) তারীখে ইসলাম (দুই খণ্ড)
২) সীরাতে মুস্তফা
৩) তাসহীলুল কাফিয়া
৪) আযহারুল আযহার শরহে নূরুল আনওয়ার
৫) নশরুল ফাওয়ায়েদ
৬) খোলাসায়ে শরহুল আকায়েদ
৭) আস-সেকায়া আলা শরহিল বেকায়া
৮) শী'আ-সুন্নী ইখতেলাফ
৯) শরহে শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া
১০) কুর'আন বুঝিবার পথ
১১) কুর'আনে হাকীম আওর হামারী যিন্দেগী।

মৃত্যু

তিনি বিগত চৌদ্দশ আটাশ হিজরীর চব্বিশে রমযানুল মুবারক (মোতাবেক ৬ অক্টোবর' ০৭) শনিবার আজিমপুরের নিজ বাসভবনেই ইফতার করেন। ধানমন্ডিতে তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের বাসায় রাতের খাবারের দাওয়াত ছিল। তিনি সেখানে খাওয়া দাওয়া করেন। বাসায় ফেরার সময় হঠাৎ করে তিনি গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক পৌনে এগারটা গ্রীন রোডের ল্যাব এইড ক্লিনিকে তাঁকে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ধারণা মতে, তিনি পথেই পরম প্রিয়তম মহান প্রভূর নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন বেলা তিনটায় জাতীয় ঈদগাহে তাঁর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ইমামতি করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আলহাজ্জ মাওলানা আতাউল হক। এরপর আজিমপুর কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২]

১. মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, প্রাগুক্ত।

২. মাওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, জাতীয় খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (র) স্মরণে '*আকাশ ছোঁয়া মিনার* (ঢাকা: রে প্রিন্টার্স, ২০০৮), পৃ. ৩২-৪০

মাওলানা সওকাত আলী (১৯২৯-২০০৭ খ্রি.)

জন্ম

মাওলানা সত্তকাত আলী খুলনা জেলার তেরোখাদা থানার বামনডাঙ্গা গ্রামে ১৯২৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি উদয়পুর মাদ্‌রাসায় (বাগেরহাট) ভর্তি হন। অত্র মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি ভারতস্থ সাহারানপুর মাদ্‌রাসায় (দিল্লি) ভর্তি হন এবং দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। খুলনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর শিক্ষাকতা করার পর তিনি জামে'আতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মুহতামিম (অধ্যক্ষ) পদে যোগদান করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর যাকারিয়া মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এরপর এখান থেকে তিনি আবার রায়েল মহল কওমিয়া মাদ্‌রাসায় (খুলনা) মৃত্যুর আগ পর্যন্তপ্রধান মুহাদ্দিস পদে হাদীসের খিদমত করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ।
২. মাওলানা সাব্বির আহমদ, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।
৩. মাওলানা হুমায়ুন কবীর, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্‌রাসা, খুলনা।
৪. মাওলানা খালিলুর রহমান, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।
৫. মাওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।
৬. মাওলানা এ. বাশার, মুহাদ্দিস, জামে'আ ইমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্‌রাসা, মনিরামপুর, যশোর।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মাওলানা সওকাত আলী উর্দূ এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

মাওলানা সওকাত আলী "জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসাটি (খুলনা) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটিতে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ৪০ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ১২ শতাধিক।

ইন্তেকাল: মাওলানা সওকাত আলী ২০০৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী (১৯৩২-২০০৭ খ্রি.)

হাদীস চর্চার বর্তমান যে সকল 'আলিম স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী অন্যতম। তিনি কর্মজীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি হাদীস চর্চায় নিয়োজিত আছেন। একাধারে তিনি হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, গবেষণা, বক্তৃতা জাতীয়

১. গবেষক ২৭/০১/২১ তারিখে জামে'আ ইসলামিয়া 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা খুলনার নায়েবে মুহতামিম মাওলানা রফিকুর রহমান-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও গবেষণাধর্মী পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি জামে'আ হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা-এর শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব 'আবদুল গফুর। তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন হরিনখাইন গ্রামে ১৯৩২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি নিজ গ্রামে জিরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখপড়া করেন। এরপর তৎকালীন সুলতান মাস্টার সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জিরি ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসায় শরহে জামি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গমন করেন ১৩৬৮ হি. সনে দাওরায়ে ইফতা, পরে দাওরায়ে হাদীস ও ১ বছর ফুনুনাতের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনের সকল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে নিজ জন্মস্থান চট্টগ্রামে আসার সংকল্প করলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত আলিম গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুর (রহ.) ইসলামাবদীকে সরাসরি নিজ মাদ্‌রাসায় আনার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা ইসলামাবদী গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিন মাস অধ্যাপনার পর ঢাকার বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এখানে তিনি দুই বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামের মাওলানা আব্দুর রহমানের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। চট্টগ্রামস্থ পটিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি তিন বছর শিক্ষকতা করেন।

তিনি নারায়নগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে ১৯৫৭ খ্রি. জামি'আ আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসার যত উন্নয়ন হচ্ছে তা সবই মাওলানা ইসলামাবদীর ক্রয়কৃত জমির উপর। পর্যায়ক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি দাওরা বা টাইটেল-এ উন্নীত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বিজ্ঞ আলিম শিক্ষা লাভ করেছেন।

এরপর তিনি চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নবাববাড়ী জামে মসজিদে খতিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। নবাববাড়ী জামে মসজিদে খতিব থাকা অবস্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, ফরিদাবাদ জামে'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম মাদ্‌রাসা ঘোড়াশাল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামে'আ হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্‌রাসার প্রধান শায়খুল হাদীস রূপে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: মাওলানা সৈয়দ আমহদ, মাওলানা মুফতী নুরুল হক, শায়খুল হাদীস মাওলানা 'আবদুল ওদুদ (রহ.) সন্দীপী, মাওলানা ইসমাইল সাহেব, মাওলানা সালেহ আহমদ হরিনখাইন, শায়খুল ইসলাম কুতুবুল আলম মাওলানা হাফেজ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। শায়খুল আদব ও ফিকাহ মাওলানা ইজাজ আলী, মাওলানা বশীর আহমদ প্রমুখ বিজ্ঞ উস্তাদগণের নিকট থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। দেশে-বিদেশে তাঁর অগণিত ছাত্র বিভিন্নভাবে ইল্‌মে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরহুম মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী, মাওলানা সুলতান যওক, মাওলানা অহিদুজ্জামান, হাফিজ জাফর প্রমুখ।

মাওলানা ইসলামাবাদী ইল্‌মে হাদীসের খিদমত ও চর্চায় একাধারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান, বিভিন্ন আলোচনা,সভা, সেমিনার, সেম্পুজিয়াম, পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী লেখনীর মাধ্যমে টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা পরিচালনা করে ইল্‌মে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে-

১) মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১ ও ২য় খণ্ড, অনুদিত, ই.ফা. বা।
২) নাসাঈ শরীফ ১ ও ২য় খণ্ড, অনুদিত, ই. ফা. বা।
৩) ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ
৪) মূল্যবান ভাষণ
৫) জুবদাতুল মাকামাত

৬) হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী
৭) বিসমিল্লাহর তাৎপর্য
৮) মহিলাদের চল্লিশ হাদীস
৯) কিতাবুল আছকার
১০)নবী করীম (সা.)-এর অসিয়্যত
১১) উসামা (রা.)
১২)হায়াতে মালেক
১৩) আবূ হুরায়রা
১৪) খুবাইব ইব্ন আদী (রা.)
১৫)মাসআব ইবন ওয়ায়ের (রা.)
১৬) জায়েদ ইব্ন হারীসা
১৭)আরাফাতের মুনাজাত
১৮) বরাতে রাত বরাতের মাস
১৯)দরসে শামায়েলে তিরমিযী
২০) মোসলেহাতে তিরমীযী
২১)দরসে ইজাজী
২২) দরসে মাদানী প্রভৃতি।

সফর ও ইনতিকাল

মাওলানা ইসলামাবাদী ইরাক, ইরান, সৌদি 'আরব এবং সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। বহুমুখীগুণের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব ২০০৭ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[১]

মাওলানা আবদুর রশীদ ফয়েজী (১৯৩৩-১৯৯৭ খ্রি.)

তিনি ১৯৩৩ খ্রি. কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলীম উদ্দীন। প্রথমে তিনি স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি গ্রামের ফোরকানিয়া মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁকে আনুমানিক সাত বছর বয়সে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান জামি'আ ইসলামিয়া মুযাফফারুল 'উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি প্রাথমিক উর্দূ, ফার্সিসহ বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়ন করার পর দেবীদ্বার উপজেলাধীন রামপুর কাওমী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে নাহু-সরফের বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ে আরবী ব্যাকরণে অত্যন্ত যোগ্যতা অর্জন করেন। দিন দিন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মেধার অসাধারণ বিকাশ ঘটতে থাকে।

লেখাপড়ার আরো উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে তিনি কুমিল্লাস্থ কাসেমুল 'উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানেও অতি সুনামের সাথে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। সেখানে তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ মাধ্যমিক ও ইল্মে হাদীসে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইসলামী বিদ্যাপীঠ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। গভীর চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। দাওরায়ে হাদীস সমাপ্তির পর তিনি প্রাইভেট মা'কূলাত বা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ চার বছর ব্যয় করে তিনি তর্কশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

দারুল 'উলূম হাটহাজারীতে শিক্ষাপর্ব সমাপ্তির পর আঠার শতকের শেষার্ধে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় গমনকরেন। কুর'আন ও হাদীসের আরো উচ্চতর শিক্ষা

১. গবেষক ০৮-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখে গবেষক তাঁর জামাতা মাওলানা ইলিয়াস (দা. বা)-এর সাথে সাক্ষ্যাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

হাসিলের লক্ষ্যে প্রথমে হাদীস তারপর তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন। দু'টি বিভাগে তিনি চার বছর যাবত লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। এ সময় তিনি ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও আত্মনিয়োগ করেন। এখানে ইল্মী, আখলাকী, তাহযীব-তামাদ্দুনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে কিশোরগঞ্জ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে কিছুকাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাঠদানের পর রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ বড় কাটারা আশরাফুল 'উলূম মাদ্রাসায় মহাপরিচালক মাওলানা 'আবদুল ওয়াহহাব (পীরজী হুজুর)-এর বিশেষ অনুরোধে সেখানে উস্তাদ নিযুক্ত হন। মানতিক, হিকমত, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষাদান করেন। এ সময় তিনি মাদ্রাসার জেনারেল শিক্ষা সচিব ছিলেন। এক সময় তিনি মাদ্রাসার সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে নিযুক্ত হন। বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার সকল হাদীসগ্রন্থ পর্যায়ক্রমে পাঠদান করেন। তাফসীরে বায়যাবী ছিল তাঁর নিয়মিত দরসের বিষয়। তিনি বড় কাটারা মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম মুফতিয়ে আযম মাওলানা ফয়যুল্লাহ (রহ.)-এর খিলাফত লাভ করেন। কিছুদিন পর বড় কাটারা মাদ্রাসা থেকে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তিনি অব্যাহতি নিয়ে জন্মস্থান মুরাদনগর এসে নিজ বাড়িতেই মসজিদসহ একটি নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসার স্বনাম ধন্য মুতাওয়াল্লী আলহাজ্ব কাজী শাহ্ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ (সংসদ সদস্যও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) -এর অনুরোধে তিনি সর্বপ্রথম দরসে হাদীসের সূচনা করেন। এখানে ৮/১০ জন ছাত্রকে দাওরায়ে হাদীসের কিতাবাদি পড়াতে আরম্ভ করেন। অতঃপর এক সময়ে তিনি জামি'আ ইসলামিয়া মুযাফ্ফারুল 'উলূম মাদ্রাসায় শায়খুল হাদসি হিসেবে নিযুক্ত হন। মাওলানা আবদুর রশীদ এখানে বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার প্রায় সব কিতাব পড়াতেন বলে জানা যায়। তিনি হাদীস ও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলো হচ্ছে-

১) জযবায়ে মা'রিফাত
২) তাফসীরে বায়যাবীর উর্দূ শরাহ
৩) শরহে কারীমা
৪) কাশফুল আসরার শরহে ফান্দেনামা
৫) সলাতুত তাসবীহ (উর্দূ)
৬) সলাতুত তাসবীহ (বাংলা)
৭) তোহফাতুল মাযার
৮) তোহফাতুল মোমেনীন।

১৯৯৭ খ্রি. ৬৫ বছর বয়সে তিনি নিজ বাড়িতে মারা যান। মুরাদ নগরের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৮ ছেলে ৪ মেয়ে ও ২ স্ত্রীসহ অগণিত ছাত্র ও মুরিদ রেখে যান।[১]

মাওলানা 'আবদুল আউয়াল (১৯৩৩-১৯৯২ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ পয়াগাছা ইউনিয়নের মইশাইর গ্রামের অধিবাসী মাওলানা 'আবদুল আউয়াল ১৯৩৩ খ্রি. জুলাই মাসে এক সুভাক্ষণে তাঁর মাতুলালয় বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবুল খায়ের। তাঁর পিতামহ হাফিয 'আবদুল্লাহ শুধু হাফিযই না বরং উঁচা মাপের একজন আলিম ও সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতামহ মাওলানা 'আবদুল আযীয প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। সুতরাং পিতৃ ও মাতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

---

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, *বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চা* (১৯০১-২০০০ খ্রি.) অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি, থিসিস (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর-২০০৯ খ্রি.)।

তার স্বীয় মাতা রহীমা খাতুনের নিকট সর্বপ্রথম লেখাপড়া শুরু করেন। অতঃপর ইমদাদুল 'উলূম মাইশাইর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি নব নির্মিত উক্ত মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। ছোটবেলা থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ইমদাদুল 'উলূম মাইশাইর মাদ্‌রাসায় চাচা মাওলানা আবুল কাশেম শেখজীর নিকট শিক্ষার্জনের পর তাঁর অনুমতি ক্রমে 'আবদুল আউয়াল তাঁর পিতার কর্মস্থল নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে প্রতিটি শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫১ খ্রি. আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ খ্রি. উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন। নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দেশের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত ছিল। নোয়াখালী থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করার পর ফেনী 'আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৫ খ্রি. কামিল পরীক্ষা দিয়ে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন-

১) মাওলানা গিয়াস উদ্দীন।
২) মাওলানা ফজলুল করীম।
৩) মাওলানা আবদুস সুবহান।
৪) মাওলনা মুবারক।
৫) মাওলানা উবাইদুল হক।
৬) মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।
৬) মাওলানা মুহিব্বুর রহমান প্রমুখ খ্যাতনামা ওলামায়ে কিরাম।

অতঃপর ১৯৫৭ খ্রি. ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফিক্‌হ গ্রুপে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাযুল এবং তাফসীরুল কুর'আনের উপর বিশেষ রিচার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তৎকালে ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার কামিল শ্রেণির শিক্ষক মণ্ডলী ছিলেন–

১) মাওলানা মুফ্‌তী আমীমুল ইহসান।
২) মাওলানা মুফ্‌তী দ্বীন মুহাম্মদ।
৩) মাওলানা 'আবদুর রহমান কাশগড়ী।
৪) মাওলানা জামীল আনসারী প্রমুখ দেশবরেণ্য মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন ও ফুকাহাগণ।

শিক্ষাসমাপ্তির পর তিনি কুমিল্লা জেলার বড়শালঘর সৈয়দপুর মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর চাঁদপুর জেলাস্থ ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ হিসেবে সুখ্যাতির সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন । তাঁর পাঠদান পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের অধিক কাল তিনি ইল্‌মী খিদমত করে গেছেন। তাঁর রচিত কিতাব দু'টি হচ্ছে- ১. আল-এজ'আন ফী শারহিল ইতকান ২. আউনুল ওয়াদুদু ফী তাকবীরে আবী দাউদ।[১] ১৯৯১ ও ৯২ খ্রিব্দের পর তাঁর মাতা ও ভ্রাতার মানস্পটে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত হানে। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৯৯২ খ্রি. ৮ আগস্ট তিনি মারা যান। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দু' ছেলে, দু' মেয়ে এবং অসংখ্য ভক্ত ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান।[২]

মাওলানা 'আবদুল মতিন (১৯৩৪-১৯৯৭ খ্রি.)

মাওলানা 'আবদুল মতিন ১৯৩৪ খ্রি. কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন মোবারকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী আলী নোয়াব মজুমদার অত্যন্ত ধর্মপ্রিয় মানুষ ছিলেন।

১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; মুহাম্মদ হারুন আজীজি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
২. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

প্রাথমিক জীবন শেষ করার পর নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন আইটপাড়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। সেখান থেকে ইল্‌মে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য মুফতিয়ে আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেখল মহিউস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। এরপর সর্বপ্রথম তাঁর ওস্তাদ মুফতিয়ে আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বহু সাধনার পর মুফতি তাঁকে খিলাফত দান করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর সর্বপ্রথম তিনি ধর্মপুর মাদ্‌রাসায় দরস দেন। এরপর আরো অনেক মাদ্‌রাসায় দ্বীনী খিদমত করেছেন। তন্মধ্যে সিঙ্গরিয়া মাদ্‌রাসা, সেনবাগ উপজেলাধীন কানকির হাট মাদ্‌রাসা ও ছাতারপাইয়া মাদ্‌রাসা ইত্যাদি অন্যতম। অতঃপর চলে যান ওলামা বাজার মাদ্‌রাসায়, সেখানে ২ বছর মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের দরস দেন। অতঃপর ফেনী জামি'আ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জামি'আ পরিচালনার দায়িত্বে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। এরপর বাড়ি এসে দারুল 'উলূম ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বহুছাত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে যোগ্য আলিম হয়েছেন। যাদের পিছনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁদের কয়েকজন হলেন:

১) মাওলানা মুয়াযযম হোসাইন, বরুড়া দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা।
২) মাওলানা লোকমান আহমদ, মুহতামিম, ওয়াসিকপুর মাদ্‌রাসা, নাঙ্গলকোট।
৩) মাওলানা আবদুর রহমান, মুহতামিম, আমানতপুর মাদ্‌রাসা।
৪) মাওলানা যায়নুল আবেদীন, মুহতামিম, ওয়াসিকপুর মাদ্‌রাসা, বেগমগঞ্জ।

মাওলানা 'আবদুল মতিন জীবনের বিরাট একটি অংশ মানুষের হিদায়েতের লক্ষ্যে ওয়ায-নসীহতের জন্য কাটিয়েছেন। সর্বস্তরের মানুষের তিনি খোদা ভীতির কথা বলতেন এবং অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য নসীহত করতেন। যেমন- সেনবাগ উপজেলাধীন পরিকোট গ্রামে মাওলানা মুমতাযুল করীম-এর অনুরোধে এক যুগেরও অধিক সময় বুখারী শরীফের তাফসীর পেশ করেছেন। এছাড়াও তিনি নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন ডুবাই বাজার মসজিদে বহু বছর যাবত তাফসীর পেশ করেছেন। তাঁর তাফসীরের বিরাট পাণ্ডুলিপি এখনো তাঁর বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। এ বুযুর্গ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মোবারকপুর দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় আমরণ খিদমত করে যান। অতঃপর ১৯৯৭ খ্রি. ১৫ ডিসেম্বর রোজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।[১]

মাওলানা শামসুদ্দীন মোহনপুরী (১৯৩৪-২০০৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচয়

শামসুদ্দীন, পিতার নাম, আলহাজ্ব সূজী রজব আলী। তিনি যশোর জেলার মনিরামপুর থানায় মোহনপুর গ্রামে ১৯৩৪ খ্রি. ১ জানুয়ারিতে এক সম্ভ্রান্তমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি তাঁর নিজ এলাকায় মোহনপুর বাঁধাঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। একই সাথে স্থানীয় মক্তবে পবিত্র কুর'আন শরীফ ও প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর তিনি পদ্মাবিলা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় (যশোর) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে তৎকালীন সরকারী নিয়মানুযায়ী ১৯৪৭ খ্রি. বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদ্‌রাসা একজন মিনেশন বেঙ্গল এর অধীনে আলিম পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ খ্রি. তিনি অত্র মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাস করেন। ১৯৫২ খ্রি. তিনি গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

১. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

কর্মজীবন

কর্মজীবন শুরুতে তিনি ১৯৫২ খ্রি. লাউড়ী রামনগর কালিম মাদ্রাসা, মনিরামপুর, যশোর-এ সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করেন এবং উক্ত মাদ্রাসায় সুদীর্ঘ ৪২ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৯৪ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মাওলানা কে. এম. মফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্রাসা, যশোর।

২. মাওলানা ওয়াককাস, সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ।

৩.আমিনুল ইসলাম, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্বদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. মাওলানা রহমাতুল্লাহ, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মাওলানা শামসুদ্দীন মোহনপুরী আরবি, উর্দূ ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা

১)১৯৮০ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ এলাকায় একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন।
২)১৯৮০ খ্রি. তিনি তাঁর নিজ গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

গ্রন্থাবলী

১)আহকামে দোয়া বা মোনাজাত মীমাংসা।
২)কালামুল কুফর ওয়ালা কাবায়ের।
৩) তোহফায়ে মোমেনীন বা ঈমানদারদের সওগাত।
৪)খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম নারী কাহিনী।
৫) হাকীকতে কুরবানী।
৬) জাওয়াহিরাল হাদীস বা হাদীস রতন।

ইন্তিকাল: মাওলানা শামসুদ্দীন মোহনপুরী ২০০৩ খ্রি. ৭ মার্চ ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা আলহাজ্ব ইউনুস আবদুল জাব্বার (হাজী সাহেব হুজুর)

(১৯৩৫/১৩২৭হি.-১৪১২হি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শায়খুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা ইউনুস সাহেব (রহ.) ১৩২৭ হিজরী সনে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল মহিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল জাব্বার। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন।

শিক্ষাজীবন

তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৩৫১ হিজরী সনে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দারুল 'উলূম দেওবন্দে কুর'আন ও হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন।

কর্মজীবন

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের পর দেশে ফিরে এসে পটিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা জমীরুদ্দীন সাহেবের কাছে বাই'আত গ্রহণ করেন এবং মাদরাসা মুহতামিম আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর আহ্বানে জমীরিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত হন। প্রথম দিকে তিনি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৩৭৭ হিজরী সনে অস্থায় ও ১৩৭৯

হিজরী সনে মজলিসে শুরার সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে স্থায়ীভাবে জামি'আ জমীরিয়ার পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

তাঁর সময়েই অত্র জামিয়ার উন্নতি, অগ্রগতির সবচেয়ে বেশি হয়েছে। দেশ বিদেশে সফর করে হাজী সাহেব হুজুর (রহ.) জামিয়াকে গড়ে তুলেছেন আধুনিক আঙ্গিকে। তাঁর মাধ্যমেই কাসেমুল উলূম জমিরিয়া মাদরাসা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করেছে।

মৃত্যু

হাজী সাহেব হুজর (রহ.) ১৪১২ হিজরী সনে ৯ শা'বান মুতাবিক ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারি ইহধাম ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।[১]

মাওলানা এম.এ. মান্নান (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.)

লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় মুখপত্র, ইসলামী মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পতাকাবাহী দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, প্রবীন রাজনীতিবিদ ও জাতীয় বোধ-বিবেকের কণ্ঠস্বর আলহাজ্ব মাওলানা এম.এ. মান্নান এদেশের এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা। দেশের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষত মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে। মাওলানা এম.এ. মান্নান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার কেরোয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৫ খ্রি. ৯ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াছীন ছিলেন ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা একজন পীরে কামেল। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর মেধার অধিক্বারী এম.এ. মান্নান মাদ্‌রাসার শিক্ষা সমাপন করেন কৃতিত্বের সাথে। এরপর কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক হিসেবে। মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৬২ খ্রি. তিনি যোগদান করেন রাজনীতিতে এবং ফরিদগঞ্জ-হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ খ্রিস্টাব্দেই তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা স্থানীয় সরকার বিষয়ক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি পাকিস্তান ইসলামী এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৫ খ্রি. থেকে ১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত তৎকালীন শাসক দল মুসলীম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বাংলাদেশ ১৯৭৯ খ্রি. মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মন্ত্রীসভায় শিক্ষাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী করা হয়। ১৯৮৬ খ্রি. আবারো তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়েরর মন্ত্রী করা হয়। পরবর্তীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পন করা হয়। তিনি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন একই সাথে দু'টি মন্ত্রণালয়। মাওলানা এম.এ. মান্নান ১৯৮৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন জনগণনন্দিত পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব এবং ১৯৮৯ খ্রি. মহাখালী-গুলশানের মত অভিজাত এলাকায় ইরাক সরকারের আর্থিক অনুদানে প্রতিষ্ঠা করেন স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন মসজিদে গাউসুল আজম ও জামিয়াতুল মোদাররেছীন কমপ্লেক্স। বহুমুখী জীবন সংগ্রাম, বর্ণাঢ্য পথ পরিক্রমার মাঝেও সতত দেদীপ্যমান মাওলানা এম.এ. মান্নান এর আলিম পরিচিতি। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও নায়েবে রাসূলের মূল দায়িত্বে অবহেলা করেননি তিনি কোন সময়েই।

একদিকে তিনি দেশের আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধির চেষ্টা জারি রেখেছেন, সাধ্যমত খিদমত করেছেন; অপরদিকে সুযোগ পেলেই ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে জাতিকে বাতলে দিয়েছেন পথের দিশা। মসজিদে গাউসুল আজমে

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

জুমার দিনে প্রদত্ত তাঁর অমূল্য ভাষণের রয়েছে বাণীবদ্ধ ক্যাসেট, যার অধিকাংশ ভাষণই সীরাতুন্নবী (স.)-এর ওপরে। প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থবদ্ধরূপ 'সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান' শিরোনামে। প্রাজ্ঞ আলিম, দক্ষ সংগঠক, সফল রাজনীতিবিদ, বহুভাষাবিদ ও অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে যেমন খ্যাত মাওলানা এম. এ. মান্নান তেমনি চারিত্রিক মাধুর্যেও তিনি অনন্যাসাধারণ। সদালাপি, বন্ধুবৎসল, অতিথি পরায়ণ, উদার ও অমায়িক এ মানুষটির সান্নিধ্যে এসে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। তাঁর বদান্যতা ও উদার হস্তের দানে উপকৃত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা বিপুল। নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ী, অধ্যবসায়ী, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, অক্লান্ত কর্মীপুরুষ মাওলানা এম.এ. মান্নান ২০০৭ খ্রি. মারা যান।[১]

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী (১৯৩৫-১৯৭৮খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ১৯৩৫ খ্রি. ৩১ মার্চ মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন সাহেবরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী 'আবদুল করীম।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৪৭ খ্রি. চাঁদপুরের ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ১ম বিভাগে আলিম ১৯৪৯ খ্রি. একই মাদ্‌রাসা থেকে ১ম বিভাগে ফাজিল এবং ১৯৫১ খ্রি. ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১ম শ্রেণিতে মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন কামিল পাস করেন। এরপর তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য মিসর গমন করেন। তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ খ্রি. ফেকাহ শাস্ত্রে ও ১৯৫৫ খ্রি. উসূলুদ দ্বীন ধর্মের মূলনীতি অনুষদ থেকে ১ম শ্রেণিতে আলামিয়া ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রি. তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান ইউনিভারসিটির প্রাচ্য শিক্ষা বিভাগ থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রি. তিনি আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের শারইয়াহ বা ইসলামী আইন অনুষদ থেকে আলামিয়া ডিপ্লোমা অর্জন করেন। মাওলনা যাফর আহমদ ওসমানী তাঁর উল্লেখযোগ্য হাদীসের উস্তাদ।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে তিনি ১৯৫৫ খ্রি. থেকে ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ও উচ্চ ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউশনে খণ্ড কালীন প্রভাষক রূপে শিক্ষকতা করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে সহকারী অফিসার ছিলেন। এরপর ১৯৫৯ খ্রি. তিনি ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৪ খ্রি. ২ এপ্রিল তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নতি হন। তিনি ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের নাসায়ী শরীফ শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় সহকারী অধ্যাপক হিসেবে এ পদে বহাল ছিলেন।

এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের আধুনিক বিষয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধক, সময় নিষ্ট, কর্মব্যস্ত ও কঠোর পরিশ্রমী। গবেষণা, অধ্যাপনা, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, বিভিন্ন সংগঠন ও সভা-সমিতি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা এ সবই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

তিনি ঢাকার মাজালিমুস সাকাফাহ (সাংস্কৃতিক সংঘ)-এর উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মাসিক আরবী পত্রিকা আস-সাকাফাহ এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি আরব বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতির প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঢাকা বেতার

---

১. রুহুল আমীন খান, *ইতিহাসের আয়নায়* (ঢাকা: বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন, ২০০৫), পৃ. ৪৫-৪৮

কেন্দ্রে আরবী মাধ্যমের সম্প্রচারন বিভাগেরও তিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে কাজ করেন।[১] তার প্রকাশিত রচনা: ১) ইসলামিয়াত ২) তাফসীর এ আযহারী ৩) কুর'আন কোষ অভিধানপঞ্জি (আরবী বাংলা) ইত্যাদি।

মৃত্যু

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী ১৯৭৮ খ্রি. ২৭ মার্চ সোমবার ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাকে মগবাজারস্থ কাজী অফিস লেনে অবস্থিত জামে মসজিদের পার্শ্বে দাফন করা হয়।[২]

আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসমাঈল ইসলামাবাদী (১৯৩৯-২০০৪ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন ইব্‌ন ইসমাঈল ইসলামাবাদী ইব্‌ন মাওলানা গোলাম মোস্তফা ইব্‌ন মাওলানা ইব্‌রাহীম সিকদার ইব্‌ন গাজী মুনজের ফারুকী। তিনি ১৯৩৯ খ্রি. চট্টগ্রামস্থ পটিয়া আশিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি বড় ভাইয়ের কাছে বাড়িতে কুর'আন মাজীদ ভাটিখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি এবং গ্রাম্য মাদরাসা এমদাদুল উলূম আশিয়াতে জামাতে দহুমের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শায়খুল হাদীস আল্লাহা ইসহাক গাজী সাহেবের তত্ত্বাবধানে পটিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলূম মাদরাসাতে জামাতে ন হুমে ভর্তি হন। ১৯৬০ খ্রি. এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস শেষে অত্র প্রতিষ্ঠানেই তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণি তথা ফনুনাতে আলিয়ার অধ্যায়ন আরম্ভ করেন। তবে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল বাসনায় মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গমনোপলক্ষে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের সাথে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। কিন্তু (তৎকালীন) মুরব্বীদের আপত্তির মুখে তিনি কৃত ব্যবস্থাপনা বাতিল করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ১৯৬১ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করে পুনরায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হলে বিশেষ কারণে লাহোরের জামি'আ আশরাফিয়ায় দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। ১৯৬২ খ্রি. লাহোরস্থ জামি'আ মাদানীয়া বিশেষ দু'জন দার্শনিক উস্তাদের কাছে ফুনুনাতে 'আলিয়ার উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

তিনি ১৯৬৩ খ্রি. নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে আযীয উদ্দীন লিমিটেড-এর অন্যতম ডাইরেক্টর হাজী বশীর উদ্দীন সাহেবের অর্থানুকুল্যে মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.)-এর সন্নিধ্যে বাংলা চর্চার সূচনা করেন। সাথে সাথে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশিত উর্দূ দৈনিক 'পাসবান' এ অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৫/৬৬ খ্রি. পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি বাংলা ভাষায় 'উলামাদের জাগরণ সৃষ্টি করে ধর্মদ্রোহীদের মুকাবিলার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট মুরব্বীর অভিভাকত্বে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাস্থ 'এদারাতুল মা'আরিফ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বাংলায় কওমী মাদরাসার প্রথম মুখপাত্র আত্-তাওহীদের রূপরেখা তৈরি করে পটিয়ার তদানীন্তন মুহতামিম হাজী সাহেব হুজুর (রহ.)-এর কাছে পৌঁছলে হুজুর তা সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৭১ খ্রি. স্বাধীনতা আন্দোলনে ইসলামী ক্রিয়া কর্মে অসুবিধার সম্মুখীন হলে ১৯৭২ খ্রি. ঢাকা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম চলে এসে বাবুনগর আযীযুল 'উলূম মাদরাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে পটিয়ার হাজী সাহেব হুজুরের আদেশক্রমে আত্-তাওহীদের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রি. ১৯ ডিসেম্বর আবুধাবিতে নিযুক্ত বাংলাদেশী দূত এ.ডব্লিউ শামশুল আলম সাহেবের তত্ত্বাবধানে 'আরবী-ইংরেজি-বাংলা অনুবাদকের সরকারী দায়িত্ব

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রি. ১ মার্চে 'সুপ্রিম শরীয়া কোর্ট আবুধাবী'-এর অনুবাদক পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রেজিষ্টার্ড খতীব পদে এবং ১৯৮৫ খ্রি. আবুধাবীর বেতার ইসলামী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রযোজক ও উপস্থাপকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরে 'অনুবাদ বিভাগীয় প্রধান' পদে উন্নীত হন। ১৯৯০ খ্রি. 'রাবেতা আল 'আলম আল-ইসলামী'র পক্ষ থেকে তাঁকে বাংলাদেশ শাখঅর পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এতদ শ্রবণে জামি'আ পটিয়ার পরিচালক হাজী সাহেব হুজুর (রহ.) তাঁকে বললেন যে, "বাংলাদেশে আসলে পটিয়াতেই আসতে হবে।"

এভাবে হাজী সাহেব হুজর (রহ.)-এর বারংবার তাগিদে বাধ্য হয়ে ১৯৯১ খ্রি. পটিয়া মাদরাসায় আগমন পূর্বক সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ খ্রি. হাজী সাহেব হুজুরেরইনতিকালের পর জামি'আর সকল শিক্ষক ও মজলিশে শুরার সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে জামি'আর প্রধান পরিচালকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জামি'আর ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে তিনি যুগের সফলকাম মহান ব্যক্তি হিসাবে অতি অল্প সময়েই দেশের আনাচে-কানাচে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মৃত্যু

কুর'আন ও হাদীসের এ মহান সাধক দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে হাজার হাজার তলাবা 'আযীয রেখে পরকালের উদ্দেশ্যে ২০০৪ খ্রি. রওয়ানা হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।[১]

মাওলানা আতাউর রহমান খান (১৯৪৩-২০০৮)

জন্ম ও বংশপরিচয়

মাওলানা আতাউর রহমান খান ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিত্রালয় হলো ইটনা থানার বনেদী গ্রামে অবস্থিত। বৃহত্তর জয়েনশাহি পরগণার ঐতিহাসিক পাঠান শাসক বংশধারার উত্তরসূরি খাজা রহিম খান, খিজির খান, বাহরাম খান, বাহাদুর খানের অধস্তন পুরুষ পুরো মুলকে ভাটি এলাকায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের নিরলস কর্মী আল্লামা ইবারত খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন তার দাদা। কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নগর দেওয়ানবাড়ি মাদরাসার শায়খুল হাদীস, বৌলাই জমিদার বাড়ি মসজিদ ও পরবর্তীতে ঐতিহাসিক শহিদী মসজিদের তৎকালীন ইমাম ও আজীবন প্রিন্সিপাল, অলিয়ে কামেল মাওলানা আহমাদ আলী খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন তার পিতা। মাওলানা ছিলেন তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা আতাউর রহমান খান ১৯৪৮ খ্রি. আল-জামি'আতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে ভর্তি হয়ে কায়দা থেকে শুরু করে ১৯৬২ খ্রি. হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রি দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। এ বছর তিনি অত্র জামি'আতে দাওরায়ে হাদীসে সালানা ইমতিহানে (বার্ষিক পরীক্ষায়) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পরবর্তীতে তিনি 'তাখাস্সু ফী ইলমিত্ তাফসীর'সহ নিজ উদ্যোগে মাতৃভাষা বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিসহ ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

বিবাহ

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ময়মনসিংহ জেলার জামি'আ ইসলামিয়া চরপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন মুহতামিম মাওলানা আশরাফ 'আলী (রহ.)-এর জ্যোষ্ঠা কন্য মুর্শিদা-ই-আমিনা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির সাথে সাথেই তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ ইমদাদুল 'উলূম (ময়মনসিংহে) শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রি. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধোত্তর সময়ে জামি'আ ইমদাদিয়ার দীনীশিক্ষা বিদ্যেশী একটি কু-চকরী মহলের ষড়যন্ত্রে তাঁর শিক্ষকতা জীবনে সাময়িক ছন্দপতন ঘটে। সেসময় মাদরাসার ঐতিহাসিক শহীদি মসজিদটিও স্বীয় ঐতিহ্য হারাতে বসে। অন্যদিকে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা-ই দারুল 'উলূম মিরপুর-৬ এর মুহতামিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেসময় তিনি ঢাকার অদূরে ডেমরা এলাকায় 'জামি'আ মিল্লিয়া ঢাকা' নামে একটি ইসলামী আদর্শ বিদ্যাপিঠ গড়ে তুলেন।

মাওলানা আতাউর রহমান খান জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে কিশোরগঞ্জ শহরে বত্রিশ এলাকায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'জামি'আ ফারুকিয়া' নামে একটি আধুনিক মানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় সেখানে হিফ্‌য ও কিরা'আত বিভাগসহ কিতাব বিভাগের জামাতে মিশকাত পর্যন্ত এগারো জামাত চালু রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন।

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আতাউর রহমান খান তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যুক্তফ্রন্টের শীর্ষচার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা 'আবদুল হামীদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ.কে.এম. ফজলুল হক ও মাওলানা আতাহার 'আলী (রহ.)সহ তৎকালীন পাক-ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ সন্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। সেই সুবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।

যুক্তফ্রন্টের শরীক দল বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় পদে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নেজামে ইসলামের মূল দলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি দেশের সকল ইসলামী দলের সমন্বয়ে গঠিত 'ইত্তিহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ'-এর অন্যতম শীর্ষ উপদেষ্টা ছিলেন।

কিশোরগঞ্জে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার সুবাদে ১৯৮৬ খ্রি. নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কিশোরগঞ্জ সদর আসনে জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়ে সকল প্রার্থীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরশাসক কর্তৃক সরকারি দলে যোগদানের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অন্যায়ভাবে পরাজিত ঘোষণা করে।

অতঃপর ১৯৯০ খ্রি. স্বৈরশাসনের অবসার ঘটলে ১৯৯১ খ্রি. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রবল অনুরোধে দলীয় ব্যানারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সেসময় আওয়ামীলীগের শক্তিশালী প্রার্থীর চেয়ে এক তৃতীয়াংশ বেশি ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর ঈর্ষণীয় জনসমর্থনের অন্যতম কারণ হলো "তিনি কারো উপকার করতে না পারলে কোনোদিন কারো ক্ষতি করতেন না।"

ইসলামী ঐক্যের নকীব

নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বিদেশি আধিপত্য ও অগ্রাসন থেকে দেশ ও জাতিকে চিন্তায় তিনি ইসলামী দলগুলো ঐক্যের আহ্বান করেন এবং শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক (রহ.), মুফতী ফজলুল হক আমীনী, পীর সাহেব চরমোনাই, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবসহ আরো নেতৃবৃন্দেকে নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেন।

রাজনৈতিক জোটবদ্ধতা ও ইস্যুর বাইরে ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের অভিন্ন অবস্থান ও ভূমিকা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বায়তুল মুকার্‌রমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শরিয়াহ কাউন্সিল গঠন করেন। শায়খুল হাদীস আজীজুল হক (রহ.), মুফতী সাঈদ আহমাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.) ও মাওলানা

দেলাওয়ার হোছাইন সাইদীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কিরামগণ এর সর্বোচ্চ কাউন্সিলর ছিলেন। এ শরীয়া কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা আতাউর রহমান খান। পরবর্তীতে তিনি ভাইস চেয়ারমেনের দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানার লেখালেখি

তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'তানযীম বার্তা', মাসিক মুনাদী' ও জাতীয় পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-কুর'আনুল কারীম'-এর বঙ্গানুবাদ ও পঁচিশ খণ্ডের বিশাল কলেবরসমৃদ্ধ 'ইসলামী বিশ্বকোষ' সম্পদনার কাছে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী বই রয়েছে।

১) তাফসীরে সূরা মূল্‌ক

২) পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

৩) ইসলামের অর্থবণ্টন ব্যবস্থা

৪) মুসলিম শিশুশিক্ষা

৫) মাওলানা আতহার আলী (রহ.) ও নির্বাচিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু

মহান এই আশেকে রাসূল ৩১ জুলাই, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মুতাবিক ২৭ রজব, ১৪২৯ হিজরী সনে রোজ বৃহস্পতিবার পবিত্র মিরাজ রজনী'র শেষভাগে ৬৫ বছর বয়সে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।[১]

প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন (জ. ১৯৪৩-২০১৬ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়

এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, পিতা- শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন, তিনি নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত কুমরাদী দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্‌রাসার স্টাফ কোয়ার্টারে ২মার্চ ১৯৫৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পরিবার থেকেই। প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকার নবাব বাগিচা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯৬৬ খ্রি. জামি'আ হোসাইনিয়া আশ্‌রাফুল উলূম মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সনদ লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রি. পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানের খায়রুল মাদারিস থেকে দাওরায়ে তাফসীর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭০ খ্রি. ঢাকা বোর্ড থেকে এস. এস. সি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ খ্রি. জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৫ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি. এ. অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৬ খ্রি. এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৯৮ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়, শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে ০১-০১-১৯৬৮ খ্রি. থেকে ৩১-১২-১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত মাদ্‌রাসা ইমদাদুল উলূম (ফরিদাবাদ), ঢাকা। ০১-০১-১৯৭৯ খ্রি. থেকে ১৭-১২-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত

---

১. সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, *বাংলার বরেণ্য 'আলিম*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৭ খ্রি.), খ-২, পৃ. ৪১২-৪১৮

হাফেজ মূসা কলেজ, ঢাকা। ১৯৭৯ খ্রি. প্রভাষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬ সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৩ সহযোগী অধ্যাপক, ১০-০১-১৯৯৯ থেকে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রচনাবলী

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায়, বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত রচনাবলী দেয়া হলো:

১) The last Prophet (ঝ.) (এ গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তথ্যবহুল বিশাল এক অনন্য গ্রন্থ। যা ইংরেজি ভাষাভাষির পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদৃত হয়ে উঠেছে)।
২) মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী।
৩) শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান (র): শিক্ষা ও রাজনীতি
৪) হাদীস সংরক্ষণে স্মৃতি শক্তির ভূমিকা।
৫) উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাওলানা মাহমূদ হাসানের ভূমিকা।
৬) হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী: ইলমে তাসাওউফে অবদান।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১) ইমাম তাহাভীর (রহ.) জীবন ও কর্ম এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান।
২) মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ।
৩) মুহাম্মদ মুস্তফা (স.): মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা।

হাদীসের খিদমত

তিনি জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ মারাদরাসায় ১৯৬৬ খ্রি. হাদীসের দরস প্রদান করেন।

১৯৮০ থেকে ইনতিকালের পর্বপযন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের দরস প্রদান করেছেন।

এজাজতে হাদীস

তিনি অনেক বড় বড় শায়খ থেকে হাদীসের এজাজত নিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোছাইন আহমদ মাদানীর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন (রহ.) (তদ্বীয় পিতা)সহ তৎকালীস সময়ে বড় কাটারা মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিসীনগণ।

ইনতিকাল

৪ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তিনি মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।

ড. মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.)

০১ মার্চ ১৯৪৪ খ্রি. ভোলার চরজংলা গ্রামে মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মোঃ 'আবদুল গণি এবং মাতা মর্জিনা খাতুন। স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি। পরে তিনি তবদি আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৩ খ্রি. ১ম বিভাগে দাখিল পাস করেন। এরপর তিনি ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৭ খ্রি. ১ম বিভাগে আলিম, ১৯৫৯ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল এবং ১৯৬১ খ্রি. মেধাতালিকায় ২য় স্থানসহ কামিল (হাদীস) পাস করেন। পাশাপাশি তিনি এস.এস.সি. ও এইচ. এস.সি. এবং ডিগ্রিও পাস করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন-

১) মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
২) মাওলানা আহমদুল্লাহ, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৩) মাওলানা আমিনুল হক, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।
৪) মাওলানা 'আবদুল করিম, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা।

ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ৮ আগস্ট ১৯৬১ খ্রি. ভোলা পাংগাশিয়া নেছারিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করে ৩১ মে ১৯৬৩ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ১ জুন ১৯৬৩ খ্রি. পটুয়াখালীর নূরাইনপুর ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ৩১ মে ১৯৬৫ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিরেন । অতঃপর ১ জুন ১৯৬৫ খ্রি. তিনি ভোলার ছোট মানিকা ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৩০ জুন ১৯৬৭ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১ জুলাই ১৯৬৭ খ্রি. হতে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি বেগুনগ্রাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, বগুড়ায় অধ্যক্ষের দাযিত্ব পালন করেন। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি. থেকে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত ১ বছর শেরপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯ জানুযারি ১৯৭৫ খ্রি. থেকে ৩১ আগস্ট ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত ভোলা বোরহান উদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ খ্রি. থেকে ৩১ জুলাই ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি কাসেমাবাদ আলিয়া মাদ্‌রাসা, বরিশালে অধ্যক্ষ হিসেবে কমরত ছিলেন। এরপর ১ আগস্ট ১৯৮৩ খ্রি. থেকে ১৭ জুন ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সৌদি আরবের রিয়াদ কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার উপর ১ বছরের প্রশিক্ষণও সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি ১৯৮৭ খ্রি. ও ২০০০ খ্রি. মোট ২ বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি বুখারী, মিশকাত, কাশশাফ, নূরুল আনোয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠদান করতেন। তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অসংখ্য ছাত্র বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী খিদমতে নিয়োজিত এবং ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তঁদের কয়েকজন হলেন:

১) মাওলানা ইব্রাহীম, অধ্যক্ষ, তজুগদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসা।
২) মাওলানা রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, তজুমদ্দিন আলিয়া মাদ্‌রাসা ।
৩) মাওলানা আবদুর রব, অধ্যক্ষ, কাউনিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, বরিশাল।
৪) মাওলানা আল আমীন চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ, মানুরী ফাযিল মাদ্‌রাসা, ফরিদগঞ্জ।
৫) মাওলানা গিয়াসউদ্দীন, অধ্যক্ষ, মানুরী ফাযিল মাদ্‌রাসা।

দ্বীনের প্রচারে তিনি লেখনী শক্তির ব্যবহারও চালু রেখেছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে-
১। আনোয়ারুল মানার (নুরুল আনোরের ব্যাখ্যা) প্রকাশিত।
২। আনোয়ারুদ দেরায়া (শরহে বেকায়ার ব্যাখ্যা)।
৩। মাবাদিউল আরাবিয়ার ব্যাখ্যা।

তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও সমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা ছাড়াও যেখানেই শিক্ষকতা করেছেন সেখানে ইমামতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি ফরিদগঞ্জ কেন্দ্রীয় জাতীয় ঈদগাহেরও খতীব ছিলেন। ১৭ জুন ২০০৪ খ্রি. এ বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মারা যান।[১]

মাওলানা 'আবদুল ওহহাব (১৯৪৫-১৯৯৮ খ্রি.)

সুমহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৫ খ্রি. মার্চ মাসে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন সাতবাড়িয়া গ্রামের সদর কাযী বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আলী মিয়া। তিনি অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন। তাঁর দাদার নাম সোলাম হোসাইন। পিতার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় ১৯৫৪ খ্রি. ৯ বছর বয়সে তিনি নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশুদ্ধভাবে কুর'আন পাঠ আয়ত্বের জন্য গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মক্তবে ইলাশপুর গ্রামের 'আবদুর রহমানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে মাত্র এক বছরে বিশুদ্ধভাবে কুর'আন শিক্ষার কাজ সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৫৯ খ্রি. মাওলানা রমযান আলীর পরামর্শে মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রয়েছেন বটগ্রাম মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা 'আবদুল হক। সেখানে জামা'আতে পাঞ্জাম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। জোলাই মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া শেষে ১৯৬৪ খ্রি. হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে শরহে বেকায়া থেকে লেখাপড়া শুরু করে ১৯৬৯ খ্রি. অত্যন্ত সুনামের সাথে দাওরায়ে হাদীস শেষ

১. গবেষকের একান্ত সাক্ষাতকার: মোঃ মিনহাজ, তদীয় মেঝ ছেলের সাথে।

করেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা 'আবদুল কাইয়ূম-এর নিকট বিখ্যাত হাদীসের কিতাব বুখারী সমাপ্ত করে ইল্‌মে হাদীসের সনদ হাসিল করেন। এরপর মাওলানা আবুল হাসান-এর নিকট মুসলিম শরীফ শেষ করেন।

হাটহাজারী মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা 'আবদুল আযীয-এর নিকট তিরমিযী শরীফ পড়েন। মাওলানা হামেদ-এর নিকট থেকে আবু দাউদ ও মিশকাতের সনদপ্রাপ্ত হন। তৎকলীন হাটহাজারী মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য মুহতামিম মাওলানা 'আবদুল ওয়াহাবের নিকট থেকে মুয়াত্তা মুহাম্মদের সনদ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে হাটহাজারী মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য মুহ্‌তামিম মাওলানা আহমদ শফী-এর নিকট থেকে ইব্‌নে মাজার সনদপ্রাপ্ত হন। দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর তৎকালীন হাটহাজারী মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা 'আবদুল ওয়াহহাব-এর পরামর্শক্রমে গোপালগঞ্জ 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। কিছুদিন পর সেখানকার কোর্ট মসজিদে তিনি খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মুহাদ্দিস পদ ছেড়ে দিয়ে সেখানে একটি কওমী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লেগে যান। পরে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলনা শামছুল হক ফরিদপুরী-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮৪ খ্রি. পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ মহামনীষী দেশ বরেণ্য আলিম মাওলানা ফয়েজউল্লাহ-এর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা শাহ্ সুলতান আহমদ নানুপুরী-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রমযান মাসে জামি'আ ওবায়দিয়া নানুপুর মাদ্‌রাসা মসজিদে ৪০ দিনের ইতিকাফ করার মধ্য দিয়ে খিলাফত লাভ করেন। তাঁর নির্দেশে ১৯৮৪ খ্রি. পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্রে সমুদ্র পথে ১৫ দিন যাবত সফর করে মক্কা নগরীতে পৌঁছেন এবং ৭৫ দিন যাবত মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করে মহানবী (স.)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. পবিত্র হজ্জ পালন করে দেশে ফেরার কিছুদিন পর তাঁর পিতা মারা জান। অতঃপর তিনি নানুপরী-এর পরামর্শে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত রাণীর বাজার মাদ্‌রাসা মসজিদের ইমাম ও খতীব নিযুক্ত হন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মাদ্‌রাসা বিলীন হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন মাওলানা মুযাফফর আলী তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা অনুভব করে কমিটির সদস্যদের সম্মতিক্রমে তাঁকে মাদ্‌রাসার মুহতামিম নিযুক্ত করেন। তখন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন। তাঁর চেষ্টার সুফলে মাদ্‌রাসা উলা পর্যন্ত হয়ে জামি'আ রশীদিয়া আযীযুল 'উলূম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এছাড়াও দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়েতের রাস্তা দেখান। বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি সদা সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি সবার পরামর্শক্রমে কাদিয়ানী নির্মূল করার লক্ষ্যে খতমে নবুওয়াত কমিটি গঠন করেন এবং কুমিল্লা জেলার কওমী মাদ্‌রাসাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য ওলামা ও মাশায়েখদের নিয়ে কুমিল্লা জেলা কওমী মাদ্‌রাসা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইল্‌মে হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৮০ খ্রি. ইমদাদুল 'উলূম কওমী মাদ্‌রাসা, ১৯৯৭ খ্রি. 'আবদুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা করেন জামি'আ রাহমানীয়া মিয়াবাজার মাদ্‌রাসা এবং মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া কোর্ট মসজিদ মাদ্‌রাসা। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মক্তব তৈরি করেন। এ মহান মর্দে মুজাহিদ ১৯৯৮ খ্রি. মারা যান।

মুফতি ফজুলল হক আমিনী (জ. ১৯৪৫-২০১২ খ্রি.)

১৯৪৫ খ্রি. ১৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আমীনপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুফতি ফজলুল হক আমিনী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ ওয়ায়েজ উদ্দিন। মুফতি ফজলুল হক আমিনী বাল্যকাল থেকেই নম্র ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধার প্রখরতা বাল্যকালেই ফুটে উঠে। যে কোন কিছু একবার দেখলেই মাথায় আটকে যেত। আর এ কারণেই ফজলুল হক আজকের মুফতি আমিনী। তিনি জামি'আ ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্‌রাসায় তিন বছর পড়াশুনা করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ খ্রি. রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জামি'আ কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। সেখানে তিনি

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরা হাদীসের সনদ লাভ করেন। এরপর ১৯৬৯ খ্রি. আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.)-এর কাছে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইনের উপর ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের করাচি নিউ টাউন মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আইনের উপর বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রখর মেধাশীল মুফতি আমিনীর কর্মজীবন দ্বীনী খিদমতের মাধ্যমেই সূচনা হয়। ১৯৭০ খ্রি. জামি'আ-ই-নূরিয়া কামরাঙ্গীচরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ বছরই তিনি হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ খ্রি. তিনি ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতীবের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রি. তিনি জামি'আ কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার ওস্তাদ ও সহকারী মুফতি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ খ্রি. লালবাগ জামি'আর ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ খ্রি. হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি লালবাগ জামি'আর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই মুফতি আমিনী রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ বিশিষ্ট আইনবিদ বাংলাদেশকে সোনার ন্যায় খাঁটি করার জন্য সভা-সমাবেশ ওয়ায-মাহফীল সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তিনি জনগণকে পুণর্জাগণের কাজে নিয়োজিত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলামী রাজনীতিতে রয়েছে মুফতি আমিনীর সরব পদচারনা। ১৯৮১ খ্রি. খেলাফত আন্দোলন সংগঠিত হলে তিনি মনোনীত হন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। হাফেজ্জী হুজুরের মৃত্যুর পরে তিনি অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃপুরুষের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চসহ দস্তি-মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি অন্যতম সফল সংগঠক। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের একজন সুযোগ্য নেতা ও ওলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের মহাসচিব।

মুফতি ফজলুল হক আমিনীর মেধার প্রখরতা গভীর । তিনি একাধারে হাদীস বিশারদ, আইনবিদ, তাফসীরবিদ। তাঁর জীবনে এমন এক বিস্ময়কর মেধার পরিচয় রয়েছে, যা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। তিনি ১৯৭২ খ্রি. কোন শিক্ষক ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে মাত্র ৯ মাসে আল-কুর'আন মুখস্থ করেন। যদিও শুনতে অবিশ্বাস্য অনুভব হয় তবে বাস্তব সত্য।

মুফতি আমিনী এমন এক নাম যা শুধু বাংলার মাটিতে আর আকাশের নয়। তিনি মধ্যপ্রাচ্য শান্তির জন্য বহু দেশ সফর করে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে করেন। বেশ কয়েবার হজ্জ ওমরা পালনসহ তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেন। ইরান, ইরাকের ভ্রাতৃযুদ্ধ বন্ধে ও বিশিষ্ট আইনবিদ মুফতি ফজলুল হক আমিনী লেখনীর মাধ্যমেও দ্বীনের খিদমত করেছেন।

যেমন: তাঁর বহু গ্রন্থের মাঝে অন্যতম হল:

১) দরসে বুখারী (আরবী)

২) কারবালার শিক্ষা।

৩) তরিকায়ে মুতালা'আ।

৪) ফতওয়াহ্ জামি'আ, ৪ খণ্ড, ইত্যাদি।[১]

১. 'আবদুল কাইয়ূম ও এফ. আর. মানুম, *সফল যারা কেমন তাঁরা* (ঢাকা: সম্পীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৯-৭২

এ বিপ্লবী সাধক, দ্বীনের মহান খাদেম ২০১২ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে লক্ষ 'আলিম-ওলামা, অনুরাগীদেরকে কাঁদিয়ে পরকালে গমন করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আমীন।

মাওলানা ইসমাঈল টুমচরী (১৯৪৫-১৯৯০ খ্রি.)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেশ কয়েকজন আলিম নিজ নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জাগরণমুখী চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজে জাগিয়েছিলেন প্রাণের স্পন্দন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নতি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যারা অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন, এ ধরনের মহৎপ্রাণ গুণী মানুষের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা ইসমাঈল টুমচরী। তিনি লক্ষীপুর জেলার টুমচুর গ্রামের দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৪৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব মুন্সী নূর মোহাম্মদ। তাঁর প্রাথমিক তা'লীম নিজ গৃহেই শুরু হয়। পিতার নিকট এবং স্থানীয় মক্তবের পাঠ শেষ করে তিনি টুমচর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৫৭ খ্রি. দাখিলে ১ম স্থান, ১৯৬১ খ্রি. আলিমে ১ম স্থান ১৯৬৩ খ্রি. ফাযিলে ১ম স্থান লাভ করেন। এরপর তিনি ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৫ খ্রি. তিনি কামিলে (হাদীস) ৪র্থ স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ ছাত্রজীবনে তিনি সুযোগ্য ওস্তাদগণের সান্নিধ্যে কুর'আন-হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন-

১. মাওলানা আশরাফ আলী, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, টুমচুর ফাযিল মাদ্রাসা।

২.মাওলানা হাফিজুর রহমান, শিক্ষক, টুমচর ফাযিল মাদ্রাসা।

৩.মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খাত্তানী, শায়খুল হাদীস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা।

৪.মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা।
৫.মাওলানা 'আবদুল আযীয, মুহাদ্দিস, ছারছিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা।

দীর্ঘদিন জ্ঞান সাধনায় অতিবাহিত করে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি টেনে তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ১৯৬৫ খ্রি. টুমচর ফাযিল মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬৬ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত ধামতি ইসলামীয়া আলিয়া মাদ্রাসার এবং ১৯৮১ খ্রি. থেকে জুলাই ১৯৯৩ খ্রি. পর্যন্ত তিনি এখানে উপাধ্যক্ষ হিসেবে হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বুখারী, মুসলিম, কাশশাফ ইত্যাদি বেশি কাছে অসংখ্য ছাত্র ইল্মে হাদীস শিক্ষা করেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১) প্রফেসর ড. সেকান্দার আলী, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২) মাওলানা হিফজুর রহমান, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা।
৩) প্রফসর ড. 'আবদুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
৪) মাওলানা বদিউল আলম, মুহাদ্দিস, উত্তর বাড্ডা।
৫) মাওলানা শহীদুল্লাহ, প্রধান মুফতী, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা।
৬) মাওলানা নূরজ্জামান, মুহাদ্দিস, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্রাসা।
৭) প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) মাওলানা মহববুর রহমান আশ্রাফী, মুহাদ্দিস, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্রাসা।
৯) মাওলানা দেলোয়ার ইব্ন মফিজ, অধ্যক্ষ, ভোলদীঘি কামিল মাদ্রাসা।
১০)মাওলানা 'আবদুল সাত্তার, মুহাদ্দিস, সোনইমুড়ী আলিয়া মাদ্রাসা।
১১) মাওলানা আবুল কালাম, মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদ্রাসা, মহিলা শাখা, ঢাকা।
১২)মাওলানা মোখলেসুর রহমান, হেড মুহাদ্দিস, ইসলামী মিশন মাদরাসা, ঢাকা।

মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (১৯৪৭-১৯৯৩ খ্রি.)

নাম ও পরিচিতি

মাওলানা আবুল হাসান যশোরী-এর প্রকৃত নাম আবুল হাসান। তিনি স্থায়ী ভাবে যশোরে বসবাস করতেন বলে তাঁকে যশোরী বলা হয়। তিনি আবুল হাসান যশোরী তাঁর নিজ গ্রাম এলাকার ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ঘোসবিলা জুনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর মাগুরা কলেজে এইচ. এস. সি তে ভর্তি হন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ভারতে গমন করেন। রহমাতিয়া মাদ্‌রাসায় (দিল্লী) ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়নের পর তিনি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা দেওবন্দ (ভারত) ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস বিষয়ে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

১৯৪৮ খ্রি. তিনি বর্তমান গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় (গোপালগঞ্জ) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রি. তিনি জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠা করেন। এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্তউক্ত মাদ্‌রাসায় মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসিদ্ধ ছাত্র

১. মরহুম মাওলানা এ. মান্নান, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
২. মরহুম মাওলানা তাহের উদ্দিন সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, জামে'আতু ইসলামিয়াতুল 'আরাবিয়া দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনা।
৩. মরহুম মাওলানা এ. হাকিম, সাবেক মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
৪. মাওলানা হেলাল উদ্দিন, সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, গহরডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, গোপালগঞ্জ।
৫. মরহুম মাওলানা সালাহ উদ্দিন, সাবেক মুহাদ্দিস, জামে'আ কুর'আনিয়া মাদ্‌রাসা, লালবাগ, ঢাকা।
৬. মাওলানা রজব আলী, প্রধান মুহাদ্দিস, শিমুলিয়া মাদ্‌রাসা,মাগুরা।

শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি: মাওলানা আবুল হাসান যশোরী আরবি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন।

গ্রন্থাবলী

১. *রাসূল (স.)-এর সৃষ্টির সাক্ষ্য*
২. *কাদিয়ানীদের মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ*
৩. *মুসলমানদের শেষ রাত*

প্রতিষ্ঠাতা

১. তিনি ১৯৫১ খ্রি. জামে'আ ইজাজিয়া দারুল উলূম (রেলস্টেশন) মাদ্‌রাসা, যশোর প্রতিষ্ঠা করেন।
২. ১৯৭৫ খ্রি. তিনি এহসানিয়া মাদ্‌রাসাটি (নড়াইল) প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. ১৯৮২ খ্রি. তিনি শামসুল উলূম মাদ্‌রাসা (লক্ষীপাশা) প্রতিষ্ঠা করেন।
৪. ১৯৮০ খ্রি. যাকারিয়া মাদ্‌রাসা (সেনহাটি, খুলনা) প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তিকাল: তিনি ১৯৯৩ খ্রি. জুলাই মাসের ৮ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[১]

---

১. গবেষক ১৬/০৬/২২ তারিখে তাঁর সুযোগ্য জামাতা ড. মোহাম্মদ নূরে আলম, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে উপরিউক্ত বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

ড. খোন্দকার আ.ন.ম. 'আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (জ.-১৯৫৮-২০১৬ খ্রি.)

নাম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক, লেখক ও শিক্ষাবিদ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের নরহরিদ্রা গ্রামে এক সম্ভ্রান্তমুসলিম পরিবারে ১৯৫৮ খ্রি.। পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা লুৎফন্নাহার বেগম।

শিক্ষাজীবন

ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাস করেন কৃতিত্বের সাথে। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে কামিল পাস করেন হাদীস বিষয়ে। ১৯৭৮ খ্রি. আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন আরবের রিয়াদে অবস্থিত আল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঊদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আরবী ব্যাকরণ ও আরবী শব্দ (Morphology) বিষয়ে। ১৯৯২ খ্রি. আরবী ব্যাকরণের ওপর পিএইচ.ডি করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ খ্রি. বাংলা, আরবী, ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে। সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাহরাইন, ওমান, আরব আমিরাত ও অন্যান্য দেশে সফর করেছেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ খ্রি.। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। যুগের আবর্তনে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে অগণিত বিশ্বাস, লোকাচার, মিথ্যা হাদীস, অবিকৃত সুন্নাতী ক্রিয়াকর্ম অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড, ধারণা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় ও তাঁর সাহাবীদের যুগে বা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। জেনে না জেনে সমাজের প্রভাবে বা বিভিন্ন অজুহাতে সমাজের অগণিত ধার্মিক ও বুজুর্গ মানুষ সেগুলো দ্বীন হিসেবে পালন করছেন। অনেক মানুষ এগুলোর পক্ষে কথা বলছেন। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সুন্নাতে নববী জানা ও জানানো, সমাজে প্রচলিত অগণিত বানোয়াট, মিথ্যা ও জাল হাদীস চিহ্নিত করণে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণপুরুষ।

নব-উদ্ভাবিত সুন্নাত বিরোধী বিষয়াবলীর বিপক্ষে 'অকাট্য' দলিল তুলে ধরে সমাজে প্রকৃত সুন্নত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে গেছেন তিনি। গবেষণা, গ্রন্থরচনা, ওয়াজ মাহফিল, সংগঠন পরিচালনা, ধর্মশিক্ষা, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ২০টি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহের নাম দেয়া হলো:

১) ইহ্ইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০২ খ্রি.)।
২) রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিকির ও দোয়া মুনাজাত, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৩) মুসলমানী নেসাব: আরকান ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (সা.) বাংলা গ্রন্থ।
৪) হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৫) বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৩ খ্রি.)
৬) হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০৫ খ্রি.)
৭) নামায ও মুনাজাত, বাংলা গ্রন্থ (ঢাকা: ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ২০০২ খ্রি.)
৮) বুহুসু ফী উলূমিল হাদীস, আরবী গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্‌সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)

৯) সহীহ মাসনূন ওযীফা, বাংলা গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্‌সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)
১০)রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পোশাক ও ইসলামে পোশাকের বিধান, বাংলা গ্রন্থ (ঝিনাইদাহ: আস্‌সুন্নাহ পাবলিকেশনস, ২০০৭ খ্রি.)

বাংলা অনুবাদ

১) মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ রচিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৮ খ্রি.)

২) ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার, মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৮ খ্রি.)

প্রতিষ্ঠাতা

এ মহান দ্বিনের খাদেম ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে পৌঁছানোর নিমিত্তে আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জনে আলাদা হাদীস বিভাগ খোলেন, যা হাদীস চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন।[১]

মাওলানা নোমান আহমদ (১৯৬১-২০১৫ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম নোমান আহমদ, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব কারী নুরুল হক (রহ.)। মাতা- মুসাম্মৎ তায়্যিবাতুন নিসা। তিনি চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত খিড্ডা (হাজীবাড়ী) গ্রামে ১৯৬১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।[২]

শিক্ষাজীবন

কচুয়াতেই তাঁর লেখা-পড়ার হাতে খড়ি। খিড্ডা জামে মসজিদের মকতবে মৌলভী সিরাজুল হক ও পিতা: আলহাজ্জ ক্বারী নুরুল হকের নিকট কায়দা ও কুর'আন শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উক্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রি, তেতৈয়্যা প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি সমাপ্ত করেন সুনামের সাথে। তারপর কচুয়া পাইলট হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া-লেখা করেন, এরপর দ্বীনী শিক্ষার তাগিদে কচুয়া বাইছারা দারুস সালাম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে তাইসীরুল মুবতাদী পর্যন্তপড়েন। তারপর কচুয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে মিজান থেকে শরহে বেকায়া পর্যন্তপড়েন। এরপর চলে যান পরিয়া জামি'আ ইসলামিয়ায়। সেখানে পড়েন মিশকাত পর্যন্ত। দাওরায়ে হাদীস, ইফ্‌তা, তাফসীর সম্পন্ন করেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে। দাওরায়ে হাদীস দারুল উলূম হাটহাজারীতে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিশ্বখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সম্পন্ন করেন ডাবল দাওরায়ে হাদীস।

কর্মজীবন: কর্ম জীবনের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা দারুল উলূম বরুড়ায় প্রায় দেড় বছর শিক্ষকতা করার পর জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুহাদ্দীস রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। টি এন্ড টি কড়াইল, বনানী মুহাম্মদীয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস এবং জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় মুহাদ্দিস হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। জামি'আ কাসিমিয়া ঢাকা-১০ এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল খায়ের কর্পোরেশন লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (সাবেক), এছাড়া তিনি অনেক দ্বীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মজলিসে সূরার সদস্য।

---

১. গবেষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার; ড. খোন্দকার আ. ন. ম. 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (মৃত্যুপূর্বে)-এর সাথে ০৯/১২/১২ খ্রি.।

২. গবেষক সরাসরি লেখকের সাথে জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়াতে তাঁর নিজস্ব হুজরায় ১৮/০৮/২০১২ খ্রি. তারিখে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

রচনাবলী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান জওক নদভীর হাত ধরে তার লেখালেখির হাতে খড়ি। এরপর লেখালেখির উপর পারদর্শিতা অর্জন করেন। অনুদিত ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া তিনি হাদীসের বহু মৌলিক গ্রন্থ ও অনুবাদমূলক কিতাব প্রনয়ণ করেছেন।[১] নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) নি'আমুল মুনইম শরহে সহীহ মুসলিম (১-৪ খণ্ড), ইসলামী কুতুবখানা, বাংলাবাজার।
২) জুদুল মুনইম (শরহে মুকাদ্দামায়ে মুসলিম), বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ।
৩) তুহফাতুল বারী (তিরমিযী সানীর দু'খণ্ডে প্রকাশিত) শিবলী প্রকাশনা, বাংলা বাজার।
৪) আন নূরুস সামাঈ 'আলা সুনানিল নাসাঈ (বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।
৫) আওনুল ওয়াদুদ আলা সুনানে আবী দাউদ (বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ), আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার।
৬) জাফরুল আমানী ফী নজরিত তাহাভী (বাংলা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।
৭) নায়লুল হাজাহ শরহে ইবনে মাজাহ (বাংলা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ), শিবলী প্রকাশনী।
৮) ফয়যুল মুলহিম ফী শারহি মুকাদ্দমাতি মুসলিম (উর্দূ ভাষায় ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ) শিবলী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৯) হাদীস সংক্রান্ত বিতর্কিত মাসায়েলের সহজ সমাধান (দারুল উলূম লাইব্রেরি)

লেখকের অনুবাদ ভিত্তিক হাদীসচর্চা

১) *বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)*-এর লিখিত ইন'আমুল বারী কিতাবের (১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ),
২) নাসরুল বারী শরহে বুখারী, মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী, শায়খুল হাদীস মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত কর্তৃক লিখিত কিতাবের ১ম, ২য়, ৮ম, ৯ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ), আনোয়ার লাইব্রেরি।
৩) *দরসে তিরমিযী*, বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী-এর লিখিত কিতাবের ১ম-৫ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ), আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।
৪) ঈযাহুল মিশকাত, ১ম খণ্ড, (বাংলা অনুবাদ), মদিনা পাবলিকেসন্স।
৫) মুসনাদে ইমামুল আজম, ব্যাখ্যা গ্রন্থের (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬) জময়ুল ফাতাওয়ায়ে নামক হাদীসের কিতাবের (বাংলা অনুবাদ), ই. ফা. বা.।
৭) তিরমিযী শরীফের পূর্ণাঙ্গ (বাংলা অনুবাদ), তাজ কোম্পানী।
৮) তুহফাতুল আলমাঈ, তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের (বাংলা অনুবাদ)।
৯) ইন'আমুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (বাংলা অনুবাদ)। এ মহান কুর'আন হাদীসের গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এজাজতে হাদীস:

তিনি অনেক বড় বড় শায়খ থেকে হাদীসের এজাজত নিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাই দা. বা. মদীনা, আল্লামা আনজার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.), শায়খ মুহাম্মদ ইউনুস দা. বা. (শায়খুল হাদীস মাজাহেরুল উলূম, সাহারানপুর), খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) শায়খ আহমদ শফী দা. বা., শায়খ আবুল হাসান দা. বা., শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.), শায়খ তৈয়্যবুর রহমান, দা. বা. (আসাম), তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য।[২] তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. মাওলানা নোমান সাহেবের মৃত্যুপূর্বে গবেষকের একান্ত সাক্ষাৎকার।

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস চর্চায় মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	শায়খুল হাদীসের রচনাবলী
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খুল হাদীসের অবদান
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের অনূদিত গ্রন্থাবলী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	*ফাযায়েলে আ'মাল* ও হাদীসের তাহকীক

প্রথম পরিচ্ছেদ
শায়খুল হাদীসের রচনাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শায়খুল হাদীসের রচনাবলী

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীর লেখাচর্চা শৈশব থেকেই শুরু হয়। কিন্তু হস্তলিপি এখনো সুন্দর হয়নি। তিনি বলেন, আমি যা লিখতাম তা শুদ্ধ ও নির্ভুল লিখার চেষ্টা করতাম। আমার হস্তলিপি সুন্দর না হওয়ায় '*বাযলুল মাজহূদ*' রচনাকালে অনেক হিংসুক লেখার কাজ থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়, এ কথা বলে যে, যাকরিয়ার হাতের লেখা সুন্দর নয়। অমুকে খুব ভালো লিখতে পারে। তাকে দিয়ে লিখালে ভালো হয়। কিন্তু মুনশী মাহবুব আলী যিনি কাতেব ছিলেন এবং সকলের হস্তলিপির উস্তায ছিলেন, তিনি *বাযলুল মাজহূদ* প্রথম খণ্ড লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট এসে বললেন, হযরত! যাকারিয়ার লেখা খারাপ হলেও তাঁকে লিখিয়ে আমাকে দিন। কারণ, তাঁর অক্ষরগুলো স্পষ্ট হয়। নোকতা সহীহ হয়। আমার মতো জাহেলের জন্য এমন লেখাই ফলপ্রসু ও উপকারী।

যাইহোক, প্রথমে তো স্লেটে ب ت ث । লেখা শুরু করি। এরপর কিছুদিন পর কুর'আন মাজীদ পড়ার জামানায় বেহেশতী যেওর দেখে দেখে লেখা শুরু করি। এরপর ফার্সি কিতাব থেকেও লেখা চর্চা করি। এরপর থেকে স্বতন্ত্রভাবে রচনার কাজ শুরু হয়ে যায়। সর্বপ্রথম আব্বাজান দু'টি অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরি করে দরসের নিয়ম বলে দিতেন এবং এরদ্বারা সীগা তৈরি করার জান্য নির্দেশ দিতেন। সে সময় সীগা চর্চা এতো বেশি পরিমাণে করেছি, بت শব্দ দিয়ে ত্রিশ চল্লিশটি সীগা তৈরি করার কথা এখনো মনে পড়ে। রাতদিন সবসময় সীগা তৈরি চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। তখনকার খাতাগুলো তালাশ করলে হয়তো এখনো পাওয়া যাবে। কোনো সময় দিল্লি যাওয়ার প্রোগ্রাম হলে বাড়িতে বসে সর্বশেষ স্টেশন পর্যন্ত সীগা চর্চায় মশগুল থাকতাম।

এরপর থেকে আদব চর্চার প্রতি অনুরাগ বেড়ে গেলো। সাহারানপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত জানালা দিয়ে মুখ বের করে কেবল কবিতা পড়তে থাকতাম। এর কিছুদিন পর এভাবে কুর'আন পড়ার যুগ শুরু হয়ে গেল। বাযলুল মাজহূদ ছাপার কাজে তখন প্রায়শই দিল্লি যেতে হতো। সে সময় সারা পথ কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াতে মশগুল থাকতাম। শায়খুল হাদীসের রচনাবলীর পরিচিতি সম্পর্কে শায়খুল হাদীস নিজেই বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

(১) *شرح الفية اردو* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*আলফিয়া* পড়ার পাশাপাশি এর উর্দু শরাহ লিখতে শুরু করেছিলাম। তিন খণ্ডে তা সমাপ্ত করেছি। ১৮ শা'বান ২৯ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার তা পূর্ণ হয়। এর পাণ্ডুলিপি আলমারিতে আছে।"[১]

(২) *شرح مسلم اردو* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি ২৩ হিজরীতে *সুল্লামুল উলূম* পড়ি। মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ লম্বা তাকরীর করতেন। আমি এগুলো সাথে সাথে নোট করে নিতাম। পরবর্তীতে পরিষ্কার করে অন্যত্রে লিখে রাখতাম।

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

এর পাণ্ডুলিপিটি কয়েক বছর আগে চোখের সামনে পড়েছে। কিন্তু এখন বেশ কিছুদিন যাবত দেখছি না।"[১]

(৩) *اضافة بر اشكال اقليدس* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি ২৩ হিজরীতে জ্যামিতি পড়ার সময় এর মূলনীতির আলোকে নিজের মতো করে বিভিন্ন বৃত্ত অঙ্কন করে তৈরি করেছিলাম। এর কপিগুলো এখনো মওজুদ আছে।"[২]

(৪) *تقرير مشكاة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি *মিশকাত* পড়ার সময় এটা লিখেছিলাম। তবে তা খুব সংক্ষিপ্ত ছিলো। ৪১ হিজরীতে যখন *মিশকাত* পড়ানো শুরু করি তখন এটাকে সামনে রেখে আরো অনেক বিষয় সংযোজন করি। এটা তো ছাপা হয়নি। তবে ছাত্র উস্তাযগণ প্রায় ১০০ কপি ফটোকপি করে নিয়েছেন।"[৩]

(৫) *تقارير كتب حديث* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি অধম সিহাহ সিত্তাহ সর্বপ্রথম আব্বাজানের নিকট পড়েছি। দ্বিতীয়বার মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট পড়েছি। উভয়ের তাকরীর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নকল করে রেখেছি। তবে তা সুনিব্যস্ত ছিলো না। আমার খুব স্মরণ আছে, মাওলানা সাহারানপুরী দুই লাইনের মধ্যেস্ত কিছু উচ্চারণ করলেও সেটাও লিখে রাখতম এ বলে যে, এটা মাওলানা সাহারানপুরী বলেছেন।

(৬) *مشائخ چيشت* (অপ্রকাশিত)

(৭) *احوال مضاهر العلوم* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি অধম পড়া-শোনা শেষে শিক্ষকতার প্রথম বছর থেকে দু'টি পুস্তিকা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলাম। একটা হচ্ছে, "*মাশায়েখে চিশতিয়া*' মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সকল আওলিয়া কিরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী বৃত্তান্ত। বরকত স্বরূপ লিখতে শুরু করেছিলাম। এটা পূর্ণ হতে অল্প কিছু বাকি ছিল।

অনুরূপ মাদরাসার হক আদায়ের নিমিত্তে শুরু থেকে নিয়ে ৩৪ হিজরী পর্যন্ত বছরের ক্রমধারা অনুসারে আয় ব্যয়ের হিসাব, ফারেগীনদের সংখ্যা উস্তাদ নিয়ো, বরখাস্ত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলোম। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে আকাবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু তাদরীসের পাশাপামি '*বযলুল মাজহূদ*' এর ব্যস্ততায় তা লেখা সম্ভব

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

হয়ে উঠেনি। উভয় পুস্তিকা বহুলাংশে লেকার পরও কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়। এখন তো এগুলো পূর্ণ করার কোনো সুযোগ নেই।"[১]

(৮) *تلخيص الذل* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"৩৫ হিজরী থেকে বাযলুল মাজহূদ লেখার কাজ শুরু হয়। অধমের নিয়ম ছিলো মাওলানা সাহারানপুরী সারা দিনে যা লিখতেন এর একটা সারনির্যাস প্রতিদিন আমি নোট করে নিতাম। এতে অনেক লম্বা আলোচনাগুলো সংক্ষেপে সামনে চলে আসতো। কিন্তু তা আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।"[২]

(৯) *شذرات الحديث* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি অধমের নিয়ম ছিলো *বাযলুল মাজহূদ* লিখার সময় *বুখারী*, *মুসলিম* ইত্যাদির ব্যাখ্যাগ্রন্থের কোনো বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হলে আমি সেটা লিখে রাখতাম। প্রত্যেক কিতাবের জন্য পৃথক পৃথক খাতা ছিলো। অনেক সময় আমি অধমও কিতাবের হাওয়া দিয়ে বলি যে, والبسط في الشذر، كذا في الشذر

কোনো ব্যক্তি দু' চার মিনিটের জন্য মাওলানা সাহারানপুরীর সাথে কথা বলার জন্য আসলে আমি তাড়াতাড়ি ঐ সব বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট খাতায় লিখে রাখতাম। এজন্য আমি সবসময় কামনা করতাম, কোনো আগন্তুক তাঁর কাছে আসলে মাওলানা সাহারানপুরী তার সাথে কথা বাড়াতেন না। খুব সংক্ষেপে জরুরি কথা সেরে লেখায় মশগুল হয়ে যেতেন। ডাক (চিঠিপত্র) আসলে সামান্য কিছু সময় পেয়ে যেতাম। মাওলানা সাহারানপুরী নিজে ডাকগুলো আগে পৃথক করে নিতেন এবং কোনো পত্র জরুরি মনে করলে সেটা খুলে দেখতেন।

এখানে একটা ঘটনা মনে পড়লো। মাওলানা সাহারানপুরীর এক ঘনিষ্ঠজন থানার কর্মকর্তা ছিলেন। সুট কোট পরে একবার তাঁর নিকট আসলেন। আমি যেহেতু দরজার সামনে বসতাম, এজন্য দূর থেকে তার আগমন দেখে খুব খুশি হলাম। ভাবলাম, এ তো شذرات লেখার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছি। লোকটি এসে তাঁকে সালাম দিয়ে কথা বলতে শুরু করলো, এরই মধ্যে আমি খাতা নিয়ে شذرات লিখতে শুরু করলাম। মাদরাসা মাযাহিরুল উলূমের নাযেমে কুতুবখানা মাযহার সাহেবও থানা কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। তিনিও সাথে এসেছিলেন। কয়েক মিনিট তিনি তাদের সাথে কথা বললেন।

এরই মধ্যে আমি شذرات লেখা শেষ করে ফেলেছি। লোকটি বের হাওয়ার সাথে সাথে আমি '*বাযলুল মাজহূদ*'-এর খাতা হাতে নিলাম। থানা কর্মকর্তা বিষয়টি খেয়াল করেলেন যে, আমি তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। সে বের হয়েই মাযহার ভাইকে বললেন, মাওলানা সাহারানপুরীর কামরায় যে লোকটি আছে তাকে আমার কাছে একটুও ভালো লাগনো না। আমার মনে হয়, সে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল মনে করেছো। মাযহার ভাই বললেন, ভাই আসলে আপনি যেমনটি মনে

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

করেছেন এমন নয়; বরং তিনি এতো বেশি ব্যস্ত যে, কারো সাথে কথা বলা বা কারো দিকে ফিরে তাকানোর সময় তার কাছে নেই। আপনি এ বিষয়ে এ খারাপ করবেন না।"[১]

(১০) *جزس حجة الوداع والعمرات* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"৪১ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে আমার *মিশকাতুল মাসাবীহ* পড়ানোর সুযোগ হয়। সেসময় তথা ২২ রবিউল আওয়াল জুমার রাতে ১২ টা থেকে এ কিতাবটি লেখা শুরু করি এবং তা একদিন দেড় রাত সময়ে তা লিখে পূর্ণ করি। আমার মুরুব্বীগণ এ কিতাবটি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, একদিন দেড় রাতে কিতাবটি নকল করাও তো সম্ভব নয়। সিনিয়র উস্তাদগণ যখন কিতাবুল হজ্জ পড়াতেন তখন তারা এ কিতাবটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতেন। সেসময় ছাপর খেয়াল করিনি। অনেকে ছাপার জন্য অনুরোধও করেছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে বলেছি, এটাতো একটি নোট মাত্র। ছাপার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

কিন্তু গত বছর ৮৯ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারায় হঠাৎ এটা ছাপার খেয়াল হয়। জিলকদের শেষ দিকে এটা গুণতে শুরু করি। চোখের সমস্যার কারণে লেখা পড়তে পারতাম না। মাওলানা আকিল ও মাওলানা সালমান এটা পুনরায় পরিষ্কার করে লিখেছে। ৯০ হিজরীর ২৬ রবিউস সানীতে এটার পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়। কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, এ পাণ্ডুলিপির সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওমরার বয়ান সংযোজন করে নিলে বইটি পূর্ণাঙ্গ হতো। এজন্য ১৭ জুমাদাল উলা ৯০ হিজরীর রোজ বুধবার *جزء العمرات* লেখা শুরু করি ১৫ রজব ৯০ হিজরীর শুক্রবার দিনে লেখা শেষ করি। ৯০ হিজরীর শা'বান মাসে এ কিতাবটি প্রথম প্রকাশ পায়।"[২]

(১১) *خصائل نبوی شرح شمائل ترمذي* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*বাযলুল মাজহূদ* ছাপার জন্য আমার প্রায় সময় দিল্লিতে যাওয়া হতো। প্রতি পনেরো থেকে বিশ দিন অন্তর অন্তর এক দুই রাতের জন্য যেতাম। রাত একটায় গাড়ি সাহারানপুর থেকে রওয়ানা হতো। ৪৩ হিজরী সনে *বাযলুল মাজহূদের* কাজের ফাঁকে ফাঁকে *খাসাইলু নাবিয়্যি শারহি শামাইলি তিরমিযী* লিখতে শুরু করি। ৪৪ হিজরী সনে ৮ জুমাদাস সানীতে আমার লিখার কাজ শেষ হয় এবং ৬০ হিজরী সনে এতে আরো কিছু সংযোজন করে প্রকাশ করা হয়।"[৩]

(১২) *حواشي بذل المجهود* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*বাযলুল মাজহূদ* ছাপার পর *আবূ দাঊদ* কিংবা হাদীসের অন্যান্য কিতাবে নতুন কোনো কথা পেলে সেটা *বাযলুল মাজহূদের* টীকা হিসেবে লিখে রাখতাম। পরবর্তীতে এটা একটা জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত হয়।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।

(১৩) *تحفة الاخوان* (প্রকাশিত)

(১৪) *شرح عربي جزري* (অপ্রকাশিত)

(১৫) *رسالة در احوال قراء سبعة البدور مع نجومهم الأربعة عشر* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"৪৫ হিজরী আমি মদীনা মুনাওওয়ারায় এক বছর অবস্থান করার নিয়তে সফর করি। সেখানে ক্বারী হাসান শায়েরের কাছে তাজবীদ পড়ার কৌতুহল জন্মায়। যিনি মক্কা এবং মদীনার ক্বারী সাহেবদের প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমি শাতেবী পড়া শুরু করলাম। কিন্তু প্রথম ক্লাসেই তাঁর সাথে আমার মতানৈক্য হয়। কেননা, ক্বারী সাহেব বললেন, "কবিতাগুলো মুখস্থ করে নাও, মর্ম বুঝার প্রয়োজন নেই।" আমি আরয করলাম, কবিতাগুলো তো অবশ্যই মুখস্থ করবো, কিন্তু মর্ম বুঝতে না পারলে এরদ্বারা কী ফায়দা হবে? মাওলানা সাহারানপুরী কয়েকমাস পরে বিষয়টি জানতে পেরে আমাকে বললেন, তুমি তো আমাকে বললেই পারতে আমি তোমাকে শাতেবী বুঝিয়ে দিতাম। সেদিন থেকেই ক্বারী সাহেবের শিষ্যত্ব শেষ। ক্বারী সাহেব তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত গর্ব করে বলতেন, এ আমার বুদ্ধিমান শাগরেদ।

ক্বারী সাহেব একটি বই পড়াতেন, تحفة الاخوان في بيان تجويد القرآن এ বইটি আরবী। কিন্তু উর্দু জানতেন না, এজন্য তিনি আমাকে এ কিতাবের উর্দু তরজমা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি এক দুই দিনে আমি তরজমা করে দিলাম। তাঁর জীবদ্দশায় কিতাবটি পনেরো থেকে বিশ বার প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় রেসালা شرح عربي جزري এটাও ক্বারী সাহেবের নির্দেশে আরবী ছাত্রদের জন্য লেখা হয়। এ রেসাটি ছাপা হয়ে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এসে গেছে।

তৃতীয় রেসালা احوال قراء سبعة এটাও মদীনা শরীফে অবস্থানকালে লেখা। এখানে সাতজন ক্বারী ও চৌদ্দজন শাগরেদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এ রেসালাটি *বাযলুল মাজহূদ* লেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখেছি।

(১৬) *اوجز المسالك شرح موطأ امام مالك* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"গ্রন্থটি ১৭ খণ্ডে অথবা বিভিন্ন প্রকাশনি বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থটির ব্যাপারে অত্র অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে।

(১৭) *فضائل قرآن* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী এর অন্যতম খলীফা শাহ ইয়াসীন প্রতি বছর মাযাহিরুল উলূমের জলসায় শরীক হতেন। ২৭ জিলকদ ১৩৪৮ হিজরী সেন জলসা চলাকালীন তিনি এর উপর কিছু লেখার জন্য খুব অনুরোধ কররেন। তাঁর নির্দেশ বাস্তাবায়নে জিলহজ্জের শুরু থেকে এটা লেখা শুরু হয় এবং ২৯ হিজরীর শেষ দিকে খতম হয়। ফাযায়েল সংক্রান্ত এটাই আমার প্রথম রচনা। আর ফাযায়েলে দরূদ হচ্ছে সর্বশেষ রচনা।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

(১৮) *فضائل رمضان* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৪৯ হিজরী সনে রামাদান মাসে চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর নির্দেশে এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে।

(১৯) *قرآن عظيم اور جبرية تعليم* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৪৯ হিজরী সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন সম্পর্কে এসেম্বলীর সদস্যদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। আমি অধমের লেখা ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পত্র ছাপা হয়।

(২০) *فضائل تبليغ* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটি ১৩৫০ হিজরী সনে ৫ সফর তারিখে আমার চাচাজানের নির্দেশে লেখা হয়।"

(২১) *الكوكب الدري* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটি হলো মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর তাকরীর।

(২২) *حكايات صحابة* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৫৭ হিজরী সনের সফর মাসে শাহ্ আবদুল কাদের রায়পুরী'র নির্দেশে প্রায় চার বছর পূর্বে শুরু করি। ৫৭ হিজরী সনের ১২ শাওয়াল মাসে তা পূর্ণ হয়।"[১]

(২৩) *الاعتدال في مراتب الرجال* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৫৬ ও ১৩৫৭ হিজরীর শুরুর দিকে লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিলো। এ মতোবিরোধে জড়িয়ে আকাবিরদের সাথে অনেকে চরম ধৃষ্টতা ও বেআদবী প্রদর্শন করে। কিছু লোক তাদের প্রতিপক্ষ ইমামকে পর্যন্ত জুমু'আ ও ঈদের নামাযে ইমামতি করতে দেয়নি। প্রতিপক্ষ দলের মৃতদেহ দাফন করাতে বাধা এসেছে।

এ সময় অধমের নিকট অনেক পত্রাবলি জমা হতো। তাদের এ পত্রাবলির জবাব পৃথক দেয়া মুশকিল ছিলো। তারপরও অপারগ হয়ে উত্তর লিখতে হয়েছে। ২৯ শা'বান ১৩৫৭ হিজরীর সকল অভিযোগের জবাব লেখা শেষ হয়।"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

(২৪) *مقدمات كتب حديث* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমি ২৬ হিজরী থেকে ১৩৫৬ হিজরী সন পর্যন্ত ইলমুল হাদীস সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তা আমি *আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থের ভূমিকায় সংযোজন করেছি।"

(২৫) *فضائل نماز* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর নির্দেশে ১৩৫৮ হিজরী সনে ৭ মুহাররম মাসে সোমবার রাতে তা পূর্ণ করা হয়।"

(২৬) *فضائل ذكر* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটিও চাচাজানের নির্দেশে ১৩৫৮ হিজরী সনে ২৬ শাওয়াল মাসে লিখেছি।

(২৭) *فضائل حج* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৬৬ হিজরী সনে ৩ শাওয়াল মাসে এ গ্রন্থটির লেখা শুরু করি এবং ১৩৬৭ হিজরী সনে ১৪ জুমাদাল উলা মাসে রোজ বৃহস্পতিবার শেষ হয়।

(২৮) *فضائل صدقات* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৬৮ হিজরী সনে ২২ সফর মাসে *ফাযায়েলে সাদাকাতের* কাজ শেষ হয়।"

(২৯) *لامع الدراري* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*أوجز المسالك* সমাপ্ত করার পর ১৩৭৬ হিজরীর ৭ মুহাররম এ কিতাবের রচনা কাজ শুরু করি। ১৩৮৮ হিজরীর ১০ রবীউল আওয়াল মাসে এ কিতাবের রচনা কাজ সমাপ্ত হয়।"

(৩০) *فضائل درود شريف* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ কিতাবটি শাহ ইয়াসীন এর নির্দেশক্রমে রচনা করি। এছাড়াও *ফাযায়েলে কুর'আন* আমি তাঁরই অনুরোধে লিখেছি। তিনি অন্তিম সময় তাঁর খাদেম ও বিশষ্ট খলীফা শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবীকে অসিয়্যত করেন, "যাকারিয়াকে বলবে, আপনি শাহ্ ইয়াসীনের অনুরোধে *ফাযায়েলে কুর'আন* রচনা করেছেন। অতএব তাঁর অনুরোধে পুনরায় *ফাযায়েলে দরূদ*ও রচনা করবেন।"

(৩১) *رسالۂ اسٹرائك* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"বিভিন্ন সময় দ্বীনি মাদরাসাসমূহে স্ট্রাইক ও অবরোধের পরিস্থিতি হতো। এক সময় স্ট্রাইক ও অবরোধ বেড়ে যাওয়ায় ১৩৮৮ হিজরী সনে ১২ রবী'উল আউওয়া এ পুস্তিকাটি রচনা করি। এতে আকাবিরগণের বাণীসমূহ সংকলন করা হয়।"

(৩২) آپ بیتي (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ সানী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের জীবনী গ্রন্থ "*সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ*" রচনা করেন। এতে সায়্যিদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী এক অনুচ্ছেদে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের মুরব্বী হিসেবে আমার নামেও কিছু বৃত্তান্ত লিখেন। সায়্যিদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবীকে আমি লিখলাম, যে বিষয় লেখার প্রয়োজন ছিল না তা লিখেছেন। আর সে বিষয়গুলো লেখার প্রয়োজন ছিলো তা আপনি লিখেননি। এরপর আমি নিজ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় লিখে তার কাছে প্রেরণ করলাম। অতঃপর অনেকের অনুরোধে আরো কিছু বিষয় সংযোজন করে ১৩৮৮ হিজরী সনের ১৫ রবীউস সানী মাসে *আপবীতি* নামে দুই খণ্ডে ছাপানো হয়।"[১]

(৩৩) *اصول الحديث على المذهب الحنفية* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের উসূলে হাদীসের উপর একটি মতন। ১৩৪২ হিজরী সনে এ গ্রন্থটি লেখা শুরু করি। ১৩৮৮ হিজরী সনে ১০ জুমাদাল উলা রচনা কার্য শেষ হয়। অতঃপর ১৩৮৮ হিজরী সনে এ গ্রন্থের উপর টীকা লেখা চলতে থাকে।

(৩৪) *الوقائع والدهور* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানার এবং তার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন বনূ উমাইয়া এবং পরবর্তী জামানায় যে সকল ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে এগুলোকে তিনভাগে লিখেছি। প্রথম ভাগে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানার ঘটনাবলী, দ্বিতীয়ভাগে খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানার ঘটনাবলী, তৃতীয় ভাগে পরবর্তী জামানার ঘটনাবলী লিখি। ১৩৮৮ হিজরী পর্যন্ত এ গ্রন্থের রচনা কার্য চলতে থাকে।"[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

(৩৫) *المؤلفات والمؤلفين* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থরচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। ১৩৪৭ হিজরী সনে ১ জুমাদাস সানীতে এ গ্রন্থে লিখনী কার্য শুরু হয়। ১৩৮৮ হিজরী সনে এ গ্রন্থের রচনা কার্য চলতে থাকে।"[১]

(৩৬) *تلخيص المؤلفات المؤلفين* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এখানে গ্রন্থ রচয়িতাগণের নাম ও তাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে এবং বিস্তারিত পড়ার জন্য কিতাবের হাওয়ালাগুলো দেয়া হয়েছে।"

(৩৭) *جزء المعراج* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মে'রাজের উপর একটি সংক্ষিপ্ত রেসালা লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। কয়েক পর্ব লেখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি।"

(৩৮) *جزء وفات النبي صلى الله عليه وسلم* (অপ্রকশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকালের পূর্ব অসুস্থতার পটভূমি থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিস্তারিত অবস্থা এখানে লেখা হয়েছে। কিন্তু আফসোস, তা শেষ করতে পারলাম না।"

(৩৯) *جزء افضل الأعمال* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"সর্বোত্ত আমল কোনটি? এ নিয়ে বহুবিধ বর্ণনা রয়েছে। এ রিসালায় সকল বর্ণনা একত্র করে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হাদীস বিশারাদগণের অনেক উক্তি রয়েছে। আমি এগুলো এ কিতাবে নকল করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি।"

(৪০) *جزء رواية الاستحاضة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"الاستحاضة সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো পারস্পরিক বৈপরিত্য এ কথা সকলেরই অবিদিত। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী *বাযলুল মাজহূদে* الاستحاضة সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিরোধ সবসময় ছিলো। ভাবছিলাম, '*বাযলুল মাজহূদ*' লেখানোর সময় হয়তো বুঝে আসবে, কিন্তু এতেও পুরোপুরি বুঝে আসেনি। এ বিষয়ে *كوكب الدراري، لامع الدراري، اوجز المسالك* গ্রন্থত্রয়ে লিখেছি। তাও পুরোপুরি বুঝে আসেনি। *كوكب الدراري* এর টীকায় হাসনা বিনতে জাহ্শ-এর ঘটনায় আমি অধম এক স্বতন্ত্র রায় লিখেছি। যা অন্য সকল রায়ের বিপরীত। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ

১. প্রাগুক্ত।

মাদানী আমার এ লেখা দেখে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর এসে বলেন, আমি এ বিষয়ে জানার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তো খুব যুক্তিসঙ্গত লিখেছো। কিন্তু আমার বুঝে আসে না সকল মুহাদ্দিসীনের রায়ের বিপরীত তোমার কাছে এটার ইলহাম কোথা থেকে আসলো? *বাযলুল মাজহূদে* তো অন্যান্যদের মতোই লিখা হয়েছে। কিন্তু তুমি এ নতুন তথ্য কোথায় পেলে? এর কি কোনো দলীল আছে? আমি আরজ করলাম, এর স্পষ্ট দলীল তো *ত্বহাবী শরীফে* এসেছে। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী বলেন, তাহলে তো এটা খুবই শক্তিশালী উৎস। অতঃপর তিনি *ত্বহাবী শরীফ* খুলে দেখেন।"[১]

(৪১) *جزء رفع اليدين* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"নামাযে রুকুতে যাওয়ার সময় ও উঠার সময় হাত উঠানো প্রসঙ্গে খুব প্রসিদ্ধ মাসআলা। আমি এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা একত্রে করে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা পুরা হয়নি।"

(৪২) *جزء الأعمال بالنيات* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ হাদীসটি তো ব্যাপক। অনেক মাসআলা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। আলোচ্য রেসালা এ হাদীস দিয়ে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত লেখার সুযোগ হয়নি।"

(৪৩) *جزء اختلاف الصلاة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*মিশকাত শরীফ* পড়ার সময় চার রাকআত নামাযে ইমামগণের মতভিন্নতা একত্র করতে শুরু করলাম। দুই শতেরও বেশি ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলা লিখেছিলাম বটে। কিন্তু হাদীসের দরসে এ কিতাবের বিষয়বস্তু প্রথমে সংক্ষেপে বর্ণনা করতাম। এরপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করতাম।"

(৪৪) *جزء اسباب اختلاف الأئمة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম থেকে '*আল-মাযাহির*' নামে মুফতী জামীলের তত্ত্বাবধানে একটি পুস্তিকা বের হওয়ার কাজ শুরু হলো। এ পুস্তিকায় আমার একটি প্রবন্ধ কয়েক ধাপে ছাপা হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম হচ্ছে, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে এতো মতোবিরোধ কেন? বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা এ সংক্রান্ত লেখা ছাপা হয়। এরপরে এ বিষয়ে আরো লিখেছিলাম। কিন্তু '*আল-মাযাহির*' বন্ধ হয়ে যায়। তখন অনেক জায়গা থেকে চিঠি আসা শুরু করলো। তারা লিখলো যে, আমরা *আল-মাযাহির* পুস্তিকাটি ক্রয়ই করতাম আপনার এ প্রবন্ধের জন্য। আর যদি প্রবন্ধটি অন্য কোথাও প্রকাশ করেন তার ঠিকানা দেন অথবা প্রবন্ধটি পূর্ণ করে স্বতন্ত্রভাবে তা প্রকাশ করেন তাও বলেন, আমরা এটা ক্রয় করে নিবো, ইনশাআল্লাহ।"[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

(৪৫) جزء المبهمات في الأسانيد والروايات (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"হাদীসের সনদ ও মতনে অনেক নাম অস্পষ্ট থাকে। আমি অন্য হাদীস থেকে অনুসন্ধান করে এ নামগুলোর অস্পষ্টতা এ গ্রন্থে দূর করার চেষ্ট করেছি। তবে تقريب التهذيب ও تعجيل المنفعة যে নামগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করিনি।"

(৪৬) رسالة التقدير (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এক সময় দিন-রাত কেবল এ চিন্তা পোষণ করতাম, মানুষের তাকদীরে যা আছে, এরচেয়ে বেশিও পায় না আবার এরচেয়ে কমও পায় না। যেমন, কারো তাকদীরে যদি মুরগি থাকে, তবে সে অবশ্যই মুরগি খাবে। হয়তো বুযুর্গ হয়ে খাবে, না হয় উপার্জন করে খাবে, কিংবা নেতা হয়ে খাবে। যদি এর কোনো যোগ্যতা তার না থাকে, তবে কোনো পদস্থ হাকীমের বাবুর্চি ও চাকর হয়ে খাবে। এ ধরবের অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এ রিসালায় লিখেছি, যা তখনকার সংবাদে ছাপা হয়েছিল।"

(৪৭) سيرة صديق (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*আস্-সিদ্দীক* পত্রিকার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু)-এর জীবন বৃত্তান্ত লেখার সুযোগ হয়েছিলো। পাণ্ডুলিপিতে অনেক লেখা তৈরি করা হয়েছিলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক দুই কিস্তি ছেপে এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।"

(৪৮) رسالة فوائد حسينى (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (রহ.) প্রায় সময় সাহারানপুর মাদরাসায় তাশরীফ আনতেন। অনেক সময় তিনি মাওলানা সাহারানপুরীর সাথে ইলমী বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমি সেই আলোচনাগুলো লিখে রাখতাম। এটা খুবই মূল্যবান রিসালা। কিন্তু রিসালাটি ছাপার সুযোগ হয়নি।"[১]

(৪৯) حواشى كلام پاك (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"কালামে পাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কুর'আন মাজীদ। ১৩৩৮ হিজরী থেকে ১৩৮৫ হিজরী পর্যন্ত রামাদান মাসে রাতের বেলা ঘুমের আমল ছিলো না। সোয়া পারা কুর'আন মাজীদ অর্থসহ কয়েকবার পড়ার অভ্যাস ছিলো। কোথাও কোনো প্রশ্ন জাগলে তাফসীরের কিতাবসমূহ দেখে সমাধান করে নিতাম এবং দুই লানের মধ্যবর্তী স্থানে সেটা লিখে রাখতাম। কিন্তু আফসোস! চার বছর যাবত চোখের সমস্যার কারণে সেটা এখন পড়তে পারছি না।"[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

(৫০) *حواشی الاشاعة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*الاشاعة في اشراط الساعة* ছাত্র যামানা থেকেই আমার মুতালা'আয় ছিলো। আমি প্রতি দুই পৃষ্ঠার মাঝখানে একটি সাদা পৃষ্ঠা দিয়ে যুক্ত করে বাইন্ডিং করে নিয়েছিলাম। মুতালা'আর সময় এতে সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ টীকা লিখে রাখতাম।"[১]

(৫১) *حواشی وذیل التهذیب* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"হাফেয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (রহ.) এর *তাহযীব*, *তাকরীর*, *তা'জীল* ইত্যাদি কিতাবে টীকা লিখে রাখার অভ্যাস ছিলো। তবে *তাহযীবুত তাহযীব* কিতাবে টীকার পরিমাণটা ছিলো বেশি। এটাকে *যাইলুত্ তাহযীব* নামে বারো খণ্ডে বিভক্ত করে সাজিয়েছিলাম। টীকায় বেশি লিখা হয়েছিলো। অবশিষ্টাংশ লেখা কম হয়েছিলো।"

(৫২) *حواشي أصول الشاشي، هداية وغيره* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এটি হলো *উসূলুশ শাশী*, *হিদায়া*সহ আরো কিছু কিতাবের বিবরণ। অর্থাৎ আমি মাদরাসা থেকে কিতাব নিতাম না। আমি আমার ব্যক্তিগত কিতাব মুতালা'আ করলাম। কেননা, মুতালা'আর সময় নতুন নতুন টীকা সংযোজন করতাম। এজন্য আমার প্রায় সব কিতাবেই কম বেশি হাশিয়া আছে।"

(৫৩) *حواشي مسلسلات* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"দাওরায়ে হাদীসের বিশিষ্ট কিছু ছাত্র ১৩৬৪ হিজরী সন থেকে মুসালসালাত হাদীসের এজাযত নেয়া শুরু করে। কিন্তু কয়েক বছর পর থেকে এটা স্বতন্ত্র দরসে পরিণত হয়। তখন থেকে এর উপর হাশিয়া লিখে রাখতাম। মুসালসালাত বর্ণনাকারীদের বৃত্তান্ত পৃথক একটা রিসালা লিখেছিলাম।"

(৫৪) *جزء مكفرات الذنوب* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"হাদীস শরীফে যে আমলকে গোনাহের কাফ্‌ফারা বলা হয়েছে, সেগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে এতে জমা করেছি। বিস্তারিত লিখার সুযোগ হয়নি।"

(৫৫) *جزء ملتقط المرقات* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"আমার উপর যখন *মিশকাত শরীফে*র দরস দানের দায়িত্ব আসে, তখন থেকে আমি *মিশকাতে*র শরাহ *মিরকাত* মুতালা'আ করার সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখতাম।"

---

১. প্রাগুক্ত।

(৫৬) *جزء ملتقط الرواة عن المرقات* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এটি *মিশকাতুল মাসাবীহ* পড়ানোর সময় লিখেছি। মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহ.) যেসকল বর্ণনাকারী সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন, তাদের আলোচনাগুলো এ কিতাবে একত্র করেছি। এটার প্রথম খণ্ড ১৩৪১ হিজরী সনে ২৯ জিলকদ শেষ হয়।"

(৫৭) *معجم المسند للامام احمد* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*মুসনাদে আহমাদের* রেওয়াতগুলো সাহাবীদের নাম অনুসারে সাজানো হয়েছে। এজন্য এতে হাদীস খুঁজে পেতে অনেক কঠিন। সাহাবীগণের নামের বর্ণনানুক্রমে এতে হাদীস একত্র করা হয়েছে। আলোচ্য রেসালায় সাহাবীগণের নাম বর্ণনুক্রম হিসেবে সাজানো হয়েছে এবং *মুসনাদে আহমাদের* কত পৃষ্ঠায় তাঁর হাদীসগুলো রয়েছে সেটার একটা বর্ণনা করা হয়েছে। এটা খুবই উপকারী একটি রিসালা। এর মাধ্যমে *মুসনাদে আহমাদের* হাদীসগুলো খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হবে।"

(৫৮) *جزء المناط* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ রিসালায় হাদীসের মধ্যে হুকুমের কার্যকরণ (المناط) নির্ণয়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম চতুষ্টয়ের মতোবিরোধ সাধারণত এর উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। উপরিউক্ত রিসালায় تخريج المناط، تنقيح المناط ও تحقيق المناط নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।"

(৫৯) *رسالة مجددين ملت* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের প্রত্যেক শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদ জন্ম নিবে। প্রত্যেক জামানায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ যাকে মুজাদ্দিদ বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের তালিকা ও এ রিসালায় তুলে ধরা হয়েছে। চৌদ্দশত শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদীনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের মন্তব্য লিখা হয়েছে।"

(৬০) *جزء صلاة الاستسقاء* (অপ্রকাশিত)

(৬১) *جزء صلاة الخوف* (অপ্রকাশিত)

(৬২) *جزء صلاة الكسوف* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"উপরিউক্ত মাস'আলায় যে ইমামগণের মতোবিরোধ রয়েছে এবং এসব মাস'আলার তারিখ নিয়ে মতোভিন্নতা রয়েছে। এসব নামায কখন শুরু হয়েছে এবং কয়বার রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের নামায পড়েছেন। এছাড়াও তিনি এ নামায কোথায় কোথায় পড়েছেন। এ বিষয়ে অনেক মতোবিরোধ আছে।

উপরিউক্ত রিসালাগুলোতে তিন নামায সংক্রান্ত সকল বর্ণনা একত্র করা হয়েছে। কিছু বর্ণনাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রাধান্য দিয়েছি। *আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থে এর সারকথা লিখা হয়েছে।"

(৬৩) *جزء ما قال المحدثون في الامام الأعظم* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর শানে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরামের আলোচনা-সমালোচনা তুলো ধরা হয়েছে।"

(৬৪) *جزء تخريج حديث عائشة في قصة بريرة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ রিসালায় আম্মাজান আয়েশা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহা)-এর সূত্রে বর্ণিত বারীরা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহা)-এর ঘটনার ভাষ্য নিয়ে রিওয়ায়তগুলো পরস্পর বিরোধী। এ রিসালায় সব রিওয়ায়তকে একত্র করা হয়েছে। যাতে পাঠক এক নযরে সবগুলো বিরোধের বিষয়ে একত্রে অবহিত হতে পারেন।"[১]

(৬৫) *تقرير نسائى شريف* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী-এর তাকরীর সংযোজন করেছি। বিশেষ করে ইমাম নাসাঈ (রহ.) قال ابو عبد الرحمن বলে যেসকল মন্তব্য করেছেন, এগুলোরও বিস্তারিত আলোচনা এখানে করেছি।"

(৬৬) *جزء امراء المدينة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে মদীনার অধিকাংশ আমীর তথা শাসকে'র ভাষা নকল করা হয়েছে। তাঁরা এমন এমন করতেন। এতে মদীনার সকল শাসকের নাম ও তাঁদের শাসনকাল এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী একত্রিত করেছি।"

(৬৭) *جزء طرق المدينة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মদীনা থেকে মক্কায় আসার জন্য চাররি রাস্তা প্রসিদ্ধ। এ রিসালায় এসব রাস্তার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেছি।"

(৬৮) *جزء ما يشكل على الجارحين* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"হাদীস গবেষকদের মন্তব্যে যেসকল আপত্তিকর কথা আছে, এ রিসালায় এগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে।"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

(৬৯) *جزء الجهاد* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে জিহাদের পরিচয়, আহকাম, শর্তাবলী, আমির ও শরীয়ত নির্দেশিত খলীফার শর্তাবলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।"

(৭০) *جزء انكحته عليه السلام* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং তাঁদের পূর্ণ বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে।"

(৭১) *مشائخ تصوف* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আকাবির বুযুগানে দীনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হয়েছে, চিশতীয়া তরিকার মাশায়েখদের বৃত্তান্ত *মাশায়েখে চিশত* নামে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছি।"

(৭২) *اوليات القيامة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থে ঐ সকল হাদীসকে একত্রিত করা হয়েছে, যার শুরুতে বর্ণনাকারী اول ما يفعل বা اول ما يسئل শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ইত্যাদি।

(৭৩) *مختصات المشكاة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"*মিরকাত* বা অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের যে সকল বিষয় *মিশকাত শরীফ* বুঝার জন্য সহায়ক এগুলো উক্ত রিসালায় জাম করা হয়েছে।"

(৭৪) *رسالة رد مودوديت* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"১৩৭০ হিজরী সনে মাওলানা মওদূদীর বইগুলো পড়ার সুযোগ হয়। রাত দিন জাগ্রত হয়ে তাঁর বইগুলো পড়ে উল্লেখযোগ্য অংশ এক রিসালায় একত্রিত করেছি।"[১]

(৭৫) *مشرقي كا اسلام* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এনায়েতুল্লাহ্ মাশরিকীর স্মরণিকা এবং তার কিতাবগুলো এক সময় খুব মুতালা'আ করেছি। তার কুফুরী মতবাদ এ রিসালায় একত্রিত করেছি।"

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

(৭৬) *میری محسن کتابیں* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী এক সময় সংবাদ পত্রে এ বিষয়ে লিখার জন্য আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন। আমি তাঁকে জবাবে বলি, "আমার সবচেয়ে বড় উপকারী কিতাব হচ্ছে আব্বাজানের জুতাপেটা।" কিন্তু তাঁর পীড়াপীড়িতে এ বিষয়ে কিছু লেখা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারিনি।"

(৭৭) *نظام مظاهر العلوم* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মাওলানা শাব্বীর আলী থানবী যখন মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক হন, তখন তিনি লিখিতভাবে মাদরাসার ইতোপূর্বেকার নেযাম সম্বন্ধে জানতে চান। তাঁর জবাবে এ রিসালা লিখা হয়। কিন্তু এ রিসালাটি কোথায় রেখেছি তা ভুলে গেছি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কপিটি পাওয়া যায়নি। এরজন্য আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি।"[১]

(৭৮) *جامع الروايات والأجزاء* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"শিক্ষকতা জীবনের শুরু থেকে যে সকল রিওয়ায়তগুলো জামি' নামে অভিহিত, এগুলোকে একত্র করেছিলাম। হাদীসের সকল কিতাবের সমন্বয়ে এটা তৈরি করেছিলাম। *মিশকাত শরীফের* বিন্যাশ অনুসরণ করে লেখা শুরু করেছিলাম। এক পর্যায়ে *মিশকাত শরীফের* জামি' রিওয়ায়তগুলো লেখা শেষ করেছিলাম। খেয়াল ছিলো, সকল কিতাবের উপরই এ কাজ করবো। কিন্তু জীবন শেষ হয়ে এলো। এজন্য কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।"[২]

(৭৯) *معجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে ছাপা হয়। প্রতি খণ্ডের সূচি পৃথক পৃথক ছাপা হয়েছিলো। আমি এ চার খণ্ডের সূচি একত্রে বর্ণনা ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করেছি। এরদ্বারা যে কোনো নাম খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছিলো।"[৩]

(৮০) *تبويب تأويل الأحاديث لابن قتيبة* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"ইবন কুতায়বা রচিত *تأويل الأحاديث* গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। কিন্তু তা অনুচ্ছেদ আকারে সুবিন্যস্ত নয়। আমি এ গ্রন্থটি ফিকহী বিন্যাসে সাজিয়েছি।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

(৮১) *تبويب مشكل الآثار* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"ইমাম ত্বহাবী (রহ.)-এর *مشكل الآثار* গ্রন্থটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কিন্তু এর অনুচ্ছেদগুলো বিন্যস্ত নয়। আমি একটাও ফিকহী তারতীবে সাজিয়েছি।"[১]

(৮২) *معجم الصحابة التي اخرج عنهم* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রহ.) *মুসনাদে আহমাদের* মতো সাহাবীগণের বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছেন। তবে তা সাহাবায়ে কিরামের স্তরের ভিত্তিতে বিন্যাস করেছেন। যারা সাহাবীগণের স্তর সম্পর্কে অবগত, একমাত্র তারাই এ কিতাব থেকে অনুসন্ধান করে বের করতে পারবেন। আমি সহজে হাদীস পাওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের নামের বর্ণনাক্রমে তা বিন্যস্ত করেছি।"[২]

(৮৩) *تبويب احكام القرآن للجصاص* (অপ্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (রহ.) রচিত *আহকামুল কুর'আন* কুর'আন মাজীদের তরতীব অনুসারে লেখা। হাফেযে কুর'আন ব্যতীত সহজে অন্য কেউ এটা থেকে উপকৃত হতে পারবে না। এজন্য আমি এর বিষয়বস্তুকে ফিকহী তারতীবে বিন্যস্ত করেছি।"

(৮৪) *أم الأمراض* (প্রকাশিত)

শায়খুল হাদীস বলেন,

"মানুষ অহংকার কেন করে? এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আবদুল ওহাব শারানী বলেন, মানুষ আপন গোলামীত্বের সীমা লংঘন করে বড়ত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে। এর কারণ হলো, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গুণাগুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে যেহেতু অহংকার, বড়ত্ব, মহত্ব, ইজ্জত, মহিমাসহ সকল গুণাগুণ রয়েছে। তাই মানুষের এ ধরনের স্বভাব থাকাটা স্বাভাবিক। এটাই হলো সকল রোগের উৎপত্তি স্থল। এটা ঠিক হলে সবকিছু ঠিক।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) এখানেই সমাপ্ত করে বলেন, আমার জানা মতে আরো বিশ থেকে ত্রিশটি কিতাব বাকি রয়েছে। এ সংক্রান্ত লেখা আর বাড়াতে চাচ্ছি না। নিজের মর্যাদা প্রকাশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রিয়া ও প্রদর্শনপ্রিয়তা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খুল হাদীসের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খুল হাদীসের অবদান

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) ছিলেন দেওবন্দী ধারা একজন হানাফী পণ্ডিত। তিনি হাদীসের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধালবী[১] ছিলেন সংস্কারমূলক আন্দোলন তাবলীগ জামা'আতে[২]র প্রতিষ্ঠাতা। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সংস্কারমূলক তাবলীগ জামা'আতের জন্য '*তাবলীগী নেসাব*' নামে একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলনে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে তাবলীগী নেসাব নামক গ্রন্থটি '*ফাযায়েলে আ'মাল*' নামে নামকরণ করা হয়। এ গ্রন্থটি সকলের নিকট সমাদৃত। বিশ্বের বহু মসজিদে প্রত্যহ এ কিতাবের তা'লীম হয়। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে যে গ্রন্থগুলো শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) প্রণয়ন করেছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

১) *বাযলুল মাজহূদ আলা শারহি আবী দাউদ* (*بذل المجهود على شرح أبي داود*)

২) *আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালিক* (*أوجز المسالك إلى موطأ مالك*)

৩) *লামি'উদ্দুরারী 'আলা জামি'য়িল বুখারী* (*لامع الدراري على جامع البخاري*)

৪) *আল-আবওয়াবু ওয়াত্ তারাজিমু লি সহীহিল বুখারী* (*الأبواب والتراجم لصيحح البخاري*)

৫) *খাসায়েলে নববী শরহে শামায়েলে তিরমিযী* (*خصائل نبيي شرح شمائل ترمذي*)

৬) *আল-কাউকাবুদ্দুরারী 'আলা-জামি'য়িত্ তিরমিযী* (*الكوكب الدري على جامع الترمذي*)

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধালবী (রহ.) ছিলেন ভারতের একজন ইসলামী পণ্ডিত। তিনি ১৮৮৫ খ্রি. বৃটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের ছোট্ট একটি শহরে (কান্ধালায়) জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ঘাটতিজনিত কারণে তিনি ১৯২০ খ্রি. তাবলীগ জামা'আত নামক সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। এ আন্দোলন ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ প্রচার করে এবং মুসলমানদের নামায, রোযাসহ অন্যান্য ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার কাজ করে। এ আন্দোলনের কর্মীগণ কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং অন্যান্যদের এতে যোগ দিতে উৎসাহ প্রদান করে। এ জামা'আত রাজনীতি ও ফিক্‌হী মাস'আলা-মাসায়েল নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা থেকে দূরে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালবী এ জামা'আতের নতুন আমীর নিযুক্ত হন। উদ্ধৃত : সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৬৯

২. তাবলীগ জামা'আত (تبليغي جماعت ধর্মপ্রচারকদের সমাজ), যা আরব বিশ্বে আহ্‌বাব নামে পরিচিত। এ জামা'আত ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও ধর্মপ্রচার আন্দোলন করে আসছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকা এবং মুসলিমদেরকে মসজিদভিত্তিক ধর্মচর্চায় ফিরিয়ে আনতে কাজ করে। বিশ্বজুড়ে সংগঠনটির আনুমানিক ১.২ থেকে ৮ কোটি অনুগামী আছে। যার অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে এবং প্রায় ১৮০ থেকে ২০০টি দেশের মুসলিমদের উপস্থিতি রয়েছে। বিশ শতকের ইসলামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধালবী (রহ.) কর্তৃক ভারতের মেওয়াতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি দেওবন্দী আন্দোলনের একটি শাখা হিসেবে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে অবজ্ঞা ও নৈতিক মূল্যবোধের সমসাময়িক অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদের যাত্রা শুরু হয়। আন্দোলনটি তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। তাবলীগ জামা'আতের মূল ভিত্তি হিসেবে ৬টি উসূল বা মূলনীতিকে ধারণ করা হয়। এগুলো হলো– কালিমা, নামায, ইল্‌ম ও যিক্‌র, একরামুল মুসলিমীন (মুসলমানদের সহায়তা), সহীহ নিয়ত (বিশুদ্ধ মনোবাঞ্ছা) এবং দাওয়াত ও তাবলীগ (ধর্মপ্রচারে আহ্বান)। তাবলীগ জামা'আত রাজনীতি ও ফিক্‌হী (আইনশাস্ত্র) সকলপ্রকার সম্পৃক্ততাকে অস্বীকার করে। এর পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়। উদ্ধৃত : গাজী 'আবদুল হাদী, তাবলীগ জামাতের কাকরাইল মসজিদ কিছুটা ব্যতিক্রম, *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (২২ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি.)।

বাযলুল মাজহূদ আলা শারহি আবী দাঊদ (*بذل المجهود على شرح أبي داود*)

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) তাঁর হাদীসের উস্তায মাওলানা খলীল আহ্মাদ সাহারানপুরী'র সাথে *সুনান আবূ দাঊদে*র শরাহ *বাযলুল মাজহূদ* প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী *সুনান আবূ দাঊদে*র একটি শরাহ্ প্রণয়নের চিন্তা করে আসছিলেন। এ কাজ তিনি তিনবার শুরু করেছেন। কিন্তু ব্যস্ততার দরুন তা আর শুরু হয়েও শুরু হয়নি। তিনি বলেন, হযরত গাংগুহি (রহ.)-এর জীবদ্দশায় কয়েকবার মনে করেছি, যেভাবেই হোক শুরু যখন করেছি শেষ করেই ফেলব। কোনো বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে হযরত গাংগুহির থেকে সমাধান করে নিব। কিন্তু হয়, হচ্ছে বলে আর হচ্ছে না। করি, করছি বলে আর করা হচ্ছে না। এরই মধ্যে হযরত গাংগুহির ইনতিকালের সংবাদে জযবার রফা' দফা হয়ে যায়। অতঃপর মনে হতে থাকে হযরত গাংগুহির পরিবর্তে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া তো জীবিত আছেন। তাঁর সাথেই আলোচনা পর্যালোচনা করে কাজটি দ্রুত অগ্রসর করে নেব। কিন্তু এখানেও ব্যস্ততার কারণে তা আর মাওলানা ইয়াহইয়া'র জীবদ্দশায় করতে পারিনি।

অবশেষে ১৩৩৫ হিজরীর রবী'উল আওয়াল মাসে হযরত খলীল আহ্মাদ সাহারানপুরী (রহ.) শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ও মৌলভী হাসান আহমাদকে সাথে নিয়ে এ কাজের আঞ্জাম দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, তোমরা দু'জন আমাকে সাহায্য করলে আমি লিখে ফেলতে পারব। শায়খুল হাদীস অকপটে উত্তর দিলেন, হযরত! অবশ্যই আপনি শুরু করে দিন। হযরত শায়খুল হাদীস কুতুবখানা থেকে হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের এক লম্বা ফিহ্রিস্তি মৌলভী হাসান আহমাদের হাতে তুলে দেন এবং বলেন, এ কিতাবগুলো সংগ্রহ করে আনুন। এ সময়ই *বাযলুল মাজহূদ* লিখার সূত্রপাত হয়।[১]

বাযলুল মাজহূদ রচনায় সাতটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে–

১) প্রতিটি মাসআলায় চার মাযহাবের ইমামদের মত উল্লেখ এবং দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

২) হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষণ ও পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পর অন্যান্য মাযহাবের দলিলের উৎকৃষ্ট ও কয়েকটি উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

৩) প্রত্যেক রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কে পুরোপুরি জরাহ ও তা'দীল করা হয়েছে।

৪) যে সকল হাদীস শিরোনামের অনুরূপ ছিলো না, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও সাদৃশ্যতা করা হয়েছে।

৫) গ্রন্থকার যে সকল হাদীস টীকা হিসেবে সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন অন্য কিতাবসমূহ থেকে সেগুলোর হাদীস সনদসহ লেখা হয়েছে। যে সকল হাদীস সংক্ষিপ্তকারে ছিলো, অন্য যে কিতাবে বিস্তারিত আছে, সেখানকার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) যে সকল হাদীস শিরোনামের অনুরূপ ছিল না, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও সাদৃশ্যতা প্রদান করা হয়েছে।

৭) হাদীসের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ উল্লেখ করতঃ ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ও হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী *বাযলুল মাজহূদ* রচনা করেছেন মদীনা মুনাওওয়ারার মসজিদে নববীতে। তাঁদের মসজিদে নববী ও জান্নাতুল বাকী যিয়ারত ছাড়া অন্য কোথাও যিয়ারতের সুযোগ হয়নি। তাঁরা *বাযলুল মাজহূদ* রচনায় নিজেদের মগ্ন রেখেছেন। অবশেষে

---

১. *হায়াতে শায়খুল হাদীস*, অনুঃ মাওলানা 'আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

২. মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী, *তাযকিরাতুল খলীল*, অনুঃ মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস (ঢাকা : মাকতাবাতুয্ যাকারিয়া, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৪৭১

১৩৪৫ হিজরীর জিলকদ মাসের *বাযলুল মাজহূদ* রচনার কাজ শেষ করে মদীনা তায়্যিবা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালিক (أوجز المسالك إلى موطأ مالك)

বাযলুল মাজহূদ রচনার পর তিনি মদীনা তায়্যিবার সম্মানে ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ ও মাক্‌বূল গ্রন্থ '*মুআত্তা*'র ব্যাখ্যা লেখা শুরু করেন। এ গ্রন্থের নামকরণ করা হয় '*আওজাযুল মাসালিক*'। গ্রন্থটি কলেবরে 'আরবীতে সতেরো খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়। শায়খুল হাদীস বলেন, আমি এ গ্রন্থটি রওযা শরীফের খুব কাছে বসেই রচনা করেছি।[২] শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী *সুনানু আবী দাউদের* ব্যাখ্যগ্রন্থ *বাযলুল মাজহূদ* রচনায় মনোবিবেশ করেছেন, তাঁর হাদীসের উস্তায মাওলানা খলীল আহ্‌মাদ সাহারানপুরীর নির্দেশক্রমে।

কিন্তু শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী '*আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থটি রচনায় মগ্ন হলেন এ কারণে যে, *সহীহুল বুখারী*র রচনার পূর্বে *মুয়াত্তা মালিক*'কে কুর'আনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব বলে আখ্যা দেয়া হতো। *মু'আত্তা মালিকে*র লেখকের নাম, আবূ 'আবদিল্লাহ্ মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন 'আমের আল আসবাহী মাদানী (রহ.)। তিনি মাদীনাতুল মুনাওওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই জান্নাতুল বাকী'তে তাঁর সমাধি। তিনি হজ্জ ছাড়া কখনো মদীনার বাহির গমন করেননি। তিনি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী এবং মালেকি মাযহাবের প্রবর্তক।

হাদীসের ময়দানে *মুয়াত্তা মালিক* হলো প্রথম রচনা। অন্যদিকে *সহীহ বুখারী*কে হাদীসের প্রথম সংকলন বলা হয়। ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে শুধু মারফূ' হাদীসই জমা করেননি; বরং তিনি মুরসাল হাদীসও জমা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম মালিক মারফূ' ও মুরসাল উভয় প্রকারের সহীহ হাদীস *মুয়াত্তা মালিকে* জমা করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু মারফূ' সহীহ হাদীস জমা করেছেন সবার আগে। তিনি *সহীহুল বুখারী*তে মুরসালকে শুধু সহীহ কোনো হাদীসের সাথে মিল থাকার কারণে উল্লেখ করেছেন। এটাই হলো উভয় কিতাবের মাঝে ব্যবধান।[৩]

মুয়াত্তা মালিকের পরিচিতি

আওজাযুল মাসালিক গ্রন্থটি *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এজন্য *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

(*مُوَطَّأ*) *মুয়াত্তা* হলো ইমাম ইব্ন আনাস-এর সংকলিত গ্রন্থ। *কাশফুয্ যুনূন* গ্রন্থে *মুয়াত্তা ইমাম মালিক* সম্পর্কে বলেন,

أَوَّلُ كِتَابٍ وُضِعَ فِي الإِسْلَامِ مُوَطَّأ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

"মালিক ইব্ন আনাসের *মুয়াত্তা*'ই ইসলামের সর্বপ্রথম হাদীস ও ফিক্‌হের কিতাব।"[৪]

এ গ্রন্থটিকে কিতাবুল্লাহ্‌র পর অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব বলা হয়। ইমাম মালিক (রহ.)-এর এ কিতাবটি সর্বাপেক্ষা মকবুল ও সমাদৃত। হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সাহাবীদের পবিত্র সীনায় আমানতস্বরূপ

১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ- ২, পৃ. ২৬৯
২. *হায়াতে শায়খুল হাদীস*, অনুঃ মাওলানা 'আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩
৩. মুফতী ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন ও মুফতী ইলইয়াস বিন ওলিউল্লাহ, *কিতাব পরিচিতি* (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১১১
৪. মুস্তফা ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ হাজী খলীফা, *কাশফুয্ যুনূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৫৫

রক্ষিত ছিল। কারো নিকট লিখিত থাকলেও তা প্রচারিত হয়নি। খলীফা 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং তাবেয়ী। 'আল্লামা যাহাবী তাঁকে হাফেযে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম মালিক '*মুয়াত্তা*'-তে তাঁর ফতোয়া থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এ মহান খলীফার যুগে সর্বপ্রথম আবূ বকর ইব্ন হাযাম কর্তৃক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁর পর ইব্ন শিহাব যুহরীও এতে অংশগ্রহণ করেন।[১]

আবূ বকর ইব্ন হাযমের কিতাবে সাহাবীদের ফতোয়াসমূহ স্থান পেয়েছে বেশি। উক্ত কিতাব ও ইমাম যুহরীর কিতাব '*মুয়াত্তা*'র মতো বিন্যাস করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের পর যেসকল সাহাবী মদীনায় বসবাস করতেন, তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইলমের মুহাফিয। তাঁদের পর তাবেয়ীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সেসকল ইলমের ধারক হন। যে সকল সাহাবী জিহাদ ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনার বাহিরে, যেমন– কূফা, বসরা, সিরিয়া, দামেশক, মিসর প্রভৃতি শহরে অবস্থান করেন। সেসকল শহরের তাবেয়ীগণ তাঁদের বর্ণনা ও ফাতওয়াগুলোর ধারক বাহক ছিলেন।[২]

ইমাম মালিক (রহ.)-এর যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক যেসকল হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়, সেসকল হাদীস গ্রন্থ নিজ নিজ শহরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সেসকল কিতাব ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। মদীনা হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এ পবিত্র শহরের সাহাবা ও তাবেয়ীনের বর্ণনাগুলো এবং জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বিশুদ্ধতার নিরিখে যাচাই এবং পরে বিন্যাস করে গ্রন্থ রচনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন একমাত্র ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.)।[৩]

'মুয়াত্তা' রচনার মহান কাজ সম্পাদনের পর তিনি এ কিতাবটি হাদীস ও ফিক্হতে অভিজ্ঞ তৎকালীন 'আলিম সমাজের নিকট মন্তব্যের জন্য পেশ করেন। বিজ্ঞজনের সকলেই এ গ্রন্থকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁর '*মুয়াত্তা*'য় সে সকল বর্ণনা ও ফাতওয়া সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। '*মুয়াত্ত*'র বিশুদ্ধতা ও এর মর্যাদা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত, সে কারণে এ কিতাবের নাম '*মুয়াত্তা*' রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ যেসকল মাস'আলার উপর আমল করেছেন, ফাতওয়া প্রদান করেছেন, সেসকল মাস'আলার সমাধান '*মুয়াত্তা*'য় সংকলিত হয়েছে এ কিতাবের নাম '*মুয়াত্তা*' রাখা হয়েছে। '*মুয়াত্তা*'র সকল মাস'আলা নিয়ে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী *আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থে সুবিন্যস্ত আলোচনা করেছেন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)-এর মতে, '*মুয়াত্তা*'য় প্রথমে দশ হাজার বর্ণনা স্থান পেয়েছিল। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৭২০ টি বর্ণনা পরিবেশিত হয়েছে, যাতে মারফূ' হাদীস আছে ৬০০টি, মুরসাল হাদীস ২৩৫টি, মাওকূফ হাদীস আছে ৬১৩টি, তাবেয়ীনদের কওল ও ফাতওয়ার সংখ্যা ২৮৫, বালাগাতে মালিক ০৫টি।[৪]

ইমাম আযম (র) বলেন, '*মুয়াত্তা*'য় আমি পাঁচশ'র অধিক মুসনাদ হাদীস পেয়েছি। *মুয়াত্ত*'র বিষয়বস্তু ফিক্হ-এর আহকাম। তাই অনেক অধ্যায় যা সাধারণত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে '*মুয়াত্তা*'য় সেসকল পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এ ধরনের কিতাবকে 'সুনান' বলা হয়। ইমাম মালিক (র.)-এর

---

১. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫০

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

'মুয়াত্তা' ব্যতীত অন্য কোনো তাবে-তাবেয়ী কর্তৃক লিখিত কোনো মুজতাহিদ ইমামের সংকলিত হাদীস গ্রন্থ আমাদের নিকট নেই।[১]

ইমাম মালিক (র) নিজেই *মুয়াত্তা*'র আদ্যোপান্ত সংকলিত করেছেন। *মুয়াত্তা*'র সমসাময়িক কোন হাদীস গ্রন্থ ছিল না। *মুয়াত্তা*'র কবুলিয়াত ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ। একমাত্র *মুয়াত্তা*'র হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রথম ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[২]

মুয়াত্তা'য় যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে মুহাদ্দিসীনের রীতিনীতি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করা হয়েছে। *মুয়াত্তা*'য় পরিবেশিত সকল হাদীস ও ফাতওয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। *মুয়াত্তা*'র রাবীগণ প্রায়ই ছিলেন হিজাযী। হিজাযের রাবীগণ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ দিক দিয়েও *মুয়াত্তা*'র শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। সাধারণত মুহাদ্দীসগণের মতে, '*মুয়াত্তা*'র স্থান তিরমিযী ও মুসলিমের পরে ধার্য করা হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) ও শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র) এর মতে, '*মুয়াত্তা*'র স্থান *বুখারী*'র উর্ধ্বে।[৩]

পরবর্তী যুগে প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থই '*মুয়াত্তা*'কে অনুসরণ করে সংকলিত হয়েছে। ইমাম শাফি'য়ী (র) বলেন, কিতাবুল্লাহ্‌র পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হচ্ছে মালিক ইব্‌ন আনাসের '*মুয়াত্তা*'। আবূ বকর ইব্‌ন আরবীও অনুরূপ উক্তি করেছেন। মুসলিম শরীফের টীকা লেখক 'আল্লামা নদভী '*মুয়াত্তা*'র শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, ইমাম মারিক (র) মুহাদ্দিসীনের উস্তায। এটাই 'মুয়াত্তা'র শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, ইমাম শাফি'য়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র) '*মুয়াত্তা*' থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেছেন। যা *কিতাবুল উম্ম* ও *কিতাবু 'আসার*-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণ যাঁদের মধ্যে ইমাম শাফি'য়ী (র)-ও আছেন, ইমাম মালিক (র) থেকে '*মুয়াত্তা*'র সিমায়াত (হাদীস শ্রবণ) করেছেন। অন্তত এক হাজার উলামা '*মুয়াত্তা*' বর্ণনা করেছেন। '*মুয়াত্তা*'র বর্ণনাকারী উলামা প্রায় প্রত্যেকেই শীর্ষস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য। '*মুয়াত্তা*'র হাদীসে তিনজনের বেশি ওয়াসাতা (মধ্যস্থতা ও ব্যবধান) নেই। *বুখারী শরীফে* এ ধরনের হাদীস মাত্র বিশটি আছে। '*মুয়াত্তা*'য় এ ধরনের হাদীস রয়েছে চল্লিশটি, যেগুলো মাত্র দুই ওয়াসাতা (রাবী-এর মধ্যস্থতা) দ্বারা বর্ণিত অর্থাৎ এসকল হাদীস ইমাম মালিক (র) এবং রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে মাত্র দুইজন রাবীর ব্যবধান রয়েছে।[৫]

ইমাম মালিক (র)-এর বিভিন্ন শাগরিদ কর্তৃক বর্ণিত ব্যবধানে '*মুয়াত্তা*'র প্রায় ১৬টি সংকলন প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে তাঁর অন্যতম শাগরিদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-মাসমূদী আল-উন্দুলুসীর পাণ্ডুলিপি প্রসিদ্ধ। মুয়াত্তা বললে এ পাণ্ডুলিপিকেই মানুষ বুঝে থাকে। আমি এখানে উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ তুলে ধরছি–

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৫. প্রাগুক্ত।
৬. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী, ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, *বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ১৪৩৯ হি.) পৃ. ৬৬

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَصَلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى اله وَصَحْبِه)

كتاب وقوت الصلاة

باب وقوت الصلاة

قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْى بْنُ يَحْى اللَّيْثِيْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا – وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ – فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هذَا يَا مُغِيْرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ ((أَنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلّ، فَصَلّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلّى، فَصَلّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلّى، فَصَلّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ثُمَّ قَالَ بِهذَا أُمِرْتُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، أَوْ إِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذِيْ أَقَامَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ. قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ((يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.))

এ নুসখাটির শুরুতে বিসমিল্লাহ্ রয়েছে। এরপর দরূদ অতঃপর সরাসরি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

“ইব্ন শিহাব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা ‘উমার ইব্ন ‘আবদুল ‘আযীয সালাত আদায় করতে দেরী করলেন। তখন ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়র তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন যে, একদিন মুগীরা ইব্ন শ‘বা কুফায় থাকাবস্থায় দেরী করে সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তাঁর নিকট আবূ মাস‘ঊদ আল-আনসারী এসে বললেন, হে মুগীরা, এটা কী? তোমার কি জানা নেই যে, জিবরীল আসলেন, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সালাত পড়লেন, তারপর আবার জিবরীল আসলেন এবং সালাত পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ও তাঁর সাথে সালাত পড়লেন, এভাবে পাঁচবার সালাত আদায় করার পর জিবরীল বললেন, আপনাকে এভাবেই হুকুম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচবেলা সালাত এবং সময় নির্ধারিত করে বললেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আপনার সালাতসমূহের জন্য এ সময়গুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তখন ‘উমার ইব্ন ‘আবদুল ‘আযীয বললেন, হে ‘উরওয়া! বুঝে দেখ কী বলছ, জিবরীল কি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য সালাতের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন? ‘উরওয়া বললেন, এভাবেই তো বশীর ইব্ন আবূ মাস‘ঊদ আল-আনসারী তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

‘উরওয়া আরো বললেন, ‘আয়েশা সিদ্দিকা, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্রা স্ত্রী ছিলেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ‘আসরের সালাতকে এভাবে আদায় করতেন যে, রৌদ্র তার কক্ষের ভিতরে থাকত: ভেতরে ছায়া প্রকাশ পেতো না।[১]

১. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

মুয়াত্তা'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

মুয়াত্তা কিতাবের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি হচ্ছে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব'[1]-এর লিখা পাণ্ডুলিপি। সে পাণ্ডুলিপির শুরুতে এসেছে–

أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.

"আমাদেরকে ইমাম মালিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুয্-যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযীয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই) এ কথা বলে। যখন তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, তখন তাদের রক্ত, জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে দীনের দাবী আদায় করা হবে, বাকী হিসাব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট।"[2]

মুয়াত্তা'র তৃতীয় পাণ্ডুলিপি

মুয়াত্তা কিতাবের তৃতীয় পাণ্ডুলিপি হচ্ছে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামাহ আল-কা'নাবী[3]-এর লিখা পাণ্ডুলিপি। সে পাণ্ডুলিপিতে তাঁর একক মুফরাদ বা একক বর্ণনায় নিম্নের হাদীসটি রয়েছে; যা অন্য কোনো *মুয়াত্তা*'য় নেই। সেখানে এসেছে,

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تروني كما أطري عيسى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ، فقولوا عبد الله ورسوله.

"'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল-কা'নাবী বলেন, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন মালিক, তিনি ইব্‌ন শিহাব থেকে, তিনি 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন মাস'ঊদ থেকে তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না; যেভাবে প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা হয়েছে 'ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের। আমি তো বান্দা। অতএব, এভাবে বলবে যে, আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।"[4]

---

১. তিনি ১২৫ হিজরী সনের জিলকদ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মালিক, লায়স ইব্‌ন স'দ, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্ ন আবু য'র, সুফয়ান আস-সাওরী, সুফয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না, ইব্‌ন জুরায়জ ও ইউনুস ইব্‌ন য়াযীদ প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। লায়স ইব্‌ন সা'দ তাঁর উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিন ২৫ শে শা'বান ১৯৭ হিজরী সনে ৭২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দ্র. ইমাম যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৫

২. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী, ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩. তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। বসরা শহরে বসবাস করতেন। তাঁর যাঁদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, ইমাম মালিক, লায়স ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন আবূ যি'র, হাম্মাদ ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, শু'বা, সালামা ইব্‌ন ওয়ারদান। ১৩০ হিজরী সনে মক্কায় ইনতিকাল করেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪. এ হাদীসটি সহীহ। কারণ, ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে এ হাদীসটি নিয়ে এসেছেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯

মুয়াত্তা'র চতুর্থ পাণ্ডুলিপি

মুয়াত্তা কিতাবের চতুর্থ পাণ্ডুলিপি হচ্ছে 'ইব্‌ন কাসিম[১]-এর লিখা পাণ্ডুলিপি। তিনি হলেন মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং সর্বপ্রথম তিনিই এ মাযহাব লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর *মুয়াত্তা*র কপিতে নিম্নোক্ত হাদীসটিকে তাফররুদ বা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অন্য কোনো *মুয়াত্তা*র বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تبارك وتعالى من عمل عملا اشرك فيه معى غيرى، فهو له كله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك.

"ইব্‌নুল কাসিম বলেন, মালিক আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আলা ইব্‌ন আবদির রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যদি কেউ কোনো আমল করে, আর তাতে আমার (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্য কাউকে সে আমলে শরীক করে, তখন আমি তা পুরোপুরি ঐ শরীকের জন্য ছেড়ে দিবো; কেননা, আমি অংশীদারদের অংশগ্রহণের চেয়ে অনেক অমুখাপেক্ষী।" আবূ 'উমার বলেন, ইব্‌ন 'উফায়রও এ হাদীসটি তার মুওয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন, তারা দুজন ব্যতীত মুওয়াত্তায় অন্য বর্ণনায় এ হাদীসটি নেই।[২] এভাবে মুওয়াত্তা মালিকের সর্বমোট ষোলটি পাণ্ডুলিপি আছে। অভিসন্দর্ভটি কলেবরে বৃদ্ধি হয়ে যাবে, তাই ষোলটি পাণ্ডুলিপির পূর্ণ আলোচনা করলাম না।

ইমাম মালিকের সমর্থনে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, *মুয়াত্তা মালিকে* যত মুরসাল হাদীস আছে তার সবই দলিলযোগ্য এবং অন্য সহীহ হাদীসের মাধ্যমে সমর্থিত। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) *মুয়াত্তা মালিকে*র ব্যাখ্যা গ্রন্থ[৩] *আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। *মুয়াত্তা মালিকে*র গ্রন্থটি বেশ সংক্ষিপ্ত, তাই তিনি প্রত্যেকটি হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি যদিও অনেক পরে লেখা হয়েছে তথাপি গ্রন্থটি পরবর্তী সকল মুহাদ্দিসগণের নিকট রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। *আওজাযুল মাসালিক* গ্রন্থটি বুখারীর অন্যান্যা (*ফাতহুল বারী*, *'উমদাতুল কারী* ইত্যাদি) ব্যাখ্যা গ্রন্থের মতোই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থটি 'আরবী, ফারসী ভাষাসহ আরো অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'আরবী ভাষায় ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী বলেন, *বাযলুল মাজহূদে*র কাজ শেষ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কদম মুবারকের কাছে বসে বিসমিল্লাহ্ লিখি। ১৩৪৬ হিজরী সনে মাদীনা মুনাওওয়ারা থেকে আমার উস্তায মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর একটি পত্র আসে। সেখানে তিনি বলেন, "আমি *বাযলুল মাজহূদে*র মতো *তিরমিযী শরীফে*রও একটি শরাহ লিখতে

---

১. তাঁর উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ, নাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জুনাদাহ আল-মিসরী আল-উতাকী। তিনি ১২৮ হিজরী সনে কেউ কেউ বলেন, ১৩০ হিজরী সনে কারো কারো মতে, ১৩২, অথবা ১৩৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২. *আত্-তাজরীদ*, পৃ. ২৭২ ; এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম মুসলিম (রহ.) *সহীহ মুসলিমে* কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়েক, বাবু মান আশরাকা ফী আমালিহী গায়রাল্লাহ-তে বর্ণনা করেছেণ।

৩. শাহ্ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) তাঁর *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন* গ্রন্থে বলেন, কেউ কেউ বলেন, *মুওয়াত্তা মালিকে*র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৩০ এর উর্ধ্বে। কিন্তু *আওজাযুল মাসালিকে*র ন্যায় একটি এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

৪. ড. সায়্যিদ 'আবদুল মাজিদ আল-গাওরী, *মানহাজুশ শায়খ যাকারিয়া কান্ধালবী ফী কিতাবিহী* (মালোশিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালায় বাসালামপুর, নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ০৬

চাই।” আমার ধারণা ছিল *আওজাযুল মাসালিকের* কাজ এক দেড় বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কারণ, মদীনা তায়্যিবায় দু' তিন মাসেই দেড় খণ্ড শেষ করেছি। এরপর আমার ইচ্ছা ছিল, *তহাবী শরীফের* একটি শরাহ লিখব। আব্বাজান মাওলানা ইয়াহ্ইয়া (রহ.) *তহাবী শরীফের* একটি উর্দূ শরাহ লেখার কাজও শুরু করেছিলেন।

যাহোক, আমি উস্তাযে মুহতারামকে লিখলাম, আমার *তহাবী*র উপর কিছু লেখার ইচ্ছা। বাকি আপনার অনুমতি, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। তিনি লিখলেন, *তহাবী শরীফ* অপেক্ষা *তিরমিযী শরীফের* চর্চা এবং প্রয়োজনীয়তা বেশি। এটার প্রয়োজনীয়তা বেশি। এ পত্র বিনিময়ের মাঝেই ১৫ রবিউস্ সানী ১৩৪৬ হিজরী সনে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে আমি চাচাজানের সাথে পরামর্শ করলাম। *আওজাযুল মাসালিক* পূর্ণ করবো নাকি *তিরমিযী*র কাজ শুরু করবো। চাচাজান পরামর্শ দিলেন যেহেতু *আওজাযুল মাসালিকের* কাজ মাঝামাঝিতে আছে, তাই এটাকে পুরো করো। অতঃপর শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবীকে বলেন, চিন্তা করেছিলাম মদীনায় যাবো হযরত সাহারানপুরীর সামনে বসে *বাযলুল মাজহূদের* মতো *তিরমিযী*র শরাহও লিখবো। যেভাবে তিনি *আবূ দাঊদের* প্রত্যেকটি হাদীসের শরাহ বলেছেন আর আমি লিখেছি, এভাবে তিরমিযীর শরাহও লিখবো, হযরত বলবেন, আর আমি লিখবো। কিন্তু সেই সুযোগ আর হলো না।

আওজাযুল মাসালিক সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের মুফতী সায়্যিদ উলূভী, যিনি হিজাযসহ সমসাময়িক যুগের গোটা পৃথিবীর 'আলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর 'আলিমরূপে সুপরিচিত ছিলেন– তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) যদি *আওজাযুল মাসালিকের* ভূমিকায় নিজেকে হানাফী বলে পরিচয় না দিতেন, তবে কেউ বল্‌লেও আমি তাঁকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে বিশ্বাসই করতাম না; বরং তাঁকে মালেকী বলেই মনে করতাম। এজন্য যে, তাঁর রচিত '*আওজাযুল মাসালিকে*' মালেকী মাযহাবের মাস্'আলাসমূহকে তিনি যে চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত ও বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিজেদের মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে তা' এমনটি সহজে বের করা যায় না ; বরং অনেক ঘাঁটাঘাটি করেই তবে পাওয়া যায়।

মালেকী মাযহাবের 'আলিম ও কাযীগণ এ কিতাবখানার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরব আমীরাতের প্রধান কাযী মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত 'আলিম শায়খ আহমাদ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন মুবারকও এ কিতাবের মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) *আওজাযুল মাসালিক* কিতাবের শুরুতে নব্বই পৃষ্ঠার একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় হাদীসশাস্ত্রের পরিচিতি, ইতিহাস, উদ্ভব ও বিন্যাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তারপর কিতাব ও কিতাবের রচয়িতা ইমাম মালিকের বিস্তারিত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তারপর *মুআত্তা মালিকের* ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ এবং নিজ মাশায়েখ ও সিলসিলায়ে ওলীউল্লাহীর সনদসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি ইমাম আবূ হানিফা মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর মর্যাদা ও ভূমিকা এবং তাঁর মূলনীতিসমূহ ও মতাদর্শের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

---

১. 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, *হায়াতে শায়খুল হাদীস*, অনুঃ মাওলানা 'আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২১৩

লামি'উদ্দুরারী 'আলা জামি'য়িল বুখারী (*لامع الدراري على جامع البخاري*)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) *সহীহুল বুখারী*র যে তাকরীর পেশ করেছিলেন। সেগুলো মাওলানা ইয়াহ্ইয়া 'আরবীতে সংকলন করেছিলেন। সংকলনের কাজটি তিনি ছাত্রজীবনেই সম্পন্ন করেছেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) *আওজাযুল মাসালিক* সমাপ্ত করার পর ৭ মুহার্‌রম ১৩৭৬ হিজরী সনে *লামিউদ্দারারী*'র কাজ শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান হাশিয়া সংযোজিত করে মুদ্রণ করেছেন। সংকলনটিতে বিশেষভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) এর বিভিন্ন অধ্যায় শিরোনাম-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো সাথে তার সামঞ্জস্যের আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে এমন কিছু দুর্লভ তাহকীক রয়েছে যা সচরাচর অন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থটি তিনি ১৭ রবি'উল আউয়াল মাসে ১৩৮৮ হিজরী সনে সমাপ্ত করেন এবং গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) এ গ্রন্থের শুরুতে জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন। এ সুদীর্ঘ ভূমিকায় কেবল ইমাম বুখারী এবং তাঁর অনন্য কিতাব "*আল-জামি'উস সহীহ*"-এর বিভিন্ন দিকই যে কেবল সবিস্তারে আলোচিত করেছেন, তাই নয়; বরং তাতে এমন কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ও উপাদেয় তত্ত্বাবলী সংকলিত হয়েছে, যা উসূল ও রিজালশাস্ত্রজাতীয় জীবনী গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এছাড়াও হাদীসের কিতাবসমূহের কোন্‌টির কী মর্যাদা, আবওয়াবে হাদীস, তাকরীর ও ইজতিহাদ এবং হানাফী মাযহাবের পক্ষের (বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে) গবেষণালব্ধ তত্ত্বাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে *লামি'উয যুরার* গ্রন্থের ভূমিকাটি ইলমে হাদীসের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষতঃ হানাফী মাযহাবের 'আলিমগণের জন্য একটি উত্তম চয়নিকা। এ গ্রন্থের বড় সাইজ প্রথম খণ্ডের কলেবরে ভূমিকা ছাড়া ৫১২ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খণ্ডও অনুরূপ কলেবরে কিতাবুল জিহাদ পর্যন্ত শেষ হয়েছে।[২]

আল-আবওয়াবু ওয়াত্ তারাজিমু লি সহীহিল বুখারী (*الأبواب والتراجم لصيحح البخاري*)

এ গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) তাঁর শিক্ষা জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি *সহীহুল বুখারী*র যে বিষয়গুলো নিয়ে ছাত্রদের সহজতার জন্য চিন্তা করেছেন, এটা তারই একটি নির্যাস। এ গ্রন্থে তিনি *সহীহুল বুখারী*র অনুবাদ, বৈশিষ্ট্য ও উপকারীতা সন্বিবেশিত করেছেন।

এ গ্রন্থটি হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্‌লবী, হযরত মাওলনা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মূদ হাসান দেওবন্দীর রিসালাসমূহ ও তাঁদের গবেষণার সমন্বিত ফসল হওয়া ছাড়াও 'আবওয়াব ও তারাজিম' সংক্রান্ত 'উসূল' ও কাওয়ায়েদ বা মূলনীতিসমূহের একত্র সমাবেশ। যা হাকিম ইব্‌ন হাজার, কাস্‌তুলানী ও 'আইনির শরাহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাগবেষণা ও অধ্যয়নপ্রসূত মূলনীতি বা কাওয়ায়েদও এতে সংযোজন করেছেন। এ গ্রন্থে সত্তরটি কাওয়ায়েদ বর্ণনা করা হয়েছে।[৩]

বিশেষ করে *বুখারী*র আবওয়াব ও তরাজিমের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা এবং তার সমাধান যে কষ্টসাধ্য, তা একমাত্র মুহাদ্দিসগণই উপলব্ধি করতে পারেন। এ গ্রন্থে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) আবওয়াব ও তারাজিমের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

১. ড. সায়্যিদ 'আবদুল মাজিদ আল-গাওরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬
২. *হায়াতে শায়খুল হাদীস*, অনুঃ মাওলানা 'আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

খাসায়েলে নববী শরহে শামায়েলে তিরমিযী (خصائل نبيي شرح شمائل ترمذي)

এ গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) *শামায়েলে তিরমিযী'*র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খাসায়েল নিয়ে আলোকপাত করেছেন। *শামায়েলে তিরমিযী*র ন্যায় *খাসায়েলে নববী* গ্রন্থটিও শানদার ও বরকতময় হিসেবে রচিত হয়ে আসছে।

আল-কাউকাবুদ্‌দুরারী 'আলা-জামি'য়িত্ তিরমিযী (الكوكب الدري على جامع الترمذي)

এ গ্রন্থটিও হযরত রশীদ আহ্মাদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর দরসী আলোচনার সংকলন। যা তিনি তিরমিযী শরীফের দরসে প্রদান করেছেন, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী (রহ.) ছাত্রজীবনেই তা 'আরবীতে রূপান্তর করে লিপিবদ্ধ করেন। তৎকালীন সময় অনেক মুহাদ্দিসগণই চড়া মূল্যে ছাত্রদের দ্বারা এর হস্তলিখিত কপি তৈরি করে নিজেদের সংগ্রহে রাখতেন। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া বলেন, আমার যতটুকু মনে পড়ে মাওলানা আলহাজ আসগর হুসায়ন সাহেব দেওবন্দী ৭৫ রুপির বিনিময়ে এটি কপি করিয়েছিলেন। যদিও অনেকে আমাকে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমি এর কপি তৈরি করতে কখনো কার্পণ্য করিনি। অনেক বন্ধুরাই এটি ছেপে দিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ করে হযরত হুসায়ন আহমাদ মাদানী (রহ.) ও মাওলানা 'আবদুর রহমান রায়পুরীর নিকট দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের বিশেষ অনুরোধ করেন।

অতঃপর ১৩৫১ হিজরীতে আমি জানতে পারলাম যে, এক লোক এ গ্রন্থটাকে হুবহু যা আছে তাই খণ্ড খণ্ড আকারে ছাপছে। আমার মনে হলো, এতে অনেক ভুল থেকে যাবে। এজন্য *আওজাযুল মাসালিকে*র কাজ স্থগিত রেখে কয়েক বছর এ গ্রন্থের কাজ করি। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে শেষ করি। ১ম খণ্ডের নযরে সানী ও টীকা লেখা ১৩৫২ হিজরী সনে রবি'উল আওয়াল মাসে সমাপ্ত করি। আর দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ ১৩৫৩ হিজরী সনে রজব মাসে শেষ হয়। এ কারণেই *আওজাযুল মাসালিক* রচনা বিলম্বিত হয়।[১]

১. ড. সায়্যিদ 'আবদুল মাজিদ আল-গাওরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের অনূদিত গ্রন্থাবলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের অনূদিত গ্রন্থাবলী

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস এবং বুযুর্গ ছিলেন। উপমহাদেশের আলিম সমাজে তিনি তাঁর আসল নামের চাইতেও "শায়খুল হাদীস" নামেই সমধিক পরিচিত। এ মহান মনীষীর গোটা জীবনই ছিলো ইসলামের খিদমতের জন্য উৎসর্গকৃত। তিনি পবিত্র কুর'আন, হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ব দিকের উপর অগণিত পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি যেমন পবিত্র কুর'আন, হাদীস শিখেছেন, শিখিয়েছেন, তদনুযায়ী আমলও করেছেন এবং তা লিখেও গেছেন।

বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের তাবলীগ পাঠ্য কিতাবসমূহের অনুবাদ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এত বেশি সংখ্যক অনুবাদক ও প্রকাশনা সংস্থাও কাজটি করেছেনে যে, অন্য কোনো বিদেশী ভাষার লেখকের রচনাবলী অনুবাদকর্ম তা কদাচিত দেখা যায়। সর্বপ্রথম শায়খুল হাদীসের *ফাযায়েলে নামায* ও অপর দু'একটি বইয়ের অনুবাদ করেন পাক্ষিক 'নেদায়ে ইসলাম' সম্পাদক মাওলানা আবদুল মাজীদ সাহেব আজ থেকে প্রায় পয়তাল্লিশ বছর পূর্বে কলকাতায় এবং সেখান থেকে তা' প্রকাশিতও হয়। তারপর ঢাকায় মাওলানা আম্বর আলী '*তাবলীগী-নেসাব*' শিরোনামে ফাযায়েলে সিরিজের প্রায় সব ক'টি কিতাবেরই অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ অনুবাদ সিরিজটি খুবই জনপ্রিয় ছিলো এবং বহুলভাবে প্রচারিতও হয়। কিন্তু তার ইনতিকালের পর তার প্রতিষ্ঠিত তাবলগী লাইব্রেরি অবলুপ্ত এবং তাঁর ফাযায়েল সিরিজের কিতাবগুলো আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকায় আশরাফিয়া কুতুবখানা ফাযায়েল সিরিজের কয়েকটি কিতাব ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অনুবাদকের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেন। এর অধিকাংশ বইয়েরই অনুবাদ শায়খুল হাদীসের একজন বাঙ্গালী শিষ্য মুহাদ্দিস মাওলানা মুহিবুর রহমান আহমদ জালালাবাদী। এঁর অনূদিত "*তাবলীগী জামাতের সমালোচনা ও সদুত্তর*"ও প্রকাশিত হয়। হাকীম হাফিয আযীযুল ইসলামও এ সিরিজের একটি বই অনুবাদ করেছেন।[১]

অধুনালুপ্ত কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরি, বাবুবাজার থেকেও ফাযায়েল সিরিজের কয়েকটি কিতাব অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন অধুনালুপ্ত *দৈনিক নাজাত*- সম্পাদক মরহুম মাওলানা কাজী আবদুশ শহীদ ও মরহুম মাওলানা নূরুয্যামান প্রমুখ।[২]

মাওলানা আমীনুল ইসলাম শায়খুল হাদীসের '*ফাযায়েলে দরূদ শরীফ* ও *হিকায়াতে সাহাবা*' পুস্তক দুটির অনুবাদ করেছেন।

হিকায়াতে সাহাবার একটি অনুবাদ মাওলানা আবুল লাইস আনসারীও করেছিলেন–যা দীর্ঘদিন পূর্বে সেই পাকিস্তান আমলেই ঢাকার প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিলো।[৩]

হিকায়াতে সাহাবা'র বাংলা ভাষায় সবচাইতে প্রাঞ্জল ও সাবলীল অনুবাদ করেন '*পরিবার নহে কারাগার*-এর লেখক মরহুম মুজাফ্ফর হুসায়ন–যা সুদীর্ঘকাল পূর্বে পাকিস্তান আমলেই ঢাকার এমদাদীয়া লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ফাযায়েল সিরিজের কোনো পুস্তকের এত সার্থক অনুবাদ যা অনুবাদ বলে বুঝার উপায় নেই, একান্তই মৌলিক রচনার মতো সাবলীল ও আড়ষ্টতামুক্ত সম্ভতঃ আর কোনোটিই নয়।

---

১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২১
২. প্রাগুক্ত, পৃ ২২২
৩. প্রাগুক্ত।

ফরিদাবাদ মাদরাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা আবূ মাহমূদ হেদায়েত হোসেন *ফাযায়েলে নামায* অনুবাদসহ বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের প্রথম আমীর মাওলানা 'আবদুল 'আযীয খুলনবীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিলো। তিনি এ সিরিজের অন্যান্য বইয়ের অনুবাদ কর্মেও হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর অঘোষিত ছোবল তাঁর সে আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে দেয়নি।

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফাযায়েলে রমযানের অনুবাদ কর্ম শেষ করে ভূতপূর্ব জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোতে জমা দেয়। পুস্তকটির মুদ্রণ কার্য প্রায় সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পুস্তকটি তখন প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার দফতর থেকে তা প্রথমবার এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত হাফিজ্জী হুজুরের আশীর্বাণীসহ মহানবী স্মরণিকা পরিষদ থেকে আরো দু'বার মোট ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে মদীনা শরীফে এ অনুবাদ গ্রন্থখানা মদীনা শরীফে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র হাতে তুলে দিলে তিনি এজন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১]

ফাযায়েল সিরিজের অনুবাদে বলতে গেলে প্রায় সর্বশেষে হাত দিয়েও মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ টুমচরী প্রায় সবগুলো বইয়ের অনুবাদই সম্পন্ন করেন। তাঁর 'তাবলীগী কুতুবখানা' চকবাজার বলতে গেলে এ পুস্তকগুলোর প্রচারের জন্যেই নিবেদিত।[২]

মোটকথা, বাংলাভাষায় শায়খুল হাদীসের পুস্তকগুলো বহুলভাবে পঠিত হচ্ছে এবং সুদীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই তা হয়ে আসছে। তাবলীগী-পাঠ্য হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চলের মসজিদসমূহেও তা জামাআতবদ্ধভাবে পঠিত হচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, এ অনুবাদ কর্মগুলোর অধিকাংশই সাহিত্যমানের নিম্নতর। শায়খুল হাদীসের মূল রচনার সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা তার অধিকাংশেই অনুপস্থিত। এছাড়া বইগুলোর ছাপা কাগজ ও উপস্থাপনাও সন্তোষজনক পর্যায়ের নয়। অনুবাদকর্মে অভিজ্ঞ কোনো সাহিত্যিক আলিমের দ্বারা তা অনূদিত হয়ে উচ্চমানের কোনো প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হলে আজো তার চাহিদা হবে রেকর্ড পরিমাণ। অবশ্য, তাবলীগী জামা'আতের বাংলাদেশী মুরুব্বীদের আশীর্বাদ এবং পরামর্শও এ ব্যাপারে নেয়ার প্রয়োজন হবে।

শায়খুল হাদীসের আত্মজীবনী *'আপবীতী'* অনূদিত হয়ে এদেশের পাঠক সমাজে তার চাহিদা পূরণ করেছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমানে মাকতাবাতুয যাকারিয়া নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, শায়খুল হাদীসের সকল গ্রন্থের মান-সম্মত অনুবাদ করে ভালো কাগজে সুন্দর মলাটে প্রকাশ করতে। শায়খুল হাদীসের আরেকটি বই *'আকাবির কা রমাযান'* অনুবাদ করেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল।[৩] এ বইটি সম্পাদনা করেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ খুরশিদ আলম, উস্তাদ, সওতুল হেরা রহমানিয়া মাদরাসা, আরীচপুর, টঙ্গী, গাজীপুর।

শায়খুল হাদীস বলেন, এ গ্রন্থটি হলো, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'র মাহে রমযানের মা'মূলাত জানার জন্য খাজা আজীজুল হাসান মরহুমের নিকট প্রশ্নাকারে একটি পত্র লিখেছিলাম। সে পত্রের জবাব পাওয়ার পর বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করে বলল, ওই সব প্রশ্নের আলোকে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী এর মা'মূলাতও যেনো উল্লেখ করি। স্বয়ং আমার কাছেও এটা ভালো

---

১. প্রাগুক্ত।
২. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৩
৩. উস্তাদ, সওতুল হেরা রাহমানিয়া মাদরাসা, আরীচপুর, টঙ্গী, ইমাম ও খতীব, ডেসা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, বিসিক রোড, টঙ্গী, গাজীপুর, ঢাকা।

মনে হলো, তাই প্রথমে আমার প্রশ্নগুলো উল্লেখ করে পরে মাওলানা সাহারানপুরীর মা'মূলাত উল্লেখ করেছি।[১]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-এর *ফাযায়েলে দরূদ* গ্রন্থটি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা গত হয়েছে। তবে এ বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে রচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে : দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দরূদ শরীফ পাঠ না করার ক্ষতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্নদরূদ শরীফের ফায়দা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী *আকাবির কা তাকওয়া* নামক যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন, তাতে আকাবিরগণের তাকওয়ার বিবরণ আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে। যথা–

প্রথম পরিচ্ছেদে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মাদরাসার বিষয়ে আকাবিরদের তাকওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর সমসাময়িক বুযুর্গগণ ও পরবর্তী মাশায়েখদের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে শায়খুল হাদীস তাঁর তাকওয়া ও অন্যান্য কিছু মাসআলার বর্ণনা করেছেন।[৩]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র আরেকটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যার নাম *শরীয়ত ও ত্বরীকত কা তালাযুম*। এ গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস মূলতঃ জাহিরী ও বাতিনী শরীয়তকে সমন্বয় করার জন্যই লিখেছেন। গ্রন্থটি পড়লে মাদরাসার ছাত্রসহ উলামায়ে কিরামগণ অথবা ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুধাবন করতে পারবেন যে, নবী, সাহাবী ও মুজতাহিদ ইমামগণ জাহিরী ও বাতিনী শরীয়ত অর্থাৎ শরীয়ত ও তরীকতকে সমন্বয় করে গেছেন এবং তাসাওউফ ও পীর মুরীদীর সকল আমলের উপর প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমলও করে গেছেন।"[৪]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী'র *'আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল'* গ্রন্থটি উর্দূ ভাষাভাষীর পাশাপাশি আরবী, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তার চাহিদা রয়েছে।

শায়খুল হাদীস বলেন,

> "১৩৫৬ ও ১৩৫৭ হিজরী সনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিবাদ ও লড়াই এত মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে যে, আকাবিরদের শানে অনেক বেআদবী ও গোস্তাখী হয়। অনেক লোক ভিন্ন

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আকাবির কা রমাযান* (ঢাকা : মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ০৫

২. শাখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *ফাযায়েলে দরূদ শরীফ* (ঢাকা : মাকতাবাতুয যাকারিয়া, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ০৯

৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আকাবির কা তাকওয়া* (ঢাকা : মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৬

৪. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *শরীয়ত ও ত্বরীকত কা তালাযুম* (ঢাকা : মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭-৮

মতের ইমামকে জুমার নামায ও ঈদের নামায পড়াতে দেয়নি। আর যে স্থানে যে দলের শক্তি বেশি ছিলো সেখানে ভিন্ন মতের মৃতদের দাফন পর্যন্ত করতে দেয়নি। এ সময় শায়খুল হাদীসের নিকট প্রচার পত্রাবলী আসতো। পৃথক পৃথক উত্তর দেয়া কষ্টসাধ্য ছিলো। এতদস্বত্ত্বেও কারো কারো পত্রের জবাব লিখতে হতো। আমার এক প্রিয়জন সব পত্রগুলো ঘেটে সেগুলোর প্রশ্নগুলোকে একসাথে জমা করে একসাথে উত্তর প্রদানের অনুরোধ করে। আমি পৃথক পড়ৃথক উত্তর লেখার চেয়ে একসাথে উত্তর দেয়াকে সহজ মনে করলাম। ২৯ শা'বান ১৩৫৭ হিজরী সনে এর কাজ সম্পন্ন হয়।

এরপর এ ধরনের প্রশ্নের জবাব চেয়ে লেখা প্রতিটি চিঠির উত্তরে লিখাতম যে, বিস্তারিত আলাপ মৌখিক হবে। মৌখিক আলাপের জন্য কেউ আসলে তার হাতে খাতা ধরিয়ে দিতাম। তখন সে তার সকল প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতো। এ কথা ঘটনাক্রমে চাচাজান মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী জানতে পেরে তা ছাপানোর অনুরোধ করেন। একপর্যায়ে মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী মির এল. আলী সাহেব এবং শাহ মাসউদ হাসানকে তা ছাপানোর নির্দেশ দেন। আমি এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করলাম যে, অন্য কারো ছাপানোর প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই এটা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে চাই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দেখাতে চাই। কিন্তু এরপরও তাঁদের অনুরোধে কয়েকদিনের মধ্যে তা ছাপিয়ে ফেলি। মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী ছাপানোর পর কিতাবটিকে খুব পছন্দ করেন এবং সফরের ব্যাগে সবসময় এর কপি রাখতেন। এসকল বুযুর্গদেরই প্রভাবে এ গ্রন্থটি আশার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শিক্ষিত শ্রেণি এবং উলামাগণ খুব পছন্দ করেন। বিশ পঁচিশটি প্রকাশনী থেকে বহুবার তা ছেপে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।"[১] এক পর্যায়ে বাংলা ভাষায় তা ব্যাপক সুনাম অর্জন করে।

উম্মুল আমরায গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে অনেক অহংকারী ব্যক্তিকে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছে।

শায়খুল হাদীস বলেন,

উম্মুল আমরায গ্রন্থটি আমি বুযুর্গদের কিতাবাদী থেকেই এ সবকিছু সংগ্রহ করেছি। বড় বড় কিতাব পড়ে ও তা থেকে কিছু অর্জন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তা পাঠ করা এবং ঐ মৌলিক রোগের চিকিৎসা করা সহজ হবে বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অহংকারে নিন্দা সম্পর্কে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অহংকারের আলামত ও লক্ষণ সম্পর্কে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে অহংকারের চিকিৎসা ও জরুরি সতর্কবাণী সম্পর্কে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তিদের চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদকর্ম করেছেন, সওতুল হেরা রহমানিয়া মাদরাসা, আরীচপুর, টঙ্গী'র শিক্ষক মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন। গ্রন্থটি ২০১১ সনে প্রথম প্রকাশ করেন এবং ২০১২ সনে দ্বিতীয় প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের নিকট ভুয়ূসী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

---

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আল-ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল* (ঢাকা : মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ০৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফাযায়েলে আ'মাল ও হাদীসের তাহকীক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফাযায়েলে আ'মাল ও হাদীসের তাহকীক

ফাযায়েলে আ'মাল (*فضائل الأعمال*)

'*মাজমূ'আয়ে ফাযায়েলে আ'মাল*' (আমলের ফযিলতসমূহ) গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। এ গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত হলেও পৃথিবীর প্রায় ৩১টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির ব্যাপারে অনেক আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। এ পূর্ণ কিতাব যা "*ফাযায়েলে 'আমাল*" বা "*তাবলীগী নেসাব*" নামে প্রসিদ্ধ, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) কোনো সুশৃংখল পরিকিল্পনার প্রেক্ষিতে সংকলন করেননি; বরং বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও বিষয়বস্তুর উপর অনেকের পিড়াপিড়িতে সংকলন করেছিলেন। আর এটাকে তাবলীগের দায়িত্বশীলরা দাওয়াতী কাজে বের হওয়া বন্ধুদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এজন্যই কিছু প্রকাশক এ ফাযায়েল সমষ্টিকে "*তাবলীগী নেসাব*" নামে প্রকাশ করে ফেলেছেন।

অনেক দিন পর্যন্ত এ নামেই চলছিল, পরবর্তীতে বিষয় বস্তুর প্রেক্ষিতে "*ফাযায়েলে 'আমাল*" নামে মুদ্রিত হতে লাগল। নয়টি কিতাবের এ সমষ্টির একেকটির সংকলন ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়াদির সামান্য কিছু নিম্নরূপ–

ফাযায়েলে কুরআন

হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর একজন খলীফা ছিলেন শাহ ইয়াছিন নগিনবী (রহ.) সাহেব, যিনি প্রতি বছর মাযাহিরে উলূম মাদরাসার বার্ষিক জলসায় আসতেন। তিনি ২৭ জিলকদ ১৩৪৭ হিজরী সনে বার্ষিক জলসা থেকে ফেরার সময় শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবীকে ফাযায়েলে কুর'আন সম্পর্কিত কিছু লিখার অনুরোধ করেন। তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ১৩৪৭ হিজরী জিলহজ্ব মাসের প্রারম্ভে এটির সংকলন শুরু হয়েছিল। আর ১৩৪৮ হিজরীর ২৯ জিলহাজ্ব এ তা সমাপ্ত হয়। এ গ্রন্থটি ফাযায়েলের প্রথম গ্রন্থ।[১]

ফাযায়েলে রমাযান

এ গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) তাঁর চাচা তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) এর নির্দেশে ১৩৪৯ হিঃ রমাযান মাসে সংকলন করেন এবং ২৭ রমাযান গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।[২]

ফাযায়েলে তাবলীগ

এ গ্রন্থটিও শায়খুল হাদীস (রহ.) তাঁর চাচা মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবী (রহ.)-এর নির্দেশে লিখেছিলেন। মাত্র কয়েকদিনে তিনি এ গ্রন্থটি সফর মাসের ৫ তারিখ, রোজ সোমবার, ১৩৫০হিজরীতে সম্পন্ন করেন।[৩]

---

১. হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী, *আপবীতী* অনুঃ মু. অছিউর রহমান (ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০১৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩

৩. হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭

ফাযায়েলে নামায

এ গ্রন্থটিও শায়খুল হাদীস (রহ.) তাঁর চাচা মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবী (রহ.)-এর নির্দেশ পালনার্থে লিখেছিলেন। ১৩৫৮ হিজরীর ৭ মুহাররমে রোজ সোমবার রাতে সম্পন্ন করেন।[১]

ফাযায়েলে হজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউছুফ (রহ.) যখন হেজাযে তাবলীগের কাজ জোরদার করেন তখন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-কে ফাযায়েলে হজ্জ সম্পর্কিত গ্রন্থ সংকলনের জন্য প্রচণ্ড পিড়াপিড়ি করেছিলেন। শায়খুল হাদীস ৩ শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরীতে এ গ্রন্থটির কাজ শুরু করেন। আর ১৪ জুমাদাল উলা ১৩৬৭ হিজরীর রোজ শুক্রবার সমাপ্ত করেছিলেন। কিতাবের মূল সংকলনের কাজ মারকাযে নেজামুদ্দীনে থাকাবস্থায়ই হয়েছিল। কেননা, ১৯৪৭/১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দের হাঙ্গামার কারণে শায়খুল হাদীস (রহ.)-কে ৪ মাস পর্যন্ত মারকাযে নেজামুদ্দীনে অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছে। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) নিজেই বলেন, মূল রচনা তো শাওয়াল মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরো কিছু ঘটনা সাহরানপুর যাওয়ার পর এ গ্রন্থে বর্ধিত করা হয়েছে। এ রচনাটির গ্রহনযোগ্যতা ও উপকারিতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) বলেন, হাজারো চিঠি-পত্র এ বিষয়ে পৌঁছল যে, এ রচনা দ্বারা হাজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে মদীনায় অনেক স্বাদ অনুভূত হয়েছে।[২]

ফাযায়েলে সাদাকাত

চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.)-কে আরো দুটি কিতাব লিখার তাগাদা দিয়েছিলেন। প্রথমটি *ফাযায়েলে যাকাত*, দ্বিতীয়টি *ফাযায়েলে তিজারত* (ব্যবসা)।

একদিন 'আসরের নামাযের ইকামত হচ্ছিল, এমন সময় চাচাজান সামনের কাতার থেকে মুখ বের করে বলেন, কিতাব দুটির কথা মনে রেখ, ভুলবে না। ১৩৬৬ হিজরী সনে শাওয়াল মাসে দেশ বিভাগের হাঙ্গামার কারণে চারমাস নিযামুদ্দীনেই আটকা পড়ি। এ সময়টাতে *ফাযায়েলে হজ্জ* সম্পন্ন করে *ফাযায়েলে সাদাকাতের* কাজ শুরু করি। সাহারানপুর ফিরে আসার পর ২২ সফর ১৩৬৮ হিজরী সনে এ গ্রন্থটি সম্পন্ন হয়।[৩]

ফাযায়েলে দরূদ

ফাযায়েলে ধারায় এটি সর্বশেষ রচনা। এটি তিনি হযরত গাঙ্গুহীর অন্যতম খলীফা শাহ্ ইয়াছীন নগিনবী (রহ.)-এর নির্দেশে ও তার প্রচণ্ড অভিলাষ পুরনার্থে লিখেছিলেন। শাহ্ ইয়াছীন সাহেব ৩০ শাওয়াল ১৩৬০ হিজরীতে রোজ বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু শয্যায় শাহ্ ইয়াছীন সাহেব তাঁর বিশিষ্ট খলীফা ও খাদেম 'আবদুল 'আযীয দেহলবীকে ডেকে এ ওসিয়্যত করেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পরেও মাওলানা যাকারিয়ার কাছে কিতাবটি লিখার আবেদন করতে থাকবে। তিনি আমার অনুরোধে *ফাযায়েলে কুর'আন* লিখেছেন। অতএব, ফাযায়েলে দুরূদও যেন তিনি লিখে দেন।[৪]

---

১. মু. অছিউর রহমান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫
২. মু. অছিউর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬
৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬
৪. হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫১

হযরত শাহ্ ইয়াসিন সাহেবের ইনতিকালের পর শাহ্ 'আবদুল 'আযীয বারংবার আমাকে এ গ্রন্থটি রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং জোর তাগিদ দেন। কিন্তু সময় সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ১৩৮৩ হিজরীতে হজ্জের সময় মদীনায় অবস্থানকালে এর ভীষণ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ২৫ রমযানে ১৩৮৪ হিজরীতে গ্রন্থটি লেখার কাজ বিসমিল্লাহ্ করি এবং ৬ জিলহজ্জ ১৩৮৪ হিজরীতে শেষ করি। এ সময় মাওলানা ইউসুফের মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম পেয়ে নিজ জীবনের প্রতি এমন নিরাশ হয়ে গেলাম যে, নিজের অজান্তেই বেশ কয়েকদিন লেখালেখি বন্ধ হয়ে থাকে।

ফাযায়েলে যিক্র্

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী (রহ.) এ গ্রন্থটিও তিনি তাঁর চাচার নির্দেশে লিখেছিলেন। ২৬ শাওয়াল ১৩৫৮ হিজরী শুক্রবার রাতে সম্পন্ন করেন।[১] *ফাযায়েলে আ'মাল* কিতাবটি একটি কিতাব নয় বরং কয়েকটি কিতাবের একত্রিত রূপ। *ফাযায়েলে যিক্রের* কয়েকটি হাদীসের তাখরীজ বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

তবে তাখরীজের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করেছি তা হলো, ফাযায়েলের যিক্রের উল্লিখিত হাদীস নাম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হবে। উক্ত হাদীসের অধীনে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে ক, খ, গ, অনুসারে আরবীতে মূল মতনসহ বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক এ হাদীসেরও তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হবে।

তাহকীকের ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, যে হাদীসগুলো মুত্তাফাকুন আলায়হি (*বুখারী* ও *মুসলিম*) এগুলোর তো হুকুমের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এ ধরনের হাদীস সবগুলোই সহীহ। এছাড়া অন্য হাদীসগুলোতে বিশেষভাবে তাহকীক করার পর হুকুমটিই শুধু উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ্।

ফাযায়েলে যিক্র

হাদীস নং ১

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خيرٌ منهم، وإن تقرَّبَ إِلَيَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا، وإن أتاني يمشى أتيتُه هرُولةً.

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (হাদীসে কুদসী) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার সাথে ঐ রূপ ব্যবহার করে থাকি, যেরূপ সে আমার সাথে ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি। অতএব, সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমার যিকির করে তবে আমি ঐ মজলিসে তার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসতে থাকে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।"[২]

---

১. হাফেয মাওলানা মুফতী মুশফিকুর রহমান অনূদিত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯

২. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ১১২৫ ; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৭৭৪; *ইবন মাজাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮ ; *ইবন হিব্বান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭ ; *মুসনাদে বাযযার*, হাদীস নং ৩০৬৫; *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ*, ১০/৭৮; *তারগীব* ২/২৫২; হাদীসটি সহীহ।

(ক) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخل على شابٍّ وهو في الموتِ فقال كيف حالك؟ قال والله يا رسُولَ الله! إِنِّيْ أرجو اللهَ، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتجمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطنِ، إلا أعطاه اللهُ ما يرجو، وآمنهُ ممَّا يَخَافُ.

"রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক নাওজোয়ান সাহাবীর মৃত্যুশয্যায় তার নিকট তাশরীফ আনলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী অবস্থায় আছো? সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গুনাহের কারণে ভয়ও করছি। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এরূপ অবস্থায় যার অন্তরের মধ্যে এ দুটি বস্তু থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আশাকৃত বস্তু দান করেন এবং ভয় হতে তাকে নিরাপত্তা দান করেন।"[১]

(খ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عَن عبد الله بن مسعود عنه موقوفا قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأن قاعد تحت جبلٍ يخاف أن يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত, মুমিন বান্দা আপন গুনাহকে এমন মনে করে, যেনো সে একটি পাহাড়ের নিচে বসে আছে। আর পাহাড়টি তার উপর ভেঙে পড়ার আশংকা। অন্যদিকে ফাসিক ব্যক্তি গুনাহকে এমন মনে করে, যেনো তার উপর একটি মাছি বসল আর সে তা তাড়িয়ে দিলো।"[২]

আলোচ্য হাদীসটির মতন *সহীহুল বুখারী*'র। তবে *জামি'উত তিরমিযী*তে হাদীসটির শেষে **فطار** শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। যার দ্বারা উর্দূতে লেখা হাদীসের মর্ম স্পষ্ট হয়েছে।

(গ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ من احسن الناس وجها وخلقا واسمهم كفا، ولما وقع الطاعون بالشام قال معاذ الله! اللهم ادخل على آل معاذ نصيبهم من هذا، فطعنت له امرأتان فماتتاثم طعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم طعن معاذ فجعل يغشى عليه فاذا افاق قال رب غمك فوعزتك انك تعلم اني احبك، ثم يغشى عليه، فاذا افاق قال مثله ولما حضرته الوفاة قال مرحبا بالموت مرحبا زائر حبيب جاء على فاقة، اللهم انك تعلم اني كنت اخافك وأنا اليوم ارجوك اني لم اكن احب الدنيا، وطول البقاء فيها لكرى الانهار ولا نعرس الاشجار ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر.

---

১. *জামি'উত্ তিরমিযী*, হাদীস নং ৯৮৩; *ইব্ন মাজাহ*, হাদীস নং ৪২৬১; *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯২; হাদীসটি হাসান।

২. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬৩০৮; *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪৯৭; হাদীসটি সহীহ।

"হযরত মা'আয (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) প্লেগ রোদে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের নিকটবর্তী সময় তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। কখনও হুঁশ ফিরে এলে বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মুহাব্বত করি। আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার এ মহব্বতের বিষয় আপনার জানা আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেলো তখন বললেন, ওহে মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হোক। কতই না মুবারক মেহমান আগমন করেছে; কিন্তু এ মেহমান অনাহার অবস্থায় এসেছে। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করেছি। আর আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ্ ! আমি জীবনকে মহব্বত করেছি, কিন্তু তা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরি করার জন্য নয়; বরং গরমে (রোযা রেখে) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকরের মজলিসে ওলামায়ে কিরামের নিকটে জমে বসার জন্য।"[১]

(ঘ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বান্দা যখন এ কথা বলে যে, আমার দু'আ কুবল হয় না। ঠিক তখনি তার দু'আ কবুল হয়।"[২]

(ঙ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

من اصابته فاقته فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى : اما بموت عاجل او غنى عاجل.

"যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে লোকদের নিকট বলে বেড়ায়, তার সচ্ছল অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আকুতি মিনতি ও দু'আ করে তবে অতি সত্বর এ অবস্থা দূর হয়ে যায়।"[৩]

হাদীস নং ২

عَنْ عبد الله بسر أنَّ رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فاخبرنى بشئ استن به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.

"হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসর (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শরীয়তের হুকুম তো অনেক আছে, তন্মমধ্য হতে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যার

১. তাহযীবুল কামাল, ২৭তম খণ্ড, পৃ ২৯৮; হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তাই হাদীসটি সহীহ।
২. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৬৩৪ ; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৭৩৫; *সুনানু আবী দাঊদ*, হাদীস নং ১৪৮৪; *জামি'উত্ তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৮৭; *ইব্ন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৮৫৩
৩. *সুনানু আবী দাঊদ*, হাদীস নং ১৬৪৫ ; *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩২৬; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৩৬৯৫; *তাবারানী কাবীর*, হাদীস নং ২৭৮৫; *বায়হাকী কুবরা*, হাদীস নং ৭৮৬৯

ওপর আমি সবসময় আমল করতে পারি। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্র যিক্র দ্বারা তুমি তোমার জিহ্বাকে সর্বদা ভিজিয়ে রাখো।"[১]

এখানে তিনি আরেকটি হাদীস বর্ণনা করে অতঃপর ব্যাখ্যার হাদীস পেশ করেছেন,

أن معاذ بن جبل قال لهم ان آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلت اى الاعمال احب الى الله قال ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله.

হযরত মু'আয (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) বলেন, বিদায়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমার সর্বশেষ কথা এ কথা হয়েছিলো যে, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্র যিকিরে তোমার জিহ্বা তরতাজা অবস্থায় যেনো তোমার মৃত্যু হয়।"[২]

(ক) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

إنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربع من اعطيته فقد اعطى خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرًا، ولسانا ذاكرا، وبدن على البلا صابر وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسها ولا ماله.

"রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি ঐগুলোর অর্জন করতে পারে, সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ হাসিল করতে পারবে। (১) এমন জিহ্বা, যা সবসময় আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকে। (২) এমন কলব, যা সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার শোকরে মশগুল থাকে। (৩) এমন শরীর, যা কষ্ট সহ্য করতে পারে। (৪) এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হিফাযত করে এবং স্বামীর সম্পদে খিয়ানত করে না।"[৩]

(খ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : علامة حب الله ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله.

হযরত আনাস (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুহাব্বতের আলামত হলো তাঁর যিক্রকে

---

১. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৭৫; *ইব্ন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৭৯৩; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৭৬৯৭; *মুসতাদরাকি হাকিম*, হাদীস নং ১৮২২; *বায়হাকী কুবরা*, হাদীস নং ৬৫২৬; *মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বা*, হাদীস নং ২৯৪৪৪

২. *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, হাদীস নং ৮১৮; *তাবরানী কাবীর*, হাদীস নং ২১২; *মাজমা'উয যওয়াইদ*, হাদীস নং ১৬৭৪৭; *মাজমা'উয যাওয়াইদে* হাদীসটিকে সহীহ বলা হয়েছে।

৩. *শু'আবুল ঈমান বায়হাকী*, হাদীস নং ৪৪২৯; *তাবারানী কাবীর*, হাদীস নং ১১২৭৫; *মু'জামুল আওসাত*, হাদীস নং ৭২১২; *মাজমা'উয যাওয়াইদ*, হাদীস নং ৭৪৭

মুহাব্বত করা, আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্বেষের আলামত হলো তাঁর যিক্‌রের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা।"[১]

(গ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ-

عَنْ أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا قال : إن الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهو يضحكون.

"হযরত আবু দারদা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) বলেন, যাদের জিহ্বা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র দ্বারা তরুতাজা থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

হাদীস নং-০৩

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبيكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله.

"হযরত আবূ দারদা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একবার সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলে দেবো, যা সকল আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরোয়ারদিকারের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে করবে অনেক বুলন্দ, আল্লাহ্ তা'আলা রাস্তায় সোনা-রুপা খরচ করা হতেও অনেক দামি এবং জিহাদের ময়দানে তোমাদের দুশমনকে কতল করো আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে তা থেকেও উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, অবশ্য বলে দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তা হলো আল্লাহ্‌র যিক্‌র।"[৩]

(ক) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ-

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ان لكل شيء صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله.

"হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসকে

---

১. *শু'আবুল ঈমান বায়হাকী*, হাদীস নং ৪১০; *মু'জামু ইব্‌ন মুকরী*, হাদীস নং ৯৪৬, *আমলী ইব্‌ন বুশরান*, হাদীস নং ১৬০৯ হাদীসটি হাসান।

২. *মুসান্নাফু ইব্‌ন আবী শায়বা*, হাদীস নং ৩০০৭২; *কানযুল উম্মাল*, হাদীস নং ১৮০৯; এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সহীহ।

৩. *জামি'উত তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৭৭; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, হাদীস নং ৩৭৯০; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২১৭৬০; *মুসতাদরাকি হাকিম*, হাদীস নং ১৮২৫; ইমাম হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পরিষ্কার করার এবং ময়লা দূর করার বস্তু আছে। (যেমন কাপড় ও শরীরের জন্য সাবান, লোহার জন্য আগুনের ভঁট্টি ইত্যাদি) আর অন্তরের ময়লা দূরকারী হলো আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র।"[১]

(খ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل أيُّ العمل أفضل؟ قال اما تقرأ القرآن؟ "ولذكر الله اكبر" لا شيء أفضل من ذكر الله.

"হযরত সালমান ফারসী (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি বললেন, তুমি কি কুর'আন মাজীদ পড়োনি? কুর'আন মাজীদে আছে ولذكر الله اكبر আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো জিনিস নেই।"[২]

(গ) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন। হাদীসটি মূলপাঠ ও অর্থ নিম্নরূপ–

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাযী 'আল্লাহু 'আনহু) রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, এক মুহূর্ত যিক্র করা ষাট বছরের ইবাদত থেকে উত্তম।"[৩]

আমি আমার গবেষণায় উপরিউক্ত হাদীসগুলোর বিশ্লেষণ করে এ কথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, শায়খুল হাদীস একটি হাদীস বর্ণনা করে আরেকটি হাদীস দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং ফায়দা উল্লেখ করে পৃথকভাবে তিনি বিভিন্ন হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে হাদীস চর্চায় তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা সকলের নিকট সমাদৃত।

---

১. *শুআবুল ঈমান বায়হাকী*, হাদীস নং ৫২২; *কানযুল উম্মাল*, হাদীস নং ১৭৭৭
২. *মুসান্নাফু ইব্ন আবী শায়বা*, হাদীস নং ৩০৯৩৯; *তাফসীরে ইব্ন জারীর আত্-তাবারী*, হাদীস নং ২৭০৮
৩. *ইব্ন হিব্বাস*, হাদীস নং ৪২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারতবর্ষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যুগে যুগে অসংখ্য নি'আমত বর্ষণ করেছেন। এ নি'আমত বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সে নি'আমতের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে একটি নি'আমত হলো, যুগে যুগে বাইরে থেকে এমন কিছু পরিবার হিজরত করে এদেশে নিবাস গড়েছেন, যারা এদেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যাঁদের অবদানে এদেশে জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, আত্মশুদ্ধি ও মানবসেবার মতো জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে; যাঁদের কারণে এ ভারতবর্ষের সুনাম-সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সে পরিবারগুলোর তালিকার শীর্ষসারির একটি পরিবারের নাম হলো কান্ধালার শায়খ পরিবার।

এ পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকেই ছিলেন একটি করে সূর্য; যাঁরা তাদের জীবনে এদেশে দীন, ঈমান, কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলো ছড়িয়েছেন; দাওয়াত ও সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন। মানবসেবার সে কন্টকাকীর্ণ পথে তারা যে চেষ্টা ও সাধনা করেছেন; তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এতোটাই কবুল ও পছন্দ হয়েছে যে, তার দ্বিতীয় কোনো নযির অন্য কোনো পরিবার দেখাতে পারবে না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো– মুফতী এলাহী বখ্শ্ কান্ধালবী, মাওলানা ইসমা'ঈল কান্ধালবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কান্ধালবী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধালবী, মাওলানা ইলিয়াস কান্ধালবী ও অত্র অভিসন্দর্ভের অগ্রনায়ক শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধালবী।

শায়খুল হাদীসের চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধালবী ছিলেন সংস্কারমূলক আন্দোলন তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সংস্কারমূলক তাবলীগ জামা'আতের জন্য '*তাবলীগী নেসাব*' নামে একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেছেন। পরবর্তীতে তাবলীগী নেসাব নামক গ্রন্থটি '*ফাযায়েলে আ'মাল*' নামে নামকরণ করা হয়। এ গ্রন্থটি সকলের নিকট সমাদৃত। বিশ্বের বহু মসজিদে প্রত্যহ এ কিতাবের তা'লীম হয়।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধালবী হাদীস চর্চায় যে অবদান রেখেছেন, অত্র অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সকল আলোচনা, প্রকৃতি নিরূপণ ও মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় বলতে চাই যে, আমার এ অভিসন্দর্ভে আলোচিত মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে আশা করি মুসলিম সমাজে হাদীস চর্চার প্রভাব ফেলবে। এমনকি জাল হাদীস থেকে বেঁচে রাসূলের সুন্নতের উপর আমলের আগ্রহ বাড়বে। আমি আশা করি, আমার এ

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে দেশ, জাতি, আপামার জনসাধারণ সকলেই হাদীস চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে। এ মনীষীর জীবন ও হাদীস চর্চা আমাদের অমূল্য পাথেয় হিসেবে গ্রহণীয় হোক–এটাই সময়ের মৌলিক চাহিদা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাম্‌দ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যিনি আমাকে অত্র অভিসন্দর্ভটি রচনা ও সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। গবেষণাকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং জাতি এর মাধ্যমে উপকৃত হোক এটাই আমার প্রার্থনা। ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সায়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালীন, ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন।